ব্রহ্মস্তুতি
অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রহ্মস্তুতি

অধ্যাপিকা রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীপঞ্চমী ১৪০৬ সন

প্রকাশক ঃ
বিভূতি ভূষণ সরকার
পি ৮২ সি আই টি রোড,
স্কিম নং ৬ এম
কলিকাতা-৭০০০৫৪

মুদ্রণে ঃ
অবিনাশ রায়
শান্তি প্রেস
১ নারিকেল ডাঙ্গা নর্থ রোড
কলিকাতা-৭০০০১১

প্রাপ্তিস্থান ঃ
শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
বাগানিয়া পাড়া, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

প্রকাশকের নিকট

মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য ঃ একশো টাকা মাত্র

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি

উৎসর্গ

নূতন চোখে নূতন আলোয় এই গ্রন্থ প্রকাশনের
পিছনে যার অতুলন অবদান সেই আমার
পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ কেশবের
শ্রীকরকমলে—

শুভার্থিনী
রমা পিসিমা

স্মরণীয় বরণীয়

কবির কথায়—

হারায়ে লাভে মূলে
মরণের সিন্ধুকূলে
পথশ্রান্ত দেহখানি
টানিয়া এনেছি হায়—

জীবনের শেষপ্রান্তে পেঁছে আজ স্মৃতিপটে অনেককেই মনে পড়ছে—পারমার্থিক ঐহিক সম্পর্ক নিয়ে যাঁদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়, একান্ত আন্তরিকতা যাঁদের স্নেহধারায় সঞ্চিত হয়েছে, জীবন যাঁদের কৃপাপরশে পুষ্টিলাভ করেছে, আত্মা প্রতিক্ষণে যাঁদের লালন পালন অনাবিল তৃপ্তিতে ভরিয়ে দিয়েছে হৃদয়—তাঁদের সকলকে আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবিনম্র প্রণাম অশেষ প্রীতি ভালবাসা এই গ্রন্থ প্রকাশনে জানিয়ে রাখি—কারণ আর সময় হয় কি না হয়।

তাঁদের সকলের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রীতি ভালবাসা জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রার্থনা করি।

কৃপাধন্যা
রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীধাম নবদ্বীপ
"রবীন্দ্র নিকেতন"
বাগানিয়া পাড়া
জেলা—নদীয়া
পিন্—৭৪১৩০২

প্রণতি

সর্ব্বশাস্ত্রমুকুটমণি সর্ব্ববরেণ্য শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে দশম স্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে শ্রীশুকদেবের মণীষায় স্থান পেয়েছেন এই ব্রহ্মস্তুতি। এই ব্রহ্মস্তুতি চল্লিটি মন্ত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ একখানি শাস্ত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র স্বয়ং ভগবান শ্রীগোবিন্দের স্তুতিতে ভরা। কিন্তু ব্রহ্মস্তুতির বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে বৈষ্ণব-দর্শনের যত কিছু সিদ্ধান্ত পরিবেশিত হয়েছে। স্তুতি করছেন বাক্‌পতি বেদবক্তা লোকপিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা চতুরানন ব্রহ্মা আর শ্রোতা হচ্ছেন—ব্রজের শ্রীবালগোপাল যশোদাদুলাল পিতা নন্দের নয়নানন্দ মা যশোদার নীলমণি। স্তুতিবাক্য ভগবানের বড় প্রিয়—স্তুতি শুনে ভগবান মৃদু হাসেন, কথা বলেন—ঈষৎ কটাক্ষে প্রসন্নহাসারুণলোচনে ভক্তগণকে পরম তৃপ্তি দান করেন—এ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। তাই স্তুতি বা বন্দনা নববিধা ভক্তি অঙ্গযাজনের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু ব্রহ্মস্তুতি এমন একটি স্তুতি যেখানে ব্রহ্মা একক বক্তা আর শ্রোতা শ্রীবালগোপাল সম্পূর্ণ নীরব। শ্রোতা একটি কথাও বলেন নি—শুধু তাই নয়—একটু মৃদু হাসি ঈষৎ কটাক্ষে ব্রহ্মার প্রতি কোনও প্রসন্নতাই দেখান নি। ভাবের গাম্ভীর্য্যে আছেন। এতে বিস্মিত হতে হয়। কারণ শ্রোতার দিক থেকে প্রশ্ন বক্তাকে মুখরীকৃত করে। যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বক্তা আর পরমপ্রিয় সখা অর্জ্জুনদেব শ্রোতা—অর্জ্জুনের মাঝে মাঝে প্রশ্ন ভগবানকে কথা বলায় সহায়তা করেছে। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায় শ্রীশুকে পরীক্ষিৎ সংবাদে বেশীর ভাগ অধ্যায়ের প্রথমেই মহারাজ পরীক্ষিতের আকুল আগ্রহে প্রশ্ন আছে—যার ফলে শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখপদ্ম থেকে লীলাকথা মধু অনন্তধারে ঝরে পড়েছে—শ্রীশুকমুখচন্দ্রমা থেকে অজস্র অমৃতধারার ক্ষরণ হয়েছে। কিন্তু

ব্রহ্মস্তুতিতে দেখা যায় সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। এর অবশ্য একটি আপাত কারণ আছে। কারণ ব্রহ্মা অপরাধী। ভগবানের ভগবত্তার পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর বালকবাছুর অপহরণ—যার ফলে ভগবানের ব্রহ্মমোহন লীলা। ভগবানকে পরীক্ষা করা—এতো মহান্ অপরাধ। ব্রহ্মা সেই অপরাধে অপরাধী। অপরাধীর প্রতি প্রসন্নতা দেখান উচিত নয়—কারণ তাহলে অপরে অপরাধ করতে সাহস করবে। এজন্য যদি ভগবান নীরব আছেন বলা যায়—তাহলেও সদুত্তর হল না। কারণ লীলায় যমলাৰ্জ্জুন নলকুবর মণিগ্রীব দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। সেখানে তাঁরা তিনটি অপরাধ একসঙ্গে করেও ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করেছেন। তাঁরা মন্দাকিনীর জলে নেমেছেন—মদ্যপান করে উলঙ্গ হয়ে এবং বারবণিতার দল সঙ্গে নিয়ে—এতো বড় অপরাধ। কিন্তু শ্রীবালগোপাল তখন মায়ের বন্ধনে বাঁধা—তবু সেই অবস্থায় নলকূবর মণিগ্রীবের সঙ্গে মৃদু হেসে অনেক কথা বলেছেন—প্রসন্নতা দেখিয়েছেন—এখানে তো অপরাধ গণনা করেন নি—করলে এখানেও নীরব থাকতেন। এখানে ভগবান অপরাধের দিকটি দেখেন নি—ভক্ত মর্য্যাদার দাম দিয়েছেন। নলকুবর মণিগ্রীব ভগবানের প্রিয়তম দেবর্ষিপাদ নারদের কৃপা পেয়ে ভগবানের কাছে এসেছেন—তাই ভগবান খুব সন্তুষ্ট। কিন্তু বাক্‌পতি ব্রহ্মা পদমর্য্যাদায় উঁচু হলেও তাঁকে ভক্তকৃপা স্পর্শ করে নি—ভক্তকৃপা ছাড়াই ব্রহ্মা ভগবানের কাছে এসেছেন—তাই ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হতে পারেন নি—ব্রহ্মার হৃদয় অভিমানেই ভরা ছিল—তবে ভগবানের কৃপায় সে অভিমান চূর্ণ হয়ে চিত্ত দীনাতিদীন হয়েছে। ব্রহ্মার উপরে ভগবানের এ কৃপা হওয়ার কারণ গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে—তাই এখানে আর পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই।

ব্রহ্মার বেদসার স্তুতিতে ভগবানের নীরবতার কারণ আমরা দেখলাম। কিন্তু সত্যিই কি এখানে ভগবান নীরব বা মৌনমুখর? তা না হলে ব্রহ্মা স্তুতি প্রসঙ্গে যে সব সুসিদ্ধান্ত পর পর করেছেন

—যাতে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র যে নিগমকল্পতরুর গলিত ফল অর্থাৎ সুসিদ্ধান্তিত শাস্ত্র বলা হয়েছে তা সার্থক হয়েছে—এটি ভগবানের কৃপা ছাড়া তো সম্ভব হতে পারে না। এই চতুর্বদন ব্রহ্মাকেই তো ভগবান চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করেছেন দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে—সেখানে প্রথমেই বলেছেন—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥ ২।৯।৩০

ভগবানের ব্রহ্মাকে দেবার গরজ—কথাতেই বুঝা যাচ্ছে—'গৃহাণ' —ব্রহ্মার নেবার গরজ নেই। ভগবান বলছেন—ব্রহ্মন্, তোমাকে আমি জ্ঞান দিচ্ছি—তুমি গ্রহণ কর। এ জ্ঞান ঘটপটাদির জ্ঞান বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান নয়—এ হল আমার জ্ঞান অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী জ্ঞান—তাই পরমগুহ্য। কিন্তু শুধু জ্ঞান হল পরোক্ষ জ্ঞান—তাই তার সঙ্গে তোমকে দিচ্ছি বিজ্ঞান—অর্থাৎ অনুভব। কারণ অনুভব ছাড়া শুধু পরোক্ষ জ্ঞানলাভের কোন সার্থকতা নেই। আবার সে অনুভব তো প্রেমছাড়া সম্ভব নয়—তাই তোমাকে এই অনুভবের সঙ্গে প্রেমও দিচ্ছি—সরহস্য এখানে রহস্য পদে শ্রীধরস্বামিপাদ প্রেম অর্থই করেছেন। রহস্য অর্থাৎ গোপ্য—প্রেম তো গোপনীয় বটেই। শ্রীল ঠাকুরমশাই বললেন—

রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া।

প্রেমলাভ ভগবানের কৃপাতেই হবে—কৃপা ছাড়া শুধু সাধনে প্রেম হয় না। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলেছেন—প্রেমা তু তৎ প্রসাদগম্যম্। প্রেমলাভ হল ভগবানের প্রসাদ অর্থাৎ কৃপা। তবু প্রেমের আগে তো সাধনের পর্য্যায় আছে। তাই ভগবান ব্রহ্মাকে প্রেম দেবার সঙ্গে সাধনও দিয়েছেন—যেটি তদঙ্গঞ্চ পদে উল্লেখ করেছেন। তাহলে ব্রহ্মা ভগবানের কাছে জ্ঞান বিজ্ঞান (অনুভব) রহস্য (প্রেম) এবং অঙ্গ (সাধন)—এত কৃপা পেয়েছেন। চতুঃশ্লোকী ভাগবত

উপদেশে করে ভগবান ব্রহ্মাতে বীজ বপন করেছেন—সেই বীজই পরে দীনাতিদীন চিত্ত ব্রহ্মার আটটি নয়নের অশ্রুধারায় সিঞ্চিত হয়ে আজ পত্রপুষ্পপল্লবফলে সুশোভিত সুবাসিত সুরভিত হয়ে দীর্ঘ স্তুতি ধারায় প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীবালগোপাল যেন বাইরে মৌনভাব অবলম্বন করে সর্ব্ব অন্তর দিয়ে সে অসীম মাধুরী পিয়ে পিয়ে আস্বাদন করছেন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সে আস্বাদনে এতই ভরপুর হয়ে আছেন যে এখানে বাক্যস্ফূর্ত্তি হলে সে আনন্দরস আস্বাদনের ব্যাঘাত হবে। শুধু অন্তর দিয়ে ব্রহ্মাকে আশীর্ব্বাদ করে যেন বলতে চাইছেন—ব্রহ্মন্—তোমাকে চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করা সার্থক হয়েছে। তুমি তাকে হৃদয়ে ধারণ করে তোমার এই স্তুতিবচনামৃতে আমাকে স্নাত করেছ।

মৌনদৃষ্টিতে ভগবান প্রশ্ন করছেন মাঝে মাঝে—এ কথা বলে প্রশ্ন নয়—যার ফলে ব্রহ্মার শ্রীমুখ হতে একটির পর একটি সুসিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়েছেন—শ্রীমদ্ভাগবতের নাম যে গলিতং ফলম্—আচার্য্য বেদব্যাস বললেন তাও সার্থক হল—আর আনুসঙ্গে জীবজগৎ ভক্তজগৎ সাধকজগৎ সে সুসিদ্ধান্ত লাভ করে কৃতকৃতার্থ হল।

আমার পরম পূজ্যপাদ পিতৃকল্প আজ নিত্যধামগত শিশিরকুমার ব্রহ্মচারী মহোদয়ের পরিচালিত শ্রীসুদর্শন পত্রিকায় ব্রহ্মস্তুতি দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত হয়ে আসছেন। আজ এক শুভলগ্নে আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুমহারাজের অযাচিত করুণায় 'ব্রহ্মস্তুতি' শিরোনামায় গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হলেন। এর পিছনে আছে আমার একান্ত ভক্তিভাজন অগ্রজপ্রতিম ভক্তপ্রবর নীরবদাতা শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ সরকার মহোদয়ের অনবদ্য অবদান। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর ঋণ এ জীবনে পরিশোধের নয়।

পরিশেষে শ্রীসুদর্শন পত্রিকার মুদ্রণ কাজে যিনি নিজেকে দীর্ঘকাল ব্রতী করে রেখেছেন সেই আমার পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত

অবিনাশদাদার কাছেও আমরে কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। অত্যন্ত সহনশীলতায় অতিযত্নে মুদ্রণ কাজ তিনি সুসম্পন্ন করেছেন। সকলের জন্য শ্রীগৌরগোবিন্দ চরণে তাঁদের পারমার্থিক কল্যাণ আত্যন্তিক ক্ষেম প্রার্থনা করি।

ভক্ত সুধীবৃন্দের শ্রীচরণে সভক্তি প্রণতি জানিয়ে এইটিই প্রার্থনা —তাঁরা আমার সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে নেবেন। গ্রন্থের মাধ্যমে যদি ভাগবতরস কণামাত্রও তাঁদের তৃপ্তি দান করতে পারেন তাহলেও আমি নিজেকে কৃতকৃতার্থ বলে মনে করব।

শ্রীধাম নবদ্বীপ
বাগানিয়া পাড়া
"রবীন্দ্র নিকেতন"
জেলা নদীয়া

অলমিতি
শ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপা প্রার্থিনী
রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্রহ্মস্তুতি

ব্রহ্মস্তুতি—বাক্‌পতি বেদবক্তা লোকপিতামহ সৃষ্টিকর্ত্তা। ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালের স্তুতি করছেন। ব্রহ্মার পরিচয় আরও আছে তিনি ভগবানের নাভিকমলে জন্মেছেন—ভগবানের পুত্র বলে শিষ্য বলে যাঁর পরিচয়। এই ব্রহ্মাকেই ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করেছিলেন। ব্রহ্মা হলেন দেবর্ষিপাদ নারদের পিতা, সনকাদি ঋষির পিতা। ব্রহ্মার এই স্তুতি হলেন বেদসার স্তুতি। যে স্তুতিতে বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাগবতধর্ম্মের সাত্বতধর্ম্মের সকল সুসিদ্ধান্ত সুষ্ঠু রূপে প্রকাশ পেয়েছে। ব্রহ্মা স্তুতি করেছেন নিজের প্রাণমন সমর্পণ করে, নিজেকে নিবেদন করে দীনাতিদীন হয়ে। তাঁর স্তুতির মধ্যে তাঁর হৃদয়টি গলান আছে। ভগবান শ্রীবালগোপালও মৌন হয়ে এই স্তুতিবাক্য প্রাণভরে আস্বাদন করেছেন। স্বয়ং ভগবানের স্তুতি শোনা অভ্যাস আছে, ভক্তেরও স্তুতি করা অভ্যাস আছে। এই ব্রহ্মাই অন্যত্র অনেক স্তুতি করেছেন যেমন গর্ভস্তুতি, যেটি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে প্রথমেই ভগবানের জন্মলীলা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবের মনীষায় ধরা আছে। আবার শ্রীএকাদশ স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্রহ্মা অন্যান্য দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বারকামন্দিরে এসে ভগবানের স্তুতি করেছেন, ভগবানকে প্রকট লীলা সংবরণ করবার কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে। এ সব স্তুতিতে কিন্তু ব্রহ্মার তেমন আত্মনিবেদন নেই—প্রাণগলান নেই—দীনাতিদীন অবস্থা হয় নি। সেখানে দেবতাদের মর্য্যাদা বজায় রেখে স্তুতি করেছেন। কিন্তু এখানে শ্রীগুরুকৃপায় আমাদের বর্ত্তমান যে আলোচ্যবিষয় ব্রহ্মস্তুতি এটি স্থান পেয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের দশমস্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে। এ স্তুতির পেছনে আছে একটি অভিনব ঘটনা—যেটি ব্রহ্মমোহনলীলা। ব্রহ্মাও কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝতে পারেননি। কৃষ্ণের গোপবেশ দেখে তাকে খাঁটি ভগবান বলে সংশয় জেগেছিল।

গোপবেশ দেখে গোপবালকই মনে করুন। ভগবান বলে সংশয় জাগবে কেন ? অঘাসুর বধের পর এই ঘটনাটি ঘটল।

যেদিন ব্রজলীলায় কৃষ্ণ অঘাসুর বধ করলেন—গোপবালকদের নিয়ে কৃষ্ণ তখনও অঘাসুরের পেটের ভিতর থেকে বাইরে আসেন নি —তখন অঘাসুরের আত্মা বাইরে এসে অপেক্ষা করছে—কৃষ্ণ বাইরে আসবেন তাঁর শ্রীচরণে লীন হবে বলে। তারপর কৃষ্ণ যখন বাইরে এলেন তখন অঘাসুরের আত্মা কৃষ্ণচরণে লীন হয়ে গেল অর্থাৎ মুক্তি পেয়ে গেল। কারণ ভগবানের স্পর্শ পেয়েছে অঘাসুর তার মুক্তি তো হবেই। শ্রীশুকদেব বলেছেন—

সকৃদ্ যদঙ্গপ্রতিমান্তরাহিতা মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্।
স এব নিত্যাত্মসুখানুভূত্যভিব্যুদস্তমায়োঽন্তর্গতো হি কিং পুনঃ॥ ভাঃ ১০।১২।৩৯

একবারের জন্যও কেউ যদি মনে মনে ভগবানের রূপ ধ্যান করে, ভগবান তাকে ভাগবতী গতি দান করেন। অঘাসুরের আত্মা কৃষ্ণচরণে যে লীন হয়ে গেল এটি দেখলেন আকাশমার্গ থেকে এই চতুরানন ব্রহ্মা। দেখেই তাঁর মনে সংশয় জাগল অঘাসুরের আত্মা কৃষ্ণচরণে লীন হবে কেন ? আত্মা তো ভগবানের চরণে লীন হবে আর কোথাও তো লীন হবে না। কৃষ্ণকে দেখে তো ভগবান বলে মনে হচ্ছে না। ভগবানের কোনও লক্ষণই তো তাতে দেখা যাচ্ছে না। ঐ তো পেটকাপড়ে বাঁশীটি গোঁজা, বগলের নীচে গরু তাড়াবার পাচনি, বামহাতের করতলে দইমাখা অন্নের গ্রাস আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে পিলু ফল—বালক বাছুর নিয়ে গোচারণ করছেন। তিনি খাঁটি ভগবান কি করে হবেন ? এই ব্রহ্মার মনে সন্দেহ জাগল —এখন এই সন্দেহ জাগাল কে ? দুর্জ্জয় অভিমান। অভিমান থাকতে ভগবানের তত্ত্ববোধ হয় না তাই কৃষ্ণকে সামনে দেখেও ব্রহ্মার ভগবানের তত্ত্ববোধ হচ্ছে না। কারণ অভিমান, গৌরব বোধ, লাভ

পূজা প্রতিষ্ঠা ভগবানের তত্ত্ববোধে বাধা দেয়। তাই মহাজন বলেছেন—ভক্তিপথ হলেন কোটিকণ্টকরুদ্ধ—ভক্তিপথ বড় পিছল—একটু অসাবধানেই অপরাধ পতনের ভয়। উপনিষদ বললেন—

'তদ্দূরে তদান্তিকে চ'—

ভগবান তাদের কাছে অনেক দূরে যার অভিমান আছে—আবার নিরভিমানের কাছে খুবই নিকটে। হরিভজনে হরিনাম করবার প্রথায় তাই বলা হল—

অভিমানং সুরাপানং গৌরবং শুদ্ধ রৌরবম্
প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা ত্রীণি ত্যক্ত্বা হরিং ভজেৎ।

অভিমানকে সুরাপানের মত ঘৃণা করে, গৌরববোধকে (নরক) রৌরবের মত ত্যাজ্য বোধ করে আর প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠার মত অশুচি বোধ করে হরিনাম করতে হবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্ঠকের তৃতীয় মন্ত্রে বললেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

তৃণের চেয়েও সুনীচ হয়ে তৃণ পদদলিত হলে মাথা নীচু করে কিন্তু আবার পরে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়—কিন্তু যে প্রেমলাভের আশায় হরিনাম করবে তার মাথা কখনও উঁচু করা চলবে না, এখানে 'অপি' পদের সার্থকতা। আর তরুর মত সহিষ্ণু হয়ে হরিনাম করতে হবে—বৃক্ষ যেমন কেটে ফেললেও কিছু বলে না, সহ্য করে প্রেমলাভের আশায় যে হরিনাম করবে তাকেও ঐভাবে সহ্য করতে হবে। যে যা বলে বলুক কোনও প্রতিবাদ করা চলবে না। আর নিজেকে অমানী অর্থাৎ মানশূন্য মনে করতে হবে, নিজের সম্মান আছে এটি মনে রাখা চলবে না—আর মানদ নিজেকে ছাড়া আর সকলকে সম্মান দিতে হবে। এইভাবে যারা হরিনাম করতে পারে তারা সহজে প্রেমলাভ করবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে উপলক্ষ্য করে শোনালেন—'যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয় তাহার

স্বরূপ বলি শুন রামরায়। প্রেমলাভ হলে তো ভগবানকে আস্বাদন হবেই। তাই ভক্ত আক্ষেপ করে বললেন—

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমবন্যায় জগৎ ভেসে গেল ডুবে গেল—কিন্তু আমি রইলাম বাকী রে—কারণ বন্যার জল তো উঁচু মাচাকে স্পর্শ করে না—আমি তো অভিমানের উঁচু মাচায় বসে আছি—

অভিমান মঞ্চে বসে রইলাম
ধনী মানী কুলীন পণ্ডিত

এই অভিমান মঞ্চে বসে রইলাম তাই একবিন্দু পরশ হল না রে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার অভিমান—গাঢ় অভিমান তাই কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝতে দিচ্ছে না। তখন ব্রহ্মা ভাবলেন তাহলে পরীক্ষা করতে হবে। কৃষ্ণ যদি খাঁটি ভগবান হন তাহলে তো সর্ব্বজ্ঞ হবেন। তিনি সব জানতে পারবেন। তাহলে কৃষ্ণের গোপ বালকের দল আর বাছুরের দলকে চুরি করে নিই। দেখি তো কৃষ্ণ জানতে পারেন কিনা! যদি ভগবান হন তাহলে তো সর্ব্বজ্ঞ হবেন, তাহলে তো জানতে পারবেন আর এটিও জানতে পারবেন যে আমি চুরি করেছি, তখন কি করেন দেখি তো। আমার কাছে আসবেন আমার কাছে প্রার্থনা করবেন—ব্রহ্মন, তুমি আমার বালক বাছুর চুরি করেছ দয়া করে ফিরিয়ে দাও ; যদি এরকম বলেন তাহলে বুঝব তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাহলে তো ভগবান বটেই আর যদি দেখি তিনি জানতেই পারলেন না আমার কাছে এলেন না, প্রার্থনাও করলেন না তাহলে বুঝব যে তিনি সর্ব্বজ্ঞ নন আর সর্ব্বজ্ঞ যদি না হন তাহলে খাঁটি ভগবান হবেন কি করে? এই হল ব্রহ্মার বুদ্ধি। ব্রহ্মা এইভাবে ভগবানকে পরীক্ষা করবার জন্য ভগবানের বালকের দল বাছুরের দল সব চুরি করে নিলেন—ভগবানকে পরীক্ষা করার বুদ্ধি যখনই ব্রহ্মার মনে জাগল তখনই মায়া ব্রহ্মার পিছনে লেগেছে। কারণ ভগবানকে পরীক্ষা করা, গুরুদেবকে পরীক্ষা করা, পিতামাতাকে পরীক্ষা করা মহান্ অপরাধ। ব্রহ্মা এই অপরাধে অপরাধী।

ব্রহ্মা বালক বাছুর চুরি করার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজে প্রতিটি বালক প্রতিটি বাছুর হয়ে সব সমাধান করেছেন—এইরকম লীলা প্রায় এক বছর ধরে চলেছে। প্রতিটি বালক বাছুর ভগবান নিজে হয়ে গোচারণে গেছেন আবার গোচারণ থেকে ফিরেছেন, বছর শেষ হতে আর যখন পাঁচ ছদিন বাকী তখন ভগবান নিজের স্বরূপ ব্রহ্মার কাছে প্রকাশ করলেন—ব্রহ্মা সেদিন দেখছেন গোচারণ ভূমিতে আর বালক বাছুর কেউ নেই প্রত্যেকটি বালক প্রত্যেকটি বাছুর চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছেন—প্রত্যেকে শংখচক্রগদাপদ্মধারী—প্রত্যেকে সত্য জ্ঞান আনন্দ অনন্ত রসঘনমূর্ত্তি অপূর্ব্ব তেজোময়। এত ভগবানের তেজঃপুঞ্জে ব্রহ্মা সহ্য করতে পারলেন না। চোখ ঝলসে গেল—ব্রহ্মা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন, মূর্চ্ছা যখন ভাঙ্‌ল তখন দেখেন সেই অনন্ত কোটি চতুর্ভুজ মূর্ত্তির একটিও নেই সেই আগে যাকে দেখেছিলেন একটি গোপবালক গোচারণ বেশে তিনিই দাঁড়িয়ে আছেন—আগে যাকে দেখেছিলেন পরেও তাকেই দেখলেন মাঝখানে দেখলেন অনন্ত কোটি বাসুদেব মূর্ত্তি। ব্রহ্মা অবাক্ হয়ে ভাবছেন—'এ আমি কি দেখলাম'। তবে কি কৃষ্ণ খাঁটি ভগবান? তখন ব্রহ্মার সমস্ত অভিমান চূর্ণ হয়ে গেছে চিত্তটি দীনাতিদীন হয়ে গেছে, তখনই দীননাথের কৃপা হয়ে গেল। ব্রহ্মার হৃদয়টি গলে গিয়ে নয়ন পথে অশ্রুধারায় ঝরছে। ব্রহ্মার চারটি বদন তার আটটি নয়ন, সেই আটটি নয়নের অশ্রুধারায় ভগবানের চরণ কমল ধুইয়ে দিয়েছেন, বার বার প্রণাম করেছেন ঐ চরণে—শ্রীশুকদেব বলেছেন—উত্থায় উত্থায় প্রণম্য। এক একটি মাথা দিয়ে একবার করে প্রণাম করছেন আবার উঠছেন আবার আর এক মাথা দিয়ে প্রণাম করছেন আবার উঠছেন—এইভাবে প্রণাম করে ব্রহ্মা কৃষ্ণের চরণে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে বেদসার স্তুতি করছেন।

এখন ব্রহ্মার ওপরে ভগবানের এই যে কৃপা—কারণ কৃপা ছাড়া তো তাঁর স্বরূপ অনুভব হয় না। ব্রহ্মা তো অপরাধী তাঁর এই

কৃপা পাওয়ায় সূত্র কোথায় ? অপরাধী ব্যক্তি তো দণ্ড পাবে সে তো কৃপা পেতে পারে না, অপরাধী ব্যক্তি যদি কৃপা পায় তাহলে তো অন্যলোকে অপরাধ করতে সাহস করবে। কিন্তু ব্রহ্মা কৃপা পেলেন তার একটি সূত্র আছে—

ব্রজের রমনীরা অর্থাৎ বালকদের মায়েরা নিজের নিজের ছেলেদের তো ভালবাসেই কিন্তু তার থেকেও বেশী ভালবাসে যশোদা মায়ের ছেলেকে যশোদা দুলালকে—কিন্তু তাতেও ব্রজরামাদের মন ভরে না। তাদের এক অদম্য বাসনা যদি যশোদামায়ের ছেলে আমার পেটের ছেলে হত এরকম বাসনা প্রতি ব্রজরমনীর। আবার এদিকে ব্রজের যত গাভীর দল তাদের নিজের নিজের বাছুরকে তো ভাল-বাসেই কিন্তু তার থেকেও বেশী ভালবাসে কৃষ্ণকে। প্রমাণ হবে কি করে ? দেখা যায় আমাদের দেশে গাভীর সামনে বাছুরকে রাখলে তার প্রতি স্নেহের আকর্ষণে গাভী দুধ দেয়। কিন্তু ব্রজের গাভীর স্বভাব তা নয়—গাভীর সামনে তার বাছুরকে রাখলে দুধ দেবে না কিন্তু যদি কৃষ্ণ এসে গাভীর সামনে দাঁড়ায় তাহলে দুধ দেবে কৃষ্ণের প্রতি স্নেহেতে। তাতেই প্রমাণ হচ্ছে কৃষ্ণের প্রতি গাভীদের স্নেহ নিজের বাছুরের চেয়েও বেশী। কিন্তু তাতেও তাদের মন ভরে না। তাদের মানে ব্রজের প্রত্যেক গাভীর মনে বাসনা কৃষ্ণ যদি আমার নিজের বাছুর হত, বাছুর হয়ে যদি আমার বাঁটে মুখ দিত তাহলে বড় আনন্দ হত। এখন ব্রজরমনী এবং গো রমনীর (গাভী) মনের বাসনা মানে ব্রজবাসীর বাসনা। কৃষ্ণ জগতের পূজ্য কিন্তু ব্রজবাসী কৃষ্ণেরও পূজ্য। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান তিনি সর্ব্বসামর্থ্যবান্ সর্ব্ব-শক্তিমান্ কিন্তু ব্রজরমনী এবং গো রমনীর এই যে বাসনা এটি পূরণ করতে পারছেন না। কারণ কৃষ্ণ তো যশোদামায়ের ছেলে তিনি অন্য মায়ের ছেলে হবেন কি করে ? আর গাভীদের বাছুরই বা কৃষ্ণ হবেন কি করে ? এতো অসম্ভব। তাহলে তাদের এ বাসনা জাগল কি করে ? বাসনা তো অসম্ভবই হয়, বাসনা তো কোন যুক্তি বিচার করে

না, কোন হেতু মানে না। যখন বাসনা জাগে তখন জেগেই যায়।

এখন ব্রজবাসীর এ বাসনা পূরণ করা সম্ভব হল কখন যখন ব্রহ্মা ভগবানের বালক বাছুর চুরি করলেন—তখন সমাধান করবার জন্য ভগবান কৃষ্ণই প্রতিটি বালক হয়ে এবং প্রতিটি বাছুর হয়ে মায়েদের কাছে এবং গাভীদের কাছে গিয়েছেন। প্রতি গোপরমনী কৃষ্ণকেই নিজের পেটের ছেলে করে পেয়েছেন কারণ কৃষ্ণ যখন শ্রীদাম হয়ে শ্রীদামের মায়ের কাছে দাঁড়িয়েছে তখন তো সে খাঁটি শ্রীদাম নয় সে তো কৃষ্ণ নিজে—তাই মা কৃষ্ণকেই নিজের ছেলে করে পেলেন আবার গাভীর কাছে কৃষ্ণ যখন তার বাছুর হয়ে গাভীর বাঁটে মুখ দিয়েছে তখন গাভী কৃষ্ণকেই নিজের বাছুর করে পেয়েছে। তখন তাদের বাসনা পূরণ হল—এবং ভগবান যে তাদের এই বাসনা পূরণ করতে পারলেন ব্রহ্মা বালক বাছুর চুরি করেছিলেন বলে তো। সেই সূত্রে ব্রহ্মা কৃপা পেয়ে গেছেন। কৃপার ফলে যে চিত্তের প্রসন্নতা সেটি কিন্তু ভগবান বাইরে দেখান নি। ব্রহ্মা যখন স্তুতি করছেন ভগবান একটি কথাও বলেন নি এমন কি মুখে মৃদুহাসি বা চোখের ইসারাতেও প্রসন্নতা দেখান নি গম্ভীর হয়ে আছেন—কারণ অপরাধী ব্যাক্তির কাছে প্রসন্নতা দেখাতে নেই। ব্রহ্মার স্তুতিবাক্য—

ব্রহ্মার প্রথম স্তুতি বাক্য—

নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস পরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু—
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥ ভাঃ ১০।১৪।১

বাক্‌পতি ব্রহ্মা, বেদবক্তা ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালের শ্রীচরণকমলে স্তুতি করছেন—'প্রভু, আমি তোমার চরণে স্তুতি করি—নৌমি নু ধাতু স্তুতি বুঝায়। কারণ জগতে কেউ যদি স্তুতিযোগ্য থাকে তাহলে সে হলে তুমি। কারণ জগতে তুমি হলে সকলের আশ্রয়

বিগ্রহ আর সকলে তোমার আশ্রিত। কারণ তোমার অধীন সবাই—সকলে তোমার অধীন তাই তুমি পরম স্বাধীন। স্বাধীন যে তারই স্তুতি পাবার অধিকার, অধীনের স্তুতি পাবার অধিকার নেই। তাই তোমাকেই স্তুতি করছি। শ্রীবালগোপাল অবশ্য কোনও কথা বলেন নি—কারণ ব্রহ্মার উপরে কৃপাসূত্রে তাঁর প্রসন্নতা আছে বটে কিন্তু বাইরে সে প্রসন্নতা দেখান নি। পরম গম্ভীর হয়ে আছেন—একটি কথাও বলেন নি। তবু যেন মৌনদৃষ্টিতে প্রশ্ন করছেন—'ব্রহ্মন্ তুমি আমাকে স্তুতি করছ না তো। অন্য কাউকে স্তুতি করছ।' ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু, আমি তোমাকেই স্তুতি করছি—অন্য কাউকে স্তুতি করছি না। ভগবান বলছেন, কি করে বুঝব? ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু বিশেষণ দিয়ে বললে বুঝতে পারবে যে তোমাকে ছাড়া এ স্তুতিবাক্য আর কাউকে লাগবে না—তোমাকে স্তুতি করছি তার একটি বিশেষণ 'অভ্রবপুষে' তে নৌমি। তোমার অভ্রকান্তি, মেঘের মত কান্তি—অবশ্য প্রাকৃত মেঘের সঙ্গে তোমার অঙ্গকান্তির তুলনা হয় না, তাই মহাজন বললেন—'নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম্' তোমার অঙ্গকান্তি নূতন মেঘের কান্তিকেও নিন্দা করে। তবু প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে ভগবানের রূপের তুলনা দিতে হয় কারণ অপ্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় নেই। 'অপ্রাকৃত' কথাটি আমরা কানে শুনি, জিহ্বায় উচ্চারণ করি—কিন্তু বস্তুর সঙ্গে কোন পরিচয় নেই। অপ্রাকৃত বস্তুকে আমরা হাতে পাই না—পেলেও অনুভব করতে পারি না এটি আমার নিজের কথা। কারণ বস্তু পাওয়া মানে বস্তুকে অনুভব করা। শুধু হাতে পেলেই পাওয়া হয় না। যেমন শিশু গ্রন্থ হাতে পায় কিন্তু তাকে পাওয়া বলা যায় না—কারণ বুদ্ধি দিয়ে তার অনুভব হয় না। শ্রীবালগোপাল যেন বলতে চাইছেন 'ব্রহ্মন্ মেঘের মত কান্তি তো নারায়ণেরও আছে, তাই তুমি নারায়ণকে স্তুতি করছ আমাকে স্তুতি করবে কেন? ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, আমি নারায়ণকে স্তুতি করছি না তোমাকেই স্তুতি

করছি আর একটি বিশেষণ দিয়ে বলি তড়িদম্বরায় তে নৌমি—বিদ্যুতের মত বসন যে তোমার সেই তোমাকে স্তুতি করছি—বলা আছে গোবিন্দের বসন রবিকরবরাম্বরং—সূর্য্যের কিরণের মত পীতবরণ। পীতবাস বলে কৃষ্ণ তাঁর পরিচয় দিয়েছেন—

কিশোরীদাস মুই পীতবাস ইহাতে সন্দেহ যার।
কোটিজন্ম যদি আমারে ভজয়ে বিফল ভজন তার॥

শ্রীজয়দেব কবি তার গীতগোবিন্দ কাব্যে বললেন—

পীতবসনবনমালী

তাই সেই পীতবসনধারী তোমাকেই স্তুতি করছি—নারায়ণকে স্তুতি করব কেন? শ্রীবালগোপাল বলছেন—ব্রহ্মন্ পীতবসন তো নারায়ণও পরেন সুতরাং তুমি নারায়ণকেই স্তুতি করছ আমাকে স্তুতি করছ এটি বুঝব কি করে? ব্রহ্মা বলছেন, 'প্রভু আর একটি বিশেষণ দিয়ে বলি—যে বিশেষণটি নারায়ণে যাবে না শুধু তোমাতেই লাগবে। গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসম্মুখায়—তোমারই গুঞ্জাফলের মালা শিরে শিখিপাখা—ময়ূরপাখার চূড়া মাথায়—তোমারই তো বন্যবেশ—ব্রজের কৃষ্ণ মাধুর্য্যময় শ্রীবিগ্রহ—তোমার বন্যবেশ—নারায়ণ তো ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি তাঁর তো বন্যবেশ নয়, তাঁর রাজবেশ—বক্ষে রত্নহার, মাথায় কনককিরীট, কানে কুণ্ডল। সুতরাং আমি তোমাকে ব্রজরাজনন্দনকে স্তুতি করছি। শ্রীবাল গোপাল যদি এতেও আপত্তি করেন তাই ব্রহ্মা আর একটি বিশেষণ দিয়ে বুঝাচ্ছেন 'প্রভু আর একটি বিশেষণ দিই তোমার বক্ষে বনমালা—বন্যস্রজ তো তুমিই। বনমালা তো তুমিই পর—নারায়ণ তো বনমালা পরেন না তাই তোমাকেই স্তুতি করছি। কৃষ্ণ কথা বলছেন না বটে আপত্তি করছেন না তবু যেন প্রসন্ন নন—তাই ব্রহ্মা তাঁর প্রসন্নতার জন্য আরও কিছু বিশেষণ দিচ্ছেন—কবলবেত্রবিষাণবেণু—প্রভু আমি যে তোমাকেই স্তুতি করছি তার প্রমাণ আরও দিই—এ বিশেষণ তো তুমি ছাড়া অন্য কোথাও যাবেই না—কবল বলতে অন্নের গ্রাসকে

বুঝায়। তোমার হাতেই দইমাখা অন্নের গ্রাস আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে পিলু ফল,—সখাদের সঙ্গে হাস্য পরিহাস করতে করতে ভোজন কর—সখাদের নিয়ে গোচারণ কর। নারায়ণ তো গোচারণ করেন না—অন্নের গ্রাস হাতে নিয়ে সখা-সঙ্গে ভোজনও করেন না। আবার তুমিই বেত্র অর্থাৎ গোচারণ লীলায় হাতে পাচনী ধারণ কর—আবার বিষাণ, বেণু এও তুমিই ধারণ কর। নারায়ণ তো বিষাণ, বেত্র, বেণু ধারণ করেন না—নারায়ণ তো বাঁশী বাজান না। বাঁশী ব্রজের কৃষ্ণই বাজান। এমনকি ঐ কৃষ্ণ যখন মথুরায় বা দ্বারকায় লীলা করেন তখনত তিনি বাঁশী বাজান না। দ্বারকার মহিষীরা প্রভুর কাছে আবেদন জানিয়েছেন—প্রভু আপনি এখানে বাঁশী বাজান না কেন? শুনেছি আপনি ব্রজে বাঁশী বাজাতেন। যে বাঁশীর সুরে পাগল হয়ে রাধারাণী ব্রজরামাগণ ঘর ছেড়ে গভীর রাতে বনে আসতেন—সেই পাগল করা মনমাতান বাঁশী শুনবার সাধ তো আমাদেরও হয়। কৃষ্ণচন্দ্র বলেন—এখানে দ্বারকা মন্দিরে তো বাঁশী বাজাবার দরকার হয় না। কারণ ব্রজে রাধারাণীর দুর্জয় মান—বাঁশীর সুরে বা অন্য কিছুতে তাঁর দুর্জয়মান ভাঙে না। এমন কি মাথার ময়ুর পাখার চূড়া রাধারাণীর চরণে লুটিয়ে লুটিয়ে দিয়েছি তাতেও তাঁর মান প্রসন্ন হয় না—আর দ্বারকার মহিষীদের মান তো একটু তিরস্কারে ভেঙে যায় সুতরাং বাঁশী বাজাবার তো প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মা বললেন—প্রভু তোমাকেই স্তুতি করছি এ স্তুতি নারায়ণের নয়।

ভগবান স্তুতি শুনছেন কিন্তু কথা বলছেন না। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, আরও বলি তুমি হলে লক্ষ্মশ্রী—তোমার যে শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য তার তুলনা হয় না—কারণ বলা আছে শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্র যে ঐশ্বর্য্য সেটি সর্ব্বোপরি—আর সৌন্দর্য্যের তো কথাই নেই। কারণ বলা আছে—কৃষ্ণের যে মাধুর্য্য সে মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে। ভগবানের অনন্তগুণ কিন্তু অনন্ত বস্তু আমরা ধারণা করতে পারি না তাই তাকে ভাগ করি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তকান।

কৃষ্ণের অনন্ত গুণের মধ্যে চৌষট্টি প্রধান—তার মধ্যে পঞ্চাশটি গুণ বিন্দু-বিন্দু রূপে জীবেতে সঞ্চারিত হয়—ভগবানে গুণের সিন্ধু আর জীবেতে বিন্দু—ভক্ত ঐ বিন্দুতেই সিন্ধু ভোগ করে—পাথারে সাঁতারে। এ হল পঞ্চাশটি গুণের হিসাব। এর পরের পাঁচটি গুণ গিরিশাদিতে থাকে অর্থাৎ দেবাদিদেব শঙ্করে। তাহলে পঞ্চান্নটি গুণের হিসাব পাওয়া গেল—এর পরের পাঁচটি গুণ অর্থাৎ সবশুদ্ধ ষাটটি গুণ থাকে লক্ষ্মীশাদিতে অর্থাৎ চৌষট্টির মধ্যে ষাটটি গুণ—এ ছাড়া যে চারটি গুণ সেই চারটি গুণ শুধু গোবিন্দে থাকে, গোবিন্দে এই চারটি অসাধারণ গুণ, এই চারটি গুণ কৃষ্ণ ছেড়ে আর কোথাও যাবে না—সেই চারটি গুণের কথা শাস্ত্র বললেন—প্রেমমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকারি লীলা কল্লোল মাধুরী।
অতুল মধুর প্রেম মণ্ডিত প্রিয়মণ্ডল।
ত্রিজগন্মানসা কর্ষি মুরলী কল কূজিতঃ
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীর্বিস্মাপিতচরাচরঃ॥

শ্রীগোবিন্দ স্বরূপে এই চারটি গুণ হল অসাধারণ চতুষ্টয়। শ্রীবালগোপালের যে মাধুর্য্য ব্রহ্মা বললেন—লক্ষ্মশ্রিয়ে এ মাধুর্য্য সকল জনের মন আকর্ষণ করে—এটিও বড় কথা নয়,—আরও যদি সূক্ষ্মরূপে বলা যায় তাহলে গোবিন্দ নিজের রূপে নিজেই আকৃষ্ট হন—'আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহরঃ।' গোবিন্দের স্বরূপ সৌন্দর্য্যের সমান অন্য কোথাও নেই, সুতরাং তার থেকে বেশী তো কোথাও থাকবেই না। ব্রহ্মা আর একটি বিশেষণ দিচ্ছেন—প্রভু তুমি হলে মৃদুপদ। কারণ ভগবান এখন বাল্যলীলায় আছেন তাই তিনি যেমন মৃদুপদ এরকম তো ভগবানের অন্যলীলায় হবে না।

ভগবানের চরণযুগল এমনিতেই কোমল কমল হতেও কোমল অতি সুকোমল। যে চরণে হাত দিতে রাধারাণী শঙ্কা বোধ করেন—গোপরামারা ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে বক্ষে ধারণ করেন কারণ বক্ষস্থানের কঠোরতায় পাছে তাঁর চরণে ব্যথা লাগে। আবার সেই ভগবান যখন বাল্যলীলায় আছেন তখন তো তাঁর চরণ আরও কোমল। তাই ব্রহ্মা বিশেষণ দিলেন মৃদুপদে। এ বিশেষণ তো নারায়ণে যাবেই না। তাই ব্রহ্মার বাক্যের তাৎপর্য্য—তোমাকেই স্তুতি করছি নারায়ণকে নয়। এর পরে আর একটি বিশেষণ—পশুপাঙ্গজায় এতে ব্রহ্মা একটি স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন এবং ভগবানও অনুমোদন করেছেন।

বেদবক্তা ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালের শ্রীচরণযুগলে বেদসার স্তুতি করছেন। প্রথম স্তুতি বাক্যে ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালের যে যে বিশেষণ দিয়েছেন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় সেটি আমাদের যথাকৃপা যথামতি আস্বাদন হয়েছেন—একটি বিশেষণ বাকী আছেন। ব্রহ্মা শ্রীবাল-গোপালকে স্তুতি করে বলছেন—তুমি পশুপাঙ্গজ, তোমার শ্রীচরণে স্তুতি করছি—ব্রহ্মা আগে আগে যে বিশেষণ দিয়েছেন তার মধ্যে প্রথম দুটি বিশেষণে অর্থাৎ অভ্রবপুষে এবং তড়িদম্বরায়—ভগবান আপত্তি করেছিলেন—এ দুটি বিশেষণ তো নারায়ণের, সুতরাং ব্রহ্মন্ তুমি নারায়ণকেই স্তুতি করছ আমাকে স্তুতি করবে কেন? ভগবান অবশ্য কথা বলেন নি—মৌন দৃষ্টিতে যেন এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন কিন্তু ব্রহ্মা ভগবানের অভিপ্রায় বুঝে এর পরে কয়েকটি এমন বিশেষণ দিয়েছেন যে তাতে আর নারায়ণকে বুঝাবে না—ব্রজের কৃষ্ণ শ্রীবালগোপালকেই বুঝাবে। ভগবান মৌন-দৃষ্টিতে অনুমোদন করছেন। এর পরে ব্রহ্মা আর একটি বিশেষণ দিচ্ছেন—এইটিই এই স্তুতিবাক্যের শেষ বিশেষণ। বলছেন, তুমি পশুপাঙ্গজ তোমার চরণে স্তুতি করি।

পশুপ বলতে বুঝায় যারা পশু পালন করে—অর্থাৎ বৈশ্য জাতি

—নন্দমহারাজ। নন্দমহারাজ ও বসুদেব দুই ভাই। কিন্তু নন্দ মহারাজ বৈশ্য জাতি আর বসুদেব হলেন ক্ষত্রিয় জাতি। দেবমীঢ় নামে এক রাজা ছিলেন—তাঁর দুই স্ত্রী, একজন ক্ষত্রিয় জাতি আর একজন বৈশ্য জাতি। ক্ষত্রিয় জাতি যে স্ত্রী তার গর্ভে জন্ম যাঁর তার নাম শূর—আর বৈশ্য জাতি যে স্ত্রী তার গর্ভে জন্ম যাঁর সেই পুত্র হলেন পর্জন্য। সন্তান মায়ের জাতি পায় তাই শূর হলেন ক্ষত্রিয় আর পর্জন্য হলেন বৈশ্য। এই শূরের পুত্র হলেন শৌরি অর্থাৎ বসুদেব—তাই ক্ষত্রিয় জাতি আর পর্জনের পুত্র নন্দমহারাজ তাই বৈশ্য জাতি। ব্রহ্মা বলছেন, এই বৈশ্য জাতি নন্দমহারাজের, তুমি অঙ্গজাত সন্তান অর্থাৎ ঔরসজাত সন্তান। তোমাকে স্তুতি করছি। এই পশুপাঙ্গজায় বিশেষণ নারায়ণে তো লাগবেই না। কারণ নারায়ণ তো নন্দমহারাজের পুত্র নন—তুমিই নন্দমহারাজের পুত্র। এখন কথা হতে পারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তো মথুরা নগরীতে কংসের কারাগারে দেবকী মা এবং বসুদেব পিতার কাছে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে শঙ্খচক্রগদাধারী হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন—ঐশ্বর্যমূর্ত্তি প্রকাশ করেছেন। এই রূপ দেখে বসুদেব দেবকী অবাক হয়ে গেছেন। সেটি বুঝতে পেরে ভগবান নিজের পরিচয় দিয়েছেন। ভগবান বলেছেন, 'তোমরা আমার এই অলৌকিক রূপ দেখে বিস্মিত হয়েছ বুঝতে পারছি। কেন তোমাদের মনে নেই? তোমরা দুজনে বহুদিন শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, হিম সহ্য করে অনাহারে অনিদ্রায় আমার আরাধনা করেছিলে। তোমাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে আমি দর্শন দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'তোমরা কি চাও?' যা চাইবে তাই দেব। তখন তোমরা বলেছিলে 'তোমার মত পুত্র যেন পাই।' তখন আমি বলেছিলাম—'আমার মত তো কেউ হয় না—যদি তোমাদের প্রার্থনা পূরণ করতে হয় তাহলে আমাকেই তোমাদের পুত্র হয়ে আসতে হবে—তাই এসেছি। আর একটা কথা—তোমরা যে শুধু এই যুগে আমার পিতামাতা—তা নও।

যুগে যুগে তোমরাই আমার পিতা মাতা। সত্যযুগে তোমরা ছিলে পৃশ্নি সুতপা আমি তোমাদের কাছে পুত্র হয়ে এসেছিলাম—তখন আমাকে লোকে 'পৃশ্নিগর্ভ' বলে সম্বোধন করত। আবার তোমরা ছিলে অদিতি কশ্যপ, তখনও আমি তোমাদের কাছে পুত্র হয়ে এসেছিল্যম—বামন অবতারে। আবার এই দ্বাপর যুগে তোমরা হয়েছ বসুদেব দেবকী—তোমাদের কাছে আমি পুত্র হয়ে এসেছি। তবে বুঝতে পারছি, তোমরা আমাকে এখানে রাখতে ভয় পাচ্ছ। কারণ এখুনি তো কংস জানতে পারবে! আর জানতে পারলে এর আগে আগে তোমাদের পুত্রদের যে অবস্থা করেছে—আমারও তাই করবে। তাই বলছি এক কাজ কর। আমাকে এখানে রেখো না, আমাকে নন্দগোকুলে রেখে এস। এই বলতে বলতে ভগবান প্রাকৃত বালকের মত দ্বিভুজ হয়ে গেলেন বসুদেব দেবকীর চোখের সামনে। তখন বসুদেব তাঁকে নিয়ে গেলেন যমুনা পার হয়ে নন্দগোকুলে। যশোদামায়ের শয্যায় নিজের পুত্রকে রেখে যশোদামায়ের কন্যাটিকে নিয়ে আবার বসুদেব কংসের কারাগারে ফিরে এলেন। এই পর্য্যন্ত শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে দশম স্কন্ধে জন্মলীলা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তো তাহলে ক্ষত্রিয় বসুদেবের পুত্র তাই ব্রহ্মা যে সম্বোধন করলেন 'পশুপাঙ্গজায়' বৈশ্যজাতি নন্দমহারাজের অঙ্গজাত সন্তান—এটির সামঞ্জস্য হয় কি করে? এর মধ্যে একটি কথা আছে—যেটি শ্রীশুকদেব স্পষ্ট করে উল্লেখ না করলেও ইঙ্গিত করেছেন শ্রীনন্দোৎসব বর্ণন প্রসঙ্গে।

ভগবানের শুভ আবির্ভাব শুধু কংসের কারাগারে মথুরায় নয়—ভগবানের আবির্ভাব দুই জায়গায়—নন্দগোকুলেও ভগবানের আবির্ভাব হয়েছে। নন্দমহারাজ ও যশোদামায়ের কাছেও ভগবানের জন্ম। শ্রীশুকদেব জন্মলীলা প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে না বললেও নন্দোৎসব বর্ণন প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে বলেছেন—

নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনা। ভাঃ ১০।৫।১

নন্দমহারাজের পুত্র হওয়াতে খুব আনন্দ হয়েছে—যার ফলে পুত্রের জন্মোৎসব করেছেন খুব ঘটা করে। প্রতি প্রজার ঘরে তিনটি করে পর্ব্বত করে দিয়েছেন নন্দমহারাজ। রত্নপর্ব্বত, সুবর্ণপর্ব্বত আর তিলপর্ব্বত, অর্থাৎ প্রচুর ঐশ্বর্য্য দান করেছেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ এটি শুনে অবাক হয়ে গেছেন—নন্দমহারাজ এক গণ্ড দেশের রাজা—কংসের অধীনে রাজত্ব করেন—তাঁর এত ঐশ্বর্য্য কি করে সম্ভব? রাজা ভাবছেন—আমিও তো পুত্রের জন্মোৎসব করেছি—আমিও তো পুত্রের পিতা—কিন্তু আমি তো প্রজাদের এত করে ঐশ্বর্য্য দিতে পারি নি। আমি তো ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাট। তখন শ্রীশুকদেব বুঝতে পেরে বলছেন—মহারাজ, এতে অবাক্ হলেন? নন্দমহারাজের পুত্র শ্রীবালগোপাল স্বয়ং ভগবান যেদিন ব্রজে নন্দগোকুলে আবির্ভুত হলেন সেদিন থেকেই মহালক্ষ্মী বৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী নন্দব্রজে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ঢেলে দিয়েছেন—সেদিন থেকে লক্ষ্মীঠাকুরাণী সেখানে সেবিকা—আমাদের এ জগতে লক্ষ্মীঠাকুরাণী সেব্যা। লক্ষ্মীঠাকুরাণীর কৃপা হলে এ সংসারে ধনে-জনে উথলে ওঠে—আর সেই মহালক্ষ্মী যেখানে সেবিকা সেখানে ঐশ্বর্য্য না জানি কেমন। তখন মহারাজ পরীক্ষিৎ বুঝলেন। এখানে শ্রীশুকদেব বললেন নন্দমহারাজের 'আত্মজ'। বসুদেবের পুত্রকে নন্দমহারাজ পালন করেছেন, তা যদি হয় তাহলে তাকে শুকদেব আত্মজ বলবেন কেন? পালিত পুত্রকে তো আত্মজ বলা যায় না। আত্মজ, দেহজ, অঙ্গজ, তনুজ—সবই ঔরস জাত সন্তানকে বুঝায়। তাই নন্দমহারাজের নিজের ছেলে গোপাল—গোপাল পালিত পুত্র নন—এটি শ্রীশুকদেবও স্বীকার করলেন।

ভগবান যে নন্দ গোকুলেও আবির্ভূত হয়েছেন—শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে স্পষ্ট করে উল্লেখ না থাকলেও কৃষ্ণযামল, ব্রহ্মযামল, এ সব শাস্ত্রে স্পষ্ট করে বলা আছে—

নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং মিথুনং সমজায়ত।
শ্রীগোবিন্দঃ পুমান্ কন্যা সাম্বিকা মথুরাং গতা॥

নন্দপত্নী যশোদা মিথুন প্রসব করেছিলেন। মিথুন বলতে যমজ সন্তানকে বুঝায় কিন্তু দুটিই যদি পুত্র হয় বা দুটিই যদি কন্যা হয় তাহলে তাকে মিথুন বলা যাবে না—মিথুন বলা হবে একটি পুত্র ও একটি কন্যা হলে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে—যশোদা মা যখন মিথুন প্রসব করেছেন বলা হয়েছে তখন একটি পুত্র আর একটি কন্যা। এখন এই পুত্রেরই বা পরিচয় কি আর কন্যাটিরই বা পরিচয় কি? শাস্ত্র বললেন—পুত্রটি হলেন শ্রীগোবিন্দ আর কন্যা হলেন দেবী অম্বিকা যাকে বসুদেব মথুরায় কংসের কারাগারে নিয়ে এসেছেন। নন্দপত্নী যশোদা যখন মিথুন প্রসব করলেন—তখন পুত্র সন্তানটি আগে হয়েছে অর্থাৎ অষ্টমী তিথিতে—যে তিথিতে দেবকী পুত্রের জন্ম। আর কন্যাটি হয়েছেন তার পরক্ষণে নবমী তিথি পড়েছে—সেই নবমী তিথিতে দেবী অম্বিকার আবির্ভাব। কারণ যমজ সন্তান ঠিক একই ক্ষণে দুজনের জন্ম হয় না—একটু আগে পরে হয়। এই দেবী অম্বিকা হলেন যশোদাগর্ভসম্ভুতা—বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী। তাহলে ভগবানের দুজায়গায় আবির্ভাব—এটি ব্রহ্মার সিদ্ধান্ত, শ্রীশুকদেবের সিদ্ধান্ত এবং ভগবানও অনুমোদন করেছেন। কারণ ব্রহ্মার এ স্তুতি শ্রীবালগোপাল শুনছেন—আপত্তি তো করেন নি। কথায় বলা হয় মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। মৌন থাকলে বুঝে নিতে হবে সে কথা মেনে নেওয়া হল। ভগবান তো মৌন আছেন তাহলে ব্রহ্মার এ সিদ্ধান্ত ভগবান অনুমোদন করেছেন—কোনও প্রতিবাদ তো করেন নি।

ভগবানের আবির্ভাব দু'জায়গায় হয়েছে—এ কথা শুনে হয়ত আমরা আশ্চর্য্য বোধ করি। কিন্তু আপত্তির কি আছে? ভগবানকে তো কোন ব্যক্তিবিশেষ আবির্ভূত করাতে পারে না। ভগবানকে আবির্ভূত করান ভক্তি মহারাণী। যেখানে যেখানে ভক্তির প্রকাশ

সেখানে সেখানেই ভগবানের আবির্ভাব। তা সে শুধু দু'জায়গায় কেন? অসংখ্য জায়গায় যদি ভক্তির প্রকাশ হয় অসংখ্য জায়গাতেই ভগবানের আবির্ভাব হবে। ভক্তির অবশ্য সংখ্যা করা যায় না, পরিমাণও করা যায় না, তবু যদি কল্পনা করা যায় বসুদেব দেবকীর ভক্তির সংখ্যা এক (১) তাহলে নন্দমহারাজ যশোদা মায়ের ভক্তির সংখ্যা এককোটি। বসুদেব দেবকীর ভক্তির পরিমাণ যদি পাংশু-মুষ্টি হয় তাহলে নন্দমহারাজ যশোদা মায়ের ভক্তির পরিমাণ সুমেরু পর্ব্বত।

এখন যশোদা মা যদি একটি পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করে থাকেন তাহলে বসুদেব যখন নিজের পুত্র কৃষ্ণকে নিয়ে নন্দগোকুলে গেলেন তখন পুত্রকে যশোদা মায়ের শয্যায় রেখে কন্যাটিকে নিয়ে এলেন এ কথা যে বলা হল, তাহলে যশোদা মায়ের শয্যায় এক পুত্র আবার বসুদেব এক পুত্র নিয়ে এলেন তাহলে ব্রজে কি দুই কৃষ্ণ? ব্রজে তো দুই কৃষ্ণকে লীলা করতে দেখা যায় না, একজন কৃষ্ণই তো লীলা করছেন। যশোদা মায়ের শয্যায় যশোদানন্দন কৃষ্ণ যে আছেন তাকে বসুদেবকে দেখান হয় নি। যোগমায়া লীলাশক্তি পুত্রটিকে আবরণে রেখেছেন। কারণ যোগমায়া লীলাশক্তি হলেন অঘটন ঘটন পটীয়সী। তিনি দেখলেন—লীলাতে দুই কৃষ্ণকে দেখালে লীলা সৌকর্য্যের হানি হয়, তাই পুত্রটিকে আবরণে রাখলেন। বসুদেব শুধু কন্যাটিকেই দেখেছেন—পুত্রটিকে যশোদা মায়ের শয্যায় রেখে কন্যাটিকে নিয়ে মথুরায় ফিরে এলেন।

তখন শ্রীহরিবংশ বলছেন—

বসুদেবসুতঃ শ্রীমান্ বাসুদেবোখিলাত্মনি।
লীনো নন্দসুতে রাজন্ ঘনে সৌদামিনী যথা॥

বসুদেবপুত্র বাসুদেব যিনি ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি, যিনি অখিল দেহ-ধারী প্রাণীর অন্তর্য্যামিরূপে থাকেন তিনি নন্দনন্দন শ্রীগোবিন্দ যিনি মাধুর্য্যের মূর্ত্তি তাতে লীন হয়ে গেলেন অর্থাৎ মিশে গেলেন

—দুই কৃষ্ণ এক হয়ে গেলেন, যেমন মেঘের কোলে বিদ্যুৎ ঝলক দিয়ে আবার মেঘের বুকে মিলিয়ে যায় তাকে যেমন আর দেখা যায় না সেইরকম। এখানে বিদ্যুতের সঙ্গে বাসুদেব ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তির উপমা দেওয়া হয়েছে আর মেঘের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে মাধুর্য্যের মূর্ত্তি শ্রীগোবিন্দের।

তাই ব্রজে যে কৃষ্ণ লীলা করছেন তিনি একজনই। এইটিই শাস্ত্রের সুসিদ্ধান্ত। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে সবই সুসিদ্ধান্ত কোন অপসিদ্ধান্ত নেই।

ব্রহ্মার প্রথম স্তুতি বাক্য গোবিন্দ শুনলেন। এর পরে দ্বিতীয় স্তুতি বাক্য।

বাক্‌পতি বেদবক্তা চতুরানন ব্রহ্মার শ্রীগোবিন্দজীর শ্রীচরণে প্রথম স্তুতিবাক্য আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপার করুণায় যথামতি যথাকৃপা আস্বাদন করলাম—এর পরে দ্বিতীয় স্তুতিবাক্য। ব্রহ্মা বলছেন—

অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ॥ ভাঃ ১০।১৪।২

শ্রীবালগোপাল ব্রহ্মার প্রথম স্তুতিবাক্য মন দিয়ে শুনলেন। বাইরে কিছু কথা বলেন নি। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে যে ভাবটি হয়েছে সেইটি রসিক টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ কথা দিয়ে টীকার মাধ্যমে ধরে দিয়েছেন। ভগবান যেন বলতে চাইছেন, ওহে ব্রহ্মন্, তুমি একটি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, সৃষ্টিকর্ত্তা, লোক-পিতামহ—কাজেই অতুল ঐশ্বর্য্য তোমার আর আমি গোপনন্দন গয়লার ছেলে, তুমি পুরাতন অর্থাৎ বহু প্রাচীন বিজ্ঞ আর আমার তো বয়স অল্প, বালক আমি। ব্রহ্মন্ তুমি সকল বেদের তাৎপর্য্য জান—চারমুখে চারখানি বেদ বলেছ, তুমি বেদবক্তা সুতরাং পরম বিজ্ঞ, তুমি সদাচার-পরায়ণ আর আমি তো গোপালন করি অর্থাৎ

বাছুর চরাই, কাজেই গরু চরান রাখাল বালক তাই একেবারেই জ্ঞানহীন মূর্খ—সদাচারের গন্ধও তো আমাতে নেই। আচার আচরণ আমি কিছুই জানি না। যদি বল তোমার সদাচার নেই কি করে বুঝব, প্রমাণ কোথায়—তার উত্তরে বলি যদি আমার সদাচার থাকত তাহলে বামহাতের করতলে দইমাখা অন্নের গ্রাস নিয়ে কি বেড়িয়ে বেড়িয়ে খেতাম? যার সদাচার আছে সে কি ঐ রকম করে খায়? আর একটা দিক তোমাকে দেখাই—ব্রহ্মন্, তুমি পরম সুখী সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। আর আমি তোমার মায়ায় মুগ্ধ হয়ে মনের দুঃখে বনে বনে ঘুরে বেড়াই। সুতরাং তুমি স্তুতি করবে আর আমি সেই স্তুতি গ্রহণ করব, তোমার স্তুতিযোগ্য আমি তো কিছুতেই হতে পারি না। তুমি আমাকে স্তুতি করছ কেন? এ সব কথা অবশ্য ভগবান শ্রীমুখে উচ্চারণ করে বলেন নি। কিন্তু ব্রহ্মা এটি আশংকা করছেন—তাই বলছেন, প্রভু, সত্যই অজ্ঞানতা বশে আমি তোমার শ্রীচরণে মহান অপরাধ করেছি। এইটিই বুঝাবার জন্য দ্বিতীয় স্তুতিবাক্য আরম্ভ করছেন।

হে দেব! দেব অর্থাৎ ভগবান—দেব বলতে শুধু তোমাকেই বুঝায়, আর কেউ জগতে দেব হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ বলা আছে—'একো দেবো দেবকীপুত্র এব।' দেবকীনন্দনই একমাত্র দেবতা। আরও বলা আছে—'একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তঃ। একমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই দেবতা অর্থাৎ ভগবান তিনি নিত্য লীলানুরক্ত। নিত্য লীলাময়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

ভগবান কৃষ্ণ—তিনিই একক ঈশ্বর—আর সব তাঁর ভৃত্য অর্থাৎ সকলে তাঁর অধীন। তিনিই প্রভু আর সব ভৃত্য তাঁর আজ্ঞাবাহী। এমন কি শিব ব্রহ্মা পর্য্যন্ত। ব্রহ্মা যে সৃষ্টি কাজ করেন তাও. গোবিন্দের আদেশে, আবার শিব যে রুদ্ররূপে সংহার কাজ করেন

তাও গোবিন্দের আদেশে। ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ অন্য যে কোন দেবতা তো কৃষ্ণের অধীনে বটেই। ব্রহ্মা বলছেন, তাই তুমি একমাত্র দেবতা। প্রভু, তোমার এই বাল্যলীলা, বালকসুলভ যে অবস্থা প্রকাশ করেছ, সেই চেষ্টা বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই। তোমার এই বাল্যলীলার বোধই যদি আমার না হয়, তাহলে এর পরে পরে তো তোমার কৈশোরলীলা বা আরও কত কত লীলা আছে সে মহিমা বুঝবার ক্ষমতা তো আমার কিছুতেই হবে না। আমার যত জ্ঞান আছে সব জ্ঞান দিয়ে যদি বুঝতে যাই তাহলেও তোমার মহিমার নাগাল পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তুমি যে এই বাছুর চরিয়ে গোবৎস চারণ লীলায় পরম আনন্দ লাভ কর, এ আনন্দের তো পার নেই—এ আনন্দের সন্ধান আমি পাব কি করে? তোমার লীলানন্দের তোমার রসানুভূতির সন্ধান তো আমার পক্ষে সম্ভব হবেই না এমন কি তোমার যারা লীলা সঙ্গী, নিত্য সহচর গোপ-বালকদের যে সুখানুভূতি তার সন্ধানও আমি পেতে পারি না। আমি ব্রহ্মা আমার পক্ষেই জানা সম্ভব হচ্ছে না তাহলে অন্য আর কার পক্ষে জানা সম্ভব হবে? অর্থাৎ আর কারও পক্ষেই হবে না। কারণ তোমার মহিমা শাস্ত্রাভ্যাস, তপস্যা বা যোগাভ্যাস অন্য কোন কিছু দিয়েই জানা সম্ভব হয় না—বিদ্যা, তপস্যা, জ্ঞান, যোগ, কর্ম, রূপ যৌবন, আভিজাত্য কোন কিছুই তোমার মহিমা বোধের হেতু হতে পারে না কিন্তু একমাত্র তোমার কৃপা কটাক্ষ কণা যদি লাভ হয় তাহলে তোমার এই মহিমা বোধ সম্ভব হয়। তোমার কৃপাতেই তোমার মহিমা একমাত্র বোধ হয় এটি বললাম কেন জান? কারণ আমি অনুভব করে বলছি। আমি তো তোমার শ্রীচরণে অপরাধী। বালক বাছুর চুরি করে তোমার ভগবত্তাকে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম। ভগবানকে পরীক্ষা করা, পিতাকে পরীক্ষা করা, শ্রীগুরুদেবকে পরীক্ষা করা, এ তো মহান অপরাধ। আমি সেই অপরাধে অপরাধী। কিন্তু তুমি আমার মত অপরাধীকেও অনুগ্রহ

করেছ—অনুগ্রহ কেন বলছি, আমার মোহ দূর করে তোমার মহৈশ্বর্য্যস্বরূপ দর্শন করালে—তাতেই বুঝা যাচ্ছে আমার প্রতি তোমার পরম অনুগ্রহ। যদি বল, তোমাকে অনুগ্রহ করলাম কেন ব্রহ্মন্? তোমাকে অনুগ্রহ করবার হেতু কি? তার উত্তরে বলি, তুমি হলে স্বেচ্ছাময়—এখানে স্বেচ্ছাময় বলতে আমরা যা বুঝি তা নয়, কারণ স্বেচ্ছাময় বলতে আমরা সাধারণত বুঝি যে নিজের ইচ্ছামত চলে—এখানে কিন্তু সে অর্থ হবে না, এখানে স্ব ইচ্ছা—স্ব বলতে ভগবানের যারা নিজজন অর্থাৎ ভক্ত। কারণ ভগবানের নিজজন বলতে ভক্তকেই বুঝায়। তাহলে স্বেচ্ছাময় বলতে বুঝায় যিনি ভক্তাধীন। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় বললেন, স্বীয়ানাং প্রেমভক্তিমতাং যথা যথা যা যা ইচ্ছা দিদৃক্ষা, সিসেবিষাদিস্তন্ময়স্য ভক্তবৎসলত্বাৎ তত্তৎসম্পাদকস্যেত্যর্থঃ। তোমার প্রতি যাদের প্রেমভক্তি সেই ভক্তের যখন যা যা ইচ্ছা, দেখবার ইচ্ছা, সেবার ইচ্ছা, তুমি ভক্তবৎসল বলে ভক্তের যখন যা ইচ্ছা তাই পূরণ কর। ব্রহ্মা বলছেন, 'আমি ভক্ত তো নইই, ভক্তাভাস এর ওপর আবার আমি অপরাধী, তাই অনুগ্রহ লেশ পাওয়ারও আমি অধিকারী নই। তবু তুমি আমাকে এই কৃপা করেছ। তাই তোমার এই যে পৃথিবীতে আবির্ভাব তোমার স্বরূপ অর্থাৎ বিগ্রহের প্রকাশ—কারণ তোমার বিগ্রহই তোমার স্বরূপ, তোমার স্বরূপ আর বিগ্রহ তো ভিন্ন নয়—তোমার এই বপু অর্থাৎ শরীর ভূতময় নয়, অর্থাৎ প্রাকৃত জড় নয়—এই বপু প্রকাশ ভক্ত ইচ্ছায়, সুতরাং চিন্ময় স্বরূপ। তাই ব্রহ্ম-সংহিতায় বলা হয়েছে,

'অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তী।

ভগবানের যে কোন অঙ্গ যে কোন ইন্দ্রিয়ের কাজ করতে পারে তাই শ্রুতি বললেন—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।

তাঁর হাত না থাকলেও তিনি গ্রহণ করেন, চরণ না থাকলেও চলতে

পারেন, চোখ না থাকলেও তিনি দেখেন, আবার কান না থাকলেও তিনি শোনেন।

ব্রহ্মা বলছেন, 'প্রভূ, তোমার দেববপু দেবাকার এই অনন্তকোটি বাসুদেব মূর্ত্তি আমার চোখের সামনে কৃপা করে প্রকাশ করলে অর্থাৎ অনুগ্রহ করে দর্শন করালে, এতে তোমারই অনুগ্রহে বুঝতে পারলাম, তোমার বিগ্রহ—অর্থাৎ শরীর আমাদের মত ভৌতিক অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক নয়, তোমার বপু চিন্ময়। সচ্চিদানন্দময়—শুধু সচ্চিদানন্দময় নয়, সচ্চিদানন্দঘন। সৎ (নিত্য বর্ত্তমানতা) চিৎ (জ্ঞান) এবং আনন্দঘন করে করে ঘনতম অবস্থা অর্থাৎ যার ওপরে ঘন আর হয় না, সেই স্বরূপ হল তোমার। আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহের চরম প্রমাণ হল যে তুমি আমাকে কৃপা করে চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করেছ। তোমার বপুর মহিমা আমি ব্রহ্মা হয়ে যখন বুঝতে পারিনি তখন অন্যে আর কে বুঝতে পারবে ? অর্থাৎ কেউ পারবে না। এতো গেল তোমার ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ। আর তুমি নিজ আনন্দ লীলারস আস্বাদনের স্বরূপে যখন বিশুদ্ধ মাধুর্য্যে বাল্যলীলায় দধি চুরি, ননী চুরি কর, মা যশোদার স্তন্য পান কর, গোচারণ কর বা অন্যান্য বাল্যসুলভ চপলতা প্রকাশ কর—সে তো তোমার নিজ রস আস্বাদনে স্বৈর বিহার, যা অন্য ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপ অন্য অবতারে কখনও সম্ভব হয় না—এ লীলা তো কারও অনুভব হতেই পারে না। তবে যদি তুমি কৃপা কর তাহলে ভক্তের এই লীলারসের আস্বাদন তখুনি হতে পারে। তাই তোমার অনুভব শুধু কৃপা সাপেক্ষ।

বাক্‌পতি ব্রহ্মা বেদবক্তা ব্রহ্মাকে শ্রীবালগোপাল মৌন দৃষ্টিতে যেন জিজ্ঞাসা করছেন, ব্রহ্মন্ এ জগতে মানুষ (জীব) সহজে কি করে আমাকে লাভ করতে পারে তার কোন উপায় কি তুমি কিছু স্থির করেছ—যদি স্থির করে থাক তাহলে বল,—আমি তো সামনেই আছি তোমার সিদ্ধান্তে যদি কোন ত্রুটি না থাকে তাহলে আমি

অনুমোদন করব আর যদি কোন ত্রুটি থাকে তাহলে সংশোধন করে দেব। ভগবানের কথা শুনে ব্রহ্মা মনে মনে ভাবছেন, প্রভু, তোমার প্রশ্নের সমাধান কি আমি করতে পারি—তবে তোমার যদি কৃপা হয় তাহলে বলতে পারি। কারণ তোমার কৃপা ছাড়া তো কিছুই সম্ভব হয় না।

প্রকাশ্যে বলছেন, প্রভু, মানুষ কি করে তোমাকে সহজে পেতে পারে তার উপায় তোমারই কৃপায় বলি, এটি ব্রহ্মার স্তুতিবাক্যের তৃতীয় মন্ত্র—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানেস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি—
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

ভাঃ ১০।১৪।৩

ব্রহ্মা বলছেন, 'প্রভু যারা তোমার ভক্ত তারা বড় চতুর। বলাও আছে যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। এ চতুরতা এ জগতের প্রতারণা নয়। চতুরতার লক্ষণ আছে—যা লোকদ্বয়তারিণী চতুরতা সা চাতুরী চাতুরী। সেই চাতুরীরই দাম যিনি এই দেহটা থাকতে থাকতে ইহলোক পরলোক দুই লোককে ফাঁকি দিয়ে গৌরগোবিন্দ পাদপদ্ম ভজে নিতে পারেন, তাঁর চাতুরীরই দাম। কারণ দেহটা চলে গেলে আর তো কিছু করা যাবে না। পরমায়ু থাকতে থাকতে কাজ করে নিতে হবে। শুধু ইহলোক ত্যাজ্য তাই নয় পরলোকও ত্যাজ্য। প্রাকৃত শুভ কর্মের ফলে পরলোকে গতি এবং প্রাকৃত অশুভ কর্মের ফলে অধঃলোকে গতি। কিন্তু পরলোকও ক্ষয়ী অর্থাৎ বিনাশী। স্বর্গ বা তার উপরে উপরে যে যে লোক আছে জন মহ তপ সত্যলোক যে লোকেই যাওয়া যাক সেখানে কিন্তু চিরকাল থাকা যাবে না। পুণ্যের বিনিময়ে সুখভোগ। এই সুখভোগ করতে করতে পুণ্য যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন আবার

মর্ত্যে ফিরে আসতে হবে। তাই বুদ্ধিমান ভক্ত স্বর্গ সুখ চায় না, ব্রহ্মলোকে গতিও চায় না—তারা জানে এসব মিথ্যা। যে বস্তু চিরকাল থাকে না—সেইটিই মিথ্যা। মিথ্যা বস্তুকে বুদ্ধিমান আদর করে না, চায় না তো বটেই। এই স্বর্গাদি সুখভোগ গৌর-গোবিন্দ-পাদপদ্ম মাধুর্য্য উপভোগে বাধা দেয়, তাই তাকে অনর্থ বলা আছে, বাধক বলা আছে। আর পাপের ফলে যে অধোগতি যার ফলে নরকে গমন—সে তো বাধা বটেই। তাই ইহলোক পরলোক দুইই ত্যাজ্য।' শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভকর্ম।
সেহ হয় জীবের এক অজ্ঞানতম ধর্ম॥

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশাইও বলেছেন—

পাপ না করিহ মন অধম সে পাপীজন
তারে মুই দূরে পরিহরি।
পুণ্য যে সুখের ধাম তার না লইও নাম
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি।
প্রেমভক্তি সুধানিধি তাহে ডুব নিরবধি
আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।

ভক্ত চতুর—তাই প্রাকৃত শুভ প্রাকৃত অশুভ, পুণ্য এবং পাপ দুটিকেই ত্যাগ করে, কারণ তারা জানে কোনটিই ভগবানের পাদপদ্ম সেবাসুখ পেতে দিচ্ছে না। ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু, তোমার ভক্ত যারা তারাই তো তোমাকে পায়—তারা জ্ঞানের পথে যায় না, 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য'—'উদপাস্য' পদে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ অর্থ করেছেন —'কিঞ্চিদপি অকৃত্বা' জ্ঞান বলতে এখানে অদ্বৈতবেদান্তীর নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান, যাতে জীবব্রহ্মের অভিন্নতা নিরূপণ করেছেন। জীব অনুচৈতন্য, সে সাধন করে করে যখন সিদ্ধিলাভ করবে তখন সেই ব্রহ্ম হয়ে যাবে, এর নাম নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান—এইটিই অদ্বৈতবেদান্তীর মত। ভক্ত এই জ্ঞানকে ত্যাগ করে। এই জ্ঞানের পথে যায় না,

কারণ অণু পরিমাণ জীব সে যতই সাধন করুক, সাধনের চরম দশায় সিদ্ধিকালে ব্রহ্মানুভূতি লাভ করতে পারে, ব্রহ্মে লীন হতে পারে, কিন্তু সে ব্রহ্ম হবে কি করে—ব্রহ্ম তো বিভু চৈতন্য বিরাট। অণু বিভু হবে কি করে। ক্ষুদ্র তো বিরাট হতে পারে না। এক ঘটি জল সমুদ্রে ঢেলে দিলে জলে জল মিশে যেতে পারে কিন্তু ঘটির জল পরিমিত সে অপরিমিত সাগর হবে কি করে? তাই ভক্ত নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের পথে যায় না, আর তাছাড়া জ্ঞানের পথে পরিশ্রম আছে অথচ ভক্তি বাদ দিয়ে শুধু জ্ঞানচর্চায় ফল তো কিছু নেই—তাতে শুধু পরিশ্রম। তা না হলে ভক্তের ভগবজ্‌জ্ঞান তো থাকবেই। ভগবানে জ্ঞান না থাকলে তার ভক্তি হবে কি করে। জ্ঞান মানে জানা আর ভক্তি মানে ভালবাসা। জানা না হলে তো ভালবাসা যায় না। অজানাকে ভালবাসা যায় না। জ্ঞানেরই পরিপাক দশায় নামই তো ভক্তি। জ্ঞানের পথে গোবিন্দ নেই। জ্ঞানের পথ মানে খোঁজার পথ। খুঁজলে গোবিন্দ মেলে না। গোবিন্দ আছেন প্রেমের পথে। নিত্যলীলায় রাধারাণী প্রভৃতি ব্রজরামা বনে বনে কৃষ্ণ খুঁজেছিলেন, কিন্তু পান নি—তাই তাঁরা খোঁজার পথ ত্যাগ করে ফিরে এসেছিলেন যমুনাপুলিনে শ্রীরাসস্থলীতে সেখানে এসে তাঁরা কৃষ্ণ গুণ গান করেছিলেন, যেটি বিশুদ্ধা ভক্তির পথ, প্রেমের পথ—গোবিন্দ আছেন প্রেমের পথে। মহাজন বলেছেন—

শুধু কুলে কি গোবিন্দ মেলে
কেন কুল কুল করে কুল হারাও গো
এমন ব্যাকুল প্রাণে না ডাকিলে শুধু কুলে কি
গোবিন্দ মেলে—

তাই ভক্ত জ্ঞানের পথে যায় না, খোঁজার পথ ছেড়ে দিয়ে দুটি সহজ পথ বেছে নিয়েছে—তারা শুধু প্রণাম করে 'নমন্ত এব'—অর্থাৎ প্রণামই করে আর কিছু করে না। ভগবান শ্রীবালগোপাল

যেন মৌন দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করছেন, ব্রহ্মন্, ভক্ত শুধু প্রণাম করে ? কেমন করে প্রণাম করে ? ব্রহ্মা বলছেন, ভক্ত প্রণাম করে তনুবাঙ্-মনোভিঃ—অর্থাৎ শরীর দিয়ে প্রণাম করে, বাক্য দিয়ে প্রণাম করে আর মন দিয়ে প্রণাম করে। কায়মনোবাক্যে প্রণাম করে। শরীর দিয়ে প্রণাম—পঞ্চাঙ্গ প্রণাম সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দণ্ডবৎ প্রণাম এ সবই শরীর দিয়ে প্রণাম। আর বাক্য দিয়ে প্রণাম যখন প্রণাম করবে তখন মুখে বলবে —আমি আপনাকে প্রণাম করছি। আবার সাধুবাদ উচ্চারণ করাকেও বাক্যের দ্বারা প্রণাম বলা যায়। কোথাও ভগবানের কথা হচ্ছেন, ভগবানের নাম হচ্ছেন, ভক্তজন বলেন হরিবোল হরিবোল—সাধু সাধু—এই যে সাধুবাদ এটিও বাক্য দিয়ে প্রণাম করা বলা আছে। আর মন দিয়ে প্রণাম—যখন প্রণাম করবে তখন শুধু শরীরকে নত করা নয়, মনকেও নত করা, অর্থাৎ 'প্রণাম' পদের সার্থকতা প্রকৃষ্টরূপে নত হওয়া—মন দিয়ে প্রণাম বলতে আস্তিক্য বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ বুঝায়, অর্থাৎ শ্রদ্ধা করে প্রণাম, শুধু আনুষ্ঠানিক নয়। ভক্ত এই কায়মনোবাক্যে প্রণাম করাটি তোমাকে পাওয়ার সহজ উপায়রূপে গ্রহণ করেছে। শ্রীবালগোপাল যেন জিজ্ঞাসা করছেন, ব্রহ্মন্, ভক্ত আমাকে পাবার জন্য শুধু প্রণাম করে আর কিছু করে না ? ব্রহ্মা বলছেন, 'প্রভু, তোমার ভক্ত ঐ প্রণামেয় সঙ্গে আর একটি উপায় নিয়েছে, সেটি হল—তারা তোমার কথা এবং তোমার ভক্তজনের কথাকে জীবনধারণের উপায়রূপে গ্রহণ করেছে। 'জীবন্তি সম্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।' ভগবানের কথা এবং ভক্ত কথাকে জীবন ধারণের উপায় করে রেখেছে সে আবার কেমন ? কথা তো কানে শুনতে হয়, তাহলে ব্রহ্মা বাক্‌পতি তিনি তো শৃন্বন্তি ক্রিয়া বলতে পারতেন তা না বলে জীবন্তি ক্রিয়া বললেন কেন ? টীকাকার গোস্বামীপাদ বলছেন, 'শৃন্বন্তি' এবং 'জীবন্তি'—দুটি ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে। কথা কানে শুনতে হবে বটে কিন্তু শুধু শোনা আর প্রাণধারণের উপায় করে রাখা যেটি 'জীব' ধাতুর অর্থ—দুইএর

মধ্যে পার্থক্য অনেক, শুধু শোনা, তার মানে শুনলেও হয়, না শুনলেও হয়। একদিন হরিকথা গৌরকথা শুনলাম, দশদিন শুনলাম না—এখানে শৃন্বন্তি বলা যাবে কিন্তু জীবন্তি বলা যাবে না। জীবন্তি—প্রাণাধারণের উপায় অর্থাৎ একদিন হরিকথা গৌরকথা না শুনলে প্রাণ যেন বাঁচে না। যেমন ক্ষুধার অন্ন পিপাসার পানীয় একদিন গ্রহণ না করলে প্রাণ বাঁচে না। কারণ প্রাণ হল বায়ুর বিকার—যা থেকে ক্ষুধা পিপাসা জন্মায়, তাই ক্ষুধায় অন্ন পিপাসায় পানীয় গ্রহণ না করলে প্রাণ যাঁচে না। ভগবানের কথা শোনাকে ভক্ত এমন করে নিয়েছে যে একদিন কথা না শুনলে প্রাণ যেন বাঁচে না তাই ব্রহ্মার জীব্‌ধাতুর প্রয়োগ সার্থক হয়েছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

কৃষ্ণনামামৃত বিনে খায় যদি অন্নপানে
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।

ভক্ত যদি চর্ব্ব্য চোষ্য, লেহ্য পেয় ভোজন করে কিন্তু যদি একদিন ভগবানের কথা এবং ভক্তকথা কানে শুনতে না পায় তাহলে সে যত ভোজনই করুক তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন—জীবন দুর্ব্বল হয়ে থাকে। ভোজন করলেও দুর্ব্বল হয় কেন? কারণ ভক্তের জীবন অন্নজলে বাঁচে না, বাঁচে ভগবানের এবং ভক্তের কথায়। কথাতেই ভক্তের জীবন প্রতিষ্ঠিত থাকে। এখন প্রশ্ন হতে পারে—ভগবানের কথাই শুনবে—আবার তার সঙ্গে ভক্ত কথা কেন? ব্রহ্মা বললেন, ভবদীয়বার্ত্তাম্‌—ভবদীয় বলতে ভগবানের যারা নিজজন অর্থাৎ ভক্তকে বুঝাচ্ছে। ভগবানের কথার সঙ্গে ভক্তের কথা শুনবার প্রয়োজন কি? মহাজন বলেন, ভগবানের কথা পরম মহৌষধ। বলা আছে, হরিনাম মহৌষধি।

হরিনাম মহৌষধি বিধান কইলা।
জীবের মায়াপিত্ত বিকার ঘুচাবার লাগি—
হরিনাম মহৌষধি বিধান কইলা।

গৌরাঙ্গ নিদানী আমার—

হরিনাম মহৌষধি বিধান কইলা।

ভগবানের কথা পরম মহৌষধ আর ভক্তকথা ভক্তচরিত্র তাতে অনুপান। কবিরাজ মশাই যখন রোগীকে বড়ি দেন তখন তার সঙ্গে অনুপানের ব্যবস্থা করেন--মধু সাধারণ অনুপান তো থাকেই এর উপরে যে রোগের যে ওষুধ এবং যে ওষুধের যে অনুপান—কোন পাতার রস বা পানের রস, দুধের সর, বড় এলাচের গুঁড়ো বা আতপ চাল ভিজিয়ে জল—এরকম অনেক অনুপানের ব্যবস্থা থাকে। বড়িটিই তো ওষুধ কিন্তু শুধু বড়ি খেলে রোগীর রোগ ভাল হবে না, অনুপানের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে তবে রোগ সারবে। তেমনি জীবের এই মায়ারোগের পরম মহৌষধ হরিকথা হরিনাম কিন্তু ভক্ত চরিত্র তাতে অনুপানের কাজ করে। ভক্তচরিত্র মিশিয়ে মিশিয়ে হরিকথা শুনতে হবে। কারণ ভগবানের লীলা অলৌকিকী—মানুষের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। মানুষ ভগবানের লীলা আচরণ করতে পারবে না। তাই শ্রীশুকদেব বললেন—

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরণং ক্বচিৎ।

ভগবানের উপদেশ নিতে হবে—লীলাকথার শ্রবণ কীর্ত্তন করা যাবে কিন্তু সেটি আচরণ করা যাবে না। কিন্তু ভক্তচরিত্র শোনাও যাবে আবার সেটি আচরণও করা যাবে। ভক্তচরিত্র অনুসরণীয় অনুকরণীয়। কারণ ভক্তও তো আমাদের মতই মানুষ, তাঁরা যেটি আচরণ করেন সেটিই মানুষের পক্ষে আদর্শ। সেটিই অনুসরণ করতে হবে। এইটিই শ্রেয়ঃ পথ। বলাও আছে—মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্হাঃ। মহাজন যে পথে গিয়েছেন সেটিই পথ। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশাই বললেন—

মহাজনের যেই পথ তাতে হব অনুরত

পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।

সাধন স্মরণ লীলা তাহাতে না কর হেলা

কায়মনে করিয়া সুসার॥

ভক্তচরিত্র জীবের কাছে বেশী উপকারী। তাই ব্রহ্মা বললেন—ভবদীয়বার্ত্তাম্। ব্রহ্মা আর একটি কথা বলেছেন, এই ভগবানের কথা এবং ভক্তকথা সন্মুখরিতা হতে হবে। অর্থাৎ সাধুভক্ত বৈষ্ণব-মুখে শুনতে হবে। অভক্তের মুখে শুনলে কাজ হবে না। যেমন দুধ বলকারক কিন্তু যে দুধে সাপে মুখ দিয়েছে—সর্পোচ্ছিষ্ট দুধ বিষের ক্রিয়া করবে। এখন প্রশ্ন হতে পারে, সাধুমুখে হরিকথা শুনতে হবে কেন? সাধুরা তো শাস্ত্র কথাই বলবেন। আমি নিজে শাস্ত্র পড়ে নেব—আবার সাধুমুখে শুনবার কি দরকার? তা বললে হবে না। কারণ সাধুরা শাস্ত্রকথাই বলবেন—শাস্ত্রবহির্ভূত কথা তাঁরা বললেন না, কিন্তু তাঁরা শুধু শাস্ত্রকথা বলেন না—শাস্ত্রের কথা তাঁরা নিজেরা অনুশীলন করে, নিজেরা অনুভব করেন এবং অনুভব মিশিয়ে যখন শাস্ত্রকথা বলেন তখন তার দাম বেশী হয় এবং তাতে কাজ হয় বেশী। যেমন প্রাকৃত জগতের একটা উদাহরণ দিলে কথাটি আরও স্পষ্ট হবে। বটগাছের নীচে অসংখ্য বটফল থাকে, সেই ফলে ছোট ছোট বীজ আছে। সেখানে মাটি আছে, বৃষ্টির জলও পড়ে—বাতাস আছে, আলো আছে, বীজই তো চারা গজাবার প্রধান কারণ, কিন্তু বটগাছের নীচে তো বটের চারা গজাতে দেখা যায় না—তা যদি হত তাহলে বটগাছের নীচে অসংখ্য বটের চারা হতে দেখা যেত। কিন্তু বটের চারা দেখা যায় কোথায় ছাদের কার্ণিসে, প্রাচীরের ওপর, খড়ের চালে সেখানে দেখা যায় বটের চারা গজিয়ে উঠেছে। কি করে হয়—সেখানে তো চারা গজাবার প্রধান যে উপাদান মাটি তাই তো নেই। আলো জল বাতাস না হয় কিছু আছে কিন্তু সেইটিই তো বীজ থেকে চারা হবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এখানে কারণ হল ঐ বটফলটি যখন কোন পাখীতে খায়, খেয়ে হজম করে, ফলের বীজ পাখীর মুখের লালার সঙ্গে মেশে তখন বিষ্ঠারূপে নিম্নগামী হয়ে যখন প্রাচীরের ওপর, পাষাণের ওপর পড়ে তখন ঐ বীজ এত শক্তিশালী হয় যে সেখানে মাটি না

থাকলেও পাষাণেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারা গজিয়ে ওঠে। এখানেও তেমনি শাস্ত্র কথা ভক্ত অনুশীলন করেন এবং তাঁদের অনুভবরূপ লালার সঙ্গে মেশে, তাঁরা হজম করেন, পরে সেই কথা তাঁরা উর্দ্ধগামী করে শ্রীমুখে উচ্চারণ করেন—কারণ কথা তো নিম্নগামী হবে না—তখন ঐ কথার শক্তি এত বেড়ে যায় যে অতি বড় পাষণ্ডীর কানেও যদি প্রবেশ করে তাহলেও তাদের অনায়াসে উদ্ধার হয়ে যায়। শ্রীকপিল ভগবান বলেছেন সাধুমুখে এই হরিকথা হৃদয়ে এবং কানে রসায়নের কাজ করে। অর্থাৎ কানের এবং মনের রোগ দূর করে এবং পুষ্টি দান করে। কানের রোগ হল বিষয়কথা শ্রবণে রুচি, পরের নিন্দা এবং নিজের প্রশংসার কথাও এর মধ্যে আছে—আর পুষ্টির অভাব হল বেশীক্ষণ কান হরিকথা নিতে পারে না—রোগী যেমন দুর্ব্বলতায় বেশীক্ষণ হাঁটতে পারে না। দু পা যায় বসে পড়ে। তেমনি কানও বেশীক্ষণ ভগবানের কথা নিতে পারে না, এটি হল কানের পুষ্টির অভাব। সাধু মুখে হরিকথা শুনতে শুনতে কানের রোগও সারবে আর পুষ্টিলাভও হবে। কান তখন আর বিষয়কথা শুনতে চাইবে না, এতে বুঝা গেল তার রোগ সেরেছে আর বেশীক্ষণ হরিকথা শুনতে পারবে—এতে বুঝা যাচ্ছে পুষ্টিলাভ হয়েছে। এটি যেমন কানের সম্বন্ধে—মনের সম্বন্ধেও তাই। মনের রোগ হল বিষয় চিন্তা আর পুষ্টির অভাব হল ভগবানের চিন্তা বেশীক্ষণ করতে না পারা। সাধুমুখে হরিকথা শুনতে শুনতে মনের রোগ দূর হবে—বিষয় চিন্তা আর ভাল লাগবে না—আর পুষ্টিলাভও হবে, ভগবানের চিন্তা বেশীক্ষণ করতে পারবে। তাই ব্রহ্মা বললেন, সন্মুখরিতাম্—সাধুমুখে ভগবানের কথা এবং ভক্তের কথা শোনাকে ভক্ত জীবন ধারণের উপায় করে রেখেছে।

ভক্ত ভগবানকে পাবার জন্য এই দুটি সহজ পথ বেছে নিয়েছে। ব্রহ্মা তো শোনার কথা বললেন, কিন্তু কি রকম করে শুনবে? যিনি কথা শুনবেন তাঁর স্বাতন্ত্র্য? অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলেই কি কথা

শুনতে পারবেন ? ব্রহ্মা বলছেন না—এখানে কথা যিনি শুনবেন তাঁর স্বাতন্ত্র নেই—হরিকথা মহাদেবী তাঁর স্বাতন্ত্র্য, তাই বাক্‌পতি ব্রহ্মা, বেদবক্তা ব্রহ্মা পদ বসিয়েছেন 'শ্রুতিগতাম্‌'—এখানে কথার স্বাতন্ত্র, হরিকথা যদি কৃপা করে কানে প্রবেশ করেন তাহলে কথা শোনা যাবে। নতুবা নয়। এতে করে মনে হতে পারে—সে কি ? হরিকথার কাছে বসলে আমি কথা শুনতে পাব না কেন ? মহাজন বলছেন, কথার কাছে বসলেও কথা কানে যাবে না, যদি কথার কৃপা না হয়—ঘুম পাবে বা অন্য চিন্তা করবে—কথা হয়ে গেল, কানে গেল না। তাই উপায় কি ? হরিকথা যখন শুনতে বসবে তখন কথা মহাদেবী তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে—'ওগো হরিকথা মহাদেবী, তুমি কৃপা করে আমার কানে প্রবেশ করো। তাই শ্রুতিগতাম্‌—পদের এখানে সার্থকতা আছে।

এখন আর একটি প্রশ্ন—এই হরিকথা কোথায় থেকে শুনবে ? ব্রহ্মা বললেন, স্থানোস্থিতাঃ—স্থানে থেকে শুনবে—স্থান বলতে নিজ নিজ আশ্রম বুঝায়। অর্থাৎ ব্রহ্মচারী তাঁর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থেকে, গৃহস্থী তার গার্হস্থ্যাশ্রম থেকে, বাণপ্রস্থী তার নিজের আশ্রমে থেকে এবং সন্ন্যাসআশ্রমে থেকে সন্ন্যাসী হরিকথা শুনবে। হরিকথা শুনবার জন্য নিজের আশ্রম ছেড়ে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্ব্বতে যেতে হবে না। আর বন জঙ্গলে পাহাড়ে পর্ব্বতে গেলে সেখানে হরিকথা মিলবে না। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ব্রহ্মার বাক্যে 'স্থানেস্থিতাঃ' পদের ওপরে টীকা করেছেন—'সতাং সঙ্গতিঃ'। হরিকথা পেতে হলে সাধুসঙ্গ করতে হবে। যে কোন জায়গায় ভগবানের কথা পাওয়া যায় না, সাধুর কাছেই হরিকথা। যে কোন জায়গায় ভগবানের কথা পাওয়া যায় না, সাধুর কাছেই হরিকথা। যে যেরকম জাতি তার কাছে সেই জাতীয় কথা। বিষয়ী লোকের কাছে বিষয়ের কথা—আর সাধু ভক্তের কাছে হরি কথা। যেমন কুকুরের গর্ত্তে পাওয়া যায় পচা মাংসখণ্ড, আর সিংহের গুহায় পাওয়া যাবে গজমুক্তা। সিংহ গজ

শিকার করে তার খাবায় করে গজমুক্তা এনে গহ্বরে রেখে দেয়। তেমনি বিষয়ী লোকের কাছে পাওয়া যাবে পচা বিষয়বার্তা, আর গজমুক্তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান যে হরিকথা—তা পাওয়া যাবে সাধুর কাছে। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশায় বলছেন—

বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন আনান্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বত্র মাথাটাকে অবিচারে নত করা (প্রণাম) আর ভগবানের কথা এবং ভক্তকথা সাধুমুখে নিরন্তর জীবনধারণের উপায় করে রাখা—এই দুটি সহজ উপায় ভক্ত নিয়েছে, যাতে সহজে তারা ভগবানকে লাভ করতে পারে।

শ্রীবালগোপাল যেন মৌন দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করছেন, 'ব্রহ্মন্, ভক্ত তো এই দুটি সহজ উপায় অবলম্বন করেছে কিন্তু তারা আমাকে কি ভাবে পায় বলতো শুনি ? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন।

স্বয়ং ভগবান শ্রীবালগোপালের মৌন প্রশ্নের উত্তরে ব্রহ্মা বললেন, প্রভু যে ভক্ত এই দু'টি সহজ উপায় অবলম্বন করেছে তোমাকে পাওয়ার জন্য তারা যে তোমাকে কিভাবে পায় সে আর আমি কি বলব। তারা তোমাকে কায়মনোবাক্যে জয় করে। শরীর দিয়ে মন দিয়ে বাক্য দিয়ে তোমাকে জয় করে অর্থাৎ অধীন করে। তনুবাঙ্-মনোভিঃ পদটি একবার নমন্ত পদের সঙ্গে লাগান হয়েছে। ভক্ত প্রণাম করে শরীর দিয়ে মন দিয়ে আর বাক্য দিয়ে। এখন টীকাকার গোস্বামিপাদ তনুবাঙ্মনোভিঃ পদটি জিত পদের সঙ্গে যোজনা করলেন। ভক্ত শরীর দিয়ে বাক্য দিয়ে আর মন দিয়ে ভগবানকে জয় করে অর্থাৎ অধীন করে। শরীর দিয়ে জয় ভগবান তার শরীর নিয়ে ভক্তের পাশে পাশে থাকেন। এ জগতে স্নেহময়ী জননী তার মাতৃস্নেহ নিয়ে যেমন শিশু সন্তানের পাশে পাশে থাকেন, সন্তান পড়ে গেছে মা তাকে ধরতে পারেননি—এ দৃষ্টান্ত বড় একটা দেখা যায় না। এ প্রাকৃত জগতেই যদি তাই হয় তাহলে ও জগতে কোটি

মাতৃস্নেহ নিয়ে ভগবান তার ভক্ত সন্তানের পাশে পাশে থাকেন—এ হল ভক্তের ভগবানকে শরীর দিয়ে জয় করা। আর বাক্য দিয়ে জয় করা—ভগবানের বাক্য ভক্তের গুণ গান ছাড়া আর কিছু করে না। ভগবান ভক্তের গুণ গাইতে মুখর। বলা আছে হরিদাসের গুণ গাইতে প্রভু হইলা পঞ্চমুখ। এক মুখে হরিদাসের গুণ গেয়ে যেন আশ মিটছে না, তাই বলছেন, আইস আইস পঞ্চানন—পাঁচমুখে যদি হরিদাসের গুণ গাইতে পারতাম তাহলে আনন্দ হত। এ হল বাক্য দিয়ে জয় করা। আর মন দিয়ে যে ভগবানকে জয় করে সে তো ভগবান শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নিজেই ঋষি দুর্ব্বাসার কাছে অকপটে স্বীকার করেছেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্ সাধূনাং হৃদরন্ত্বহম্। ভাঃ ৯।৪।৬৮

মহারাজ অম্বরীষ উপাখ্যানে ঋষি দুর্ব্বাসার কাছে ভগবান বৈকুণ্ঠাধিপতি বললেন, 'ঋষি, সাধুর হৃদয় আমার হৃদয় আর আমার হৃদয় সাধুর হৃদয়। সাধু ভক্ত তার হৃদয় আমাকে দিয়ে রেখেছে তাই ঠিক ঠিক বিনিময় দেবার জন্য আমার হৃদয় আমি ভক্তের কাছে দিয়ে রেখেছি।' এটি হল ভক্তের ভগবানকে মন দিয়ে জয় করা। এই যে শরীর দিয়ে বাক্য দিয়ে এবং মন দিয়ে জয় করা অধীন করা এর নামই পরাধীনতা। কারণ অধীন এবং পরাধীন—দুটির মধ্যে তফাৎ আছে। অধীন বলা হবে—মুখে বললেন, আমি তোমার অধীন কিন্তু মনে স্বীকার করলেন না বা কাজেও দেখালেন না। তাকে অধীন বলা যাবে কিন্তু পরাধীন বলা যাবে না। কিন্তু মুখে বলবেন আমি তোমার অধীন, মনেও স্বীকার করবে এবং কাজেও দেখাবে অর্থাৎ আচরণেও দেখাবে তখন বলা হবে পরাধীন। ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ ঋষি দুর্ব্বাসাকে বললেন, 'অহং ভক্তপরাধীনঃ।' এই পরাধীন হওয়ারই অর্থ হল ভক্ত ভগবাকে কায়মনোবাক্যে জয় করে। ব্রহ্মা বললেন, 'প্রভু, ভক্ত তোমাকে কায়মনোবাক্যে জয় করে—এইটিই ভক্তের সহজ ভক্তি অঙ্গ যাজনের ফলশ্রুতি। ভগবানকে শরীর দিয়ে

বাক্য দিয়ে মন দিয়ে জয় করা কম কথা নয়, অথচ ভক্ত কত সহজে এই ফল পায়—শুধুমাত্র কায়মনোবাক্যে প্রণাম করে এবং সাধুমুখে হরি কথা এবং হরিভক্তের কথা শ্রবণকে জীবনধারণের উপায় করে রাখে, এরই ফলে ভগবানকে তারা এইভাবে জয় করে।'

বেদবক্তা ব্রহ্মা ভগবানকে 'অজিত' বলে কিন্তু সম্বোধন করেছেন অথচ বললেন ভক্ত তোমাকে কায়মনোবাক্যে জয় করে। তখন ভগবান ব্রহ্মার বাক্যে দোষ ধরেছেন—ভগবানের পক্ষ হয়ে টীকাকার গোস্বামীপাদ বলছেন, 'ব্রহ্মান্ তোমার কথাবার্ত্তা কি রকম? তুমি আমাকে 'অজিত' বলে সম্বোধন করলে অর্থাৎ আমাকে কেউ জয় করতে পারে না অথচ আবার বলছ ভক্ত আমাকে কায়মনোবাক্যে জয় করে। আমি জিত হই। আমি অজিত এবং জিত দুইই হব কি করে? হয় বল জিত, না হয় অজিত। তোমার কথায় এ অসামঞ্জস্য থাকবে কেন?' তখন ব্রহ্মা বলছেন, 'প্রভু, আমি ভুল করিনি। কারণ ভক্ত তো তোমাকে ভক্তি দিয়ে জয় করে, ভক্তি মহারাণীর স্বরূপ এবং তোমার স্বরূপ তো ভিন্ন নয়—একই। তাই তোমার স্বরূপ দিয়েই তোমাকে জয় করে এতে তোমার 'অজিত' নামের হানি হবে না। তুমি অজিতই থাকলে আবার ভক্ত তোমাকে জয় করে অর্থাৎ তুমি জিতও হলে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতকে চেপে ধরে তাহলে তার যেমন সেটি বন্ধন বলা যাবে না, আর সেই বন্ধন ছাড়ঃবার জন্য কেউ আসে না—কারণ তার নিজেরই ডান হাত আবার নিজেরই বাঁ হাত—এর আবার বন্ধন কি? তেমনি ভক্ত যে ভক্তি দিয়ে তোমাকে জয় করে সে ভক্তি তো তোমার নিজেরই স্বরূপ তাই তোমার স্বরূপ দিয়ে তোমাকে জয় করা এতে তোমার অজিত নামের হানি হবে না। অথচ তুমি জিতও হলে।'

ব্রহ্মা এই সিদ্ধান্ত করলেন এবং ভগবান যখন মৌন হয়ে আছেন, কোন প্রতিবাদ করেন নি তখন বুঝতে হবে ভগবান অনুমোদন

করেছেন। ব্রহ্মার সিদ্ধান্ত এবং ভগবানের অনুমোদিত—সুতরাং এ বাক্যের দাম আছে।

ব্রহ্মস্তুতি প্রসঙ্গে বাক্‌পতি ব্রহ্মার চতুর্থ মন্ত্র—

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো !
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্‌ ॥

—ভাঃ ১০।১৪।৪

ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালের সামনে স্তুতি করছেন! এ বাক্যের বড় মর্য্যাদা। কারণ এতে বাকপতি বেদবক্তার সিদ্ধান্ত তার উপরে আছে ভগবানের অনুমোদন। ভগবান এ সিদ্ধান্ত শুনে কোন প্রতিবাদ করেন নি। মৌন হয়ে আছেন। বলা আছে মৌনং সম্মতিলক্ষণম্‌। কথা না বললে বুঝা গেল ভগবান ব্রহ্মার বাক্য অনুমোদন করেছেন তা না হলে প্রতিবাদ করতেন। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত অকাট্য।

ব্রহ্মা বলছেন, হে বিভো! অর্থাৎ তুমি বিভু চৈতন্য ঈশ্বর—তোমার উপরে আর ঈশ্বর কেউ নেই। তুমিই বিভু অর্থাৎ বিরাট, তোমার উপরে বিরাট আর কেউ নেই। বলা আছে—'বিভুরপি কলয়ন্‌ সদাভিবৃদ্ধিম্‌'—বাড়িতে নাই ঠাঁই তবু বাড়য়ে সদাই। মহাজন বললেন—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

গোবিন্দ হলেন ঘনীভূত ব্রহ্ম। যেজন্য তাঁকে বলা হয় পরং ব্রহ্ম। নরাকৃতি পরম ব্রহ্ম। গীতাবাক্যে ভগবান নিজের তত্ত্বকথা বললেন—

'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহম্‌—গীঃ ১৪।২৭

ব্রহ্মের আমি প্রতিষ্ঠা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ টীকা করছেন—ঘনীভূতং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ ব্রহ্মকে ঘন করে করে ঘনতম

যে স্বরূপ তিনি হলেন শ্রীগোবিন্দ। যেমন পাতলা দুধ ঘন করে করে যখন ডেলা ক্ষীর হয়, যার থেকে ঘন আর হয় না। তেমনি ব্রহ্মকে ঘন করে করে, যার থেকে ঘন আর হয় না—তিনি হলেন শ্রীগোবিন্দ। ব্রহ্মের সম্বন্ধে বলা আছে—'বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ বা আত্মা ব্রহ্মেতি গীয়তে।' ব্রহ্মাই যদি বৃহৎ হন তাহলে শ্রীগোবিন্দ তো সবচেয়ে বৃহৎ—যার উপরে বৃহৎ আর হয় না। তাই ব্রহ্মা সম্বোধন করলেন, হে বিভো! শ্রেয়ঃ সৃতি ভক্তিকে বাদ দিয়ে যারা শুধু জ্ঞানচর্চা করে তাদের পরিশ্রমই সার—ফল লাভ কিছু হয় না। অর্থাৎ তোমার পাদপদ্মে ভক্তি বাদ দিয়ে শুধু জ্ঞানচর্চা করে তাদের বৃথা পরিশ্রম। জীবের উদ্দেশ্য হল সাধ্যবস্তু পাওয়া। তার জন্য সাধনের প্রয়োজন। কারণ সাধন ছাড়া সাধ্য বস্তু পাওয়ার কোনও পথ নেই। যেমন পথ ধরে না গেলে তো গন্তব্যস্থানে পেঁছান যাবে না। গন্তব্যস্থানের নাম হল সাধ্য আর যে পথকে অবলম্বন করে যেতে হবে তাকে বলা হয়েছে সাধন। সাধনকে অবলম্বন করে সাধ্যবস্তু পেতে হবে। এখন সাধ্য বা তত্ত্ব বস্তু তো একটি অর্থাৎ অদ্বয় শাস্ত্র নিরূপণ করলেন। সাধ্যকেই তত্ত্ব বলা হয়। ষাট হাজার ঋষির কাছে সূতমুনি নৈমিষারণ্য তীর্থক্ষেত্রে বসে বললেন—বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞান-মদ্বয়ম্'—যাঁরা তত্ত্ববিদ অর্থাৎ তত্ত্বকে জানেন তাঁরা তত্ত্ববস্তুকে অদ্বয় অর্থাৎ অদ্বিতীয় বলেন। অর্থাৎ তত্ত্ববস্তু একটিই তার দ্বিতীয় হয় না। এরই অনুবাদ করলেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ—

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন তিনিই তত্ত্ববস্তু—তাঁর দ্বিতীয় হয় না। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সিদ্ধান্ত করলেন তাঁর তত্ত্বসন্দর্ভে—'ভগবান্ এব তত্ত্বম্।' তত্ত্বের অদ্বিতীয়ত্ব স্থির হলেও সূতমুনি তার তিনটি নামকরণ করেছেন, 'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।' ঐ তত্ত্ববস্তুর তিনটি নাম ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান।

কেউ বলেন ব্রহ্ম, কেউ বলেন পরমাত্মা আবার কেউ বা বলেন ভগবান। তাহলে মনে হতে পারে তত্ত্ব যদি অদ্বয় হয়, যার দ্বিতীয়ই নেই তার দ্বিতীয় ছেড়ে তৃতীয় পর্য্যন্ত হয় কি করে? ব্রহ্ম পরমাত্মা, ভগবান তিনই যখন তত্ত্ব তখন অদ্বয়ত্ব বজায় থাকে কি করে? এর উত্তরে বলা হয়েছে—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান তিনই তত্ত্ব বটে, কিন্তু ভগবানই তত্ত্ব—আর ব্রহ্ম পরমাত্মা তাঁর ভিতরেই অনুস্যূত হয়ে আছেন। যেমন দশ সংখ্যার মধ্যে এক থেকে নয় সংখ্যা অনুস্যূত হয়ে থাকে। তাই দশ জানলে যেমন এক থেকে নয় জানা হয়েই যায় উপরন্তু কিছু বেশী জানা হয়। তেমনি ভগবানকে জানলে ব্রহ্ম পরমাত্মা অনায়াসে জানা হয়েই যায় উপরন্তু কিছু বেশী জানা হয়। মহাজন তাই বললেন, জানতে হয় তো গোবিন্দকে জান, তাহলে সব জানা হয়ে যাবে। 'হরি না জানিয়ে লাখ জানে যদি সে জানা কেবল ছাই।' এটি স্বকপোল কল্পিত কথা নয়—শ্রুতি-বাক্য আছে—'যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং স্যাৎ।' যাঁকে জানলে সব জানা হয়ে যায়, আবার যাঁকে লাভ করলে আর লাভ করবার কিছু বাকী থাকে না—ভগবান বললেন—'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।' তাহলে প্রশ্ন হতে পারে একক ভগবানই তত্ত্ব এইটে বললেই হত, ব্রহ্ম পরমাত্মা তত্ত্ব এ কথা বলা হল কেন? তার উত্তরে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন, এই যে একই তত্ত্ববস্তুর তিনটি নাম—এ হল সাধন ভেদে। কারণ সাধন তো তিনটি—জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি।

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥

কথা আছে ভিন্নরুচি হি লোকঃ। লোকের রুচি তো ভিন্ন। তাই সকলে তো এক জিনিষ নেবে না। এ জগতেও দেখা যায়—খাদ্যের মধ্যে ষড়রস—এর মধ্যে মধুররস সকলের উপরে। দেখা যায় মিষ্টি খেলে আর কিছু ভাল লাগে না, তাই বলে কি সবাই

মিষ্টি ভালবাসে ? টক ঝালও তো ভালবাসে। এখানেও তেমনি, ভক্তি সাধন বিচারে সকলের উপরে। কিন্তু ভক্তি পথে তো সকলে যাবে না, ভক্তি পথ সকলে নেবে না। কেউ জ্ঞানের পথে যায়, কেউবা যোগের পথে যায়, আবার কেউ বা ভক্তি পথ অবলম্বন করে। তাই জ্ঞান যোগ ভক্তি এই তিনটিই সাধন আখ্যা পেয়েছে।

এখন যে যেরকম সাধন অবলম্বন করবে—তার সেইরকম প্রাপ্তি। যে জ্ঞান সাধন অবলম্বন করবে তার সাধনের চরম দশায় অর্থাৎ সিদ্ধিকালে যে প্রাপ্তি সেটি হল ব্রহ্মানুভূতি। জ্ঞান সাধন ব্রহ্মানুভূতি পর্য্যন্ত করতে পারে। এই ব্রহ্মকে জ্ঞানবাদী বলেন নিরাকার, নির্গুণ, নিরঞ্জন, নিষ্কল, নিরুপাধি। জ্ঞানী তাঁর চরমদশায় অর্থাৎ সিদ্ধিকালে যখন দর্শন করলেন, তখন দেখলেন এক জ্যোতি—নিরাকার-সাধনকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে জ্যোতি দর্শন হল এর নাম কি ? সাধন জবাব দিলেন, এর নাম ব্রহ্ম সিদ্ধ স্বরূপ জ্ঞানী শুধু জ্যোতিদর্শন করে তৃপ্ত হতে পারে না, তাঁর মন ভরে না—তাই প্রশ্ন করেন ওগো জ্ঞান সাধন তুমি আমাকে এর বেশী দর্শন করাতে পার না—রূপ, গুণ, লীলা রস আস্বাদন করাতে পার না ? সাধন জবাব দেন—না, আমার এর বেশী দর্শন করাবার মত ক্ষমতা নেই। তুমি এই জ্যোতি দর্শন করেই তৃপ্ত হও। কারণ আমার এই পর্য্যন্ত গতি। ব্রহ্ম তত্ত্ব বটে, কিন্তু আংশিক। কারণ শুধু জ্যোতি তো থাকতে পারে না। জ্যোতির একটি আধার থাকবে। যেমন সূর্য্যের কিরণ আমরা এ জগতে পাই, যাকে রোদ বলা হয়। এই রোদ পেয়ে আমরা তৃপ্ত হতে পারি, কারণ তাতে আমার প্রয়োজন মেটে, ব্যবহারিকতা চলে যায়। কিন্তু যারা সূর্য্যের উপাসক সূর্য্য দেবতা যাদের উপাস্য তারা তো শুধু রোদ পেলে খুসী হবে না। তারা চায় তাদের উপাস্যের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেবে, তাঁকে ভোগরাগ নিবেদন করবে, তার স্তুতি বন্দনা করবে—এ তো কিরণকে করা যায় না। তাঁদের কাছে সূর্য্য দেবতার শ্রীবিগ্রহ চাই—যিনি সাতঘোড়ার রথে চড়ে

আছেন। এই কিরণ বা রোদের আধার হলেন সূর্য্য। তেমনি জ্ঞানবাদী যাঁরা সিদ্ধিকালে ব্রহ্মানন্দভূতি লাভ করছেন—তাঁরা শুদ্ধ জ্যোতিদর্শনে তৃপ্ত হতে পারেন, কারণ জ্ঞান সাধন এর বেশী অনুভব করাতে পারে না। এই যে ব্রহ্ম জ্যোতি এর আধার কে? কার জ্যোতি? শাস্ত্র বললেন ব্রহ্ম হলেন শ্রীগোবিন্দের অঙ্গজ্যোতি। গোবিন্দ হলেন এই ব্রহ্মজ্যোতির আধার। ব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মার বাক্য—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ড কোটি—
কোটিষবশেষ বসুধাদি বিভূতি ভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

ভক্তিবাদী তাই শুদ্ধ জ্যোতিদর্শনে তৃপ্ত হতে পারে না। তার চাহিদা অনেক বেশী। ভক্ত রূপ, রস, গুণ লীলা আস্বাদনে ভরপুর হতে চায়। জ্ঞান সাধন ব্রহ্ম দর্শন করালেন বটে, কিন্তু ব্রহ্ম তত্ত্ব হলেও আংশিক। জ্ঞানী তত্ত্বকে সম্পূর্ণ করে পাচ্ছে না।

এর পরে যোগী যোগসাধনকে অবলম্বন করলেন—অষ্টাঙ্গ যোগ সাধনের কথা পাতঞ্জল দর্শনে বলা আছে—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা সমাধি। সাধন করে করে যোগী সিদ্ধিলাভ করলেন—সাধনে সিদ্ধিলাভ বলতে ইষ্ট দর্শন বুঝায়। যোগীকে সাধন ইষ্ট দর্শন করালেন। এই ইষ্ট কিন্তু জ্ঞানবাদীর জ্যোতিস্বরূপে ব্রহ্ম নিরাকার নন, ইনিই হলেন পরমাত্মা, এঁর আকার আছে তবে রূপমাধুর্য্য, রস মাধুর্য্য বা লীলামাধুর্য্যের প্রকাশ নেই। সুতরাং ইনিও সম্পূর্ণ নন। ইনিও আংশিক। যোগী দর্শন করলেন বটে কিন্তু তৃপ্ত হতে পারলেন না, মন ভরল না, তাই যোগ-সাধনাকে জিজ্ঞাসা করেন, ওগো যোগসাধন তুমি আমাকে এর বেশী দর্শন করাতে পার না? যোগসাধন জবাব দেয়—না, আমার এই পর্য্যন্ত গতি। যোগী তুমি এতেই তৃপ্ত হও। যোগী পরমাত্মানু-

ভূতিরূপ তত্ত্ববস্তু পেলেন বটে কিন্তু সেও আংশিক, সম্পূর্ণরূপে তত্ত্ববস্তুকে যোগসাধন পাইয়ে দিতে পারল না। তাহলে তত্ত্ববস্তুকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করাবে কে ?

তখন সুচতুর ভক্ত ভক্তিমহারাণীকে (ভক্তিসাধনকে) অবলম্বন করলেন—জিজ্ঞাসা করলেন—ওগো ভক্তিমহারাণী তুমি আমাকে আমার তত্ত্ববস্তু পাইয়ে দিতে পারবে তো ? ভক্তি অঙ্গ যাজন বলতে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চ্চন, পাদসেবন, দাস্যসখ্য আত্মনিবেদন এই নববিধাকে বুঝায়। ভক্তিমহারাণী বলেন দেখ ভক্ত, আমি যখন সাধন তখন তোমাকে সিদ্ধিকালে তোমার তত্ত্ববস্তু অর্থাৎ সাধ্যবস্তুকে তো দর্শন করাবই—শব্দে, স্পর্শে, রূপে, রসে, গন্ধে অনন্ত লীলামাধুর্য্যে ভরপুর তোমার ইষ্টকে তোমার হৃদয়ঘরে পেঁছে দেব—এতখানি সামর্থ্য আমার আছে। সাধক তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। তুমি ঘরে বসে ভজন করবে। তোমার প্রেমে রসিয়ে মজিয়ে গলিয়ে তোমার ইষ্টবস্তুকে তোমার হৃদয়-ঘরে এনে দেব। শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বললেন, 'কৃত্বা হরিং প্রেমভাজং প্রিয়বর্গসমন্বিতম্।' ইষ্টকে একা নয়, তাঁর প্রিয়-পরিকরের সঙ্গে দর্শন করাব। পরিকর ছাড়া ভগবানের শোভা হয় না। সখাদের মাঝে ভাই কানাই, মায়ের কোলে শ্রীবালগোপাল, গোপীমণ্ডলীবেষ্টিত শ্রীগোপীজনবল্লভ পরম শোভা। যেটিকে লক্ষ্য করে শ্রীশুকদেব বললেন—

তত্রাতি শুশুভে তাভি ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মনীনাং হৈমানাং মহামরকতো যথা॥ ভাঃ ১০।৩৩।৭

ভক্তিসাধনে সিদ্ধিকালে এ পাওনা তো ভক্তের আছেই, এ ছাড়াও ভক্তিমহারাণীর বৈশিষ্ট্য হল—সাধনকালে ফললাভ। ভক্ত যখন সাধন করে অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন করছে তখন সিদ্ধিলাভ হয় নি—তখনও ভক্তিমহারাণী ভক্তকে কিছু দেন। এটি ভক্তিমহারাণীর নগদ দান। এ কিন্তু জ্ঞান যোগ দিতে পারে না। তারা সাধনের

সিদ্ধিকালে ফল দেন কিন্তু সাধক যখন সাধন করে তখন তাদের কিছু দিতে পারে না। প্রথম যোগীন্দ্র শ্রীকবি বলেছেন, 'বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ত্ততে ভীঃ। বিশ্বাত্মনা পদে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ টীকা করেছেন—'সাধনদশায়ামপি।' সাধন কালে পাওনা, এটি হল ভক্তি-মহারাণীর বৈশিষ্ট্য। কি পাওনা দেন? ভক্ত সাধনকালে কি পায়? ভগবানের দর্শন? না—ভক্ত যখন সাধন করে অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তন করে তখন পায়, অনাবিল আনন্দ—যে আনন্দে ভরপুর হয়ে ভক্ত ভগবানকে না পাওয়ার ব্যথাও ভুলে যায়, পরমানন্দ লাভ করে। এই আনন্দ ভক্ত সাধনদশাতে পায়। এটি ভক্তিমহারাণীর কৃপার দান। কারণ আনন্দের জন্যই তো যা কিছু মানুষ করে। ভাল খাওয়া হোক, ভাল থাকা হোক, ভাল পরা হোক—আনন্দের জন্যই মানুষ করে। আনন্দই প্রাপ্তি। ভক্ত এই আনন্দ পায় সাধন দশায়! এর জন্য সিদ্ধিলাভের অপেক্ষা নেই। ভক্তিমহারাণী এ সম্পদ দেন কেন? মহাজন রসিকতা করে বলেন, জ্ঞান, যোগ—এরা পুরুষ জাতি —ত্যরা হিসাব রাখতে পারে সাধন করে করে সাধক সিদ্ধিলাভ করলে তারা তাদের পাওনা মিটিয়ে দেয়। কিন্তু ভক্তিমহারাণী নারীজাতি—অত হিসাবনিকাশের ধার ধারেন না। অত হিসাব করতে পারেন না, তাই ভক্ত যখন সাধন করে শ্রবণ কীর্ত্তন করে তখনই তাদের পাওনা কিছু নগদ নগদ দিয়ে দেন। এ তো গেল একটি দিক। আর একটি হল ভক্তিমহারাণী ভক্তকে তত্ত্ববস্তুকে সম্পূর্ণ করে অনুভব কর্যাচ্ছেন। জ্ঞানসাধন যে তত্ত্ববস্তুকে অনুভব করান তার নাম ব্রহ্ম, যোগসাধন যে তত্ত্ববস্তুকে অনুভব করান, তাঁর নামই পরমাত্মা—এ দুই তত্ত্বই আংশিক কিন্তু ভক্তিমহারাণী যে তত্ত্ববস্তুকে উপলব্ধি করান তিনি হলেন ষড়ৈশ্বর্য্যশালী লীলাময় শ্রীভগবান। ইনি অংশ নন, ইনি হলেন সম্পূর্ণ। আবার তাঁর সম্পূর্ণতা কেমন? ভগবান বলতে একা ভগবানকে বুঝায় না। ভগবান বলতে তাঁর ধাম, নাম, বিগ্রহ, লীলা পরিকর সব নিয়ে

ভগবান যেমন শ্রীজীবগোস্বামিপাদ উপমা দিয়েছেন—রাজা গচ্ছতীতিবৎ কেউ যদি কখনও এসে হঠাৎ বলে, দেখে এলাম পথ দিয়ে রাজা যাচ্ছেন—তখন লোকে কি বুঝবে—রাজা একা একা নিঃসঙ্গ যাচ্ছেন ? না তা বোঝে না—রাজা যাচ্ছেন বললেই বুঝে নেয় রাজার সঙ্গে পাত্র মিত্র সভাসদ্, চতুরঙ্গ সেনা, ছত্র, চামর সব আছে—তবে তো রাজা যাচ্ছেন—এটি মানাবে। তেমনি ভগবান বললেই ভগবানের শ্রীবিগ্রহ, ধাম, নাম, লীলা, পরিকর সব নিয়ে ভগবান। ভক্তিমহারাণী শুধু ভগবানকে দর্শন করান তা নয় ভগবানের নাম, ধাম, বিগ্রহ, লীলা পরিকর সকলের স্বরূপ অনুভব করান। তাই ভক্তিমহারাণী তত্ত্ববস্তুকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব করান। এর পক্ষে প্রমাণ বাক্য আছে ভগবানের শ্রীমুখের উক্তি—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

গীঃ ১৮।৫৫

ভগবান শ্রীগোবিন্দ বললেন, ভক্তদ্বারা আমাকে সম্পূর্ণরূপে জানা যায়—ভগবান শুধু 'জানাতি' বলতে পারতেন, তা না বলে বললেন, 'অভিজানাতি'—'অভি' বলতে সম্যক—এই সম্যক জানাটি কিরকম ? বললেন, যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। অর্জুন, যশ্চাস্মি অর্থাৎ আমার নিজের স্বরূপ কেমন এবং যাবান্ পদে আমার ধাম, নাম, লীলা, বিগ্রহ, পরিকর—এ সব কেমন—এ একমাত্র ভক্তির দ্বারাই জানা যায়, অন্য কিছু অর্থাৎ জ্ঞান বা যোগ সাধনের দ্বারা জানা যায় না। ভগবান কিন্তু গীতা বাক্যে অষ্টাদশ অধ্যায়ে এখানে জ্ঞানসাধন প্রসঙ্গেই কথা বলছেন, কিন্তু জ্ঞানের দ্বারা এ সব জানা যায়, তা তো বললেন না—বললেন ভক্তির দ্বারা জানা যায়।

কপিল ভগবান মা দেবহূতির কাছে ভক্তিমহারাণীর মহিমা প্রসঙ্গে বলেছেন, ভক্তি হলেন মনঃস্থানীয়। উদাহরণ দিয়েছেন—যেমন দুধকে চোখ দেখে শুধু সাদা, দুধের অন্য গুণ চোখ নিতে পারে না। কিন্তু দুধের তো অন্য গুণও আছে ? কিন্তু চোখ তা

নিতে পারে না। আবার জিহ্বা দুধকে বলবে দুধ খেতে মিষ্টি। জিহ্বা অর্থাৎ রসনা রস ছাড়া আর কিছু নিতে পারে না। দুধ খেতে মিষ্টি (স্বাদু) ঠিকই বলেছে কারণ দুধ তো মিষ্টিই ঝাল বা টক নয়। কিন্তু শুধু মিষ্টি বললে তো দুধকে বুঝান হল না, কারণ মিষ্টি জিনিস তো কত আছে। জিহ্বা বলল বটে কিন্তু আংশিক বলল সম্পূর্ণ করে বলতে পারল না। এর পরে ত্বগিন্দ্রিয় দুধকে বুঝাতে গিয়ে বলল দুধ শীতল ঠাণ্ডা কারণ তখনও দুধ গরম করা হয় নি। ত্বগিন্দ্রিয় ঠিকই বলেছে, তবে সম্পূর্ণ করে দুধকে বুঝাতে পারল না। আংশিক বলল। কারণ শুধু ঠাণ্ডা বললে তো দুধকে বুঝান হল না, ঠাণ্ডা জিনিষ তো আরও কত আছে। কাজেই চোখ, রসনা বা ত্বগিন্দ্রিয় দুধকে সম্পূর্ণ করে কেউই বুঝাতে পারল না। তাহলে দুধকে সম্পূর্ণ করে বুঝাবে কে ? মনকে পাঠাও। মন দুধকে সম্পূর্ণ করে বুঝাবে। মন বলবে দুধ দেখতে সাদা, খেতে মিষ্টি এবং স্পর্শ করলে শীতল— এর উপরে দুধ-দুধ-দুধ আবার কার মত হবে। সেইরকম জ্ঞানসাধন তত্ত্ববস্তুকে বলল, জ্যোতিস্বরূপ ঠিকই বলেছে, তবে আংশিক বলল—সম্পূর্ণ করে বুঝাতে পারল না। যোগসাধনও তত্ত্বকে বলল —চেতনস্বরূপ সাকার পরমাত্মা—ঠিকই বলেছে তবে অংশত বলেছে —সম্পূর্ণ করে বুঝাতে পারল না। কিন্তু ভক্তিমহারাণী হলেন মনঃস্থানীয়। মন যেমন দুধকে সম্পূর্ণরূপে বুঝাল তেমনি ভক্তিমহারাণী তত্ত্ববস্তুকে সম্পূর্ণ করে বুঝালেন, তত্ত্ববস্তু জ্যোতি-স্বরূপ তো বটেই—যে সত্যস্বরূপ ভগবান তাঁর তেজঃপ্রভাবে মায়া কুহককে বহু দূরে সরিয়ে রাখেন। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে প্রথম মন্ত্রেই বলা আছে—

ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।

ভাঃ ১।১।১

আবার তত্ত্ববস্তু আকারবান্ একথাও ভক্তি বললেন—শুধু আকার

নয়. আকার বলতে রূপ বুঝায়—ভগবান অসীম রূপবান—তাঁর অনন্ত রূপ। গোবিন্দের রূপমাধুরী সম্বন্ধে বলা আছে—

যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন
নরনারী করে আকর্ষণ

আবার বললেন, সে মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে।

কৃষ্ণরূপমাধুরী ত্রিভুবনকে আকর্ষণ করে, এটি বললেও ঠিক সম্পূর্ণ বলা হল না। আরও যদি সূক্ষ্ম করে বলা যায়, তাহলে বলতে হয়, গোবিন্দ নিজের রূপে নিজেই মুগ্ধ হন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন, 'আত্মপর্য্যন্তসর্ব্বচিত্তহরঃ।' গোবিন্দ যে নিজের রূপে নিজে মুগ্ধ হয়ে নিজের মাধুরী রাধারাণীর মত করে আস্বাদন করতে চেয়েছেন এইটিই তো গৌরস্বরূপের বীজ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যখন রাধারাণীর মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দিয়ে নিজের মাধুরী আস্বাদন করেন তখন তিনিই তো গৌর। তাই দেখা যাচ্ছে ভক্তি-মহারাণী তত্ত্ববস্তুকে অর্থাৎ ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছেন যা জ্ঞান বা যোগসাধনের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাছাড়া ধাম, লীলা, পরিকর বিগ্রহ, নাম এদের স্বরূপও ভক্তিমহারাণী প্রকাশ করেন যা জ্ঞান বা যোগ পারে না। তাই সব দিক দিয়ে বিচার করে ব্রহ্মা ভক্তিপদকেই বললেন শ্রেয়পথ শ্রেয়ঃ সৃতি। মানুষ যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে জ্ঞান বা যোগসাধন বাদ দিয়ে ভক্তিপথই অবলম্বন করবে। কারণ সাধন করতে হলে পরিশ্রম তো কিছু থাকবেই। বিনা পরিশ্রমে সাধন হয় না। জ্ঞান বা যোগসাধনে পরিশ্রম আছে, আর ভক্তিকে যখন সাধন আখ্যা দেওয়া আছে তখন তাতেও কিছু পরিশ্রম আছে বৈকি। তবে শ্রবণ কীর্তনময়ী যে ভক্তি ভক্ত যখন এই ভক্তি-অঙ্গ যাজন করে অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তন করে তখন পরিশ্রম বলে তো মনে করেন না বরং পরম আনন্দ করে করে। তাই শ্রুতিগণ যখন স্তুতি প্রসঙ্গে বললেন—প্রভু ভক্ত তোমার লীলাসাগরে সাঁতার দেয়—তখন ভগবান জিজ্ঞাসা করছেন, শ্রুতিগণ আমার ভক্ত যে

আমার লীলাসাগরে সাঁতার দেয় তাদের হাত কোথায়? কারণ হাত দিয়ে জল কেটে সাঁতার দিতে হয়। তখন শ্রুতিগণ বললেন, 'প্রভু ভক্তের দুটি হাত—একটি হল শ্রবণ আর একটি কীর্ত্তন। কারণ শ্রবণ এবং কীর্ত্তনের মাধ্যমেই তো লীলারসের আস্বাদন। তখন ভগবান বলছেন, তাহলে এই যে সাঁতার দেয় ভক্ত—তাদের পরিশ্রম হয় না? শ্রুতিরা বললেন, না প্রভু তাদের পরিশ্রম তো হয়ই না, বরং আনন্দ করে শ্রবণ কীর্ত্তন করে। 'পরিবর্ত্ত পরিশ্রমণা' —পরি উপসর্গটিকে এখানে টীকাকার গোস্বামিপাদ বর্জন অর্থে ব্যবহার করেছেন।

তাহলে জ্ঞান যোগ সাধনে পরিশ্রম আছে অথচ পাওনা কম—তত্ত্ববস্তুকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু ভক্তি সাধনে পরিশ্রম তো নেইই—যেটিকে পরিশ্রম বলে মনে হয় সেটি পরিশ্রম তো নয়ই বরং পরম আনন্দ, অথচ পাওনা অনেক বেশী। কারণ ভক্তির দ্বারা তত্ত্ববস্তুকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং বাক্‌পতি ব্রহ্মা সিদ্ধান্ত করলেন এই ভক্তিই হলেন মানুষের জীবনে শ্রেয়ঃপথ। সাধন যদি করতে হয় তাহলে ভক্তিপথেই যেতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। মহাজন তাঁর নিজের অনুভব বললেন, জীব যতই সাধন করুক না কেন, কিছুতেই স্থির হতে নারে। সম্বন্ধ লক্ষণা ভক্তির আশ্রয় না পেলে জীব কিছুতেই স্থির হতে নারে। জ্ঞান, যোগসাধনে ভ্রংশ আছে। জ্ঞানভ্রষ্ট যোগভ্রষ্ট কথা শাস্ত্রে আছে। জ্ঞান যোগ সাধন করতে করতে দেখা যায় পতন হয়ে গেল। চণ্ডী বললেন—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

জ্ঞানীদের চিত্তকেও মহামায়া আকর্ষণ করে মোহগর্ত্তে ডুবিয়ে দেন। আর যোগভ্রষ্ট কথা তো ভগবান নিজেই গীতাবাক্যে বললেন—

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে। গীঃ ৬।৪১

যোগসাধন করতে করতে ভ্রংশ হলে তারা পবিত্র ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করে।

কিন্তু শাস্ত্রে ভক্তিভ্রষ্ট কথা কোথাও পাওয়া যাবে না। কারণ ভক্তিপথে পতন হয় না। যেটি আপাততঃ দেখা যায় পতনের মত যেমন রাজর্ষি ভরতের মৃগজন্ম বা চিত্রকেতু গন্ধর্ব্বরাজ তাঁর অসুরদেহ প্রাপ্তি—ওটি আসলে পতন নয়—পতনের মত দেখতে। এটি তাকে আরও বেশী করে এগিয়ে দেওয়ার জন্য। রাজর্ষি ভরত মৃগজন্মের পরের জন্মে আবার মানুষ দেহ পেয়েছেন—যেটি জড়-ভরত জন্ম সেইটিই তাঁর চরম কলেবর—সেই জন্মেই ভরতের মুক্তি হয়ে গেছে। আর চিত্রকেতু রাজা যে বৃত্রাসুর হলেন সেটি পতন নয় কারণ তাঁর ভক্তিপথ রুদ্ধ হয় নি। এ সব হল লোকশিক্ষা। ভক্তি সূত্র ছিন্ন হয় না—শ্রীবালগোপাল যমলার্জ্জুন ভঙ্গলীলায় দেখালেন উদূখলের সঙ্গে নিজের কটিদেশে দড়ি টানাটানির ফলে শতজন্মের বদ্ধমূল দুটি অর্জ্জুনবৃক্ষ প্রচন্ড শব্দ করে মূলশুদ্ধ উপড়ে পড়ল অথচ দড়িটি একটুও ছিঁড়ল না। কারণ মা যশোমতী গোপালকে যে দড়ি দিয়ে বেঁধেছেন, ওতো দড়ি নয়, দেখতে দড়ির মত—এর উপাদান তো মায়ের হৃদয়ের অফুরন্ত বাৎসল্য প্রেম। তা ছিঁড়বে কি করে!

ব্রহ্মা বলছেন, এই শ্রেয়ঃসৃতি ভক্তিকে বাদ দিয়ে যারা শুধু জ্ঞান চর্চ্চা করে তারা ফল তো কিছু পায়ই না, শুধু পরিশ্রমই সার হয়। কারণ ফল দেবার জন্য অন্য যে কোনও সাধন ভক্তিমহারাণীর মুখের দিকে চেয়ে আছে। 'ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্মযোগ জ্ঞান।' যেমন একবস্তা তুয (ধানের খোসায়) ঢেঁকিতে পাড় দিলে হাতে এককণা চাল তো মিলবেই না পায়ে ব্যথাই সার হবে, তেমনি ভক্তি বাদ দিয়ে শুধু জ্ঞান চর্চ্চা করলে ফল তো পাওয়া যাবেই না—শুধু পরিশ্রমই সার হবে।

জ্ঞান যোগ ভক্তি এই তিনটি সাধনের মধ্যে ভক্তি সাধনই যে সর্ব্ব-

শ্রেষ্ঠ এটি বাক্‌পতি ব্রহ্মা সিদ্ধান্ত করলেন। তাই ভক্তিকে বলা হয়েছে শ্রেয়ঃসৃতি—কারণ ভক্তি দ্বারাই তত্ত্ববস্তুকে সর্ব্বতোভাবে জানতে পারা যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বললেন—

কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণভক্তের সেই মুক্তি হয় অসাধনে॥

আরও বলেছেন—

ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যশ্চ যৎ।
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা॥

শ্রীগোবিন্দ উদ্ধবজীকে বলেছেন, কর্ম্মযোগ, তপস্যা, জ্ঞান বৈরাগ্য প্রভৃতি সাধন অনুষ্ঠান করে কর্ম্মী, তপস্বী, জ্ঞানী, বিরক্তগণ যে ফললাভ করেন আমার ভক্তগণ একমাত্র ভক্তিসাধনের ফলে অনায়াসেই সে সমস্ত ফললাভ করে থাকে।

ব্রহ্মস্তুতির পরবর্ত্তী মন্ত্র—

পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনস্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়া।
বিবুধ্য ভক্ত্যৈব কথোপনীতয়া প্রপেদিরেঽঞ্জোঽচ্যুত তে গতিং পরাম্।
ভাঃ ১০।১৪।৫

ব্রহ্মা এখানে ভগবানকে দুটি সম্বোধন করলেন—হে ভূমন্ অর্থাৎ তুমি বিরাট, ভূমা, অসীম—তোমার মহিমা অসীম, তোমার মাহাত্ম্য বুদ্ধির অগোচর—মাপতে পারা যায় না। আর তুমি হলে অচ্যুত। অচ্যুত বললেন কেন? ভগবানের চ্যুতি নেই, ব্যয় নেই, ক্ষয় নেই এইজন্য তাঁকে অচ্যুত বলা হচ্ছে তা নয়—কারণ অণু চৈতন্য জীব তারই ব্যয় নেই, ক্ষয় নেই, আর ভগবান বিভু চৈতন্য ঈশ্বর তাঁর তো ব্যয় থাকবেই না, সেজন্য ভগবানকে অচ্যুত বলা হচ্ছে তা নয়—তবে ভগবানের চরণ আশ্রয় করে যারা পড়ে থাকে অর্থাৎ

ভক্ত তাদেরও ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই এইজন্যই ভগবানকে বলা হয় অচ্যুত। বলা আছে, 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' আমার ভক্ত কখনও বিনাশ পায় না। ভক্তি পথে ভ্রংশ নেই। তাই ভক্তিভ্রষ্ট কথা শাস্ত্রে কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু জ্ঞানভ্রষ্ট কথা শাস্ত্রে আছে। চন্ডীবাক্যে বলা আছে—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

জ্ঞানীদের চিত্তকেও আকর্ষণ করে দেবী মোহগর্ভে ডুবিয়ে দেন। আর যোগভ্রষ্ট কথা তো ভগবান নিজেই বলেছেন।

শুচীনাং শ্রীমতাংগেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে।

—গীতা ৬।৪১

যোগসাধন করতে করতে যাদের পতন হয় তাদের ধনবান শুচি ব্যক্তির ঘরে জন্ম হয়, আর এরও উপরে যারা—অর্থাৎ যোগসাধনে আরও উন্নত হয়ে যাদের পতন হয়, তাদের যোগীর ঘরে জন্ম হয়।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্।

গীতা ৬।৪২

জ্ঞান স্যধন ব্রহ্মানুভূতি করায় যোগসাধনও পরমাত্মানুভূতি করায় কিন্তু শুদ্ধাভক্তি সম্পর্ক না হওয়া পর্য্যন্ত চিত্তসম্পূর্ণ শুদ্ধ হচ্ছে না। তাই দেবতারা বললেন—

জ্ঞানী জ্ঞানে মুক্তদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুত চিত্তশুদ্ধি নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥

তাই ব্রহ্মা অনুভব করে বললেন, 'প্রভু যোগীরা বহু বহু যোগসাধন করেছেন, কিন্তু দেখলেন এতে তো তৃপ্তি হচ্ছে না। প্রতিষ্ঠালাভ হচ্ছে—সিদ্ধিলাভ হচ্ছে—তাই কি অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়? তা হয় না—হয়ত একটি সিদ্ধি লাভ হল—খুব বেশী হলে দুটি বা তিনটি লাভ হল। তাতে লোককে চমৎকৃত করা যায়—অনিমা

সিদ্ধি লাভে দেহকে খুব ছোট করতে পারা যায়, লোকে দেখে অবাক হয়—লঘিমা সিদ্ধি লাভে দেহকে খুব হাল্কা করতে পারা যায়, এত হাল্কা যে জলের উপর দিয়ে হেঁটে পার হয়ে গেল—সোলা যেমন জলে ভাসে দেহ সোলার থেকেও হাল্কা হয়ে যায়—এ সব সিদ্ধি যোগসাধনে হতে পারে, তাতে মানুষ মুগ্ধ হয় বাহবা দেয়। কিন্তু যোগীর নিজের তাতে কি তৃপ্তি? আত্মতৃপ্তি তো হয় না, নিজের তো তাতে কোন আনন্দ হয় না। ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু সব যোগীর নয়—তবে এই সব যোগীর মধ্যে যাদের উপর ভগবানের করুণা হয় —কিরকম করুণা—ভগবান যদি এই যোগীর সম্বন্ধে চিন্তা করেন, এরা তো সাধনে পরিশ্রম করছে কিন্তু ফল তো পাচ্ছে না, আমার পাদপদ্মে সেবাসুখ পাচ্ছে না—এই করুণা যে সব যোগীর উপরে হয় তখন সেই যোগী নিজেদের যোগসাধনের ফল ভগবানে অর্পণ করে—'তদর্পিতেহা'—ঈহা অর্থাৎ—চেষ্টা—তাদের যা কিছু যোগ সাধনের চেষ্টা ভগবানে সমর্পণ করে দেয়। ভগবান তখন কি করেন? যে যোগী তার সব কর্মফল ভগবানে দিয়েছে, ভগবান তো তাকে কিছু দেবেন। ভগবান যোগীকে কি দেন? ভগবান তখন সেই যোগীকে ভগবানের কথাতে রুচি দান করেন। যোগীর তো ভগবানের কথা শ্রবণে রুচি ছিল না। এই কথা রুচি ভগবান যোগীকে দান করেন কারণ বলা আছে, ভগবানের কথাতে যদি রুচি না হয় তাহলে যত ধর্ম আচরণই করুক তার সব ধর্মাচরণ বৃথা শুধু পরিশ্রমই সার হয়। বলা আছে—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বকসেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥

ভাঃ ১।২।৮

ভগবানের কথার শ্রবণ কীর্ত্তনই ভগবানে রুচি দান করবে। কথা বলতে চারটি বুঝায়—ভগবানের নাম, রূপের কথা, গুণের কথা, লীলা কথা। কথার আগে শ্রবণ তারপরে কীর্ত্তন। যেমন আগে

জমা তারপরে খরচ। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেছেন, 'আদৌ স্থিতিঃ পশ্চাদভিব্যক্তিঃ। শ্রীকপিল ভগবানও মা দেবহূতির কাছে বলেছেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতিভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

ভাঃ ৩।২৫।২৪

কপিল ভগবান বলছেন, জানো মা, আমারই কথা অর্থাৎ ভগবানেরই কথা কিন্তু যখন সাধু ভক্ত সেই কথা জিহ্বায় উচ্চারণ করেন তখন তার শক্তি বেড়ে যায়। তাই সাধুমুখে হরিকথা শুনলে যেরকম কাজ হয় শাস্ত্রে পড়লে সেরকম কাজ হয় না—যদি প্রশ্ন করা যায় কেন? সাধুরা তো সেই শাস্ত্রকথাই বলবেন কিন্তু শুধু শাস্ত্রকথা নয়, তাঁরা তার সঙ্গে নিজেদের অনুভব মিশিয়ে কথা বলেন—সেই অনুভবের দাম বেশী এবং তাতেই কাজ হয়। যেমন বটগাছের ফল বটগাছের তলে বিছিয়ে থাকে—সেখানে মাটি আছে, জলও পড়ে, বাতাস আছে আলো আছে, বটের ফলের মধ্যে বীজ আছে চারা গজাবার মত উপাদান সবই সেখানে আছে কিন্তু চারা গজায় না। তা যদি হত তাহলে বটগাছের নীচে অসংখ্য বটের চারা দেখা যেত কিন্তু তা তো দেখা যায় না। বটের চারা কোথায় দেখা যায়? ছাদের আলসেতে, খড়ের চালে প্রাচীরের উপর। সেখানে প্রধান উপাদান যে মাটি তাই তো নেই—তাহজে চারা হয় কি করে—আলো বাতাস জল না হয় সেখানে কিছু থাকে কিন্তু সেইটাই তো চারা গজাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ঐ বটফলটি পাখীতে খায়, খেয়ে হজম করে—ঐ বীজ পাখীর লালার সঙ্গে মেশে, তখন পাখী সেটি নিম্নগামী করে বিষ্ঠারূপে ঐ প্রাচীরের উপর ছাদের উপর যখন ফেলে তখন তার শক্তি এত বেড়ে যায় যে পাষাণেও চারা গজিয়ে ওঠে। এখানেও তাই শাস্ত্রকথা ভক্ত পাখী খায় অর্থাৎ অনুশীলন করে নিজেদের অনুভবরূপ লালার সঙ্গে সেই কথা মেশে—এখন কথা তো নিম্নগামী হবে না—ঐ কথা উর্দ্ধগামী হয়ে যখন শ্রীমুখে তারা উচ্চারণ করে

তখন সেই কথার শক্তি এত বেড়ে যায় যে ঐ কথা যদি অতি বড় পাষন্ডীর কানেও প্রবেশ করে তাহলেও তাদের অনায়াসে উদ্ধার হয়ে যায়। এই কথা তখন হৃদয় এবং কানে রসায়নের কাজ করে। কবিরাজী রসায়ন যেমন রোগ দূর করে আবার পুষ্টিদান করে তেমনি সাধুমুখে হরিকথা জীবের হৃদয়ের ও কানের রোগ দূর করে আবার পুষ্টি দান করে। হৃদয়ের রোগ হল বিষয় চিন্তা, সংসারের চিন্তা আর হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পুষ্টির অভাব হল ভগবৎচিন্তা বেশীক্ষণ করতে না পারা। সাধুমুখে হরিকথা শুনলে হৃদয়ের রোগ দূর হবে অর্থাৎ বিষয় চিন্তা সংসারের চিন্তা চলে যাবে আর ভাগবৎ চিন্তা বেশীক্ষণ করা যাবে অর্থাৎ পুষ্টি লাভ হবে, দুর্ব্বলতা সারবে। এইরকম কানেরও রোগ আছে, পুষ্টির অভাব আছে। কানে রোগ হল বিষয়কথা শোনাতে রুচি আর ভগবৎ কথা বেশীক্ষণ শুনতে না পারা—এটি হল পুষ্টির অভাব। দুর্ব্বল রোগী যেমন বেশীক্ষণ হাঁটতে পারে না, দু পা যায় আবার বসে পড়ে। আমারও সেই অবস্থা—ভগবানের কথা বেশীক্ষণ কানে নিতে পারি না। কিন্তু সাধুমুখে হরিকথা শুনতে শুনতে কানের রোগ সারবে তখন আর বিষয় কথা শুনতে ভাল লাগবে না, আর ভগবানের কথা অনেকক্ষণ শুনতে পারা যাবে—তখন বোঝা যাবে—পুষ্টিলাভ হচ্ছে। এইভাবে হরিকথার সেবা করলে কি হবে? আশু অর্থাৎ—খুব তাড়াতাড়ি অপবর্গবর্ত্মনি অর্থাৎ ভগবানে অপবর্গ অর্থে মুক্তি বুঝায়—সেই মুক্তি যার বর্ত্মা অর্থাৎ পথ—মুক্তি যার পথে পড়ে আছে সেই ভগবানে ব্রহ্মা যেটি অন্যত্র বলেছেন, মুক্তিপদ শ্রদ্ধা রতি ভক্তি ক্রমে ক্রমে লাভ হবে। অনুক্রমিষ্যতি। এখানে কথার মধ্যে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হচ্ছে। একবার বললেন 'আশু' অর্থাৎ তাড়াতাড়ি শ্রদ্ধা রতি ভক্তি লাভ হবে—আবার বললেন ক্রমে ক্রমে লাভ হবে। আশু এবং অনুক্রমিষ্যতি—এর মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? মনে হয় পরস্পর বিরোধী, কারণ যেটি তাড়াতাড়ি লাভ হবে তার

তো ক্রম হতে পারে না—আবার যেটি ক্রমে ক্রমে লাভ হবে সেটি তো তাড়াতাড়ি হতে পারে না। এখানে দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামিপাদ সমাধান করলেন, এ ক্রম কেমন? উপমা দিলেন শতপত্রভেদ-ন্যায়। একটি পদ্মফুলের একশ পাপড়ি থাক করে সাজিয়ে উপর থেকে একটি ছুঁচ যদি ফুটিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ছুঁচটি নীচে নেমে আসে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি হল—তাহলে আশু—আবার এটি তো অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে একটি দুটি তিনটি করে পদ্মফুলের একশ পাঁপড়ি ভেদ করে ছুঁচটি নীচে নেমেছে—তাহলে ক্রম আছে। অথচ এত তাড়াতাড়ি নেমেছে যে ক্রম বলে বোঝা গেল না। এখানেও তাই—সাধুমুখে হরিকথা শুনতে শুনতে ভগবানে শ্রদ্ধা রতি ভক্তি এত তাড়াতাড়ি লাভ হবে যে দেরী হল বলে বোঝা যাবে না।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন, 'কিছুই না জানে যেহ শুনিতে শুনিতে সেহ কি অদ্ভুত চৈতন্য-চরিত।'

কাজেই যোগী যখন ভগবানের কৃপা পেয়ে তার নিজের যোগ-সাধনের সমস্ত ফল ভগবানে সমর্পণ করে দেয়, তখন ভগবান ঐ যোগীকে তাঁর কথা শ্রবণে রুচি দান করেন। তাতেই কাজ হয়ে যায়। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বললেন, এই কথারুচি হলেন দূতী। কথারুচিরূপা দূতীর সঙ্গে যখন যোগীর দেখা হ'ল—তখন এই কথারুচি দূতীই তাকে কথনীয়রুচি দান করবে। কথনীয় অর্থাৎ যার কথা। এই কথা শ্রবণে রুচিই তাকে ভগবানে রুচি জাগিয়ে দেবে। কারণ দূতীর সঙ্গে দেখা হলে আর চিন্তা নেই। রাধা-রাণীর দুর্জ্জয় মান, সে মান কিছুতে প্রসন্ন হয় না—শ্রীগোবিন্দ যখন রাধারাণীর কাছে নিসৃষ্ঠার্থা দূতী পাঠালেন তখন নিশ্চিন্ত দূতী যখন গেছে তখন রাধারাণীর মান প্রসন্ন করে গোবিন্দের সঙ্গে মিলন করাবেই করাবে। এখানেও যোগীর যখন ভগবানের কথারুচিরূপা দূতীর সঙ্গে দেখা হল অর্থাৎ ভগবানের কথা শ্রবণে যখন রুচি জাগল

তখন ভগবানে তার রুচি জাগবেই। ভক্তিলাভের পথ হয়ে গেল এবং এই ভক্তিই যোগীকে ভগবানকে পাইয়ে দেবে। কারণ শ্রীগোপাল-তাপনী শ্রুতি বললেন, ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিরেব ভক্তিরেব ভক্তিরেব ভুয়সী। সুতরাং জ্ঞানী বা যোগী যখন তাঁর করুণায় এই ভক্তিপথে আসবে তখন তাদের সম্পূর্ণতা—তাদের সার্থকতা।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের করুণায় ব্রহ্মার স্তুতিবাক্যে আমরা সিদ্ধান্ত দেখলাম যেটি শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁর টীকায় বললেন তত্ত্বজ্ঞান পিপাসা যদি মানুষের মনে সত্যি সত্যি জাগে তাহলে তার উপায় স্বরূপ ভক্তিমহারাণীকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। কারণ ভক্তি ছাড়া কোন তত্ত্বজ্ঞানই লাভ হয় না। তত্ত্ব তিনটি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। জীবাত্মা তত্ত্ব নয়। শ্রুতি বললেন,—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া—দেহবৃক্ষে দুটি পাখী জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। দুটিই চিৎ। এর মধ্যে একটি অণু আর একটি বিভু। জীবাত্মা অণু আর পরমাত্মা হলেন বিভু। তাই বলে জীবাত্মাকে পরমাত্মার প্রতিবিম্বও বলা চলে না। কারণ জীবাত্মাকে মায়া অধিকার করে। মায়ার দ্বারা সম্মোহিত জীব অর্থাৎ মায়া বশীভূত। আর পরমাত্মার কাছে মায়া ঘেঁসে না। মায়া তত্ত্ববস্তুর কাছে যেতে লজ্জা পায় যেমন অন্ধকার সূর্য্যের কাছে যেতে লজ্জা পায়। অন্ধকার সূর্য্যকে ভয় করে কারণ তার সান্নিধ্যে গেলে অন্ধকার তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে। নিজের অস্তিত্ব কেউ হারাতে চায় না। তেমনি মায়া ভগবানকে ভয় করে কারণ ভগবানের সান্নিধ্যে মায়ার অস্তিত্ব লোপ পাবে। জীব মায়া বিমুগ্ধ হয়ে আমি আমার এই প্রলাপ বাক্য বলে—এটি মায়ার আক্র-মণের ফল। এতেই জীব এবং ভগবৎ তত্ত্বের মধ্যে কত পার্থক্য এটি সুন্দর করে দেখান হয়েছে। মায়াবশেই জীবকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ত্ব রজ ও তমো গুণে রঞ্জিত বলে মনে হয়—যেমন শুদ্ধ স্বচ্ছ স্ফটিক লাল জবার সান্নিধ্যে নিজেকে লাল বলে মনে করে। সে যে লাল নয়

শুদ্ধ স্বচ্ছ স্বরূপ এটি ভাবতে পারে না। তেমনি মায়াবশীভূত জীব নিজেকে ত্রিগুণাত্মক ছাড়া ভাবতে পারে না—তার ফলে জীব রোগ শোক, ক্ষুধা পিপাসা জন্ম মৃত্যু কবলিত কাতর হয়ে পড়ে। জীব যে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ নিজেকে এ স্বরূপে ভাবতে পারে না। তার যে জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা পিপাসা, রোগ শোক নেই সেটি চিন্তা করতে পারে না। জীব মায়ার রঙে এমনই রঞ্জিত হয়ে গেছে যে সে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ স্বরূপ এটি বিশ্বাস করতে পারে না—কেউ যদি তার নিজের স্বরূপ চিনিয়ে দিতে যায় তাহলেও সে বুঝতে পারে না। স্ফটিক জবাব সান্নিধ্যে যেমন নিজেকে লাল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না, জীবও তেমনি মায়া কবলিত হয়ে নিজেকে আমি পিতা মাতা, ধনী মানী কুলীন, পণ্ডিত ছাড়া ভাবতে পারে না। এমন কথা হচ্ছে এই মায়ামুক্তির উপায় কি? জবার কাছ থেকে যদি শুদ্ধ স্বচ্ছ স্ফটিককে সরিয়ে আনতে পারা যায় তাহলে যেমন সে আর নিজেকে লাল বলে মনে করবে না—তখন সে দেখবে শুদ্ধ স্বচ্ছ স্বরূপ এখানেও তেমনি ভগবানে যদি সুদৃঢ়া ভক্তি হয় তাহলেই মায়ার তৈরী অনর্থের বিনাশ পাবে। বলা আছে—

অনর্থোপশমং সাক্ষাৎ ভক্তিযোগমধোক্ষজে। ভাঃ ১।৭।৬

মায়াকে জীবের কাছ থেকে সরান বড় কঠিন। কারণ জীব যদিও চিৎ কিন্তু অনাদি কাল থেকে গোবিন্দ পাদপদ্ম ভুলে যাওয়ার ফলে সেই অপরাধে মায়া তাকে মুগ্ধ করে রেখেছে। কাজেই মায়া বলবতী তাকে সরাতে পারা যাবে না। জীবকে মায়ার কাছ থেকে সরে আসতে হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে কেমন করে সরে আসা যাবে? কৃষ্ণকথার ছায়ায় যত সময় কাটান যাবে ততই মায়া থেকে সরে আসা যাবে। সংসারকে ফাঁকি দিয়ে কৃষ্ণকথায়, গৌরকথায় যারা যত সময় কাটাতে পারে তারাই মায়ার কাছ থেকে সরে এসেছে বুঝতে হবে। মায়া তখন জানতে পারবে এ ব্যক্তি আমার কবলিত নয়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে জীবাত্মা চিৎ জাতি ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানও

চিৎ জাতি যে হিসাবে অদ্বৈত বেদান্তীর গুরু আচার্য্য শঙ্কর চার বেদের চারটি মহাবাক্য—অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম এখানে অদ্বৈত পক্ষে ব্যাখ্যা করলেন জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। কিন্তু যদিও দুইই চিৎ তত্ত্ব তারা অভিন্ন নয়। যেমন বৈকুণ্ঠ-ধামে বৈকুণ্ঠনাথ ভগবান এবং তাঁর পার্ষদগণ দুইই চিৎ সচ্চিদানন্দ-ময়—তত্ত্ব তাদের মধ্যে ভেদ যেমন অবশ্য স্বীকার করতে হবে—তা না হলে সেব্য সেবক এই সম্বন্ধ থাকে না। তেমনি জীব এবং ব্রহ্ম দুইই চিৎ তত্ত্ব তাদের মধ্যে ভেদ স্বীকার করতেই হবে। প্রাকৃত জগতেও দেখা যায়—একই অন্ন খেলেও কারো সে অন্নে বেশী লাবণ্য হয় আবার ক্যারো বা অত লাবণ্য হয় না—কিন্তু অন্ন তো একই। শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্ব বলতে নাম করে তিনটি বললেন ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। জীবাত্মা কিন্তু তার মধ্যে পড়ে না। তাই জীবাত্মা তত্ত্ব নয়। শঙ্কর মতে জীবাত্মা পরমাত্মা অভিন্ন। তাই জীবাত্মাও তত্ত্বের মধ্যে পড়েছে। শ্রীজীবপাদ সিদ্ধান্ত করেছেন অবিদ্যা যদি জীবকে আবৃতই করতে পারল তাহলে আর জীবাত্মা তত্ত্ব হল কেমন করে। অবিদ্যা কখনও তত্ত্বকে আবৃত করতে পারে না। কাজেই জীবাত্মা তত্ত্ব নয়। শ্রীজীবপাদ বললেন মুক্তদশাতেও জীব এবং ব্রহ্মের পার্থক্য আছে। জীব তৎ হয়ে যায় না—তৎ ইব হয়। আচার্য্য শঙ্করকেও স্বীকার করতে হল জীব যতই ব্রহ্ম হোক কিন্তু জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কাজ জীব করতে পারবে না—জগৎ ব্যাপারবর্জম্। যেমন প্রাকৃত জগতের একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি বুঝা যাবে। এক-পোয়া শুদ্ধ জলে যদি আর একপোয়া শুদ্ধ জল মেশান যায় তাহলে পরের একপোয়া জল নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আগের জলের সঙ্গে মেশে। তাতে তার নিজের স্বাতন্ত্র্য বা সত্তা হারায় না। কাজেই দুটি একসঙ্গে করে ওজন হয় আধসের। কিন্তু সত্তা যদি হারিয়ে ফেলত তাহলে ওজন হত একপোয়া। তেমনি মুক্ত জীব যখন ব্রহ্মে মিশে যায় তখন তার নিজের সত্তা হারায় না। তাই জীব

তৎ হয়ে যেতে পারে না কিন্তু গুণসাম্যে তৎ ইব হয়। জীব মুক্ত-দশাতে চিৎ উপলব্ধি করে এবং তাতে মায়ার আক্রমণ হয় না। এখন প্রশ্ন হতে পারে জীবাত্মা যদি তত্ত্ব না হয় তবে তাকে জানবার জন্য গীতায় ভগবান উপদেশ করলেন কেন? জীবাত্মার বোধের প্রয়োজন পূজার স্নানের মত। স্নান যেমন পূজা নয় অথচ স্নান না করলে পূজায় ঘরে যাওয়া যাবে না এও ঠিক সেইরকম। জীবাত্মার বোধ তত্ত্ববোধ নয় কিন্তু তত্ত্ববোধের উপায়। কৃষ্ণপাদপদ্ম জানবার জন্য আমাকে জানতে হবে। আমাকে জানবার জন্য আমাকে জানা নয়।

সৃষ্টিরক্ষায় চাতুর্য্য সৃষ্টিকর্ত্তা কখনও ছাড়ে না। সমষ্টি সৃষ্টি-কর্ত্তার এই স্বভাব ব্যষ্টি সৃষ্টিকর্ত্তা জগতে সংসারের কর্ত্তাতেও দেখা যায়। কোন পিতার সন্তান যদি সন্ন্যাসী হয়ে যেতে চায় তাকে সংসারে ধরে রাখবার জন্য পিতামাতা যথেষ্ট চেষ্টা করে। সন্তানের মৃত্যু পিতামাতা সহ্য করতে পারে কিন্তু সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া সহ্য করতে পারে না। সৃষ্টিরক্ষার চাতুর্য্যেরই একটি উপায় হল শাস্ত্র। সেইজন্যই শাস্ত্রে কর্মকান্ডের এত প্রভাব। বিভিন্ন কর্মের বিভিন্ন ফলশ্রুতি নির্দ্দেশ করেছেন। কৃষ্ণভজনই যদি জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহলে শাস্ত্র শুধু সেইটিই উপদেশ করলে পারতেন তা না করে কর্মের এত ফলশ্রুতি দিলেন কেন? একটি কথা বললেই তো হোত যে গোবিন্দ ভজনা কর। নানারকম ফলশ্রুতি দেখিয়ে জীবকে মুগ্ধ করাই শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। জীবমোহনই শাস্ত্রের কৌশল। বেদব্যাস জীবকে ধর্ম উপদেশ করবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি নানাশাস্ত্র বেদবিভাগ, পুরাণ রচনা করলেন নানাকর্ম ফলশ্রুতি নির্দ্দেশ করেও মনে শান্তি পেলেন না। শান্তির পন্হা উপদেশ করেন নি বলে নিজেও শান্তি পান নি। শেষপরে দেবর্ষিপাদ নারদের উপদেশে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র প্রকাশ করে যখন কৃষ্ণভজনের উপদেশ করলেন তখন প্রকৃত শান্তির পথ খুঁজে পেলেন। হরিপাদপদ্ম অর্চ্চনাই হল প্রকৃত ধর্ম। ভগবান নিজে ধর্মের লক্ষণ করেছেন।

মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ ধর্মঃ। সৃষ্টিকর্তা জগতের জীবকে মুগ্ধ করার জন্য কাম্যকর্মের দারওয়ান রেখে জীবকে বেঁধে রাখে। এখন জীবের এই সংসার কারাগার থেকে পালাতে হবে সেজন্য সিঁদকাঠি চাই। ভগবান নিজে সে উপায়ও বলেছেন।

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। গীঃ ২।৪৭

কর্ম কর অর্জুন কিন্তু ফল কামনা শূন্য হয়ে। অনাসক্তি হল ছিদ্র এর দ্বারাই পালাতে হবে। এটি প্রাথমিক নিষ্কাম কর্ম ছিদ্র। ভগবান মায়াতরণের উপায় বলেছেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গীঃ ৭।১৪

শ্রীমদ্ভাগবতামৃতে বিচার করা হয়েছে জগতে যত শাস্ত্র আছে তার মধ্যে কাম্যকর্মের শাস্ত্র সবচেয়ে বেশী। তার চেয়ে কম নিষ্কাম কর্ম প্রতিপাদক শাস্ত্র—তারচেয়ে কম জ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্র আবার তার চেয়েও কম ভক্তিপ্রতিপাদক পারমার্থিক শাস্ত্র॥ আবার শুদ্ধ কৃষ্ণপাদপদ্ম উপাসনার শাস্ত্র জগতে আরও কম। কারণ যতবেশী মূল্য ততই গোপনতা। এ সংসারেও দেখা যায় যত অল্পমূল্যের জিনিষ তত বাইরে ছড়ান থাকে আর মূল্য যত বেশী ততই তাকে গোপনে রাখা হয়। সবচেয়ে যেটি মূল্যবান সেটি সবচেয়ে বেশী করে লুকিয়ে রাখা হয়। গোপী আনুগত্যে কৃষ্ণ উপাসনায় উপদিষ্ট শাস্ত্র অতি কম। এইটিই শ্রীমন্মহাপ্রভুর দান। তাই গোস্বামী-পাদগণের ওপর সেই দানের আদেশ। প্রথমে লীলা বর্ণনায় রুচি তারপর ভজন তাতে প্রেম আস্বাদন। অপ্রকটে নামরূপে সাক্ষাৎ ভগবান। নামই গোস্বামি গ্রন্থরূপে মূর্তি ধারণ করেছেন। কাজেই এ শাস্ত্র অতি দুর্মূল্য এবং উপাদেয়। তত্ত্ব তিনটি উপদেশ করা হলেও বস্তুত তত্ত্ব একটি। ব্রহ্ম বা পরমাত্মার পৃথক্ তত্ত্ব স্বরূপ নেই। দুটিই ভগবানের অনুগত। বরুণদেব ভগবানের স্তুতি করেছেন—নমো ভগবতে তস্মৈ ব্রহ্মণে পরমাত্মনে। তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ সিদ্ধান্ত করলেন ভগবানের তত্ত্বম্। মন একাই যেমন

পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয় দ্বারে কাজ করে তেমনি একটি তত্ত্ব ভগবান তিনিই ব্রহ্ম পরমাত্মা প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পান। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধি হয়। যে ভক্তির দ্বারা যোগিগণও পরাগতিকে লাভ করেন সে ভক্তি কেমন? তার দুটি বিশেষণ দিলেন ব্রহ্মা—(১) তদর্পিতেহনিজকর্মলব্ধয়া এবং কথোপনীতয়া।

ভক্তি ছাড়া কোন প্রাপ্যই মেলে না। শ্রীজীবপাদ বলেছেন ভক্তিসনাথেন এব জ্ঞানং বৈরাগ্যং জনয়তি। মোট কথা হল ভক্তি ছাড়া মুক্তিও হয় না। ভগবৎ পাদপদ্মকে আদর করার নামই ভক্তি। এ আদর শব্দের অর্থ কি? সচ্চিদানন্দ বুদ্ধি করা। ভক্তি ছাড়া কোনটিই সিদ্ধি হয় না। তাই কর্মকাণ্ডেও ভক্তির অনুষ্ঠান দেখা যায়।

কর্মকাণ্ডে আচমন বিধিতে ভগবানের নাম উচ্চারণের কথা বলা আছে।

ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু, ওঁ বিষ্ণু তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্। আবার বললেন—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥
মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ
সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রং নাম সংকীর্ত্তনং তব॥

আচার্য্য শঙ্করও এটি স্বীকার করেছেন—ভগবদুপাসনা করতেই হবে। চার রকম কর্মের উপদেশ করা আছে—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত এবং উপাসনা কর্ম।

ভক্তি স্বীকার করাতে বেদান্ত এবং ভাগবতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। দুই পক্ষই ভক্তি স্বীকার করেছেন। কিন্তু তফাৎ হল বেদান্ত মতে ভক্তিকে জ্ঞানের অঙ্গ বলা হয়েছে। সেখানে জ্ঞান সাধ্য আর ভক্তি সাধন। বৃক্ষছেদনের পরে যেমন কুঠারের প্রয়োজন থাকে

না তেমনি জ্ঞান পেলে তাদের মতে আর ভক্তির দরকার নেই। এইটি আচার্য্য শংকরের মত। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের মত হলেন— মুক্তৈঃপ্রার্থ্যা হরেভর্ক্তিঃ। মুক্তজীবও হরিভক্তি প্রার্থনা করে। বলা আছে ব্রহ্মজ্ঞানাদিক হয় তার (ভক্তির) পরিবার। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন—জ্ঞান বৈরাগ্য আমাদেরও চাই। কিন্তু তার জন্য আলাদা করে চেষ্টার প্রয়োজন নেই। ভক্তি যত দৃঢ় হবে জ্ঞান বৈরাগ্য বৈরাগ্য ততই আপনা থেকে আসবে। জ্ঞান জেনে বৈরাগ্য ভক্তি লাভ করতে হবে না। ভক্তি হলেই তার থেকে জ্ঞান বৈরাগ্য হবে। মিছরির টুকরো যে মিষ্টি এটি শাস্ত্র থেকে জেনে খাবার দরকার নেই। খেলেই বুঝা যাবে যে সেটি মিষ্টি। তেমনি জ্ঞানানন্দময়ী ভক্তি—শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ বছলেন—জ্ঞান বৈরাগ্যের জননী হলেন ভক্তি—ভক্তি থেকে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের জন্ম—কিন্তু জ্ঞান বৈরাগ্যের কন্যা ভক্তি অর্থাৎ জ্ঞান বৈরাগ্য থেকে ভক্তির জন্ম তা বলা যারে না।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাস্ত বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥ ভাঃ ১।২।৭

ভগবানে ভক্তি লাভ হলে আপনিই জ্ঞান লাভ হবে—কারণ ভগবানকে জানলে সব জানা হয়ে যায়। শ্রুতি বললেন—যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। আর হরিকে না জেনে যত জ্ঞান লাভ করা যাক্ সে জ্ঞানের কোনও দাম নেই—সব জ্ঞান পুড়ে ছাই হয়ে যাবে যখন শ্মশানে দেহ ভস্মীভূত হবে। আর বৈরাগ্য পদের অর্থ হল বিষয়ে অতৃপ্তি। বিরাগের ভাবের নাম বৈরাগ্য। বিরাগ বলতে দুটি বুঝায় বিগত রাগ আর বিশেষ রাগ। বিষয়ে বিগত রাগ এবং ভগবানে বিশেষ রাগ। ভগবানে বিশেষ রাগ না হলে বিষয়ে বিগত রাগ হতে পারে না। কারণ মন তো নির্ব্বিষয় থাকতে পারে না। চৌদ্দভুবনের যত সুখৈশ্বর্য্য—এসব তো বটেই এর ওপরেও আছে মুক্তিসুখ—কোনটিতে যদি প্রয়োজনবোধ না থাকে তার নাম বৈরাগ্য। বিষয়ে বৈরাগ্য কেমন করে আসবে? আমাদের

জীবাত্মা অনাদি কালের ক্ষুধা নিয়ে বসে আছে। জীবাত্মার এ ক্ষুধা মেটাতে খাদ্য তো চাই। কিন্তু এ খাদ্য যে কি সেটি জীব জানে না। ইন্দ্রিয় সেই খাদ্য অন্বেষণে বিষয় হতে বিষয়ান্তরে চলেছে। তাদের পাঠিয়েছে মন মহারাজ এবং বুদ্ধি মহারাণী। কিন্তু মজা এমনই কোনও বিষয়েই তার তৃপ্তি হচ্ছে না। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। এটি সে ভুলে গেছে। আমরা মানুষ কিন্তু ভাবনাতে পশুর চেয়েও অধম। তাই মহাজন বললেন—

মানুষ আকার হইলে কি হয় করহ ভূতের কাম।
নহিলে বদনে কেন না বলছ শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ নাম ॥

আমরা গরুর খাদ্য খেয়ে ভুলে আছি। প্রাকৃত খাদ্য যে আত্মার খাদ্য নয় এ বোধ নেই--তাই যতই প্রাকৃত বিষয় ভোগ করি তৃপ্তি হয় না। জীবাত্মার ক্ষুধা যেদিন মিটবে সেদিন প্রাকৃত বিষয়ে বৈরাগ্য আসবে এবং সেই বৈরাগ্য হবে খাঁটি বৈরাগ্য। কৃষ্ণপাদপদ্ম-মাধুর্য্য সাগরে যদি জীব পিপীলিকা কোনদিন পড়ে যায় তাহলে ভূমা আনন্দে ডুবে গিয়ে প্রাকৃত বিষয়ে বিরক্ত হতে পারে। কারণ শ্রুতি বললেন—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। জ্বর হলে যে উপবাস দেওয়া তাকে বৈরাগ্য বলা যাবে না। এটি আপেক্ষিক। আসলে ভক্তি না হলে প্রকৃত বৈরাগ্য হয় না। ভক্তি বৈরাগ্যের বাহক। ভক্তিস্রোত দূরের ভগবৎপাদপদ্মমাধুর্য্যকে আকর্ষণ করে। ভক্তি গঙ্গা ভগবানের পাদপদ্মের বিলাস। ব্রহ্মদ্রবগাত্রী বলেই গঙ্গার পাবনত্ব। শিবের মাথা থেকে যেমন ভগীরথ গঙ্গাকে এনে মাটির জগতে বইয়ে দিয়েছিলেন তেমনি ভক্তি গঙ্গাকে সাধু গুরু বৈষ্ণব ভগীরথের মত জীবের কাছে বইয়ে দেন। একমাত্র ভক্তির আশ্রয় ছাড়া জীবের আত্যন্তিক ক্ষুন্নিবৃত্তি কিছুতেই সম্ভব নয়। শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে আস্বাদন করেছেন—

জীব কিছুতেই স্থির হতে নারে—যতই সাধন করুক না কেন।
সম্বন্ধলক্ষণা ভক্তির আশ্রয় না পেলে জীব কিছুতেই স্থির হতে নারে।

জীবের চঞ্চল হৃদয় হৃষীকেশকে বুকে না ধরলে কিছুতেই স্থিরতা লাভ করতে পারে না। ষট্ সন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বিচার করে দেখিয়েছেন—ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য যে ইচ্ছা করে আর বিষয়ে বিমুগ্ধ যে ব্যক্তি—এরা দুজনেই সমান। কারণ দুজনেই কৃষ্ণপাদপদ্মে বিমুখ।

ব্রহ্মা ভক্তিমহারাণীর দুটি বিশেষণ দিয়েছেন—(১) তদর্পিতেহা নিজকর্মলব্ধয়া আর (২) কথোপনীতয়া। ঈশ্বরে কর্ম অর্পণ করলেই একমাত্র ভক্তিলাভ হয়। ষাট হাজার ঋষির কাছে নৈমিষারণ্য তীর্থক্ষেত্রে সূতমুনি বললেন—

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বকসেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

ভাঃ ১।২।৮

হরিকথায় যদি রুচি না হয় তাহলে অন্য সকল ধর্মানুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করলেও বুঝতে হবে তারা শুধু বঞ্চনাই করেছে, কোনও ফল দেয়নি। সকল নদীর গতি যেমন সমুদ্রে না পড়া পর্য্যন্ত বিশ্রাম নেই তেমনি সকল ধর্মানুষ্ঠানের ফল হল হরিকথা-রুচিতে। কথাতে রুচি না হওয়া পর্য্যন্ত বুঝতে হবে ধর্মানুষ্ঠান কোন ফলই দেয়নি। শ্রীশুকদেব বললেন সেটি কেবল শ্রম অর্থাৎ বিফল। এখন প্রশ্ন হতে পারে ধর্মানুষ্ঠান যে স্বর্গাদি সুখভোগ ফল দিল তবে শুধু শ্রম অর্থাৎ বিফল বলা হচ্ছে কেন? স্বর্গ ক্ষয়ি বলে তাকে ফলের মধ্যে গণনা করা হয় না। ক্ষয়িষ্ণুত্বাৎ ন তৎ ফলম্। কারণ কর্মের দ্বারা উপার্জিত লোক যেমন বিনাশী পুণ্যের দ্বারা উপার্জিত লোকও তেমনি বিনাশী। অন্য ফলকে ফলের মধ্যে গণনা করা হয় না—হরিকথাতে রুচিই হল আসল ফল। এই রুচি আবার দুই রকম। (১) কথারুচিরূপা আর (২) কথনীয়রুচি-রূপা। কথনীয় অর্থাৎ যার কথা। হরিকথাতে আগে রুচি জন্মাবে তারপর সেই কথারুচিই কথনীয় অর্থাৎ শ্রীহরিতে রুচি এনে

দেবে। এই রুচি যদি খাঁটি হয় তাহলে আর তাঁকে পেতে দেরী হবে না।

তদর্পিতেহানিজকর্মলব্ধয়া এই বিশেষণটিতে বুঝা যাচ্ছে কৃষ্ণে কর্মার্পণ করতে হবে। শ্রীপাদ রামানন্দ রায় প্রথম স্তরে এটিকে সাধ্যসার বলে উল্লেখ করেছেন। ভগবান গীতাবাক্যেও বললেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ মদর্পণম্॥ গীঃ ৯।২৭

যোগীন্দ্রও বললেন—

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥
ভাঃ ১১।২।৩৬

নিয়ম হল বিহিত বা অবিহিত যে কোন কর্ম শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করবে। কৃষ্ণে কর্মার্পণের একটি স্থান আছে। যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভু তাকে এহো বাহ্য আগে কহ আর বলছেন তবু বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করলে ভগবান হরি সন্তুষ্ট হন। এই সন্তোষের ফল হল কৃষ্ণ-কথাতে রুচি। তদর্পিতেহা পদটি যোগিনঃ পদের বিশেষণরূপে ধরা হয়েছে। অথবা তোমাতে অর্পিত ঈহা অর্থাৎ অখিল চেষ্টা এইটিই হল নিজ কর্ম। ভক্তিমহারাণীর দ্বিতীয় বিশেষণ দেওয়া হয়েছে কথোপনীতয়া অর্থাৎ কর্মার্পণের ফল কথারুচি দান করে আবার কথারুচি কথনীয়রুচি অর্থাৎ ভগবানে রুচি দান করে। মাধুর্য্য-কাদম্বিনী গ্রন্থে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ রুচি এবং আসক্তি এই দুটির স্থান নির্দ্দেশ করেছেন। ভজনে রুচিকে বলা হয় রুচি আর ভজনীয় অর্থাৎ ভগবানে রুচির নাম হল আসক্তি। এই রুচি প্রথমে পাতলা থাকে তারপর কথাই কথারুচিকে বাড়িয়ে দেয়। রুচির তারতম্যে অনুভূতিরও তারতম্য হয়। ভগবানে প্রেমসম্পত্তি বড় দুর্লভ। যোগী ন্যাসী এরা ভালবাসতে জানে না—এরা কেবল আদায় করতে জানে। ভালবাসার পাত্রের কাছে কিছু আদায় করতে

ইচ্ছা করে না। কেবল দিতে ইচ্ছা করে। তার কাছ থেকে নেওয়ার প্রবৃত্তি থাকে না। নিতে শিখলে আর ভালবাসা যায় না। ভালবাসতে পারলে আদায়ের চেয়ে বেশী লাভ হয়। ভগবান তাই বললেন—

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈ তে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্। গীঃ ৭।১৮

এ জ্ঞানী কোন জ্ঞানী? এ জ্ঞানী হল ভক্ত। ভক্ত ভগবানের কাছে আদায় করে না—সে ভগবানকে ভালবাসে। ভগবানের এমনই মহিমা যে কামনা নিয়ে তাঁকে ভজলেও কামনার অন্ধকার সরে যায়। অন্য ভগবানের ভজনা করলে কামনা বাড়ে কিন্তু কৃষ্ণ উপাসনায় কামনার জ্বালার চিরতরে নিবৃত্তি হয়। প্রেমসুধায় ভক্তিমহারাণী কামনার ক্ষুধা মিটিয়ে দেন। পেট যদি ভরে যায় তাহলে আর খাদ্যে রুচি থাকে না। ভগবানের পাদপদ্মকে গোপরামারা বলেছেন—ইতররাগ বিস্মারণং নৃণাম্। অর্থাৎ কৃষ্ণচরণের ধ্যান অন্য সকল প্রকার আসক্তিকে ভুলিয়ে দেয়। কৃষ্ণমোহে ডুবতে পারলে এর চেয়ে তৃপ্তি আর কিছুতে নেই। কৃষ্ণপাদপদ্ম ভিন্ন মতির অবলম্বন আর কিছু হতে পারে না। ইন্দ্রিয়দমন জীবের দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ ইন্দ্রিয় জীর্ণ হলেও আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ আশা জীর্ণ হয় না। আশা চিরযুবতী। একমাত্র বাসুদেব ভজনের দ্বারা ইন্দ্রিয়রোধ অনায়াসে হবে। ভক্তের কাছে ইন্দ্রিয়রোধের দিকে দৃষ্টি নেই—তার মন তো কৃষ্ণপাদপদ্মমাধুর্য্য লোভে লোলুপ। অন্য বিষয়ে মন দেবার তো তার সময় নেই। ভক্তের কাছে বিষয় কালসর্পের দংশন নেই। সৎ-সংকল্পের চ্যুতি ঘটানই হল দংশন। এই দংশনের ফলে মরণ অনিবার্য্য। কৃষ্ণসুধাসাগরে যে ডুবতে পেরেছে তার অঙ্গে আর জগতের তাপ লাগে না। ভগবানের প্রীতি যার ওপর পড়ে তার ইন্দ্রিয় আপনা হতেই দমিত হয়ে যায়। তার আর চেষ্টা করে দমন করতে হয় না। আর চেষ্টা করে দমন করা যায়ও না। দমন করলেও সেটি স্থায়ী হয় না। কাজ হল ভক্তিকে পুষ্ট করা। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশাই বললেন—

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে ক্রোধ ভক্তদ্বেষি জনে
লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথা
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে মদ কৃষ্ণ গুণগানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

অপ্রাকৃত খাদ্যের দ্বারা যদি ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়ে যায় তাহলে প্রাকৃত বস্তুতে অর্থাৎ অখাদ্যে আপনা থেকেই অরুচি হবে। ভক্তি থেকে বিরক্তি এবং তার থেকে প্রবোধ অর্থাৎ জ্ঞান ক্রমে ক্রমে হবে। প্রেমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের উপলব্ধি হবে। যোগীরা ভগবানে কর্মফল অর্পণ করে কথারুচিকে লাভ করে এবং তার থেকে কথনীয়-রুচি অর্থাৎ ভগবানে ভালবাসা লাভ করে। এর ফলে তারা ভগবানে পার্ষদগতি লাভ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভক্তিই সকলের ফল-দাত্রী। শ্রবণ গাঢ় হলে মানস প্রত্যক্ষ হবে—পরপর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হবে।

এরপরে বাক্‌পতি ব্রহ্মা পরবর্ত্তী মন্ত্রের দ্বারা শ্রীবালগোপালের স্তুতি করছেন—

তথাপি ভূমন্ মহিমা গুণস্য তে বিবোদ্ধুমর্হত্যমলান্তরাত্মভিঃ।
অবিক্রিয়াং স্বানুভবাদরূপতো হ্যনন্যবোধ্যাত্মতয়া নচান্যথা॥
ভাঃ ১০।১৪।৬

ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালকে হে ভূমন্ বলে সম্বোধন করলেন। ভূমা অর্থাৎ বিরাট, হে অপরিচ্ছিন্ন তুমি অসীম তোমাকে কিছু দিয়ে সীমাবন্ধ করা যায় না। কাল, দেশ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এ জগৎ—কিন্তু তুমি তার অতীত স্বরূপ! আমরা অখন্ড বস্তু চিন্তা করতে পারি না—তাই কাল দেশকে খন্ড খন্ড করে ভাগ করি। কিন্তু কাল এবং দেশও অখন্ড তবু সেটি প্রাকৃত কারণ তার বিকার আছে অর্থাৎ পরিবর্ত্তন আছে—আর তুমি হলে প্রকৃতির উদ্ধের্ব। এখানে বাক্যের প্রথমে ব্রহ্মা 'তথাপি' পদ প্রয়োগ করলেন। এর সার্থকতা কি? শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বললেন—পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে সিদ্ধান্ত

হয়েছে যোগীরা নিজেদের যোগের কর্মফল ভগবানকে সমর্পণ করে—যখন তারা নিজেদের যোগসাধনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে কিন্তু অন্তরের তৃপ্তি পায় না—ভগবানকে কর্মফল অর্পণ করায় ভগবানও বিনিময়ে তাদের কথারুচি দান করেন। যার ফলে এই কথারুচি যোগীদের কথনীয় রুচিকে পাইয়ে দেয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত তো আছে যে শুদ্ধা প্রেমভক্তি যাকে কেবলা ভক্তি বলা হয়েছে তার দ্বারাই একমাত্র ভগবানের সাক্ষাৎভাবে স্বরূপানুভব হয়—তাই ভক্তি বাদ দিয়ে শুধু জ্ঞানচর্চাকে নিন্দা করা হয়েছে। ভক্তিবিহীন জ্ঞান শুধু পরিশ্রম। ব্রহ্মা পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে বলেছেন শ্রম এব হি কেবলম্। তুঁষের ওপর পাড় দিলে যেমন হাতে এককণা চাল তো মেলেই না—উপরন্তু পায়ে ব্যথাই সার হয়—তেমনি ভক্তি বাদ দিয়ে শুধু জ্ঞান বৃথা পরিশ্রম। লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা লাভ হয় বটে—কিন্তু অন্তরের তৃপ্তি হয় না—মন ভরে না। তাই রামানন্দ যখন সিদ্ধান্ত করলেন জ্ঞান মিশ্রা ভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার তখনও মহাপ্রভু বললেন—'এহো বাহ্য আগে কহ আর।' ভক্তিকে খাঁটি করতে হবে। তাতে জ্ঞান কন্টক মেশান চলবে না। জ্ঞানকে কন্টক বলা আছে। সুন্দর রসালা সরবৎ পান করতে গিয়ে তার ভিতরে যদি একটি কাঁটা থাকে তাহলে তো গলায় গিয়ে লাগবে—তাতে ব্যথার অনুভব হবে—তেমনি শুদ্ধা প্রেমলক্ষণা ভক্তিতে জ্ঞানকন্টক ভক্তহৃদয়ে ব্যথার উদ্রেক করে। এখন প্রশ্ন হতে পারে—তাহলে ভক্তিতে কি জ্ঞান থাকবে না? জ্ঞান না থাকলে ভক্তি হবে কি করে? কারণ জ্ঞান মানে জানা আর ভক্তি মানে ভালবাসা। না জানলে তো ভালবাসা যায় না। পথের একজন লোককে ডেকে তো তাকে ভালবাসা যায় না—তাকে আগে জানতে হবে তার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া মেলামেশা করতে করতে তার সম্বন্ধে জ্ঞান হলে অর্থাৎ তাকে জানলে তবে ভালবাসা যাবে। তাই ভক্তি থেকে জ্ঞানকে যে বাদ দেওয়ার কথা বলা হল—এ কি রকম? তখন বলা হচ্ছে—এ জ্ঞান ভগবজ্‌জ্ঞান নয়—ভগবানকে জানা যে জ্ঞান সে

জ্ঞান নয়। কারণ ভক্তিতে ভগবজ্‌জ্ঞান তো থাকবেই—ভগবানকে না জানলে তাকে ভালবাসবে কি করে? যে জ্ঞানকে ভক্তি থেকে বাদ দেবার কথা বলা হল সে হল জ্ঞানবাদীর অদ্বৈত বেদান্তীয় নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ—সোঽহংবাদ—আমিই ব্রহ্ম। জীবের অভিন্নতা ব্রহ্মের সঙ্গে এইটি—অদ্বৈত বেদান্তী প্রতিপাদন করেন। ঋক, সাম, যজু, অথর্ব্ব এই চার বেদের যে চারটি মহাবাক্য—অহং ব্রহ্মাস্মি (ঋগ্বেদ) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম (যজুর্বেদ) তত্ত্বমসি (সামবেদ) এবং অয়মাত্মা ব্রহ্ম (অথর্ব্ববেদ), চারটি মহাবাক্যই জীবব্রহ্মার অভিন্নতা প্রতিপাদন করে অদ্বৈত বেদান্তীর মতে। একে বলা হয় নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান। শুদ্ধা প্রেমলক্ষণা ভক্তি থেকে এই নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানকে বাদ দেবার কথা বলা হল। জীব যতই সাধন করুক—সাধন করে সিদ্ধ অবস্থায় ব্রহ্মে লীন হতে পারে কিন্তু সে ব্রহ্ম হয়ে যেতে পারে না। কারণ জীব ক্ষুদ্র অণু পরিমাণ আর ব্রহ্ম হলেন বিরাট বিভু চৈতন্য। অণু তো বৃহৎ হতে পারে না। ছোট বড় হবে কি করে? আচার্য্য শঙ্কর যিনি অদ্বৈত বেদান্তীর গুরু তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছে জীব যতই ব্রহ্ম হোক্ কিন্তু ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্তা—জীব ব্রহ্ম হলেও জীব জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কাজ করতে পারবে না। আচার্য্য বলেছেন—জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্। তাই শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ব্রহ্মার বাক্যের 'তথাপি' পদটির তাৎপর্য্য দেখাচ্ছেন যদিও কেবলা প্রেমভক্তির দ্বারাই ভগবৎ স্বরূপের সাক্ষাৎ অনুভব হয় তথাপি কেবল জ্ঞান অর্থাৎ ভক্তি বাদ দিয়ে শুদ্ধ জ্ঞানকে নিন্দা করা আছে বটে কিন্তু ভক্তি মিশ্রা জ্ঞান তোমার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপানুভব করাতে পারে। কারণ যে কোন সাধন ফল দেবার জন্য ভক্তি-মহারাণীর মুখের দিকে চেয়ে আছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্মযোগ জ্ঞান। চৈতন্যচরিতামৃত যদিও তার কেবলাভক্তি হচ্ছে না—তবু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপানুভব হবে।

ব্রহ্মার সম্বোধন—হে—ভূমন্—ভূঃ প্রাদুর্ভাব-স্তদ্বত্তমধুরৈতদ্রূপ-প্রাদুর্ভাবয়ন্ তুমি যখন এ জগতে আবির্ভূত হয়েছ তখন তোমার মধুররূপকেও আবির্ভূত করিয়েছ। এখানে অগুণ বলতে গুণরহিত অর্থাৎ গুণ নেই—গুণহীন তা নয়—অগুণ বলতে বুঝাচ্ছে প্রাকৃত গুণ রহিত। ভগবানে প্রাকৃত কোন কিছুই যায় না। প্রাকৃত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ কোনটিই ভগবানকে স্পর্শ করে না। কারণ তিনি প্রকৃতির অতীত স্বরূপ তাঁর রূপ, গুণ, শক্তি সবই অপ্রাকৃত। তাই অগুণ শব্দে চক্রবর্ত্তিপাদ অর্থ করলেন অগুণস্য প্রাকৃতগুণরহিতস্য তোমার মহিমা মহত্ত্ব অর্থাৎ বৃহৎস্বরূপ—এটি তোমার কৃপা ছাড়া কারও অনুভব হয় না। শুদ্ধ চিত্তে অমলাত্মাতে তোমায় কৃপায় তোমার স্বরূপ অনুভব হয়। তুমি অবিক্রিয় তোমার কোনও বিকার নেই, কারণ বিকার হল মায়ার ধর্ম। তুমি তো মায়ার অতীত স্বরূপ—তাই তোমার বিকার হবে কি করে? অরূপ বলতেও বুঝান হয়েছে প্রাকৃত রূপ রহিত। ভগবানের রূপ প্রাকৃত নয়—অপ্রাকৃত। ব্রহ্মানুভব যে চিত্তে হয় সে চিত্তে অন্য বিষয়ভাবনা আর থাকে না—তখন চিত্ত ব্রহ্মাকারে আকারিত হয়ে যায়—বিষয়াকারে আকারিত হৃদয় যেমন শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিষয়কেই মাত্র গ্রহণ করে ব্রহ্মকে গ্রহণ করতে পারে না তেমনি চিত্ত যখন নির্মল হয় তখন ব্রহ্মাকারে আকারিত হয়ে যায় তখন সে ব্রহ্মকেই অনুভব মাত্র করে শব্দাদি বিষয়কে আর গ্রহণ করে না।

ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু তুমি অপ্রাকৃত অনন্ত গুণের আধার—এই ভগবৎস্বরূপকে একমাত্র প্রেমভক্তির দ্বারাই জানা যায়। বিদ্যা বা অন্য সাধনের দ্বারা জানা যায় না। এমনকি ভক্তি ছাড়া তোমাকে চোখে দেখলেও দেখা হয় না—জানা যায় না। তোমাকে চোখে দেখাই যদি না যায় তাহলে তোমার অসংখ্য মধুর গুণ তো গণনা করতে পারা যাবেই না। গুণ সংখ্যা করা যায় না—তাহলে তোমার মাধুর্য্য অনুভব করা তো অনেক দূরের কথা। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মার বাক্য—

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্বা বিমতাঃ সুকল্পৈ
ভূপাংসবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥ ১০।১৪।৭

প্রভু! তোমার অনন্ত গুণ কেউ বর্ণনা করতে পারে না—তোমার গুণের কেউ সংখ্যা করতে পারে না, পরিমাপ করতে না। তোমার গুণ শুধু নয়, তোমার রূপ, লীলা, যশ সবই অনন্ত। এই জন্যই তোমার একটি নাম অনন্ত। যদি তার অন্ত পাওয়া যেত তাহলে তোমার অনন্ত নাম সার্থক হত না। এখন প্রশ্ন হতে পারে জ্ঞানবাদী তো ব্রহ্মকে নির্গুণ, অরূপ, নিরুপাধি নির্বিশেষ বলেন—তাহলে তাঁর গুণ রূপ যে বলা হচ্ছে এ কেমন? জ্ঞানবাদী বেদান্তী তত্ত্ব-বস্তুতে অর্থাৎ ব্রহ্মে রূপ গুণ রস স্বীকার করেন না। কারণ তাঁরা দেখেন প্রাকৃত জগতে সকল বস্তুরই রূপ অর্থাৎ আকার আছে গুণও কিছু না কিছু আছে—তবে তা বিনাশী, নশ্বর। চিরস্থায়ী নয়। তাই তাঁরা ভাবেন তত্ত্ববস্তু ব্রহ্মে গুণ রূপ স্বীকার করলে তাও প্রাকৃত হবে। ব্রহ্মে প্রাকৃতত্ব দোষ স্পর্শ করবে। এই আশঙ্কায় তাঁরা বলেন ব্রহ্ম নির্গুণ অরস অরূপ প্রভৃতি। কিন্তু প্রকৃত কথা তা নয়। কারণ তত্ত্ববস্তুতে প্রাকৃত দোষ স্পর্শ করে না যেমন সূর্য্যে অন্ধকার স্পর্শ করে না। তত্ত্ববস্তু প্রকৃতি অর্থাৎ মায়াকে নিজের তেজঃপ্রভাবে বহুদূরে সরিয়ে রাখে। কিন্তু তত্ত্ববস্তুরও রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ আছে তবে তা মায়িকতা দোষে দুষ্ট নয়। তত্ত্ব বলতে তিনটি—ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবান। জ্ঞানীরা বলেন ব্রহ্ম, যোগীরা বলেন পরমাত্মা আর ভক্তেরা বলেন ভগবান—অবশ্য তিনটি তত্ত্ব হলেও তাদের তারতম্য আছে। পরপর উৎকর্ষ। ব্রহ্মের চেয়ে পরমাত্ম স্বরূপের উৎকর্ষ আবার পরমাত্ম স্বরূপের চেয়ে ভগবৎ স্বরূপের উৎকর্ষ। এ তারতম্য হয়েছে তত্ত্ববস্তুর শক্তিবিকাশের তারতম্যে। ব্রহ্মে শক্তি আছে কিন্তু প্রকাশ নেই। ব্রহ্ম হলেন

অপ্রকাশিত শক্তিক। কারণ প্রাকৃত মায়িক বস্তুর শক্তি আছে—চাঁদের জ্যোৎস্না, অগ্নির দাহিকা শক্তি, দুগ্ধের শুভ্রতা—আর অপ্রাকৃত তত্ত্ববস্তুর শক্তি নেই এ তো বলা যায় না। তবে তত্ত্ববস্তুর শক্তি প্রাকৃত নয়। তত্ত্ব অপ্রাকৃত সুতরাং তার শক্তি প্রাকৃত হবে কি করে। তাই তত্ত্ববস্তুর শুধু শক্তি নয়, রূপ গুণ লীলা রস সবই অপ্রাকৃত। ব্রহ্মে এ সবই অপ্রকাশিত—প্রকাশ নেই। আছে অথচ প্রকাশ নেই—তা কি করে হয়। কেন হবে না? কারণ গায়ক যখন ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে তখন তার কণ্ঠে গীতশক্তি তো থাকেই কিন্তু তার প্রকাশ থাকে না। শক্তি তার কণ্ঠে থাকে বুঝা যায় কি করে? কারণ সেই ব্যক্তিই তো ঘুম থেকে উঠে গান গাইবে। আর পরমাত্মা হলেন কিঞ্চিৎ অভিব্যক্তশক্তিক। পরমাত্মাতেও শক্তি, রূপ, রস লীলা আছেন কিন্তু তার সম্পূর্ণ প্রকাশ নেই—তবু আকার রূপে চেতনতারূপ, প্রকাশ। তাই যোগীরা বলেন পরমাত্মা সাকার (আকারবান্) চেতন! এই পরমাত্মার চেতনতাই সমস্ত দেহে ছড়িয়ে থাকে—যার ফলে দেহকে চেতনের মত দেখায়। জীবাত্মা শরীরে আছে বটে কিন্তু তার চেতনতা এত ক্ষুদ্র অণু পরিমাণ যে জীবাত্মার চেতনতায় শরীর চেতন হতে পারে না। তাই পাশে পরমাত্মাকে থাকতে হয়। পরমাত্মার অন্য অন্য কিছুর প্রকাশ নেই তাই পরমাত্মা অপ্রকাশিত শক্তিক নন কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিব্যক্ত শক্তিক। শুধু চেতনরূপে প্রকাশিত হন। আর এই পরমাত্মারও উপরে হলেন ভগবান। কারণ ভগবানে শব্দ স্পর্শ, রূপ রস গন্ধ, লীলা গুণ শক্তি সম্পূর্ণ প্রকাশিত। ভগবান হলেন সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত শক্তিক। শুধু শক্তির প্রকাশ নয় তাঁর অনন্ত শক্তি, অনন্ত গুণ, অনন্ত রূপ অনন্ত রস সবই অনন্ত। তাই তাঁর নাম অনন্ত। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁর তত্ত্ব-সন্দর্ভে সিদ্ধান্ত করলেন ভগবান এব তত্ত্বম্। ভগবানই তত্ত্ব—তাঁর মধ্যেই ব্রহ্ম পরমাত্মা অনুস্যূত হয়ে আছেন। অর্থাৎ ভগবানকে জানলে আর ব্রহ্ম পরমাত্মা আলাদা করে জানতে হবে না। যেমন দশ

সংখ্যার মধ্যে এক থেকে নয় সংখ্যা তো আছেই উপরন্তু কিছু বেশী আছে যার ফলে তাকে দশ বলা হয়। তাই দশ জানলে এক থেকে নয় তো জানা হয়ই উপরন্তু কিছু বেশী জানা হয়। তেমনি ভগবানকে জানলে ব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানা তো হবেই উপরন্তু কিন্তু বেশী জানা হবে। ভগবানকে জানলে ব্রহ্ম পরমাত্মা জানা আপনা থেকে হয়েই যাবে। শ্রীগোবিন্দজী গীতাবাক্যে বললেন—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।

গীঃ ৬।২২

যাঁকে লাভ করলে আর লাভের কিছু বাকী থাকে না। মহাজনও বলেছেন—'হরি না জানিয়ে লাখ জানে যদি সে জানা কেবল ছাই। অর্থাৎ হরিকে জানলে সব জানা হয়ে যাবে। লীলাতেও ভগবান দেখালেন জলাধিপতি বরুণদেব শ্রীগোবিন্দকে যখন বরুণালয়ে স্তুতি করেন তখন বলেছেন—ওঁ নমো ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।

এই গোবিন্দজীকে শ্রীবালগোপালকে স্তুতি প্রসঙ্গে ব্রহ্মা বলছেন —প্রভু তোমার গুণ অনন্ত—এই গুণ ভগবানের কোথাও থেকে ধার করা নয়—এ গুণ রূপ রস, শক্তি লীলা সবই তাঁর স্বরূপ। মানুষের গুণ শক্তি ধার করা তাই তা বিনাশী। কিন্তু ভগবানের এটি স্বরূপ তাই অবিনাশী চিন্ময়ী শক্তি চিন্ময় গুণ। ভগবান তাঁর অনন্ত গুণ, লীলা শক্তি নিয়ে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন—মানুষকে তাঁর তত্ত্ব জানাবার জন্য। ভগবান তো গোলোকে বৈকুণ্ঠে থাকেন—তিনি এই ভূলোকে আসবেন কেন ? কারণ গোলোক বৈকুণ্ঠে থাকলে তাঁর তত্ত্ব মানুষ কোনদিনই জানতে পারত না—কারণ তাঁর তত্ত্ব হল দুর্ব্বোধ। শ্রুতি বলেছেন ভগবানের তত্ত্ব দুরবগম। তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ না হলে মানুষ কখনই তাঁর তত্ত্ব বুঝতে পারত না। শ্রীশুকদেব যিনি ভাগবতী কথার বক্তা তিনি লীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলার শেষে মন্তব্য করেছেন—ভগবান যে ধরাধামে এই ভূলোকে অবতীর্ণ হয়ে বিবিধ লীলা প্রকাশ করেন এইটিই তাঁর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ।

শ্রীশুকদেবের দৃষ্টি অনেক উচ্চস্তরে কারণ এ অনুগ্রহ অর্থাৎ দয়া এ জগতের প্রাকৃত দয়া অন্নদান বস্ত্রদানের মত নয়—এ আপাততঃ দয়া নয় এটি হল আত্যান্তিক দয়া। অন্নদান বস্ত্রদান ঔষধদান যে কোন দান—এ দয়া আত্যান্তিক হচ্ছে না। কারণ তাতে চিরকালের অভাব মেটান যাচ্ছে না। কিন্তু ভগবান এই প্রকট লীলায় অবতীর্ণ হয়ে লীলাপ্রকাশ করে জীবকে যে অনুগ্রহ করেছেন সে অনুগ্রহ হল আত্যান্তিক—এমন কল্যাণ দান করেছেন যে কল্যাণ আর কোনদিন হারাতে হবে না। এ জগতের সব কল্যাণই হারিয়ে যায় তাই তাকে আত্যান্তিক বলা যায় না—কিন্তু যে কল্যাণ কোনদিন হারাতে হবে না—তার নাম আত্যান্তিক কল্যাণ। শ্রীশুকদেব বললেন—ভগবান এ জগতে অবতীর্ণ হয়ে বিবিধ লীলা প্রকাশ করেছেন কেন—কারণ এই লীলাকথার শ্রবণ কীর্ত্তন করে মানুষ ভগবানে উন্মুখতা লাভ করবে —"যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ"—যা শুনলে ভগবানে রুচি জাগবে এবং মনে হবে গোবিন্দই আমার সবচেয়ে আপন জন—তাঁর মত আপন আর কেউ নেই। গোবিন্দই আমার পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এইটিই মনে হবে। ভগবানকে ভুলেই জীব মায়াকবলিত হয়ে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করছে। তাহলে জীবের দুঃখের একমাত্র কারণ হল ভগবৎ বিস্মৃতি—এইটিই মূল রোগ আর দেহের ব্যাধি মনের অশান্তি বা ভয় শোক মোহ এ সব হল উপসর্গ। নিদান ধরে তো চিকিৎসা করতে হবে। বিমুখতা যদি রোগ হয় তাহলে উন্মুখতা হবে চিকিৎসা। ভগবান এই প্রকট লীলায় এসে লীলা প্রকাশ করে জীবের এই বিমুখতা রূপ মূল রোগকে দূর করে উন্মুখতা দান করে চিকিৎসা করেছেন। এর নামই আত্যান্তিক কল্যাণ। অরুচি সারিয়ে রুচি জাগানো—এর মত কল্যাণ আর হয় না। যেমন একজন উন্মাদ ব্যক্তির কল্যাণ করতে হলে তাকে বস্ত্র অলঙ্কার যাই দেওয়া যাক তাতে কল্যাণ হবে না—কিন্তু কেউ যদি তার উন্মাদ রোগটি ভাল করে দিতে পারে—তাকে সুস্থ করে দিতে পারে তাহলে তার প্রকৃত

কল্যাণ করা হল। জীবেরও মস্তিষ্ক বিকৃত এইটিই মায়ারোগ সে যা তা বলে যা তা খায়—যেমন পাগল যা তা বলে যা তা খায়। মানুষও যা তা বলে—আমি ধনী মানী কুলীন পণ্ডিত নিজের এই পরিচয় দেয়—আমি নিত্য কৃষ্ণদাস এই খাঁটি পরিচয় দিতে পারে না —যা তা খায়—অখাদ্য খায়—হরিনাম অমৃত যা আত্মার খাদ্য তা খেতে পারে না—তাই তার মস্তিষ্ক বিকৃত। এটি হয়েছে ভগবানকে ভুলে যাওয়ার ফলে। তাই ভগবানকে মনে পড়লে এ বিকৃতি সেরে যাবে। ভগবান এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে প্রকট লীলা প্রকাশ করেছেন জীবের এই হিত করবার জন্য। এর নামই আত্যন্তিক কল্যাণ তাই ব্রহ্মা বললেন, প্রভু তুমি হিতাবতীর্ণ। হিতের জন্য এ জগতে অবতীর্ণ হয়েছ—এই লীলা প্রকাশের মধ্যে তোমার অনন্ত গুণ জগতে প্রকাশ পায়। কিন্তু এ গুণ অনন্ত বলে কেউ তা কোন দিন গণনা করতে পারে না। ব্রহ্মার কাছে ভগবান অবশ্য কোন কথা বলেন নি—নীরব হয়ে আছেন কারণ ব্রহ্মা অপরাধী। অপরাধীর সঙ্গে প্রসন্ন হয়ে কথা বলা চলে না। তবু যদি মনে হয় ভগবান যদি বলেন ব্রহ্মন্ মানুষ যদি এমন অখণ্ড পরমায়ু পায় তাহলে আমার গুণ গণনা করতে পারবে না? ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু অখণ্ড পরমায়ু পেয়ে পৃথিবীর ধূলিকণা আকাশের হিমকণা যা গণনা করা কখনও সম্ভব নয়—তাও যদি গণনা করা সম্ভব হয় তাহলেও তোমার গুণ কারও পক্ষে গণনা করা সম্ভব হবে না। জীব অর্থাৎ মানুষ গণনা করতে পারবে না এ তো সামান্য কথা—ব্রহ্মা নিজে দেবর্ষিপাদ নারদকে বলছেন—নারদ আমি প্রভুর লীলা গুণ আজও বুঝে উঠতে পারি নি, তোমার অগ্রজ সনকাদি ঋষি তারাও পারেন নি। আর বেশী কি বলব আদিদেব সঙ্কর্ষণ বাসুকী সর্পাকৃতি সহস্র বদনে আজও কৃষ্ণগুণ গাইছেন কিন্তু কৃষ্ণের লীলা সাগরের পারে পৌঁছুতে পারেন নি।

নান্তং বিদাম্যহমমীমুনয়োঽগ্রজাস্তে মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽ পরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্যপারম্॥
ভাঃ ২।৭।৪১

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মশাই খুব মিষ্টি করে একটি প্রসঙ্গ করেছেন—

আরে কিবা রাম গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা রুদ্র সুর সিদ্ধ মুনীশ্বর আনন্দে হেরিছে॥

একদিন কৃষ্ণ বলরাম দুই ভাই-এ বিবাদ বেধেছে যে বিবাদ শুনবার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শঙ্কর, ইন্দ্রাদি দেবতা সিদ্ধগণ, মুনিগণ সকলে উপস্থিত। কারণ যেমন দরের বিবাদ তেমনি দরের শ্রোতা। তা কি নিয়ে বিবাদ? কৃষ্ণ বলছেন—দাদা, পৃথিবী ধারণের লোক পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি যদি এই কাজের ভার নাও তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি। এখন বলদেব তো কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবায় থাকেন। পৃথিবী ধারণ করতে হলে তো সাক্ষাৎ সেবা ছেড়ে যেতে হবে। সেটা তো ইচ্ছা নয়। অথচ কৃষ্ণ বলছেন—উপেক্ষাও করতে পারেন না—তাই একটু কৌশল করে জিজ্ঞাসা করছেন, ভাই পৃথিবী ধারণের কাজ কতদিন করতে হবে? উদ্দেশ্য হল সময়টা জানতে পারলে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আবার সাক্ষাৎ সেবায় ফিরে আসতে পারবেন। কৃষ্ণ বলছেন—দাদা বেশী দিন নয়। যেদিন তুমি আমার গুণ গেয়ে শেষ করে দিতে পারবে সেদিন তোমাকে আর পৃথিবী ধারণের কাজ করতে হবে না। বলদেব রাজী হলেন। বলদেব সঙ্কর্ষণ সর্পাকৃতি পৃথিবী ধারণ করলেন কৃষ্ণগুণ গাইতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তাঁর তো একটি বদন একটি জিহ্বা একটি জিহ্বায় কৃষ্ণগুণ গাইতে গিয়ে দেখেন এ তো অসীম অগাধ। এতো গেয়ে শেষ করা যাবে না। তাই তাড়াতাড়ি গেয়ে শেষ করবার

জন্য সহস্রবদন প্রকাশ করলেন। সহস্র বদনে সহস্র জিহ্বায় কৃষ্ণগুণ গাইতে লাগলেন। কারণ একখানি বৈঠা দিয়ে নৌকা বাইলে নদী পার হতে দেরী হয় কিন্তু যদি হাজার বৈঠায় বাওয়া যায় তাহলে তাড়াতাড়ি নদী পার হওয়া যাবে। কৃষ্ণ দেখলেন দাদা তো ভারী চতুর—গুণ তাড়াতাড়ি গেয়ে শেষ করবার জন্য হাজার বদন প্রকাশ করেছে—তাহলে তো তাড়াতাড়ি গুণ গেয়ে শেষ করে দেবে—তখন আবার পৃথিবী ধারণের লোক পাব কোথায়? তাই কৃষ্ণও গুণ বাড়াতে লাগলেন—যাতে দাদা গুণ গেয়ে শেষ করতে না পারে। শ্রীচৈতন্যভাগবতকার বললেন—

নাগ বলী ধায় বেগে সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল অধিক অধিক বাড়ে॥

বলদেব সংকর্ষণ সর্পাকৃতি (নাগ) মহাবলশালী কৃষ্ণের যশের সাগর পার হবার জন্য বেগে ধাবিত হচ্ছেন—সহস্রবদনে কৃষ্ণ-গুণ গাইছেন। আর এদিকে কৃষ্ণও যশ বাড়িয়ে বাড়িয়ে যাচ্ছেন—যাতে বলদেব গুণ গেয়ে শেষ করতে না পারেন। বলদেবের গুণ গাওয়াও শেষ হচ্ছে না—আর কৃষ্ণের গুণ (যশ) প্রকাশও শেষ হচ্ছে না।

কেহ মুখ নাহি মুড়ে।

ব্রহ্মা বলছেন যে প্রভু তোমার এ অনন্ত গুণ কারো পক্ষেই গেয়ে শেষ করা সম্ভব নয়। তোমার গুণের যদি অন্ত পাওয়া যেত তাহলে তোমার অনন্ত নাম সার্থক হত না। শুদ্ধ কৃষ্ণ-ভক্ত তাই ভগবানের তত্ত্ব বুঝবার জন্য অন্য কিছু উপায় গ্রহণ করে না। কারণ সে জানে পাণ্ডিত্য, তপস্যা, সাধন কোন কিছু দিয়েই ভগবানের তত্ত্ব বুঝা যায় না। একমাত্র ভগবানের অহৈতুকী কৃপাতে ভগবানের তত্ত্ব বোধ হয়। তাই ভক্ত অন্য কোন পথ না নিয়ে শুধু তাঁর কৃপার দিকে চেয়ে থাকে। এই কৃপাই হল একমাত্র সম্বল। ভক্ত কৃপার দিকে চেয়ে থাকে যেমন চাতক পাখী মেঘের জল ছাড়া খায় না। পিপাসায় কাতর হলেও কোন জল পান করে না—মেঘ

হয়ত জল না দিয়ে বজ্রপাত করে—তাঁতে চাতক প্রাণ হারায় তবু প্রার্থনা করে যায় পরজন্মে যেন তোমার জলই পান করতে পারি। এ হল চাতকের নিষ্ঠা। ভক্তও তেমনি এই নিষ্ঠা নিয়ে ভগবানের কৃপার দিকে চেয়ে থাকে। এই সম্বন্ধে ব্রহ্মার স্তুতি প্রসঙ্গে পরবর্তী মন্ত্র।

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত ভগবানের শ্রীগোবিন্দের কৃপার দিকে চাতকের দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে! তিনি রাখতে হয় রাখবেন মারতে হয় মারবেন। তিনি অনুরাগও করতে পারেন আবার পদাঘাতও করতে পারেন তাতে ভক্তের কোন ভেদ দৃষ্টি থাকে না। কারণ ভক্ত নিজেকে সর্ব্বতোভাবে তাঁর শ্রীচরণে সঁপে দিয়েছে তাই নিশ্চিন্তভাবে জানে যে শ্রীগোবিন্দ যা করবেন সবই মঙ্গলের জন্য। তাঁর কাছ থেকে ভক্তের কাছে কখনও কোন অমঙ্গল আসতে পারে না। যেমন মিছরির কুঁদো থেকে কখনও নিমপাতার তেতো রস বেরুতে পারে না। ভক্ত তাই সুখ, দুঃখ, জয়, পরাজয়, মান অপমান, লাভ লোকসান, নিন্দা স্তুতি—দুটিকেই সমান দৃষ্টিতে নেয়। এই দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা ভক্তের কি করে হয় কারণ ভক্ত জানে দুটি ভগবানের কাছ থেকে আসছে। তাই পরস্পর বিরোধী হলেও ভক্তকে এর কোনটিই বিচলিত করতে পারে না। কারণ তাঁরই দেওয়া সুখ, তাঁরই দেওয়া দুঃখ। শ্রীগোবিন্দ গীতাবাক্যে ভক্তের লক্ষণে বলেছেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। আবার অর্জুনদেব যখন স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানতে চাইলেন, তখনও আবার বললেন—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্মমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ। গীঃ ২।৫৬

ভক্ত দুঃখে বিচলিত হয় না—উদ্বেগ পায় না আবার সুখেতেও কোন উল্লাস নেই—অবশ্য এ সুখ এবং এই দুঃখ দুটিই প্রাকৃতসম্বন্ধ নিয়ে কথা। দুটি সমান হয় কি করে। প্রাকৃত সুখ দুঃখ দুইই মিথ্যা অর্থাৎ চিরকাল থাকবে না। কারণ মিথ্যার লক্ষণই হল যা তিনকালে থাকে না। আর তিনকালে অর্থাৎ অতীতে

বর্ত্তমানে ভবিষ্যতে যা থাকে তাকেই বলা হয় সত্য। সত্যের লক্ষণ তাই শাস্ত্র করলেন ত্রিকালাবাধিত্বং সত্যত্বম্। তিনকালে যেটি অবাধিত তার নাম সত্য। এ জগতে সত্য বলে কিছু নেই—সুতরাং এ জগতে যেটি আমরা সত্য বলে মনে করি সেটিও মিথ্যা। কারণ এ জগতে সত্য বস্তুতে সত্যের লক্ষণ মিলছে না। তাই তাকে সত্য বলা যাবে কি করে। ভক্ত দেখে এ জগতের সুখও মিথ্যা দুঃখও মিথ্যা—কারণ কোনটিই চিরকাল থাকবে না। তাই তাদের সুখেও উল্লাস নেই দুঃখেও কাতরতা নেই। দুটিকেই সমান দৃষ্টিতে নিতে পারে। বিশ্বকবি তাই জগদ্বাসীকে আশ্বাসের বাণী শোনালেন—

বলো মিথ্যা আপনার সুখ মিথ্যা আপনার দুঃখ।

প্রাকৃত সুখদুঃখে উল্লসিত হওয়া এবং কাতর হওয়াই আমাদের স্বভাব কিন্তু ঋষির এই মন্ত্র মনেপ্রাণে নিতে পারলে আর কোন বেদনা নেই। ভগবানে চিরসমর্পিত আত্মা কান্তকবি তাঁর মনপ্রাণ ইষ্টচরণে সমর্পণ করে গাইলেন—

তোমারই দেওয়া প্রাণে তোমারই দেওয়া দুঃখ।
তোমারই দেওয়া বুকে তোমারই অনুভব॥
তোমারই দেওয়া নিধি তোমারই কেড়ে নেওয়া
তোমারই সান্তনা তোমারই হাহারব।

এটি বলতে পেরেছেন কেন—কারণ কবি ভাল করে জানেন আমিও তোমারই গো তোমারই সকলই তো। যাদুকর যেমন খেলা দেখায় থলি থেকে কত টাকা বার করে—সব টাকাই মিথ্যা চোখের ভেলিক কোনটিই সত্য নয়। তার একশত টাকাও যা এক হাজার টাকাও তাই। সেইজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি কোনটিতেই লোভ করে না। কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তির মিথ্যা বস্তুতে লোভ হয় না। ভক্ত তো বুদ্ধিমান বলা আছে—যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর। এখানে চতুর বলতে বুদ্ধিমান তাই ভক্ত প্রাকৃত বস্তুতে লোভ করে না। সে সুখে দুঃখে অবিকার। কিন্তু এই সুখ দুঃখই যদি ভগবৎ

সম্পর্কিত হয় তাহলে ভক্তের সুখেতে উল্লাস এবং দুঃখে মুহ্যমান অবস্থা হয়। শ্রীপাদ রামানন্দকে দিয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু সিদ্ধান্ত করালেন 'ভক্ত বিরহ দুঃখ দুঃখ মধ্যে গণি।'

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত প্রাকৃত সুখ দুঃখ ভোগ করে বটে, কিন্তু সেজন্য ভগবানের কাছে কোন অনুযোগ করে না। বাক্‌পতি ব্রহ্মা শ্রীবাল-গোপালের শ্রীচরণে স্তুতি প্রসঙ্গে অষ্টম মন্ত্র উচ্চারণ করছেন—প্রভু—

তত্তেনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥
ভাঃ ১০।১৪।৮

তোমার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্ত শুধু তোমার কৃপার দিকে চেয়ে থাকে। তাতে কি হয় এই যে চেয়ে থাকা এটিরও একটু তাৎপর্য্য আছে। বাক্‌পতি ব্রহ্মা চেয়ে থাকার দুটি উপসর্গ দিয়েছেন একটি সু এবং আর একটি সম্। অর্থাৎ সুন্দর করে চেয়ে থাকে এবং সম্যক্‌রূপে চেয়ে থাকে। সুন্দর করে চেয়ে থাকা আর সম্যক্‌রূপে চেয়ে থাকা তার অর্থ কি? গোস্বামীপাদ টীকায় বললেন—অন্য দেবতা নিরপেক্ষ হয়ে এবং অন্যাভিলাষিতা শূন্য হয়ে চেয়ে থাকে। অর্থাৎ—শুধু ইষ্টপাদপদ্ম গোবিন্দ কৃপার দিকেই চেয়ে থাকে—তাঁর উপরেই শুধু নির্ভর করে থাকে—ফললাভের জন্য অন্য দেবতাকে অপেক্ষা করে না। আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে করি শুধু গোবিন্দ নাম করলে কি কাজ হবে? এর সঙ্গে অন্য দেবতারও আরাধনা করি। কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত জানে গোবিন্দচরণ আশ্রয় করলেই সব ফল হবে কারণ তিনিই তো মূল। বৃক্ষের মূলে জল দিলে যেমন শাখা-প্রশাখা পত্র পুষ্প পল্লব সবাই প্রফুল্লিত হয়—তাদের সঞ্জীবিত করবার জন্য যেমন শাখা-প্রশাখায় জল ঢালতে হয় না। এখানেও তেমনি শ্রীগোবিন্দ হলেন সকলের মূল তাঁর শ্রীচরণে ভজন জল ঢাললে সব দেবতা প্রসন্ন হবেন। দেবতাদের প্রসন্নতার জন্য আলাদা করে তাঁদের উপাসনা করতে হবে না। কারণ তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্। শ্রীগোবিন্দ যে

সকলের মূল ভগবান গীতাবাক্যে তত্ত্বকথা বলেছেন—"ঊর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্"—। কাজেই ভক্ত বড় চতুর সে অন্য কোথাও যায় না শুধু কৃষ্ণপাদপদ্ম ধরে পড়ে থাকে। আর অন্যাভিলাষিতা শূন্য হয়ে গোবিন্দ ভজে। অর্থাৎ তার ভগবানের ভজনে কোন প্রাকৃত আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কিছু পাবার আসায় ভগবানকে ভজে না। প্রাকৃত বাসনা-কামনা পূরণের জন্য গোবিন্দ ভজন করলে তার নাম কপটতা যাকে—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন কৈতব। কৈতবেরই নাম কপটতা। কপটতার লক্ষণ হল—কৃষ্ণ ভজে চতুবর্গ বাসনা এর নাম কপটতা। ভজছি গোবিন্দ পাদপদ্ম চাইছি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। এর নাম কপটতা। কারণ যখনই চতুবর্গ চাই তখনই মনটি কৃষ্ণ পাদপদ্ম ছেড়ে অন্য জায়গায় গেল। মুখে কাজে মনে মিল হল না। একেই তো কপটতা বলে। কৃষ্ণ ভজে তাঁকেই চাইতে হবে বা তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি চাইতে হবে—ভগবানকে চাওয়া আর ভক্তি চাওয়া একই কথা কারণ ভগবান আর ভক্তি দুই এর স্বরূপ একই। ভগবান বা ভক্তি এটি চাওয়া কামনার পর্য্যায় পড়ে না। কারণ এ প্রার্থনায় ভগবানের পাদপদ্ম ছেড়ে মন অন্যত্র যাচ্ছে না তাই কপটতা হচ্ছে না। শাস্ত্র তাই ভক্তি প্রার্থনাকে বাসনার পর্য্যায়ে ধরেন নি—তাকে কর্ম আখ্যা না দিয়ে বললেন নৈষ্কর্ম্য। কর্মের ফল বন্ধন আর নৈষ্কর্ম্যের ফল মুক্তি তো বটেই তারও উপরে যাকে প্রেমলক্ষণা ভক্তি বলা হয় সেটি পাইয়ে দেয়।

এ মুক্তি সম্বন্ধেও আবার কথা আছে। সাধারণ আস্তিক দর্শনের মতে যে মুক্তি তার লক্ষণ হল জন্মমৃত্যু নিরোধ। জন্ম এবং মৃত্যু দুটিই বন্ধ হয়ে যাবে দেহধারণ করে আর আসতে হবে না সুতরাং দেহত্যাগ করে যেতে হবে না। জন্মে তো যাভনা আছেই মৃত্যুতেও কণ্ট আছে। এই দুটি কণ্ট আর ভোগ করতে হবে না সাধারণ দর্শন তাকে বলেছেন মুক্তি। প্রায় সকল প্রাণীরই এই মুক্তি চরম কাম্য হয়ে আছে। কারণ জন্মমৃত্যুর কণ্ট পেতে হবে না তাঁদের মতে

এর থেকে সুখ আর নেই। কিন্তু ভক্তিদর্শন শ্রীমদ্ভাগবত দর্শন পারমহংস্যদর্শন সাত্ত্বতদর্শন এই মুক্তিকেও বললেন কপটতা। শুধু কপটতা নয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কপটতা। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বললেন—

তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হন অন্তর্ধান॥

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলছেন—

ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।

ভোগের আকাঙ্ক্ষা মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে পিশাচী বলা আছে।

আমরা শ্রীগুরুমহারাজ শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখে কীর্ত্তন প্রসঙ্গে শুনলাম—যে হৃদয়ে ভুক্তি মুক্তি বাসনা ধৃষ্টা চণ্ডালিনী থাকে সে হৃদয়ে শুদ্ধা, সাধ্বী ব্রাহ্মণী ভক্তিদেবী কখনও যান না। ধর্ম অর্থ কামনা বাসনা হৃদয়ে থাকলে তবু তার কোনদিন নিবৃত্তি হতে পারে যদি তার উপর সাধু গুরু বৈষ্ণবের করুণা হয়—কারণ নানারকম ভোগ করে করে তার যখন অতৃপ্তি আসে—দেখে কোন ভোগ্যবস্তুই তো চিরস্থায়ী হচ্ছে না—কোনোটাতেই তো আত্যন্তিক কল্যাণ হচ্ছে না—কোনটিই তো শাশ্বত হচ্ছে না—তখন মনে হতে পারে যে এমন কোন কল্যাণ নেই যা পেলে আর হারাতে হবে না তখন গোবিন্দ ভজনে প্রবৃত্তি হতেও পারে। কিন্তু যে মুক্তি পেয়েছে—জন্ম ও মৃত্যুর যাতনা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে তার মুক্তির আনন্দ এমনই মোহগ্রস্ত অবস্থা পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তির মত যে তার কখনও মনেই জাগে না যে এর ওপরও কোন সম্পদ আছে। কাজেই তার ভক্তি পাবার জন্য কোন লোভই জাগে না। সেইজন্য এই জন্মমৃত্যু-নিরোধ রূপ যে মুক্তি তাকে বলা হয়েছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কপটতা। আচার্য্য বেদব্যাস 'প্রোজ্ঝিতকৈতব'—যে ভক্তিতে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৈতব অর্থাৎ কপটতা মুক্তি বাসনা প্রকৃষ্টরূপে উজ্ঝিত অর্থাৎ ত্যক্ত হয়েছে তাকে বলা হবে শুদ্ধা ভক্তি। অর্থাৎ মুক্তি বাসনা নির্ম্মুক্তা যে ভক্তি তার

নাম শুদ্ধা ভক্তি কেবলা ভক্তি, একা ভক্তি, নির্মলা ভক্তি নিষ্কামা ভক্তি, অব্যভিচারিণী ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি অব্যবহিতা ভক্তি। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ এর নাম দিলেন উত্তমা ভক্তি। লক্ষণ করেছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

ভক্ত যে ভগবানের কৃপার দিকে চেয়ে থাকে এই অন্যাভিলাষিতা-শূন্য হয়ে চেয়ে থাকে—অর্থাৎ ভগবানের কাছে কিছু চায় না—ধর্ম, অর্থ, কামনা তো চায় না এমনকি মুক্তিও চায় না। ভক্ত কখনও বলে না—প্রভু আমাকে মুক্তি দাও। জন্মমৃত্যু বন্ধ করতে তো বলেই না বরং জন্ম প্রার্থনা করে, জন্ম থাকলে তো মৃত্যু থাকবেই। ভক্ত বলে আসিব যাইব চরণ সেবিব। ভক্ত বলে—

তুমি আর নিত্যানন্দ বিহরিবে যথা।
এই কর জন্মে জন্মে ভৃত্য হই তথা॥

কারণ দেহইন্দ্রিয় ধারণ করে জন্মগ্রহণ করতে পারলেই তো ভজন করা যাবে। নরতনু ভজনের মূল। ভজন করলে তবেই তো ভগবানের অপার মাধুর্য্যের আস্বাদন হবে। জ্ঞানী বা যোগী যে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলেন অরূপ নির্গুণ নিরাকার নিঃশক্তিক বলেন —তাঁরা শুদ্ধা ভক্তিতে ভগবানের আরাধনা করতে পারেন না তাই ভগবানের মাধুর্য্য অনন্ত অপ্রাকৃত শক্তি রূপ, গুণ রস, লীলা তাঁদের কাছে প্রকাশিত হন না। ভগবানের শক্তি, রূপ, রস, গুণ নেই তা নয়—তবে ভগবান যে মাধুর্য্যমণ্ডিত অশেষ কল্যাণ গুণগণের আধার সে শক্তি, রূপ রস গুণ প্রাকৃত নয়—সেটি অপ্রাকৃত। এই অপ্রাকৃত স্বরূপ শুদ্ধাভক্তি দিয়ে তাঁর ভজনা না করলে তাঁর কাছে প্রকাশিত হয় না। ভজনের দ্বারাই ভগবানের মাধুর্য্যের আস্বাদন। শ্রুতি বললেন—তিনি অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। তাঁর চরণ নেই তবু চলেন, হাত নেই তবু গ্রহণ করেন—চোখ নেই তবু দেখেন, কান নেই তবু শোনেন। আবার

ভগবান গীতাবাক্যে নিজের তত্ত্ব কথা বলেন—অর্জ্জুন আমার সব আছে—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

ভগবানের কর, চরণ, চক্ষু, কর্ণ সবই আছে তবে তা প্রাকৃত আমাদের মত প্রকৃতি উপাদানে গড়া নয় সেটি চিন্ময় অপ্রাকৃত স্বরূপ। এই অপ্রাকৃত চিন্ময় স্বরূপ একমাত্র শুদ্ধাভক্তির কাছেই প্রকাশিত হন। ভগবান শ্রীগোবিন্দ যখন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জ্ঞান উপদেশ করছেন অষ্টাদশ অধ্যায়ে তখনও বললেন—ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ভক্তির দ্বারাই আমার স্বরূপ এবং আমার সম্বন্ধে যা কিছু সব সম্যক্‌রূপে জানা যায় অর্জ্জুন।

এখন জন্মমৃত্যু নিরোধ রূপ যে মুক্তি ভক্ত চায় না কেন? কারণ এই মুক্তিতে কিছু ত্রুটি আছে। এই মুক্তিতে জীবের স্বরূপানুভূতি হচ্ছে না। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এইটিই জীবের খাটি স্বরূপ—কিন্তু মুক্ত পুরুষ মুক্তিধামে গিয়ে মুক্তি সুখ অনুভব করে—জন্মমৃত্যুর যাতনা তাকে ভোগ করতে হয় না কিন্তু জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এই স্বরূপানুভূতি না হওয়ায় ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসুখ পাচ্ছে না—কারণ দাসই তো তাঁর সেবা করবে। এই দাস স্বরূপের অনুভব সেবাই হল প্রাপ্তি। তাই জন্মমৃত্যু নিরোধ রূপ যে মুক্তি তাতে এই ত্রুটি থাকায় ভক্ত এ মুক্তি চায় না—শুধু তাই নয় এই মুক্তিকে ঘৃণা করে। শ্রীল প্রবোদানন্দ সরস্বতীপাদ বললেন 'কৈবল্যং নরকায়তে।' কৈবল্যসুখ অর্থাৎ মুক্তিসুখকে নরকের মত ঘৃণা করে। তাহলে প্রশ্ন হবে ভক্ত তো মুক্তি চায় না বা মুক্তি নেবে না—তাহলে কি ভক্ত মুক্তি পাবে না। ভক্ত কি মায়াবদ্ধ হয়েই থাকবে? না, তা নয়। কারণ ভক্ত তো মুক্তি অনায়াসে পাবে। কারণ ভক্ত ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসুখ পায় সে তো মায়ার সম্পর্ক নিয়ে সেবাসুখ পেতে পারে না। কারণ ভগবানের কাছে তো মায়া যায় না—তুরীয় কৃষ্ণের নাহি

মায়ার সম্পর্ক। অন্ধকারের পুঁটলি সঙ্গে নিয়ে কেউ যেমন সূর্য্যের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারে না তেমনি মায়ার অন্ধকার নিয়ে কেউ ভগবানের কাছে সেবাসুখ পেতে যেতে পারে না। মায়াকে পার হয়ে মুক্তি পেয়েই তাকে ভগবানের কাছে যেতে হবে। আচার্য্য বেদব্যাস বললেন—'ধাম্না স্বেন সদানিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।' ভগবান তার নিজের তেজঃপ্রভাবে কুহক অন্ধকার স্বরূপ যে মায়া তাকে বহুদূরে সরিয়ে রাখেন।

ভক্ত মুক্তি তো অনায়াসে পাবে তবে মুক্তি পাওয়ার দিকে তার লক্ষ্য থাকবে না—লক্ষ্য থাকবে ভক্তিলাভ ভগবানের পাদপদ্মলাভের দিকে। মহাজন একটি উপমা দেন। ভক্ত মুক্তি পাবে কেমন? নগরীং গচ্ছন্ গ্রামং পশ্যতীতি বৎ। এক জন মানুষ নগরে যাচ্ছে। নগরে যাওয়াই তার লক্ষ্য কিন্তু নগরে যে পথ দিয়ে যাচ্ছে সেই পথের দুই পাশে যত গ্রাম সে গ্রাম তো তার অনায়াসে দেখা হয়েই যাবে। কিন্তু এ গ্রাম দেখা তার উদ্দেশ্য নয়—নগরে যাওয়াই উদ্দেশ্য—কিন্তু নগরে যেতে হলে যাবার পথে যেমন পথের দুপাশের গ্রাম অনায়াসে দেখা হয়েই যায় এখানেও তেমনি ভক্ত যাচ্ছে ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসুখ পেতে তার পথে পড়ে আছে মুক্তি। সে মুক্তি তো ভক্ত অনায়াসে পাবেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ভক্ত যে মুক্তি পাবে সে কোন মুক্তি? তার লক্ষণ কি? ভগবানের চরণে ভক্তিলাভই হল প্রকৃত মুক্তি জীবের স্বরূপানুভূতিই হল প্রকৃত মুক্তি। কেবল-মাত্র সংসার দুঃখ মুক্তির নামই মুক্তি নয়। শ্রীমদ্ভগতশাস্ত্রে মুক্তির লক্ষণ করেছেন—

মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।

অন্যথা রূপ ত্যাগ করে জীব যখন তার নিজ স্বরূপে অর্থাৎ 'জীব নিত্য কৃষ্ণদাস' এই স্বরূপানুভূতিতে ফিরে আসবে তখন তার নাম হবে প্রকৃত মুক্তি। স্বরূপানুভূতি হলে জীব ভগবানের সেবা-সুখ পেয়ে ধন্য হবে। এই মুক্তি ভক্ত পায়। পদ্মপুরাণ বললেন—

নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব ভক্তিজনার্দ্দন।
মুক্তা এব হি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণো যতো হরে॥

হে ভগবন্, তোমার শ্রীচরণে নিশ্চলা ভক্তিই প্রকৃত মুক্তি কারণ যাঁরা তোমার চরণ ভজনা করেন সংসারমুক্তি তাঁদের অনায়াসে লাভ হয়। সংসারমুক্তি তাঁদের অযত্নলভ্য এবং আনুষঙ্গিক ফল।

বাক্‌পতি ব্রহ্মার কথা আমরা শুনলাম—ভক্ত বাসনানির্মুক্ত হয়ে ভগবানের কৃপার দিকেই একমাত্র সুন্দরভাবে এবং সম্যক্‌রূপে চেয়ে থাকে কিন্তু প্রশ্ন তো হবে ভক্ত তার কর্মফল ভোগ করে না? কর্ম দুরকম, পুণ্য এব্য পাপ। পুণ্যের ফল সুখভোগ আর পাপের ফল হল দুঃখভোগ। ভক্ত তো সুখ দুঃখ ভোগ করে। সুখভোগে না হয় কিছু মনে হয় না কিন্তু দুঃখ ভোগ, ভক্ত ভগবানের পাদপদ্ম এমন করে ভজে কিন্তু সে দুঃখ পায় কেন? তারও তো দেখা যায় রোগ-শোক ক্ষুধা পিপাসা বিপদ আপদ—এটি হয় কেন? ভক্ত কি তাহলে কর্মফল ভোগ করে—কর্মফলে দুঃখ পায়? ব্রহ্মা যে বললেন ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। ভক্ত ভোগ ঝরছে। তার উত্তরে বলা যায় ভক্তের দুঃখভোগ আছে—ভক্তের বিপদ আছে কিন্তু ভক্ত মুহ্যমান হয় না। কারণ সে জানে সুখ দুঃখ যা আসছে বিপদ বা সম্পদ্ সবই প্রভুর দান।

তাই ভক্ত সুখ দুঃখ দুটিকেই সমান দৃষ্টিতে নেয়। সুখেও তার উল্লাস নেই দুঃখেও কোন উদ্বেগ নেই। তোমারই দেওয়া দুঃখ তোমারই দেওয়া সুখ। সম্পদ বিপদ যা আসে সবই প্রভুর দান বলে গ্রহণ করে। পুত্র প্রাপ্তিও তাঁর করুণা পুত্র নাশও তাঁর করুণা। কাজেই দুটিই তার কাছে সমান।

ভক্ত দুটিকেই না হয় প্রভুর দান বলে গ্রহণ করল—তবু তো ভক্তকে কর্মফল ভোগ করতে হবে। ভক্তও যদি কর্মফল ভোগ করে তাহলে ভক্ত এত কষ্ট করে ভগবানকে ভজনা করে—তার সঙ্গে অভক্তের পার্থক্য কোথায় হল? এই আশঙ্কা মানুষের হতে পারে

বলে দার্শনিক শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লেখনী ধরেছেন—বলছেন, ভক্তের কর্মফল নেই। ভক্ত দুঃখ পায় কিন্তু কর্মফল ভোগ করে না। ভক্তের এ দুঃখভোগ তার কর্মফলের পাওনা নয়। কারণ ভক্তের কর্মফল থাকে না। সে যখনই ভগবানের নাম উচ্চারণ করে তখনই তার সব কর্মফল খণ্ডিত হয়ে যায়। গোপরামারা কৃষ্ণকথামৃতকে বলেছেন কল্মষাপহম্। কৃষ্ণকথা সকল রকম পাপকে বিনাশ করে—এমন কি প্রারব্ধ পাপ পর্য্যন্ত। প্রারব্ধ পাপের ফলে দেহধারণ হয়। প্রারব্ধ পাপ হল কারণ আর তার কার্য্য হল দেহধারণ। কারণের নাশে কার্য্যের নাশ হয় এতো সবাই জানে। তাই বিপক্ষ ও জ্ঞানবাদী ভক্তিবাদীকে প্রশ্ন করেছেন ওগো ভক্তিবাদী তোমরা তো বলছ ভক্তের ভগবানের নাম উচ্চারণ মাত্রে সব রকম পাপ এমনকি প্রারব্ধ পাপ পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে যায় তাহলে প্রারব্ধ পাপের ফল যে দেহধারণ ভক্তের দেহধারণ হয় কি করে? ভক্ত তো দেহ নিয়ে থাকে। তাঁর উত্তরে ভক্তিবাদী বলেন ভক্তের দেহধারণ হয় ভগবানের ইচ্ছায়। ভগবান ইচ্ছা করে ভক্তের দেহকে বজায় রাখেন। যেমন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মাঝামাঝি অবস্থায় শত্রুপক্ষের ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপে অর্জ্জুনের রথখানি ভস্মীভূত হয়েছিল কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয় নি—যুদ্ধের জন্য রথের প্রয়োজন আছে বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অর্জ্জুনের ভস্মীভূত রথই নূতন করে রেখেছিলেন অর্জ্জুনকেও সেটি জানতে দেন নি। কৃষ্ণ হয়ত অর্জ্জুনকে নূতন করে রথ তৈরী করে দিতে পারতেন কিন্তু তা দেন নি ঐ ভস্মীভূত রথকেই নূতন করে রেখেছিলেন। কারণ নূতন করে রথ তৈরী করতে সময়ও লাগবে আর তা ছাড়া লোক জানাজানি হবে তাতে অর্জ্জুন উপহাসের পাত্র হবেন। তাই ভগবান ঐ রথ খানিকেই নূতন করে রেখেছিলেন। এখানেও তাই ভক্তের দেহরথ ভস্মীভূত হয়ে যায় ভগবানের নাম উচ্চারণ মাত্রে—কারণ দেহধারণের কারণ যে প্রারব্ধ পাপ তা তো ভক্তের ভগবানের নাম উচ্চারণ মাত্রে আর থাকে না। তাই ভক্তের দেহও থাকার কথা

নয়। কিন্তু আমরা দেখি ভক্তের দেহ তো থাকে। কিন্তু ভক্তের এ দেহধারণ কর্মফলের পাওনা নয় ভক্তের দেহ থাকে ভগবানের ইচ্ছায়।

এখন প্রশ্ন হতে পারে ভক্তের দেহ থাকার প্রয়োজন কি? অর্জুনের রথ না হয় যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন ছিল এখানে ভক্তের দেহরথের কি দরকার? এখানেও প্রয়োজন আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তো আঠারদিনের যুদ্ধ তারপরে তো অর্জুনের আর রথের প্রয়োজন হবে না কিন্তু ভক্তের দেহরথের প্রয়োজন তো সারাজীবনের। কারণ ভক্তের জীবনে তো যুদ্ধ শেষ হয় না। ভক্তের ভজনই হল যুদ্ধ। ভজন অর্থাৎ মায়ার সঙ্গে ভক্তিমহারাণীর যুদ্ধ এর নামই ভজন। শ্রীমাধুর্য্য কাদম্বিনী গ্রন্থে বলা আছে ভজন হল বিষয়সঙ্গয়া ভক্তি। যুদ্ধে যেমন হার জিৎ আছে। তেমনি মায়া এবং ভক্তিমহারাণীর মধ্যে যে যুদ্ধ এখানেও হার জিৎ আছে। কখনও মায়ার জয়লাভ ভক্তি-মহারাণীর পরাজয় তখন ভক্তের ভজনে বিঘ্ন। আবার কখনও মায়ার পরাজয় ভক্তিমহারাণীর জয়লাভ তখন ভক্তের জীবনে নির্ব্বিঘ্নে ভজন। এখন মায়া জয়লাভ করছে বলে এটি মনে করা চলবে না যে ভক্তিমহারাণীর চেয়ে মায়ার বল বেশী। ওটি যুদ্ধের মারপ্যাঁচ। বলবান পক্ষও কখনও কখনও পরাজিত হয়। কারণ ভক্তিমহারাণীর বল ভগবানের চেয়েও বেশী সুতরাং মায়ার থেকে বেশী তো হবেই। ভক্তের জীবনে এইরকম জয় পরাজয় হতে হতে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় ভক্তিমহারাণীর জয়লাভ ভক্ত শেষ মুহূর্ত্তে গৌর-গোবিন্দ বলে আনন্দ করে চলে যায়। এখন যুদ্ধ বলা হয়েছে—বিজেতা রাজা তো বিজিত রাজার রাজ্য অধিকার করে—তাতে ধনাগার রাজকোষ পায় তারপরে রাজসিংহাসনে বসে। এখানে ভক্তের জীবনে যখন ভক্তি-মহারাণীর জয়লাভ হল তখন ভক্ত কোন সিংহাসনে বসে কি রত্নাগার পায়। ভক্তও সিংহাসনে বসে—কৃষ্ণদাস্য সিংহাসনে বসে—তার অনুভব হয়, আমি নিত্য কৃষ্ণদাস এইটিই তার সিংহাসন প্রাপ্তি। তাই ভক্ত বৈষ্ণবকে মহারাজ বলা হয় আর প্রেমমণি ভক্তিরত্ন পায়—

এইটিই হল তার ধনাগার প্রাপ্তি। এখন এই ভজন যুদ্ধ তো ভক্তের জীবনে শেষ হয় নি তাই তার দেহরথের প্রয়োজন আছে। দেহ ইন্দ্রিয় না থাকলে তো ভজন হবে না কারণ নরতনু ভজনের মূল ভগবান তাই ভক্তের দেহরথ বজায় রাখেন। ভক্তের দেহধারণ কর্ম-ফলের পাওনা নয়—এটি ভগবানের ইচ্ছায়। তবু তো মনে হবে ব্রহ্মা বললেন 'ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।' ভক্ত কর্মফল ভোগ করছে। তখন শ্রীজীবগোস্বামীপাদ বললেন দেখ, এখানে পদটি ভুঞ্জান নয় ওর আগে একটি অকার প্রশ্লেষ করে নিতে হবে। যাকে লুপ্ত অকার বা অবগ্রহ বলা হয়। তাহলে পদ হবে অভুঞ্জান অর্থাৎ ভক্ত কর্মফল ভোগ করে না। ভক্তের ক্যোন কর্মফল নেই। কারণ অবগ্রহ বা লুপ্ত অকার উচ্চারণ করাও যায় আবার উচ্চারণ না করলেও হয়। ভক্তের কোন কর্মভোগ নেই। দেখতে কর্মফলের মত। রাজর্ষি ভরত তাঁর তৃতীয় জন্মে জড়ভরত জন্মে রাজা রহুগণের পাল্কি বইছেন দেখে মনে হচ্ছে তিনি কর্মফল ভোগ করছেন, কিন্তু তা নয় ওটি দেখতে কর্মফলের মত। শ্রীল হনুমানজী দেবর্ষিপাদ নারদকে বলেছেন—পাণ্ডবেরা যে দুঃখ ভোগ করে, তাদের যে বিপদ তা কর্মফলের নয়, এটি ভগবানের ইচ্ছায়। পাণ্ডবদের বিপদের দুটি কারণ (১) কৃষ্ণ ইচ্ছা করে নূতন নূতন বিপদ তৈরী করে পাণ্ডবদের কাছে পাঠান তাতে পাণ্ডবদের মহিমা প্রচারিত হবে। কারণ বিপদে পড়লেই মানুষের ধৈর্য্য, সংযম তিতিক্ষা এসব গুণের পরীক্ষা হয়। যে যাকে ভালবাসে তার মহিমা জগতে প্রচার করতে চায়। কৃষ্ণ পাণ্ডবদের ভালবাসেন তাই তাদের মহিমা প্রচার করেন। পাণ্ডবদের বিপদের আর একটি কারণ তারা নিজেরাই নূতন নূতন বিপদ তৈরী করে—কারণ বিপদে পড়লে পাণ্ডবেরা বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করে না কিন্তু, গোবিন্দপাদপদ্ম স্মরণ করে। পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে স্মরণ করলে কৃষ্ণ তো তাদের কাছে না এসে পারবেন না—এলে কৃষ্ণ পাদপদ্ম তাদের দর্শন হবে এই দর্শনের

লোভে তারা বিপদ তৈরী করে কৃষ্ণদর্শনে সব বিপদ তো দূর হবেই। শ্রীহনুমানজী পাণ্ডবদের এই বিপদকে বললেন 'সুসেবিত মহত্তমা'—কারণ পাণ্ডবদের বিপদ গোবিন্দ দর্শন করায়। গোবিন্দদর্শন তো হয় প্রেমে। এই প্রেমলাভ হয় সাধু সেবায় বৈষ্ণবসেবায়। সুতরাং পাণ্ডবদের বিপদ যখন কৃষ্ণদর্শন করায় তখন ঐ বিপদই হল সাধু—তাদের সেবায় পাণ্ডবদের প্রেমলাভ এবং এই প্রেমে তাঁদের কৃষ্ণদর্শন।

ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু, তোমার ভক্ত হৃদ্বাক্‌বপুর্ভি অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে প্রণাম করে। শরীর দিয়ে প্রণাম আমরা বুঝি—পঞ্চাঙ্গ প্রণাম সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দণ্ডবৎ প্রণাম। বাক্য দিয়ে প্রণাম অর্থাৎ প্রণাম করবার সময় জিহ্বায় উচ্চারণ করবে—আমি আপনাকে প্রণাম করছি এটি হল বাক্য দিয়ে প্রণাম। অথবা ভগবানের নাম বা কথাকে সাধুবাদ দেওয়া একেও বাক্য দিয়ে প্রণাম বলা হয়। আর মন দিয়ে প্রণাম অর্থাৎ শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম—প্রণাম অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে নত হওয়া। শুধু শরীরকে নত করা নয়, সঙ্গে সঙ্গে মনটিকেও নত করা। এর নাম মন দিয়ে প্রণাম। ভক্ত এইভাবে কায়মনোবাক্যে প্রণাম করে। যদি প্রশ্ন হয় প্রয়োজন কি ? ব্রহ্মা বলছেন প্রভু তোমার ভক্ত এইভাবে কায়মনোবাক্যে প্রণাম করে করে বেঁচে থাকে। ব্রহ্মা পদ বললেন 'জীবেত'। কারণ ভক্তিপথে থাকার নামই বেঁচে থাকা আর ভক্তিপথ থেকে সরে আসার নামই মৃত্যু। আমি মনে করি জীবনে তো একবারই মৃত্যু হবে। কিন্তু তা নয়, আমার তো ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যু। কারণ মৃত্যুর লক্ষণ করেছেন শাস্ত্র—মৃত্যুরত্যন্তবিস্মৃতিঃ। ভগবানকে ভুলে যাওয়ার নামই মৃত্যু আর ভগবানকে মনে রাখার নামই জীবন অর্থাৎ বেঁচে থাকা। ব্রহ্মা এ কথা বললেন কেন ? ভক্ত বেঁচে থাকে—অর্থাৎ ভক্তিপথে থাকে। এখন এই বেঁচে থাকলে লাভ কি ? ব্রহ্মা সিদ্ধান্ত করছেন প্রভু, প্রাণে বেঁচে থাকলেই সে দায়ভাক্‌ হয় অর্থাৎ সম্পত্তিলাভের অধিকারী হয়। মরে গেলে তো আর সম্পত্তির ভাগ পাবে না। বলা আছে—

কাণা হোক্ খোঁড়া হোক্ বেঁচে থাকলেই ভাগের ঠাকুর।

ভক্তিপথ থেকে সরে আসার নামই মৃত্যু। মৃত পুত্র যেমন পিতার সম্পত্তি পায় না জীবিত থাকলেই পায়—এখানেও তেমনি ভক্তিপথে থাকলেই সম্পত্তি পাবে ভক্তিপথ থেকে সরে এলে আর সম্পত্তি পাবে না। এখানে সম্পত্তি বলতে ব্রহ্মা কি বুঝাচ্ছেন? সম্পত্তি হল প্রেম—প্রেমকেই ধন বলা হয়েছে। মহাজন বললেন 'প্রেমধন নাই যার জগমাঝে সেই দরিদ্র। কৃষ্ণনামকেই চিন্তামণি বলা আছে—

কৃষ্ণনাম চিন্তামণি হও সেই ধনের ধনী
ভরি লহ বদন কুঠরি।
খাও বিলাও নাহি ক্ষয় যম জিনি যাক্ ভয়
ডঙ্কা পড়ুক ত্রিভুবন ভরি॥

ভক্ত এই ভক্তিপথে থাকে বলেই প্রেমসম্পত্তি পাবার অধিকারী হয় অর্থাৎ দায়ভাক্ হয় আর ভক্তিপথ থেকে সরে এলে সে তো মৃত—সুতরাং মৃত পুত্র যেমন সম্পত্তির অধিকারী হয় না এখানেও তেমনি ভজন থেকে সরে এলে সে কখনও দায়ভাক্ হবে না অর্থাৎ প্রেমসম্পত্তি পাবে না। এ প্রেম কোথায় লাভ হবে ব্রহ্মা বললেন মুক্তিপদে অর্থাৎ ভগবানে। মুক্তি যার শ্রীচরণে গড়াগড়ি যায় তিনি হলেন মুক্তিপদ অর্থাৎ ভগবান। সেই ভগবানে প্রেমলাভ করবে।

ব্রহ্মার এই বাক্যটি একবার শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শুনিয়েছিলেন তাতে ব্রহ্মার এই মুক্তিপদ কথাটি উচ্চারণ না করে পাঠটি ফিরিয়ে উচ্চারণ করেছিলেন ভক্তিপদ—অর্থাৎ ভক্তি যার শ্রীচরণে বিলাসপরায়ণা সেই ভক্তিপদ ভগবানে প্রেম সম্পত্তি পাবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বললেন ভট্টাচার্য্য, তুমি ব্রহ্মার বাক্যের মুক্তিপদ পাঠ না বলে ভক্তিপদ বললে কেন? ভট্টাচার্য্য বললেন 'প্রভু মুক্তি' কথাটি আমার জিহ্বায় উচ্চারিত হয় না। এখানে এ

মুক্তি বলতে জন্মমৃত্যু নিরোধ রূপ মুক্তি, যে মুক্তিতে জন্মমৃত্যু বন্ধ হচ্ছে বটে কিন্তু জীবের স্বরূপানুভূতি হচ্ছে না—জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এই অনুভবটি জাগছে না। তাই এই জন্মমৃত্যু নিরোধ রূপ মুক্তি ভক্ত নেয় না তো বটেই—বরং ঘৃণা বোধ করে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

চতুর্ব্বিধা মুক্তি ভক্ত অঙ্গুলি না ছোঁয়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের এই কথায় শ্রীমন্মহাপ্রভু সুখী হলেন।

ব্রহ্মার আত্মনিবেদনের পরবর্ত্তী স্তুতি বাক্য—

পশ্যেশ মেঽনার্য্যমনন্ত আদ্যে পরাত্মনি ত্বয্যপি মায়িমায়িনি॥

মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাত্মবৈভবং হ্যহং কিয়ানৈচ্ছমিবার্চ্চিরগ্নৌ॥ ৯

বাক্‌পতি ব্রহ্মা নিজের জ্ঞানগরিমায় যে অপরাধ করেছেন—এ অপরাধ বলতে কি বুঝাচ্ছে? পাপ যখন ভগবান এবং ভগবানের ভক্তে হয় তখন তাকে বলা হয় অপরাধ। ভগবানকে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে পিতামাতাকে পরীক্ষা করতে যাওয়া মহান অপরাধ। ব্রহ্মা সেই অপরাধে অপরাধী। কৃপা না হলে তো নিজকৃত অপরাধে দৃষ্টি পড়ে না। ব্রহ্মার উপর যতক্ষণ কৃপা হয় নি তিনি নিজের জ্ঞানে মত্ত ছিলেন—এ অপরাধকে অপরাধ বলে গণনাই করেননি। তাই সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর গোচারণলীলায় বালক বাছুর চুরি করে তাঁকে পরীক্ষা করতে গিয়ে-ছিলেন। কৃষ্ণকে দেখে তো ভগবান বলে মনে হচ্ছে না। বরং একটি সামান্য গোপবালক বলেই মনে হচ্ছে। অথচ চোখের সামনে দেখলেন অঘাসুরের আত্মা ঐ গোপবালকের চরণে লীন হল। এর থেকেই সন্দেহ জাগল—আত্মা তো ভগবানের চরণে লীন হবে সে তো গোপ বালকের চরণে লীন হবে না। তবে কি কৃষ্ণ খাঁটি ভগবান? পরীক্ষা করতে হবে। বালক বাছুর চুরি করে দেখি তিনি জানতে পারেন কিনা —কারণ ভগবান যদি হন তাহলে তো তিনি সর্ব্বজ্ঞ হবেন আর সর্ব্বজ্ঞ হলে জানতে পারবেন সব আর এটিও জানতে পারবেন যে

আমি চুরি করেছি—তখন কি করেন দেখি। ব্রহ্মার এই বুদ্ধি। ভগবানকে পরীক্ষা করবার বুদ্ধি যখনই ব্রহ্মার জেগেছে তখনই মায়া তার পিছনে লেগেছে।

এখন ভগবানের কৃপায় যখন ব্রহ্মার দৃষ্টি খুলে গেছে—বুঝতে পারলেন কৃষ্ণ খাঁটি ভগবান—কারণ ভগবান কৃপা করে নিজের অনন্ত-কোটি বাসুদেব চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ব্রহ্মাকে দর্শন করালেন—ব্রহ্মা সে ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি সহ্য করতে পারেন নি—মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন—মূর্চ্ছা যখন ভাঙ্‌ল তখন দেখলেন কোথায় সেই অনন্তকোটি বাসুদেব মূর্ত্তি! কেউ কোথাও নেই—সেই আগে যাকে দেখেছিলেন সেই একটি গোপবালক গোপবেশে দাঁড়িয়ে আছেন। ব্রহ্মার চিত্ত তখন দীনাতিদীন হয়ে গেছে—চারটি বদনের আটটি নয়নে প্রেমাশ্রুধারা বইছে হৃদয়টি গলে গিয়ে এই অশ্রুধারা-রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। তখন নিজের তুচ্ছতাতিতুচ্ছ অবস্থা অনুভব করে ভগবান শ্রীবালগোপালের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করে বলছেন—হে ঈশ, অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর—তুমি জগতের নাথ—তুমি ঈশ্বর অর্থাৎ সকলকে বশীভূত করে রাখবার ক্ষমতা তোমার আছে। তুমি সর্ব্বময় কর্ত্তা তুমি পরম স্বাধীন। আমি তোমারই অধীনে এক তুচ্ছ কীটানুকীট। কারণ শ্রুতিবাক্যে বলা আছে—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

জগতে সকলে যখন তোমার অধীন—তখন আমি তো জগৎ ছাড়া নই। সুতরাং আমিও তোমার অধীন। আমার এ তুচ্ছতা কেমন জান প্রভু? একটি উপমা দিয়ে বলি। একটি অগ্নিকণা যাকে স্ফুলিঙ্গ বলা হয় সে অগ্নিকুণ্ড থেকেই আসে কিন্তু অগ্নি-কুণ্ডের কাছে অগ্নিকণা অতি তুচ্ছ। তেমনি আমি তোমার কাছ থেকেই এসেছি। কিন্তু তুমি জনক আর আমি জন্য। তুমি অনন্ত আর আমি সান্ত। তুমি অপরিচ্ছিন্ন আমি পরিচ্ছিন্ন।

তুমি অপরিমিত আমি পরিমিত অর্থাৎ সীমিত—তাই তোমাতে আমাতে অনেক তফাৎ। তুমি সকলের কারণ স্বরূপ সর্ব্বকারণকারণম্ আমি তোমারই কার্য্য। তোমার থেকেই সকলের প্রকাশ। তুমি পরমাত্মারূপে সকলের অন্তরে থেকে সকলকে নিয়ন্ত্রিত কর। তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনদেবকে তত্ত্বকথা বলেছেন—'ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। যাঁরা মায়া নিয়ে কাজ করেন সেই মায়ী পুরুষকেও তুমি মুগ্ধ কর। তুমি মায়িনামপি মোহিনী। তোমারই শঙ্করমোহন লীলা তুমি শঙ্করকেও মুগ্ধ করেছ। সেই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান যে তুমি তোমাকে আমি নিজের অজ্ঞতায় নিজের দৌর্জন্যে আত্মবৈভব অর্থাৎ নিজের ঐশ্বর্য্য দেখাবার ইচ্ছা করেছিলাম। অহো! আমার কি রকম মূঢ়তা—কি রকম অভিমান—এটি তুমি দেখ—আমার এ অজ্ঞতা কেমন জান? অগ্নিকুণ্ড থেকে প্রকাশিত একটি অগ্নিকণা (স্ফুলিঙ্গ) যদি অন্য তৃণখণ্ডকে পোড়াতে পারছে বলে অভিমানভরে যদি অগ্নিপুঞ্জকে পোড়াবার জন্য চেষ্টা করে তাহলে সেটি যেমন তার মূঢ়তা ছাড়া আর কিছু নয়—এখানে আমার অবস্থাও তাই। আমি তোমারই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে সৃষ্টিকাজ করি—তোমারই বলে বলীয়ান হয়ে ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করি—আমি যে লোকপিতামহ, বেদবক্তা—সেও তো তোমারই কৃপা। কারণ ব্রহ্মা দেবর্ষিপাদ নারদকে বলেছেন—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।

আমি সৃষ্টিকাজ করি তোমারই আদেশে আবার সংহারকর্ত্তা রুদ্র সংহার করেন তোমারই আদেশে। তাই আমরা কেউ স্বাধীন নই। সবাই তোমার অধীন। এই অধীনতার জন্যই ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শঙ্কর, ঋষি দুর্ব্বাসা যখন শ্রীসুদর্শনচক্রের তাপে জর্জরিত হয়ে তাঁদের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন তখন তাঁকে আশ্রয় দিতে পারেন নি। কারণ যিনি নিজে অধীন তিনি অপরকে আশ্রয় দেবেন কি করে—যিনি নিজে স্বাধীন স্বতন্ত্র ঈশ্বর তিনি অপরকে আশ্রয়

দিতে পারেন। আমার এই অভিমান এখন তোমারই কৃপাদৃষ্টিতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েছে। তাই বলি প্রভু আমার এই ধৃষ্ঠতা তুমি নিজ গুণে ক্ষমা কর। আমার গর্ব্ব অহঙ্কার ধূলিসাৎ করে তোমার চরণে কৃপা করে আশ্রয় দাও—তা না হলে আমার কোন গতি নেই। কুপুত্রও তো পিতার পুত্র, দুষ্ট প্রজাও তো রাজার প্রজা—সে পুত্রও তো পিতার কাছে স্থান পায় সে প্রজাও তো রাজ্যে স্থান পায়—তাই হে প্রভু—কারণ তুমি প্রভু—কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্তুং শক্যঃ—তুমি করতে পার না করতে পার—আবার অন্যরকম করতে পার—তুমি সকলের উপরে প্রভুত্ব কর বলেই তুমি প্রভু—প্রভবতি যঃ সঃ প্রভুঃ। আমার সকল অভিমান চূর্ণ করে তোমার দাসানুদাস করে নাও। আমি শতশত অপরাধী কিন্তু তুমি তো অদোষদর্শী। আমি অধম কিন্তু তুমি তো উত্তম। অপরাধ করা স্বভাব আমার কিন্তু ক্ষমার মূর্ত্তি তুমি—ক্ষমা করা স্বভাব তোমার। স্বভাব কেউ ছাড়তে পারে না। তাই অপরাধ করা স্বভাব আমি ছাড়তে পারি না। কিন্তু তুমিই বা তোমার স্বভাব ছাড়বে কেন? তুমি তো করুণাবৎসল, তুমি তো দীনবৎসল। বরং দীনজনে তোমার অধিক দয়া। কারণ ভগবানের যত যত গুণ আছে তার মধ্যে ভক্তবাৎসল্য গুণকে বলা হয়েছে গুণসম্রাট। মহাজনের পদ আছে—

কি করব জপ তপ দান ব্রত নৈষ্ঠিক যদি করুণা নাহি দীনে।
সুন্দর কুলশীল রূপ গুণ যৌবন কি করব লোচনহীনে।

অন্ধব্যক্তির যত রূপই থাক কিন্তু সে রূপ যেমন কিছু ম্লান হয়ে যায়ই তেমনি ভগবানের যত গুণই থাক দীনহীনের প্রতি যদি তাঁর দয়া না থাকে তাহলে ভগবানের কোন গুণ কাজে লাগে না। তাই একান্ত প্রার্থনা প্রভু ঐ চরণে—আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করে এই অধম কাঙালকে তোমার শ্রীচরণে দাসানুদাস করে নাও। এছাড়া আমার কোনও উপায় নেই। অভিমানের কাছে গর্ব্বের কাছে তোমার স্থান নেই। বিশ্বকবির কথায়—

সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।

নিজেকে গৌরব দান করতে গিয়ে বারে বারে আঘাতই পাই। তোমাকে গৌরব না দিয়ে নিজেকে গৌরব দানের মত মূঢ়তা আর কিছু নেই। আমার সেই মূঢ়তা তুমি কৃপা করে দূর কর।

পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে দেখান হয়েছে জ্ঞানাদি সাধনের প্রযোজকতা নেই। জ্ঞানের যে প্রয়োজকতা নেই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ব্রহ্মা নিজে। ব্রহ্মা নিজে জ্ঞানী কিন্তু তার জ্ঞান কোন কাজে লাগে নি। তবে যে ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালের মহিমা উপলব্ধি করলেন এটি ব্রহ্মার জ্ঞানের ফলে নয়। বালগোপালের কৃপা তাঁর প্রতি হয়েছে তাই মহিমা বুঝেছেন। ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু, আমার জ্ঞানের গরিমার যে চাঞ্চল্য প্রকাশ করেছি সেজন্য ক্ষমা চাইবার উপক্রম করছি। ব্রহ্মা নিজের আচরণকে বললেন অনার্য্য। এই অনার্য্য বলতে কি বুঝাচ্ছে। যে আর্য্য নয় তাকে বলা হবে অনার্য্য। এখন আর্য্য পদের অর্থ হল সুজনতা। এই সুজনতা বিজ্ঞতাকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। তাই আর্য্য বলতে সুজন এবং বিজ্ঞকে বুঝায়। অতএব দুর্জ্জন শব্দের দ্বারা দুর্জ্জন এবং অজ্ঞজনকে বুঝায়। ব্রহ্মা বলছেন, আমার জ্ঞানের ফল হল দুর্জ্জনতা এবং মূঢ়তা। বিদ্যা যেমন বিনয় ছাড়া শোভা পায় না, জ্ঞান তেমনি ভক্তি ছাড়া শোভা পায় না। তাই বলা হয়েছে—

বাসুদেবে ভগবতী ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানাং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্ ॥
ভাঃ ৩।৩২।২৩

আমাদের ইন্দ্রিয় তো দুর্ব্বার। ভগবান নিজেও বলেছেন—

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ। গী ২।৬০

ভগবানের অনুভূতি শুষ্কজ্ঞানের অগোচর। যেখানে ভক্তি আছে সেখানে জ্ঞান অনুগতের মত যায়। ব্রহ্মা বললেন আত্মবৈভব দর্শন করবার জন্যই আমার এই গোবৎসহরণ ক্রিয়া। শ্রীল সনাতন-গোস্বামিপাদ এই আত্মবৈভব পদের ব্যাখ্যা করেছেন—তব বৈভবম্—

অর্থাৎ শ্রীবালগোপালের বৈভব। এর আগেই শ্রীশুকদেব বলে এসেছেন দ্রষ্টুং মঞ্জুমহিত্বম্—জগতের পিতা কৃষ্ণ। তিনিই প্রভু তিনিই ঈশ্বর। তিনিই সর্ব্বকারণকারণম্। শ্রীচৈতন্যভাগবত বললেন—

জ্ঞানের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
.... তার জন্মে জন্মে তাপ॥

ব্রহ্মা যে বিশেষণগুলি ভগবানের সম্বন্ধে দিলেন—তা হয়ত অন্য ভগবানে লাগতেও পারে কিন্তু যখন 'ত্বয়ি' বললেন তখন এটি শ্রীবালগোপাল ছাড়া অন্য কাউকে বুঝাবে না। ব্রহ্মা বলছেন,—যে ভক্ত হবে সে কৃষ্ণের ইচ্ছা জেনে কাজ করে। ভগবানের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তারা কাজ করে তাই তাদের মূঢ়তা বলে কিছু নেই। যে ভগবানের মাধুর্য্য যত বেশী সে ভগবান তত বেশী গম্ভীর। কৃষ্ণলীলায় গাম্ভীর্য্য তাই এত বেশী। কৃষ্ণের লীলা অনন্তকোটি সমুদ্র গম্ভীর। অনন্তকোটি ভগবত্তা কৃষ্ণে কিন্তু তা প্রকাশ পায় না। তাই তাঁর এত মাধুর্য্য। যে ভক্ত হয় সে কখনও প্রভুকে পরীক্ষা করতে যায় না। ব্রহ্মা প্রভুকে পরীক্ষা করতে গিয়েছেন তাই তাঁর সমুচিৎ দণ্ড পাওয়া উচিত কারণ তিনি মূঢ়। কিন্তু দণ্ডনীয় যে সে তো ক্ষমা পেতে পারে না। ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু আমি দুর্জন বটে কিন্তু অজ্ঞ। দুর্জন বলে দণ্ডনীয় আর অজ্ঞ বলে ক্ষমার্হ—ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য। দণ্ড এবং ক্ষমা দুটিই ব্রহ্মার প্রাপ্য হলেও ভগবান তো মহা কৃপালু—তাই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বললেন—হে অচ্যুত! ব্রহ্মাকে তোমার ক্ষমা করাই উচিত।

ব্রহ্মা বলছেন—

অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত মে রজোভুবো হ্যজানতস্ত্বৎ পৃথগীশমানিনঃ।
অজাবলেপান্ধতমোহন্ধচক্ষুষ এষোঽনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি॥

১০।১৪।১০

এখানে ব্রহ্মা ভগবানকে 'অচ্যুত' বলে সম্বোধন করেছেন।

ভগবানের নাম অচ্যুত কারণ তাঁর স্বরূপ গুণের বিচ্যুতি ঘটে না। জলের শৈত্য গুণও স্বাভাবিক নয়। কারণ অগ্নি সংস্পর্শে জল উষ্ণ হয়। জগতের সববস্তুই সৃষ্ট। কাজেই যা কিছু শক্তি সবই আগন্তুক। কোনটি তাই স্বাভাবিক হতে পারে না। ব্রহ্ম সৃষ্ট নন। তাই তার গুণও সৃষ্ট নয়। স্বাভাবিক গুণ বলা হবে তাকেই যাকে অন্য দ্রব্যের স্পর্শে ব্যাহত করা যাবে না। শ্রুতি বললেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।

তাঁর থেকেই যখন সব কিছুর প্রাদুর্ভাব তখন কেমন করে অন্য দ্রব্যের দ্বারা তার প্রতিবন্ধক ঘটান যায়? শ্রীবিষ্ণুপুরাণ বলেছেন— কেনচিৎ বিহন্তুং ন শক্যতে। স্বরূপ গুণ স্বাভাবিক। ভগবানের এ শক্তি অপরকে কষ্ট দেয় না কখনও। জগতের গুণ ও শক্তি থেকে নিরন্তর সুখ দুঃখ উঠছে। মায়ার অধীনতা থেকে উদ্ধার পেয়ে যদি সাধুগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় সচ্চিদানন্দ ভগবানের আশ্রয় পাওয়া যায় তাহলে আর মায়ার দণ্ড পেতে হবে না। সুখ ও দুঃখের বোঝা তখন আর বইতে হবে না। তখন স্বরূপ শক্তি সচ্চিদানন্দের প্রভাবে কেবলই আনন্দে ভরপুর থাকবে। ভগবানের যত গুণ আছে তার মধ্যে ভক্তবাৎসল্য গুণ হল গুণসম্রাট। অন্য সব গুণ তার প্রজা। ভগবানের অন্য সব গুণ থেকেও যদি ভক্তবাৎসল্য গুণ না থাকত তাহলে উপাসকের উপাসনা ব্যর্থ হয়ে যেত। এইজন্যই ভক্তবাৎসল্য গুণকে গুণ সম্রাট বলা হয়েছে। এই গুণ ছাড়া তাঁর অন্য সব গুণ ব্যর্থ। মহাজন বললেন—

কি করব জপ তপ দান ব্রত নৈষ্ঠিক
যদি করুণা নাহি দীনে।
সুন্দর কুলশীল রূপ গুণ যৌবন
কি করব লোচনহীনে॥

একজন মানুষের অনেক রূপ গুণ থাকলেও তার নয়ন দুটি যদি অন্ধ হয় তাহলে তার রূপ যেমন ম্লান হয়ে যায়ই তেমনি ভগবানের

যত গুণই থাক ভক্ত ডাকলে তিনি যদি সাড়া না দেন তাহলে তাঁর কোন গুণ কাজে লাগে না। ভগবানের কৃপালুতা হল এই ভক্ত-বাৎসল্য গুণের অংশ বিশেষ। এখন ব্রহ্মা ভগবানের সেই কৃপা প্রার্থনা করছেন।

প্রশ্ন হতে পারে ভগবানের এই কৃপা পাওয়ার অধিকারী কে ? যে যত দীন হীন কাঙ্গাল সে তত কৃপা পাবে। দীন হীন যে কৃপা চাইতে জানে তা নয়। কিন্তু ভগবান তার দীনবন্ধু-নাম সার্থক করবার জন্য দীন দেখলেই তাকে কৃপা করেন। ভগবানের স্বরূপ থেকেই এই ভক্তবাৎসল্য মহাকৃপালুতা গুণগুলি উঠছে এবং এই গুণ থেকে তিনি কখনও বিচ্যুত হন না তাই তাঁর নাম অচ্যুত। কৃপালুতা গুণটিকে ভগবান ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ব্রত বলতে বুঝায় অপতিতভাবে গ্রহণ। ব্রত কখনও ভঙ্গ করা চলে না। ভগবান বলেছেন—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তরাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতৎ ব্রতং মম॥

ভগবান বলেছেন, যে একবারও বলে যে প্রভু আমি তোমার হলাম —তাকে সর্ব্বদা আমি অভয় দান করি। এখানে সর্ব্বদা বলতে ইহকাল এবং পরকাল দুইই বুঝাচ্ছে। তস্মৈ—সম্প্রদানে চতুর্থী দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সত্বত্যাগ করে দান। চিরকালের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অতঃ ক্ষমস্ব—এখানে অতঃ বলতে শ্রীবৈষ্ণব-তোষনীকার বলেছেন—মমাপ্যাতিতুচ্ছত্বাৎ তবাতিমহত্বাচচ ক্ষমস্ব। আমি অতি তুচ্ছ এবং তুমি অতি মহৎ এই বিবেচনা করে আমাকে ক্ষমা কর। রজোভুব—ব্রহ্মা বলছেন—আমার রজোগুণে জন্ম। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ রজঃ শব্দের অর্থটি শ্লেষে ধরেছেন। ধূলির পুত্র অতএব হ্যজানতঃ অর্থাৎ অজ্ঞ। এইটিই রজোগুণের দোষ। রজোগুণই আমার ভগবৎতত্ত্বে অন্ধতা এনেছে। আমি ধনী মানী কুলীন পণ্ডিত—এইটিই রজোগুণের ক্রিয়া। এই রজোগুণে আমার

জন্ম বলে আমার নিজের পৃথক্ ঈশ্বরত্ব অভিমান আছে আমি যে তুমি ছাড়া পৃথক্ ঈশ্বর এ বোধ আমার আছে। আমি আমার স্বতন্ত্র প্রভুত্ব স্থাপন করেছি। নিজের স্বতন্ত্র প্রভুত্ব থাকলে সত্যকার প্রভুকে চেনা যায় না। নাভিপদ্মে অবস্থানের সময়ে ব্রহ্মা তো ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু সে দর্শন খাঁটি দর্শন হয়নি। কারণ দেখলেই দেখা যায় না। স্বরূপের অনুভূতি হলে তবে প্রকৃত দেখা হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে মাতৃদর্শন করলেও সেটি ঠিক মাতৃ-দর্শন নয়। ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু, রজোগুণের প্রভাবে আমি তোমাকে দর্শন করলেও স্বরূপের অনুভূতি না হওয়ায় প্রকৃত দর্শন আমার হয়নি। তাই তোমাকে ঠিক ঠিক দেখা হয়নি। অজা অর্থাৎ মায়ার অবলেপ স্পর্শ আমাতে আছে। মায়ার অর্থাৎ প্রকৃতির স্পর্শ থাকলে চক্ষু অন্ধ হয়। ব্রহ্মা এটি নিজের কথা বললেন বটে কিন্তু নিজের দ্বারা জগৎকে শিক্ষা দিলেন যে মায়ার স্পর্শ চক্ষুকে অন্ধ করে দেয়। তত্ত্বানুভূতি করতে দেয় না। তখন অবস্থা কেমন হয়? মায়া স্বরূপ ভুলিয়ে দেয়। তত্ত্ব সত্য বস্তুকে জানতে দেয় না। মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলে মনে করায়। চতুঃশ্লোকী ভাগবতে ভগবান ব্রহ্মাকে বলেছেন—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথাতমঃ॥ ভাঃ ২।৯।৩৩

যা অবস্তু হয়েও আত্মাতে বস্তুবৎ প্রতীত হয় এবং বস্তু হয়েও আত্মাতে প্রতীত হয় না তাই আমার মায়া বলে জানবে। আকাশের চাঁদ জলে প্রতিবিম্বিত হলে দ্বিচন্দ্র অবস্তু হলেও প্রতিভাত হয়। অর্থাৎ জলে প্রতিবিম্বিত চাঁদ তো চাঁদ নয়—ওটি অবস্তু তবু তাকে চাঁদ বলে মনে হয় আর যেমন তমঃ স্বরূপ রাহু যথার্থ বস্তু হয়েও প্রতিভাত হয় না। রাহুকে দেখা যায় না।

মায়ার দুটি শক্তি—আবরণ শক্তি আর বিক্ষেপ শক্তি। আবরণ শক্তি দিয়ে বস্তুকে আবরণ করে রাখে দেখতে দেয় না এটির তবু

কিছু সত্যতা আছে কিন্তু বিক্ষেপ শক্তির কাজ আরও বিচিত্র। অবস্তু দর্শন করায়। মিথ্যা বস্তু ভোগের ফলে জীব জর্জরিত হয়। ব্রহ্মার এক নাম অজ অর্থাৎ স্বয়ম্ভু জন্মরহিত। অর্থাৎ জন্ম নেই—এই মহিমার জন্যও ব্রহ্মার মনে গর্ব্ব ছিল। তাঁর জন্ম নেই—অযোনিসম্ভবত্ব হেতু গর্ব্ব। চিত্তে গর্ব্বের লেশ থাকলে বস্তু দর্শন হয় না। ব্রহ্মা নিজের চিত্তের গর্ব্ব বুঝতে পেরেছেন। ভগবান যেন বলছেন,—ব্রহ্মন্ তুমি তো আমাকে দয়া করতে বলছ কিন্তু কোন্ পথে আমি দয়া করব? আমাকে তার রাস্তা দেখাও। তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—এষোহনুকম্প্যো ময়ি নাথবানিতি—তুমি এইটিই মনে কর প্রভু, ব্রহ্মা অন্যত্র ঈশ্বর অভিমানী হলেও অর্থাৎ ব্রহ্মার অন্য জায়গায় নিজেকে ঈশ্বর বলে অভিমান থাকলেও ময়ি নাথবান অর্থাৎ আমার সে ভৃত্য। আমি ব্রহ্মার প্রভু এবং ব্রহ্মা আমার ভৃত্য এই মনে করে তুমি আমাকে ক্ষমা কর। প্রভু, আমার প্রতি অনুকম্পা অর্থাৎ দয়া প্রদর্শন কর। আমাকে করুণা কর প্রভু। বাক্য আছে—অনুত্তমকে দয়া কর। অতি পতিতকেই ভগবান দয়া করেন। নীচ ব্যক্তিই কৃপা পাবার অধিকারী। বিষয় সম্পর্ক ঘটলে তত্ত্বের অনুভূতি হয় না। দেবতাদেরও তাই বিষয় সম্পর্কে তত্ত্বের অনুভূতি হয় না। তত্ত্বে তাদের দৃষ্টি থাকে না। বিষয় সম্পর্ক কৃষ্ণ বুঝতে দেয় না। তার দৃষ্টান্ত ইন্দ্র—ইন্দ্র তো ভগবানকে দর্শন করেছেন। কিন্তু তাঁর স্বরূপের অনুভূতি হয় নি। বিষয় সম্পর্ক আছে বলে। ভগবানের কারুণ্যচন্দ্রের উদয়ে জীবের অবলেপ গর্ব্বরূপ তম (অন্ধকার) চিরতরে দূরীভূত হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কৃপা হলে গর্ব্ব চলে যায় কেন? প্রাকৃত গর্ব্ব নষ্ট হলে অপ্রাকৃত গর্ব্বও আসে না। কৃপা হলে তখন তার লোভ জাগে এবং বস্তু না পাওয়ার ফলে চিত্তে ব্যথা জাগে। ব্যথিত চিত্তে গর্ব্বের উদয় হয় না। উদাহরণ হয়ে আছেন শ্রীমতী রাধারাণী এবং গোপরামাগণ। তাঁদের ওপরে ভগবানের যত কৃপা এমন কৃপা তো আর কারও ওপর হয় নি।

রাসস্থলীতে যখন গোপরামাদের কৃষ্ণকে পেয়ে গর্ব্ব অনুভব হল আমরা কৃষ্ণ সঙ্গে বিহার করছি তখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাদের গর্ব্বরোগ দূর করবার জন্য তাদের ত্যাগ করে রাসস্থলী থেকে অন্তর্হিত হলেন। শ্রীশুকদেব বললেন—

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ভাঃ ১০।২৯।৪৮

সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রচুর জলপানও যেমন কিছু নয় তার মনে হয় জল যেন একটুও খাইনি তেমনি যাঁরা কৃষ্ণদর্শনে লোভী তাদের দর্শন করলেও মনে হয় যেন দেখা হয়নি। দেখা হল না। তাঁদের নিত্য নূতন লোভ জাগে এবং পেলাম না পেলাম না—এই খেদে চিত্ত ব্যথিত থাকে স্বরূপের অনুভূতি হলে তবে প্রকৃত দর্শন হয়। ব্রহ্মা বলছেন,—প্রভু তুমিই আমাকে সৃষ্টিকর্তার পদ দান করেছ। তোমার দেওয়া পদে আমি গর্ব্বিত হয়ে থাকি। কিন্তু এটি তুমি স্থির জেনে রাখ যে আমি তোমারই দাস এর বেশী পদমর্য্যাদা আমার নেই। আমি নাথবান অর্থাৎ আমি তোমার দাস অর্থাৎ তোমার অধীন। তোমারই মায়া—সেই মায়ার অধীন। তোমারই মায়া—সেই মায়ার অধীন আমি হয়েছিলাম। মায়া আমাকে অধীন করে এই কাজ করিয়েছে। কিন্তু তুমি এইটি মনে কর—যে তুমি তো মায়ার অধীশ্বর—তুমি মায়াধীশ আমি তোমারই অধীন। এতে আর কোন সন্দেহ নেই। ব্রহ্মার চিত্তে দৈন্য এসেছে তাই অতি বিনীত হয়ে বলছেন,—আমি যে ব্যবহার তোমার সঙ্গে করেছি প্রভু তাতে তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া চলে না। কিন্তু আমি তোমারই একান্ত দাস এই মনে করে তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

শ্রীবালগোপালের কৃপা দৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার অভিমান-ভরা হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে। সকল অহংকার দম্ভ মালিন্য ধুয়ে গিয়ে হৃদয় স্বচ্ছ হয়েছে—তাই অনুতাপানলে চিত্ত দগ্ধ হচ্ছে। অপরাধী ব্যক্তি যদি নিজ কৃত অপরাধ মনে করে এবং তার জন্য অনুতপ্ত হয়

তাহলেও সেই সূত্রে কৃপা পেয়ে যায়। ব্রহ্মা এখন ঠকে শিখেছেন। শ্রীভগবানের মহত্ত্ব, মহানুভবতা, সর্ব্বময় কর্তৃত্ব অনুভব করেছেন এবং সেই সঙ্গে নিজের তুচ্ছাতিতুচ্ছতা বুঝে ভগবানের শ্রীচরণে শরণাগতি নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। শ্রীবালগোপালের চরণে দাসত্ব প্রার্থনা করে বলেছেন—প্রভু, তুমি বিরাট তাই তুমি প্রভু—কারণ বিভুত্বই হল প্রভুত্ব। আর আমি অতি তুচ্ছ অণু পরিমাণ জীব তাই আমি দাস। কারণ অণুত্বই হল দাসত্ব। অণু কখনও প্রভু হতে পারে না আর বিভু কখনও দাস হতে পারে না। তুমি প্রভু আমি দাস। তুমি পিতা আমি পুত্র। আমাকে তোমার ক্ষমা করাই উচিত। কারণ আমি কুপুত্র—আমার অপরাধ করা স্বভাব—স্বভাব তো কেউ ছাড়তে পারে না। আমিও আমার স্বভাব ছাড়তে পারিনি বলে অপরাধ করেছি। কিন্তু তোমার স্বভাব অপরাধ ক্ষমা করা—তাই তুমিই বা তোমার স্বভাব ছাড়বে কেন? তাছাড়া তুমি তো অচ্যুত। তাই তুমি তো তোমার স্বভাব থেকে চ্যুত হবে না। আর কথাও আছে—

কুপুত্র যদ্যপি হয় কুমাতা কখনও নয়।

আমার তুচ্ছতা, অণুত্ব এবং তার পাশাপাশি তোমার মহানুভবতা, তোমার বিভুত্ব, একটু নমুনা দিয়ে বলি—

কাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূসংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্কেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যাবাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥

ভাঃ ১০।১৪।১১

কবি বিদ্যপতি বলেছেন—

গণইতে দোষগুণ লেশ না পাওবি যব তুঁহু করবি বিচার
তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি জগ বাহির নই মুঞিচ্ছার॥

তুমি অশেষ গুণের আকর আর আমি অশেষ দোষের খনি। আমার গুণের লেশও নেই। তোমাতে এবং আমাতে অনেক তফাৎ। এই মহান্ পার্থক্য বুঝাবার জন্য ব্রহ্মা তাঁর এই বাক্যে দুটি 'ক্ক' শব্দ

দিয়েছেন। দুটি 'ক্ক' শব্দ যখন এক জায়গায় প্রয়োগ করা হয় তখন মহৎ-অন্তর অর্থাৎ মহান্ পার্থক্য বুঝায়। ব্রহ্মা বলতে চাইছেন—প্রভু কোথায় তুমি আর কোথায় আমি। প্রথমে তোমার স্বরূপ বলি—তোমার অংশাংশ প্রকৃতির অন্তর্য্যামি পুরুষের প্রতি লোমকূপ-বিবরে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড যুগপৎ ত্রসরেণুর মত যাওয়া আসা করে। ত্রসরেণু বলা হয় জালার্করশ্মি—অর্থাৎ জানালার গরাদের ফাঁকে সূর্য্যকিরণ পড়লে অতি সূক্ষ্ম যে অসংখ্য ধূলিকণার মত দেখা যায় তাকে বলা হয় ত্রসরেণু—এ এত সূক্ষ্ম যে খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না। তোমার অংশাংশের প্রতি লোমকূপে ঐরকম অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত্রসরেণুর মত যাওয়া আসা করে—এ হল তোমার স্বরূপ—ব্রহ্মাই ব্রহ্মসংহিতায় বলেছেন—

যস্যৈকনিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্ম্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি। (ব্রহ্মসংহিতা)

নিজের লোমকূপবিবরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-পতিগণ যাঁর নিঃশ্বাস পরিমিত কাল জীবিত থাকে সেই মহাবিষ্ণুও যাঁর অংশাংশ সেই সর্ব্বকারণ কারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দই আমার ভজনীয়।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা আছে—

পুরুষনাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস। নিঃশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে। শ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ শরীরে।
গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে। পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥

প্রভু, এ হল তোমার স্বরূপ আর এই সঙ্গে আমার তুচ্ছতা, আমার ক্ষুদ্রতাও উল্লেখ করি। আমি প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব,

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই অষ্টাবরণবেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ড-ঘটের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিনহাত পরিমিত নিকৃষ্টদেহধারী এক ক্ষুদ্র জীব মাত্র।

কাজেই প্রভু, তোমার বিরাটত্বের সঙ্গে আমার তুচ্ছতার কোন ধারণাই করা যায় না। তুমি সর্ব্বকারণ কারণ স্বয়ং ভগবান, তোমার বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ, তাঁর চারটি কায়ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। এই দ্বিতীয় কায়ব্যূহ সঙ্কর্ষণের একটি অংশ কারণার্ণবশায়ী যাঁকে প্রথম পুরুষাবতার বলা হয়। এই প্রথম পুরুষাবতারে অংশ হলেন গর্ভোদশায়ী যাঁকে দ্বিতীয় পুরুষাবতার বলা হয়। এই গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারের নাভিকমল থেকে আমার (ব্রহ্মার) জন্ম। সুতরাং আমি মৃদ্‌ভাণ্ডের মত ক্ষণভঙ্গুর এই ব্রহ্মাণ্ডঘটের মধ্যে সামান্য একটি জীব মাত্র। আর এইরকম অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড যাঁর প্রতি লোমকূপে ত্রসরেণুর মত যাওয়া আসা করে তুমি সেই কারণার্ণবশায়ী নারায়ণেরও অংশী-পুরুষ—স্বয়ং ভগবান। তাই আমার মত ক্ষুদ্র জীবের এই দৌর্জন্য মূঢ়তা, অজ্ঞতা তোমার যে দৃষ্টিগোচর হতে পারে এও তো ধারণা করতে পারি না।

প্রভু, তোমারই দেওয়া সৃষ্টিশক্তি পেয়ে তাই দিয়ে এই ব্রহ্মাণ্ডে আমি জীবদেহ তৈরী করি বলে লোকে যারা অজ্ঞ তারা আমাকে বড় বলে করতে পারে। কিন্তু তা নয়। আর আমিও তোমার পাদপদ্মে ভজনে বিমুখ বলে মায়ার বঞ্চনায় নিজেকে বড় বলে মনে করতে পারি কিন্তু এটি মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ আমার নিজের পরিমাণ বুঝলেই সেটি ঠিক ঠিক অনুভব হবে। আমি আমার নিজের হাতের সাড়ে তিনহাত পরিমাণ দেহধারী—কাজেই কত তুচ্ছ এটি অনুভব করতে পেরেছি—এটি তোমারই একান্ত করুণা। কারণ তুচ্ছতায় ক্ষুদ্রতায় মূঢ়তাতেই অভিমান জাগে। যিনি বিরাট, বিভু বিজ্ঞ তাঁর স্বরূপে অভিমান জাগে না। সাড়ে তিন হাত দেহ-

ধারী হয়ে যে নিজেকে বড় বলে মনে করে তার মত ছোট আর কেউ নেই।

আমার আরও মূর্খতা দেখ প্রভু! অগ্নিশিখা কাঠের টুকরো পোড়াতে পারে এই গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়ে যদি অগ্নিপুঞ্জকে দহন করতে যায় তাহলে তার যেমন ধৃষ্টতা—তেমনি আমি তোমারই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে বিসৃষ্টি কাজ করতে পারি বলে তুমি সৃষ্টিকর্তা —তোমাকেই পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম—এত তেমনি অত্যন্ত ধৃষ্টতা। তবে তুমি তো করুণার সাগর তাই ভরসা তুমি আমার মতে অপরাধ ক্ষমা করে আমাকে কৃপা করবে। তোমার করুণা ছাড়া আমার কোন গতি নেই। তোমার শরণাগতি নিলে মায়ার হাত থেকে অনায়াসে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এ তো তোমার কথা দেওয়া আছে। ভগবান গীতা বাক্যে বললেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

গীঃ ৭।১৪

তাই একান্ত প্রার্থনা সেই মায়া কবলিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে আমাকে তোমার দাস করে নাও।

উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য পাদয়োঃ কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে।
কিমস্তি নাস্তি ব্যপদেশভূষিতং তবাস্তি কুক্ষেঃ কিয়দপ্যনন্তঃ॥

১০।১৪।১২

এই শ্লোকে ব্রহ্মার আর্ত্তি প্রকাশ পাচ্ছে। বলছেন—জগতে দুটি বস্তু আছে। সেই দুটি হল—অস্তি এবং নাস্তি। একটি হল আছে আর একটি হল নেই। কিন্তু সেই দুটিই তোমারই কুক্ষিগত। তোমার মধ্যেই সব। তুমি ছাড়া কিছুই নেই। সন্তান যখন মায়ের গর্ভে থাকে এবং গর্ভে পাদপ্রহার করে তখন মা তার অপরাধ গ্রহণ করেন না তো বটেই উপরন্তু আনন্দ পান এই মনে করে যে গর্ভস্থ সন্তান জীবিত আছে। ব্রহ্মা বলছেন—মা যেমন সন্তানকে পাদ প্রহার করলেও অপরাধ গণনা না করে ক্ষমা করেন তেমনি তুমি আমার

গোবৎসহরণকে অপরাধ বলে গণনা না করে ক্ষমা কর। কারণ তুমিও তো জগতের মা। শ্রীগীতাবাক্যে ভগবান বলেছেন—

পিতাহহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ গীঃ ৯।১৭

ভগবান যেন মৌন দৃষ্টিতে বলছেন, ব্রহ্মন্ তুমি তো বলছ এ জগতের যা কিছু সব আমারই কুক্ষিগত অর্থাৎ আমার ভিতরেই আছে। আমি জগতের মাতা। তাহলে জগতের সকলের অর্থাৎ সকল সন্তানের অপরাধ যখন ক্ষমা করব আর তোমার অপরাধও ক্ষমা করব। তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—অন্য সকলের কুক্ষিগতত্ব অর্থাৎ সকলে যে তোমার ভিতরে আছে সে সম্বন্ধ পরম্পরাগত—সে সম্বন্ধ সাক্ষাৎ নয় কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার যে সম্বন্ধ সেটি পরম্পরায় নয়—সে সম্বন্ধ সাক্ষাৎ গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারের নাভি কমল থেকে ব্রহ্মার জন্ম—এ সকলেই জানে। তাই আমার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ সাক্ষাৎ। ভাল হোক মন্দ হোক সবই তোমার কুক্ষিগত। কুপুত্র কি পিতার পুত্র নয়? অসৎ প্রজা কি রাজার প্রজা নয়? তাই তুমি আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর এইটিই প্রার্থনা। ভগবানের একটি নাম অধোক্ষজ। কারণ তিনি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচর হন না। প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। আমাদের প্রাকৃত মন তাঁকে ভাবতে পারে না—প্রাকৃত কাণ তাঁর কথা শুনতে পায়না। প্রাকৃত চোখ তাঁকে দেখতে পায় না—শ্রুতি বলেছেন—তিনি অবাঙ্-মনসোগোচর। আরও বলেছেন—

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ

যেখানে বাক্য মনের সঙ্গে ফিরে আসে তাঁকে জানতে না পেরে। আমাদের দেহ ইন্দ্রিয় সব প্রকৃতি উপাদানে গড়া আর ভগবান হলেন প্রকৃতির অতীত স্বরূপ—অপ্রাকৃত। তাই বিজাতীয় বলে তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন। অক্ষজ বলতে ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানকে বুঝায়। অধঃকৃত হয়েছে ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান যেখানে তিনি হলেন

অধোক্ষজ। সেই অধোক্ষজ ভগবান যে তুমি, তুমি তোমার সন্তানের অপরাধ কি করে গণনা করবে? তাহলে তো সন্তান বাঁচে না। কারণ কথায় আছে—

বাপে যদি শাপে মাধাই তাহলে কি সন্তানে বাঁচে?

বাপ যদি সন্তানকে অভিশাপ দেয় তাহলে তার বাঁচবার কোন পথ নেই। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ব্রহ্মার চিত্ত এইভাবে দীনাতিদীন হওয়ায় দীননাথের কৃপা হয়েছে। কারণ চিত্ত দীন না হওয়া পর্য্যন্ত দীননাথের কৃপা হয় না।

জগত্রয়ান্তোদধিসংপ্লবোদে নারায়ণস্যোদরনাভিনালাৎ।
বিনির্গতোঽজস্তিবতি বাঙ্ ন বৈ মৃষা কিং ত্বীশ্বর ত্বন্ন
বিনির্গতোঽস্মি॥ ১০।১৪।১৩

ব্রহ্মা বলছেন—ভগবান তাঁকে কেন ক্ষমা করবেন—তার যুক্তি দেখাচ্ছেন। প্রভু, তুমিই আমার পিতা—পিতার পুত্রকে ক্ষমা করাই শোভন। পিতা পুত্রকে ক্ষমা না করে পারে না—তাই বলি তুমি আমাকে ক্ষমা কর। এখন যদি বল, আমি তোমার পিতা হই—এ কথা তুমি কি করে বল? তার উত্তরে বলি—মহাপ্রলয়কালে যখন ত্রিজগতের অন্ত হয়—সাগরগণের তখন পরস্পর সম্মেলন হয় তখন নারায়ণ জলে শয়ন করেন। সেই সময়ে জলশায়ী নারায়ণের উদর হতে তাঁর নাভিদেশ থেকে এক পদ্মনাল প্রকাশ পায় আর সেই নাভিনাল থেকে অজ অর্থাৎ ব্রহ্মা বিনির্গত হন—এই যে বাক্য প্রচলিত আছে তা তো মিথ্যা নয়। কারণ আমি কি তোমা থেকে উৎপন্ন হই নি? তোমার থেকেই আমার উদ্ভব হয়েছে।

ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবন্ করুণাময়—অত্যন্ত কৃপা করেই তুমি আমার পিতা হয়েছ। আমার এইটিই গর্ব্ব যে আমি নারায়ণের পুত্র। উদ্ধর্ব মধ্য এবং অন্ত এই ত্রিভুবনের প্রলয়কালে যখন সমস্ত সাগর একাকার হয়ে যায় যাকে উদধিসংপ্লব বলেছেন অর্থাৎ একার্ণবী-কৃত হয় তখন তার নাল অর্থাৎ কমলদণ্ড তার দ্বারা কমলকেই

বুঝাচ্ছে। বলা আছে নলিনে তু নালং মতমিতি বিশ্বকোযান্নালং কমলম্। গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারের নাভিপদ্মে যে আমার জন্ম এ কথা তো মিথ্যা নয়। ব্রহ্মা বললেন—অহং বিনির্গতঃ এখানে 'বি' উপসর্গের সার্থকতা কি? গোস্বামিপাদ বলেছেন—তস্মাৎ তুশব্দেনান্যতো বিশেষং বোধয়তি বিনাপি মাতৃব্যবধান-মুৎপন্নত্বাৎ। অতএব বিশব্দশ্চ অতএব নির্গত ইতি চিরমুদরান্তঃ-স্থিতিঃ সূচিতা। হে ঈশ্বরেতি পুনর্ভগবতি পিতৃদৃষ্টিমযোগ্যাং মত্বা। ব্রহ্মার মাতা নেই। শুধু পিতা। ব্রহ্মা বলছেন—লোকে আমাকে অজ বলে বটে কিন্তু সেটি নামে ধর্মদাসের মত। যে দ্বিতীয় পুরুষাবতার হতে আমি নির্গত হয়েছি তিনি তো তোমা হতে ভিন্ন নন। অংশ অংশী অভেদে তুমি ও তিনি অভিন্ন। তিনি অংশ আর তুমি হলে অংশী। যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী যন্নাভ্যজং লোকসংঘাতনালম্। লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতু স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

তাহলে দেখা যাচ্ছে গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার স্বয়ং ভগবানের অংশ এবং অংশাংশিরূপে উভয়ে অভিন্ন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বললেন—

কৃষ্ণ কহেন—ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন।
আমি গোপ তুমি কৈছে আমার নন্দন?

ব্রহ্মা যে ভগবানকে বললেন তুমি আমার পিতা—তাই আমাকে পুত্র বলে ক্ষমা কর। এই কথা শুনে কৃষ্ণ বলছেন—ব্রহ্মান্—তোমার পিতা তো নারায়ণ। আমি তো গোপজাতি সুতরাং তুমি আমার পুত্র হবে কি করে? তার উত্তরে ব্রহ্মার পরবর্ত্তী মন্ত্র—স্তুতিবাক্য—

নারায়ণস্তবং নহি সর্ব্বদেহিনামাত্মাস্যধীশাখিলুলোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়নাৎ তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া।

১০।১৪।১৪

ব্রহ্মার এই মন্ত্রটি কাকু অর্থে নিতে হবে—অর্থাৎ ব্রহ্মা বলতে

চাইছেন—আমি নারায়ণের নাভিকমলে জন্মেছি বলে প্রভু তুমি যে বলছ আমি নারায়ণের পুত্র কাজেই তোমার পুত্র নই তাই বলছি—তুমি কি নারায়ণ নও ? তুমিই তো নারায়ণ।

'নার' শব্দে কহে সর্ব্ব জীবের নিচয়।
'অয়ন' শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়॥
অতএব তুমি হও মূল নারায়ণ।
এই এক হেতু শুন দ্বিতীয় কারণ॥

জীবসমূহ আশ্রয় যাঁর। ভগবানের পুরুষ নামও এইভাবে হয়েছে। পুর্ষু শেতে যঃ সঃ পুরুষ। জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে ভগবানের স্থান। তাই জীব ভগবানের স্থান। তাই জীব ভগবানের আশ্রয়। অধীশ শব্দের অর্থ প্রবর্ত্তক। জীবের প্রবৃত্তি যাহা হতে তিনি হলেন জীবের অধীশ। যার নিঃশবাস থেকে জীবের নিঃশবাস। ভগবানের ধামে তাঁর নিত্য লীলা আছে বলেই এ জগতে তার ছায়া মায়িক ক্রিয়া দেখা যায়। কারণ সেখানে কায়া আর এখানে ছায়া। ঈশ্বরই সকল জীবের শুভাশুভ প্রবৃত্তি ঘটান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বললেন—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ গীঃ ১৮।৬১

জীবের সমুদয় চেষ্টা ঈশ্বরেরই দেওয়া প্রবৃত্তির ফলে। প্রবৃত্তি তাঁর দেওয়া বটে কিন্তু এই শুভ এবং অশুভ প্রবৃত্তির যে বীজ তা জীবের অন্তরেই অনাদিকাল হতে বর্ত্তমান। ভগবান সুবৃষ্টিদানের মত পর্জন্যবৎ জীবের সেই কর্মবীজকে অঙ্কুরিত করতে সহায়তা করেন মাত্র তাই শুভ এবং অশুভ কর্মজনিত ফলের তারতম্যের জন্য ভগবান দায়ী হন না। সেজন্য জীবই দায়ী। যেমন আম নিম তেঁতুল—এই তিনটি ফলের আস্বাদনের তারতম্যের জন্য বৃষ্টিকে দায়ী করা চলে না। তার জন্য নিজ নিজ বীজই দায়ী। আম মিষ্টি, নিম তেতো আর তেঁতুল টক। এখানেও সেইরকম।

জীব নিজের আসক্তি সেখানে লাগিয়েছে। তাই বন্ধন জীবেরই ঘটে—ভগবানে সে ফল যায় না। ফল ভগবানে যেত কারণ প্রবৃত্তি তো তাঁরই দেওয়া কিন্তু ভগবানে ফল পেঁছুবার আগেই মাঝপথে জীবের আসক্তি বাধা দেয় এবং সেই বাধার ফলে ফল আর ভগবানে পেঁছুতে পারে না। আসক্তি যার তারই বন্ধন ঘটে। ভগবান বলেছেন—

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভি র্ন স বধ্যতে॥ গীঃ ৪।১৪

ভগবান কখনও কর্ম স্পর্শ করেন না। জীবের নিজ নিজ স্পৃহার জন্যই বন্ধন ঘটে। তা না হলে শুদ্ধ জীবাত্মা তো ভগবানের চিৎ অংশ। তার বন্ধন ঘটবে কেন। স্পৃহা অর্থাৎ আসক্তিই বন্ধন ঘটায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে পুরঞ্জন উপাখ্যান উদাহরণ রূপে তুলে ধরেছেন। দেবর্ষিপাদ নারদ প্রাচীনবর্হিষ রাজাকে উপদেশ দান করে বলেছেন—

প্রাণেন্দ্রিয়মনোধর্মানাত্মন্যধ্যস্য নির্গুণে।
শেতে কামলবান্ ধ্যায়ন্ মমাহমিতি কর্মকৃৎ॥ ভাঃ ৪।২৯।২২

আত্মা পরোঽপি ত্রিগুণং মনুতে। ভগবৎ বিস্মৃতি মূলে জীবের আছে যার ফলে মায়া জীবকে আক্রমণ করেছে। এই অবিদ্যারই ফল দেহ ইন্দ্রিয় মন জীব গ্রহণ করেছে। জীবাত্মার জ্ঞানটুকু নিয়ে সে পৃথিবীতে এসেছে কিন্তু তার আশ্রয় হয়েছে এই পর্ণকুটির রূপ দেহ। তাই তাকে রোদে পুড়তে হয়, জলে ভিজতে হয় সর্ব্বদা ত্রাহি ত্রাহি ডাক। অনেকে অজ্ঞানতার বশে বলে আত্মার চাহিদা আত্মাকে দাও। আত্মাকে কষ্ট দিয়ে ধর্ম হয় না। কিন্তু আত্মা যে প্রকৃত পক্ষে কি চায় তা তো জীব জানে না। অবিদ্যা বশে দেহ, ইন্দ্রিয় মন প্রাণের ধর্ম আত্মাতে আরোপ করে এবং তাদের চাওয়াকেই আত্মার চাওয়া বলে মনে করে। এটি হল ভূতের চাওয়া। অবিদ্যা বশে অবিদ্যা ও আত্মা এক হয়ে গেছে। তাই ভূতের চাওয়া বলে বুঝা যায় না।

আত্মার চাওয়া বলেই ভুল হয়। মায়া ছাড়লে বুঝা যাবে আত্মা কি চায়। মায়া যাদের ছেড়েছে তাদের উক্তিতে বুঝা যাবে। দেহকে জীবাত্মা আমি বলে গ্রহণ করেছে এবং মন প্রাণ ইন্দ্রিয়কে আমার বলে গ্রহণ করেছে। প্রাণ মন ইন্দ্রিয়ের ধর্ম আত্মাতে আরোপ করা হয়। প্রাণের ধর্ম ক্ষুধা পিপাসা, ইন্দ্রিয়ের ধর্ম অন্ধতা, বধিরতা খঞ্জতা। আর মনের ধর্ম ভয় কাম ক্রোধ শোক মোহ প্রভৃতি।

আরও বললেন—

যথাত্মানমবিজ্ঞায় ভগবন্তং পরং গুরুম্।

পুরুষস্তু বিসজ্জেত গুণেষু প্রকৃতেঃ স্বদৃক্॥ ভাঃ ৪।২৯।২৬

ত্রিবিধ তাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক তাপ হল মনের আধি এবং শরীরের ব্যাধি। ঔষধ দ্বারা শরীরের বাইরের ব্যাধির কিছু উপশম হলেও কামনা প্রভৃতি দ্বারা মানসিক তাপের (আধি) কোন উপশম হয় না। ব্যাধির প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকলেও আধির প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা নেই।

দেবর্ষিপাদ নারদ বলেছেন—

যথা হি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্।

তৎ স্কন্ধেন সমাধত্তে তথা সর্ব্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ॥ ভাঃ ৪।২৯।৩০

গুরুভার মাথায় বইতে বইতে মাথা ব্যথা করছে বোঝাটি কাঁধে নামালে মাথা হাল্কা হল বটে কিন্তু কাঁধটা আবার ব্যথা করবে। জায়গার পরিবর্তন হল বটে কিন্তু ব্যথা কমল না। তাই মাথার ভার কাঁধে নামালে প্রতিকারের ব্যবস্থা হয় না—দুঃখ মেটে না। দুঃখ মিটবে যদি বোঝাটা ফেলে দিতে পারা যায়। কিন্তু তা তো মানুষ পারে না। তেমনি আসক্তি বোঝা ফেলে না দেওয়া পর্য্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তির কোন পথ নেই। আসক্তি ছাড়লে তবে ভার যাবে। সংসারের ভার বহনেও ঠিক সেইরূপ অবস্থা। আসক্তি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তা কমানোর কোন প্রতিকার নেই। আমরা যাকে প্রতিকার বলি সেটি আসল প্রতিকার নয়। প্রতিকারের একমাত্র উপায় ভাগবতধর্ম যাজন।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ সমাহিতঃ।

সধ্রীচীবেন বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ জনয়িষ্যতি॥ ভাঃ ৪।২০।১৪

ভগবানে ভক্তি হলেই বিষয়ে বৈরাগ্য এবং জ্ঞান অনায়াসে হবে। ভগবান গীতাবাক্যেও বলেছেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গীঃ ৭।১৪

আমার পাদপদ্মে একান্ত শরণাগতি হলেই মায়ার হাত হতে অনায়াসে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

টাকার পুঁটলি ফেলে দিলে যেমন করে ভার কমে তেমনি জীবের কর্মের পুঁটলি ফেলে দিতে পারলে তবে তাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। ভগবানে ভক্তিযোগ বিধান হলে তার কোন চিন্তা নেই। অচ্যুতের কথাকে আশ্রয় করেছে যারা সেইসব সাধুমুখে যদি ভগবানের চরিত্রগাথা গাঢ় কানের দ্বারা শ্রবণ করা যায় তাহলে সে ক্ষুধা, পিপাসা, ভয়, শোক মোহ সবই জয় করতে পারে। গাঢ় কান বলতে বলা হয়েছে যে কানে অন্য কোন কথা শুনবার বাসনা নেই। আসক্তি যদি ভগবানে সমর্পিত হয় তাহলে সে সমর্পিত আত্মা। এই সমর্পিত আত্মার কোন দায় নেই। ভগবান নিজে তার সকল ভার গ্রহণ করেন। জীব তার আসক্তিরূপ জিহ্বা বিষয়ে লাগিয়ে বন্ধনে পড়েছে। ভগবান বললেন—

মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। গীঃ ১০।৮

ভগবানেরই দেওয়া সব প্রবৃত্তি হলেও বন্ধন ভগবানের নয়, বন্ধন হল জীবের। কারণ আসক্তি তো জীবের। তিনি হলেন সর্ব্বদ্রষ্টা। ব্রহ্মা বলছেন—জলশায়ী যে নারায়ণ তিনি তোমার অঙ্গস্বরূপ। এখন ভগবানের প্রশ্ন হতে পারে, ব্রহ্মন্ জল তো পরিচ্ছিন্ন সুতরাং জলশায়ী নারায়ণই বা অপরিচ্ছিন্ন হবেন কি করে? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু, জলের যে পরিচ্ছিন্নতা তা সত্য নয়। সেটি তোমার মায়া। জল বস্তুত অপরিচ্ছিন্ন, অতএব জলশায়ী নারায়ণ তিনিও অপরিচ্ছিন্ন।

'নারায়ণস্ত্বং হি সর্ব্বদেহিনাম্'—এই শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীবাল-গোপালের প্রতি যা বললেন তাতে বুঝা গেল ব্রহ্মার নিজেকে নারায়ণের পুত্র বলে অভিমান আছে। ব্রহ্মা বললেন, প্রভু তুমি অধীশ অর্থাৎ সকলের প্রবৃত্তির প্রেরক অর্থাৎ প্রবর্ত্তক আবার তুমি অখিল-লোকসাক্ষী। গীতাবাক্যে ভগবান বললেন—আমাকে কর্ত্তা এবং অকর্ত্তা দুইই বলে জানবে। জীবের কর্মজীবের আসক্তির জন্য জীবেরই বন্ধন। ভগবানের বন্ধন হয় না। জীবের আসক্তি বলতে ফল পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকেই বুঝায়। ফলাকাঙ্ক্ষার নামই আসক্তি।

কর্ম মোটামুটি দু'রকম। সনিমিত্ত কর্ম এবং অনিমিত্ত কর্ম। সনিমিত্ত কর্মের ফলে বন্ধন হয়। যেমন শিশু যদি টাকায় হাত দেয় তাহলে সেটি হল অনিমিত্ত। সেজন্য তার কোন শাস্তি হবে না। কিন্তু কোন জ্ঞানবান লোক যদি টাকা নেয় তাহলে তাকে চুরির অপরাধে অপরাধী করা হবে। জীবের অনাদিকালের শুভা-শুভ কর্মবীজের উপর কৃষ্ণের পর্জন্যবৎ প্রবৃত্তির প্রেরণা বর্ষিত হয় এবং সেই বীজ হতে অঙ্কুর জন্মানোতে সহায়তা করে। এখন এই বীজই যেমন ফলাফলের জন্য দায়ী তেমনি জীবের নিজস্ব কর্মবীজই তার বন্ধনের জন্য দায়ী। কৃষ্ণ দায়ী হবেন না। তাই কৃষ্ণকে জানলে অর্থাৎ ভগবানকে জানলেই একমাত্র এ কর্ম বন্ধনের ক্ষয় হবে। তাঁকে জানলে তবে অমৃতত্ব লাভ হবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বললেন—

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।

তাঁকে জানা ছাড়া মায়া তরণের অর্থাৎ জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করা অর্থাৎ মুক্তিলাভের অন্য কোনও পথ নেই। যেমন আলো জ্বালা ছাড়া অন্ধকার দূর করার কোন উপায় নেই।

মহাপ্রলয়কালে প্রথম পুরুষাবতার কারণার্ণবশায়ীর বিগ্রহে অনন্তকোটি জীবনিচয় নিজ নিজ কর্মফল নিয়ে বিশ্রাম লাভ করে। জীবসমূহ বিগ্রহ অঙ্গে স্থান পেলেও বিগ্রহের অনুভূতি তার হয় না।

কারণ সামনে দাঁড়ালেই অনুভূতি হয় না। ভগবানকে সামনে দেখলেও তাঁকে অনুভব হবে না—ব্রহ্মা নিজে তার দৃষ্টান্ত। একমাত্র ভজনে এবং তার সঙ্গে ভগাবানের কৃপা হলে অনুভব হয়। এই অনুভব হওয়ার নামই ভগবানকে পাওয়া। জলসত্রে যখন যাত্রীরা সমাগত হয় তখন তাদের নিজ নিজ পুঁটলি ছাড়া অন্য কোনদিকে দৃষ্টি থাকে না। যখন কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতারে শ্রীবিগ্রহে জীবনিচয় লীন হয়ে থাকে তখন তাদের চেতনার বিকাশ হয়নি। যার জ্ঞান বিকশিত হয়েছে বুঝতে হবে তার ভজনের বয়স হয়েছে। তখন তার উপলব্ধি হবে। কিন্তু অবিকশিত জ্ঞানের উপলব্ধি হবে না। জীবের দেহে তো কত চেতন কৃমি কীট থাকে কিন্তু তারা তো জীবের রসিকতা বা অন্যান্য স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। কোন কর্মক্ষম ব্যাক্তিকে ঘরে চাবি বন্ধ করে রাখা হয়েছে—চাবি খুলে দিলে সে কাজ করতে পারে কিন্তু চাবি বন্ধ অবস্থায় যেমন তার পক্ষে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না তেমনি প্রথম পুরুষাবতারের শ্রীবিগ্রহে জীব লীন হয়ে আছে সে চাবি বন্ধ হয়ে আছে। তাকে সৃষ্টি করলে সে কাজ করতে পারে। এখন চাবি খুলে দেওয়া তো দয়াময়ের ইচ্ছা। ঈশ্বরের করুণাতেই জীবের সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট হয়ে দেহ ইন্দ্রিয় পেয়ে শাস্ত্রের উপদেশে তবে গৌর গোবিন্দ বলতে পারে। জীবের সৃষ্টিই ভগবানের এক করুণা। এ জগতে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ যেমন নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী বাসা করে এবং তাতে আশ্রয় নেয় জীবও তেমনি সৃষ্ট হয়ে নিজের কর্ম অনুযায়ী আবার দেহকে আশ্রয় করে। জীবের কর্মবীজকে অংকুরিত করার শক্তি কেবল দান করেন ভগবান। প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন কর্মবীজের জন্য জীব নিজে দায়ী। মেঘ করুণা করে বীজের ওপর বর্ষণ করে—কারণ মেঘের নিজের কোন প্রয়োজন নেই। কামারকে দিয়ে ছুরি গড়িয়ে লোককে হত্যা করলে সে হত্যাজনিত পাপ কামারকে স্পর্শ করে না। অগ্নিতে প্রবেশ করান হয় গঠনের জন্য। কিন্তু ছুরি কাঁচি কোনটি

তৈরী হবে তার জন্য অগ্নি দায়ী হয় না। তেমনি ভগবান ও অগ্নির মত গঠন কাজ করেন মাত্র কিন্তু কোন জীব কি রকম তৈরী হবে সেজন্য ভগবান দায়ী হন না। ব্রহ্মা বলছেন—নারম্ অয়সে। নারম্ শব্দের অর্থ হল জল। অয়সে অর্থাৎ পশ্যাসি—জলশায়ী নারায়ণ তোমার অঙ্গ।

এখন ভগবান বলছেন,—হে ব্রহ্মন্, জল তো পরিচ্ছিন্ন তাহলে আমিও তো পরিচ্ছিন্ন হব। ব্রহ্মা বলছেন,—না প্রভু জল পরিচ্ছিন্ন নয় তবে যে পরিচিছন্নের মত দেখায় ওটিও তোমার মায়া। গোস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করেছেন—তব এব রূপম্। নরভূজলায়নাৎ নর অর্থাৎ পরমাত্মা তার থেকে জন্ম যার সে হল জল। সেই জল হয়েছে অয়ন যার—অতএব এই জলশায়িত্ব হল নারায়ণের উপাধি। এই উপাধিযুক্ত হয়ে তার নাম হয়েছে নারায়ণ। এ জগতের উপাধি অসত্য কিন্তু নারায়ণের যে উপাধি তা অসত্য নয়—সে উপাধিও সত্য। এটি মায়া নয়। নারায়ণ অঙ্গ যেমন সত্য—তার জলও তেমনি সত্য। ভগবান যেমন নিত্য তাঁর পরিকর লীলা সব নিত্যস্বরূপ পরিকর হলেন লীলার উপকরণ। পরিকর ছাড়া তো লীলা হবে না। জীব বিন্দুভোগ করে তাতেই তার হৃদয় ভরে উপছে পড়ে। সিন্ধু ভোগ করতে পারল না বলে তার কোন আক্ষেপ হয় না। কারণার্ণবের জল চিৎ কাজেই তাতে মায়িকতা দোষ থাকতেই পারে না। আর মায়িকতা না থাকলে সেটি পরিচিছন্নও হতে পারে না। তাই নারায়ণ তো অপরিচিছন্ন বটেই তার জলও অপরিচ্ছিন্ন। নারায়ণের চেয়ে যে কৃষ্ণের মহিমা অনেক বেশী এটি ব্রহ্মা এখন ভাল করেই বুঝেছেন। ব্রহ্মা এটি ঠেকে শিখেছেন। সেই কৃষ্ণকে ব্রহ্মা নারায়ণ বলে উল্লেখ করলেন। 'নারায়ণস্ত্বং নহি'—এখানে আর 'নহি' পদে কাকু নেই। ব্রহ্মা বলতে চাইছেন—প্রভু, তুমি শুধু নারায়ণ নও—তুমি নারায়ণের চেয়ে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। তুমি অধীশ অর্থাৎ ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। ঈশানামপি ঈশ। তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষী অর্থাৎ দ্রষ্টা।

অন্যান্য নারায়ণ এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর কিন্তু কৃষ্ণ সকল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। ব্রহ্মা বলছেন—জলশায়ী যে নারায়ণ তিনি তোমার অঙ্গ আর তুমি হলে অঙ্গী। অঙ্গ বলতে এখানে অংশকে বঝাচেছ।

শ্রীএকাদশে বলা হয়েছে—

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ॥

ভাঃ ১১।৪।৩

নিজের সৃষ্ট পঞ্চভূত দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরী তৈরী করে অংশরূপে তাতে প্রবেশ করে আদিদেব নারায়ণ পুরুষ সংজ্ঞা ধারণ করেছেন।

কৃষ্ণের অংশ হলেন নারায়ণ—এই নারায়ণের চারটি কায়ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। এই সঙ্কর্ষণের অংশ কারণার্ণবশায়ী—ইনিই প্রথম পুরুষাবতার—ইনি প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। যার ফলে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। এইরকম অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতারের অংশ প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করে দেখেন পূর্ব্বকালীন মহাপ্রলয়ের গাঢ় অন্ধকারে সে ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছন্ন। তখন প্রথম পুরুষাবতারের অংশ যাঁকে গর্ভোদশায়ী বা দ্বিতীয় পুরুষাবতার বলা হয় তিনি সেই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করে নিজের চিৎ অঙ্গকান্তিচ্ছটা দিয়ে সে অন্ধকার গ্রাস করে নিজের অঙ্গের ঘর্মজলে সেই ডিম্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেকটি পূরণ করে তাতে শয়ন করলেন। তাঁর নাভিদেশ থেকে এক পদ্মনাল প্রকাশ পায়—সেই নালে তেরটি ভুবন প্রকাশিত হয় আর ঐ নালের অগ্রভাগে এক প্রস্ফুটিত কমল—সেইটিই ব্রহ্মার জন্মস্থান—তাই ব্রহ্মার একটি নাম পদ্মযোনি। কাজেই দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মার পিতা যে গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার তিনি হলেন কৃষ্ণের অংশ। কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর অংশাংশী সম্বন্ধ। অংশ এবং

অংশী অভিন্ন। সেইজন্য কৃষ্ণও ব্রহ্মার উৎপত্তিস্থল হলেন। কৃষ্ণও ব্রহ্মার পিতা। শ্রীগীতাবাক্যে ভগবানের বলা আছে—মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে॥

ভগবান আরও বলেছেন—

ময়াঽধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। গী ৯।১০

প্রকৃতিই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে কিন্তু কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতারের ঈক্ষণ রূপ অনুমতিকে অপেক্ষা করে। সন্নিধিমাত্রম-পেক্ষতে। গন্ধদ্রব্যের উপস্থিতি মাত্রই যেমন নাসিকা ক্ষুব্ধ হয় তেমনি কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষাবতারের সন্নিধিমাত্রেই প্রকৃতি ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী হয়। শ্রীবলদেব বলেছেন—চুম্বক সান্নিধ্যে যেমন লৌহের চেষ্টা দেখা যায়—তদ্বৎ। ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হলেও আসলে তিনি সৃষ্টি কর্ত্তা নন তিনি বিসৃষ্টিকর্ত্তা। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে দশটি পদার্থের কথা বলা আছে—সর্গ, বিসর্গ স্থান পোষণ উতি নিরোধ মুক্তি, ঈশানুকথা আশ্রয় প্রভৃতি। এর মধ্যে প্রথম থেকে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত নয়টি পদার্থ বলা হয়েছে যারা আশ্রিত আর দশমস্কন্ধে আশ্রয়তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যিনি আশ্রয়তত্ত্ব—যাঁকে অশ্রিয় করে সকল আশ্রিত থাকে তাঁর কথা বলা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সকল আশ্রিতের আশ্রয়। তাঁকে বলা হয় আশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহ। বিসর্গ বলতে বিসৃষ্টি বুঝায়। উপাদান তৈরী করা আছে পঞ্চমহাভূত—তাই দিয়ে ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড তৈরী করলেন। পঞ্চমহাভূত ব্রহ্মা তৈরী করতে পারেন না। যেমন মাটি আছে তাই দিয়ে কুম্ভকার ঘট সড়া হাঁড়ি কলসী তৈরী করে। কুম্ভকার মাটি তৈরী করতে পারে না ঘট তৈরী করে। ব্রহ্মাও তেমনি ব্রহ্মাণ্ড ঘট তৈরী করেন—তাই তাঁকে বলা হয় বিসৃষ্টি কর্ত্তা।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সকল আশ্রিতের আশ্রয়—তিনিই অভয় শরণ। তাই তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় নেবে কে? যার যাতনার বোধ হয়েছে। ত্রিতাপ জ্বালায় সকলেই অহরহঃ জ্বলছে। কিন্তু যার জ্বালার বোধ

হয়েছে—আচার্য্য শংকর উদাহরণ দিলেন দীপ্তশিখা ব্যক্তিবির। মাথায় যার আগুন ধরে গেছে সে যেমন জলে ঝাঁপিয়ে পড়বেই তেমনি যে ব্যক্তি মায়ার তাপে জর্জ্জরিত মূর্চ্ছিতপ্রায় সে সমিৎপাণি হয়ে বিনীত হয়ে শ্রোত্রিয় অর্থাৎ ভগবদনুভূতি সম্পন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণ নেবে। আমার নিজের তো এ জ্বালার বোধ নেই তাই প্রতিকারের চেষ্টাও নেই। সমুদ্রের মাছ যেমন চন্দ্রকে (সমুদ্র থেকে উঠেছে বলে) নিজেদেরই একজন বলে মনে করে কিন্তু সেটি যেমন ঠিক নয় তেমনি কৃষ্ণ যদুবংশে জন্মেছেন বলে তিনি যদুবংশের অন্যান্য সকলের মত—এটি মনে করা ঠিক হবে না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে এই জ্বালার বোধ হবে কার? শাস্ত্র উত্তর দিয়েছেন—'যদা হি মহাপুরুষ পুরুষ প্রসঙ্গঃ। মহাপুরুষের কৃপা ছাড়া শ্রীগুরুকৃপা ছাড়া এ জ্বালার বোধ হয় না। মূর্চ্ছা তো জীবের ভাঙতেই চায় না। বিষয় খেলা সংসার খেলা ভাঙতে চায় না অথচ আয়ুবেলা তো দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যায়। তাই কবির কথা আছে—বেলা যে চলে ষায় খেলা যে ভাঙে না হায়।

জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মে কে অধিকারী এই নিয়ে শ্রীএকাদশে বিচার করা হয়েছে। নির্ব্বিণ্ণ চিত্ত যাদের তাদেরই জ্ঞানযোগে অধিকার, প্রাকৃত সুখ সম্বন্ধে যারা সম্পূর্ণ নিঃস্পৃহ তাদেরই নির্ব্বিণ্ণচিত্ত বলা হয়। প্রাকৃত সুখ বলতে এ জগতের ক্ষুদ্র সুখ থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মার পদ পর্য্যন্ত বুঝায়। এই সুখৈশ্বর্য্যে যে বীতস্পৃহভাব তা মর্কটবৈরাগ্য বা শ্মশান-বৈরাগ্য হলে হবে না। খাঁটি অরুচি হওয়া চাই। কর্মযোগ করবে তারা যারা বিষয়ে অত্যন্ত আসক্ত। তারা নানারূপ ফলকামনায় কর্ম্মে লিপ্ত হয়। কিন্তু ভক্তিযোগে কারা অধিকারী—ভগবান উদ্ধবজীকে বললেন—ন নির্ব্বিণ্ণঃ নাতিসক্তঃ। যারা নির্ব্বিণ্ণ অর্থাৎ বৈরাগ্যবানও নয় আবার অত্যন্ত আসক্তও নয়। অত্যন্ত অনাসক্তও নয় আবার অত্যন্ত আসক্তিও নেই। জগতের বিষয় যে কুৎসিত তা মনে প্রাণে বুঝেছে। বুঝেও যারা বিষয় ছাড়তে

পারে না তারাই ভক্তির অধিকারী। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এখানে প্রশ্ন তুলেছেন তাহলে উত্তম কক্ষা হল জ্ঞানযোগ কনিষ্ঠ কক্ষা হল কর্মযোগ আর মধ্যম অবস্থায় দাঁড়ালেন ভক্তিমহারাণী—এইটিই কি ঠিক সিদ্ধান্ত ? তখন এই অধিকারের হেতু নিয়ে বিচার করা হয়েছে। প্রথমে কর্মযোগে—নিষ্কাম কর্ম করে চিত্তশুদ্ধ হয়েছে এবং শুদ্ধচিত্ত হয়ে বিষয়ে বৈরাগ্যবান হয়েছে। নিষ্কাম কর্ম করে চিত্তশুদ্ধিই তাহলে জ্ঞানযোগের হেতু। আর কর্মযোগীর যে কর্মে আসক্তি সেটির কারণ হল অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞতা কিন্তু ভক্তিযোগে যারা অধিকারী তাদের এর কোনটিই কারণ নয়। নিষ্কাম কর্মজনিত চিত্তশুদ্ধি যদি কারণ হত তাহলে তো জ্ঞানযোগী হত আর অবিদ্যা যদি কারণ হত তাহলে কর্মযোগী হত। কিন্তু ভক্তিযোগকে যারা আশ্রয় করেছে তাদের এ দুটির কোনটিই কারণ নয়। জ্ঞান বা কর্মযোগ হেতুকে অপেক্ষা করে—অর্থাৎ কারণ থাকলে তবে জ্ঞান বা কর্মযোগে অধিকারী হবে। জ্ঞানযোগীর কারণ নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য আর কর্মযোগীর পক্ষে হেতু হল অবিদ্যা। কিন্তু ভক্তি-যোগকে যারা আশ্রয় করেছে তাদের পক্ষে বৈরাগ্য বা অবিদ্যা কোনটিই কারণ নয়। তাদের একমাত্র কারণ হল মহৎকৃপা। ভক্তি হল মহৎকৃপালভ্য। মহৎকৃপা ছাড়া ভক্তিপথ অবলম্বনের অন্য কোন কারণ হতে পারে না। এইটিই ভক্তি যোগের অবস্থা। এখন প্রশ্ন হতে পারে নির্ব্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্যের ওপর যদি ভক্তির স্থান হত তাহলে আপত্তি কি ছিল। কিন্তু ভক্তির জন্ম তো দৈন্যে। দৈন্য না থাকলে ভক্তি সেখানে থাকেন না। নির্ব্বেদ বা বৈরাগ্য হলে সেখানে গর্ব্ব থাকবে। কাজেই সেখানে তো দৈন্য থাকবে না। দৈন্য না থাকলে তো ভক্তি থাকতে পারে না। ভক্তি তো গর্ব্বের গন্ধ সহ্য করতে পারে না। কাজেই যদিও ভক্তির স্থান মধ্যম বলে মনে হয়েছিল এর পিছনে মহৎকৃপা হেতু থাকায় ভক্তির স্থান উত্তমই হবে—মধ্যম হবে না। কারণ কোন কর্মজনিত

হেতু থেকে ভক্তির জন্ম নয়। এইজন্যই ভক্তিকে নৈষ্কর্ম বলা হয়।

এই ভক্তিযোগই হল মানুষের জীবনে আত্যন্তিক ক্ষেম বা আত্যন্তিক কল্যাণ—এরই অপর নাম ভাগবতধর্ম। আত্যন্তিক ক্ষেম বা মঙ্গল বলতে বুঝায় যে মঙ্গল এলে আর হারাতে হয় না। প্রথম যোগীন্দ্র শ্রীকবিও মন্তব্য করেছেন—অচ্যুতের পাদপদ্ম উপাসনা ছাড়া মানুষের আত্যন্তিক মঙ্গল হয় না। আর এই মঙ্গল লাভ হলে তার আর কোথাও থেকে ভয় বলে কিছু থাকবে না। জীবনে অকুতোশ্চিৎভয় হওয়ার এই একটাই উপায়। অনাত্মাতে আত্মভাবনার নামই অসদাত্মভাবনা। অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ আমি বুদ্ধি এবং দেহসম্বন্ধী যা কিছু গৃহ, কুটুম্ব, পরিজন এ সকলে আমার বুদ্ধি এইটিই অসৎ ভাবনা। যেগুলিকে আমার নয় বলে জানি বুঝি অথচ আমার নয় বলে ভাবতে পারি না তখনই চিত্তে দৈন্য আসে এবং চিত্ত দীন হলেই জীব শরণাগত হয়। যে চিত্তে দৈন্য আছে সে চিত্ত উদ্বিগ্ন হয় এবং উদ্বিগ্ন বুদ্ধি হলেই লোকে আশ্রয়প্রার্থী হয়। দুঃশাসন যখন প্রকাশ্য রাজসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করছে তখন দ্রৌপদীর সামনে বীর পঞ্চপতি উপস্থিত থাকলেও দ্রৌপদী দীনচিত্তে দীনবন্ধুরই শরণ নিয়েছিলেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হলেন সকল আশ্রয়প্রার্থীর আশ্রিত যোগ্য বিগ্রহ। সম্রাট যেমন যে কোন রাজপুরুষের কাজকে নিজের কাজ বলতে পারেন তেমনি যে কোন ভগবততত্ত্বের কাজ কৃষ্ণ তাঁর নিজের কাজ বলতে পারেন।

ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালকে বলছেন, তুমি তো সর্ব্বদেহীর আত্মা। ব্যষ্টি পুরির ওপরে একজন সমষ্টি দেহী থাকেন। ব্যষ্টি এবং সমষ্টি পুরী দুইএরই নাম বিরাজ—তাই বৈরাজলোক বলা হয়। এইরকম সকল সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হলেন কৃষ্ণ নিজে। তাই তাঁকে ব্রহ্মা বলেছেন সর্ব্বদেহিনাম্ আত্মা! অবতারী নারায়ণ পুরুষোত্তমই জলশায়ী নারায়ণ হলেন। ব্রহ্মা ভগবানের স্তুতি

করেও যখন তাঁর শ্রীমুখে কোন প্রসন্নতার চিহ্ন দেখতে পেলেন না তখন ভগবানের পরম প্রিয়জন ভক্ত ব্রজবাসীর স্তুতি করেছেন। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু তুমি হলে অখিললোকের সাক্ষী। আদিপুরুষ নারায়ণ তোমার অংশ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাতে আছে সে অখিললোক ব্রহ্মাণ্ড সমূহ তার সাক্ষী হলে তুমি। ব্রহ্মার ওপর যখন ভগবানের কৃপা হয়েছে তখন ব্রহ্মা এই বৃন্দাবনের ভূমিতে অসংখ্য বাসুদেব মূর্ত্তি দর্শন করেছেন। তাঁকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলে স্তব করছেন এমনকি ব্রহ্মা নিজেও সেই বাসুদেব মূর্ত্তির স্তব করছেন তাও ব্রহ্মা দর্শন করলেন। নারায়ণ একটি ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষী—আর তুমি (কৃষ্ণ-শ্রীবালগোপাল) হলে সকল দেহীর আত্মা। সকল ব্যষ্টি জীব যাতে তিনি হলেন সর্ব্বদেহী—এইরকম বহু সর্ব্বদেহী (তাই সর্ব্বদেহী-নাম্—বহুবচন দেওয়া আছে) সেই সর্ব্বদেহীর-আত্মা হলে তুমি।

শ্রীবালগোপাল প্রশ্ন তুলেছেন,—ব্রহ্মন্ তুমি তো পৃথিবীকে ভারমুক্ত করবার জন্য সব দেবতাকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরসাগরের তীরে গিয়ে ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের শরণাপন্ন হয়েছিলে—তার ফলে তো আমার আবির্ভাব। তাহলে তো এইটিই দাঁড়াচ্ছে যে ঐ ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের অংশ বা অবতার হলাম আমি। তাহলে তো ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণই তো কৃষ্ণ। তবে তুমি আমাকে 'নারায়ণ নও' বলছ কেন ?

ব্রহ্মার এই স্তুতিবাক্যে দুটি হেতু (১) তুমিই নারায়ণ—জলশায়ী নারায়ণ হলেন তোমার অঙ্গ। (২) তুমি নারায়ণ নও। এর পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব বলে এসেছেন—ব্রহ্মা ভগবানের ঐশ্বর্য্য দেখে বিস্ময় সাগরে ডুবে গেছেন। ভগবানের মহিমা অতল। অর্থাৎ তর্কের দ্বারা ভগবানের মহিমা জানা যায় না। শ্রুতি বলেছেন—

অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যাচ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।

অচিন্ত্য বলতে ভগবানের চব্বিশটি বস্তু দিয়ে এই ভাণ্ড প্রস্তুত করা হয়েছে। ভগবানের

স্বরূপ স্বপ্রমিতিক অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। ভগবৎ স্বরূপ পরত্র অজাত অর্থাৎ প্রকৃতিজাত নয়। অতৎ নিরসনমুখে ব্রহ্মাকে শ্রুতিশির অর্থাৎ বেদান্ত নিরূপণ করেছেন। দেহ হল তৎ এবং অতৎ এর সমষ্টি। যে অতৎ বাদ দিতে পারে সে তৎ নির্দ্দেশ করতে পারে। ব্রহ্মা যখন ভগবানের রূপ দেখে কিমিদম্ ইতি বলে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন তখন ভগবান সেটি জেনে ব্রহ্মার চোখের ওপরে মায়া যবনিকার আচ্ছাদন দিলেন কিংবা যোগমায়ার প্রভাবে যে ভগবৎস্বরূপ ব্রহ্মা দর্শন করছিলেন সেই যোগমায়ার আচরণটি সরিয়ে নিলেন। ব্রহ্মা তাই আর ভগবানকে দেখতে পেলেন না। কৃষ্ণকে পরম অজ বলা হয়েছে। পরম অজ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অজ। যত অজ ভগবান আছেন তাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেন কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃপাতেই ব্রহ্মার জ্ঞান হয়েছে যে কৃষ্ণই অদ্বয় ব্রহ্ম। কারণ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং অনন্তকোটি বাসুদেব মূর্ত্তি দর্শনের আগে কৃষ্ণ তো একা ছিলেন। আবার যখন সব মূর্ত্তি অন্তর্হিত হলেন তখনও সেই এক কৃষ্ণই বিরাজমান। অতএব এর থেকেই সিদ্ধান্ত হল কৃষ্ণই অদ্বয়তত্ত্ব। তাই বলা আছে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন। ঘট, হাঁড়ি সরা কলসী—এসব যেমন মৃত্তিকার বিকার মাত্র কিন্তু মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্। তেমনি এক কৃষ্ণই সত্য—আর সকলেই তাঁর সৃষ্ট। ব্রহ্মা বলছেন—প্রথমে ও শেষে তুমিই থাক। অতএব তুমিই একমাত্র সত্য। শ্রীবালগোপাল যে প্রশ্ন করেছিলেন—ক্ষীরোদশায়ী অবতার তো আমি তবে তুমি আমাকে নারায়ণ নও—একথা বলছ কেন? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন —তুমি নারায়ণ এটি বিচারিত বাক্য নয়। ক্ষীরসাগরের তীরে যে ব্রহ্মা দেবতাদের নিয়ে গিয়েছিলেন তার কারণ হল ক্ষীরোদশায়ী ভগবান ভিন্ন জীবের উপাস্য আর কিছু হতে পারে না। জীব ক্ষীরোদশায়ীকেই উপাসনা করে। প্রথমস্কন্ধে বলা হয়েছে— 'জগৃহে পৌরুষং রূপম্।' ভগবান পৌরষরূপ গ্রহণ করলেন। গ্রহণ করলেন যখন বলা হল তখন সে রূপটিকে তো নিত্য বলা চলে

না। তা বললে হবে না। কারণ বস্তু যদি না থাকে তাহলে তাকে গ্রহণ করা যাবে কি করে? অসত্যে কথং গ্রহণং স্যাৎ? এই পৌরুষ-রূপকে যেন প্রাকৃত রূপ বলে ভুল না হয়। কারণ তখন প্রাকৃতরূপ আসবে কোথা থেকে? তখন তো সৃষ্টি কাজ আরম্ভই হয় নি। তাই প্রাকৃতের দোকানই খোলা হয়নি কাজেই প্রাকৃত বস্তু বলে তখন কিছু ছিল না। ভগবানের এই পৌরুষরূপকে তিনি প্রাদুর্ভূত করলেন। এ রূপ তাঁর নিত্য কারণ অপ্রাকৃত। আর প্রাকৃত রূপ—যা কিছু তা হল অনিত্য।

ভগবানের ষোলকলা যে বলা হয় তার মধ্যে অষ্টসিদ্ধি, ষড়ৈশ্বর্য্য, লীলা এবং কৃপা। ৮টি সিদ্ধি, ৬টি ঐশ্বর্য্য একটি লীলা ও একটি কৃপা—৮ + ৬ + ১ + ১ = ১৬ এই হল ষোল কলা। এই অষ্টসিদ্ধির কোনটির বিন্দু যোগিগণ পান। এই অষ্টসিদ্ধি ভগবৎ বিগ্রহের সেবা করেন।

বিষ্ণু ভগবানের তিনটি রূপ—(১) মহৎস্রষ্ট—ইনিই কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার—ইনি প্রকৃতির প্রতি অনুমতিরূপ ঈক্ষণ করে ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেন। (২) গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার। ইনি প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে চৌদ্দভুবন প্রকাশ করেন। (৩) ক্ষীরোদশায়ী ভগবান তৃতীয় পুরুষাবতার—ইনি সর্ব্বজীবের ভিতরে অন্তর্য্যামি-রূপে অবস্থান করেন। অতএব দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মার পিতা হলেন দ্বিতীয়পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী যাঁর নাভিকমলে ব্রহ্মার জন্ম। কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতার থেকে বাইশজন অবতারের জন্ম। এর মধ্যে কৃষ্ণভগবানও আছেন। কিন্তু কৃষ্ণ তো শুধু অবতার নন তিনি তো সর্ব্বাবতারী। তাই অবতারের মধ্যে তাঁকে গণনা করায় সূতমুনি লজ্জিত হয়েছেন। সঙ্কোচ বোধ করে শেষে তাই বললেন —এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। একটি ক্রম বলতে বলতে যদি তা ভঙ্গ করে অন্য উপক্রম করা যায় তখন কিন্তু বা তু এই অব্যয় পদ বসান হয়। এখানে তাই বলা হয়েছে কৃষ্ণস্তু

ভগবান স্বয়ম্। অর্থাৎ কৃষ্ণকে অবতারের মধ্যে গণনা করা হলেও কৃষ্ণ অবতারগণ হতে ভিন্ন। তিনি স্বয়ং ভগবান। যিনি পৌরুষ-রূপ গ্রহণ করেছিলেন তিনিই কৃষ্ণ। ইনি স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ স্বতন্ত্র ভগবান। স্বয়ং ভগবানের লক্ষণ শাস্ত্র বলেছেন—

অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপং তদুচ্যতে।

সকল অবতারের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু কৃষ্ণভগবানের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি সর্ব্বকারণকারণম্। যত অবতারী আছেন তাঁদেরও বড় হলেন কৃষ্ণ। এখন প্রশ্ন হতে পারে তবে কৃষ্ণকে অবতারের মধ্যে গণনা করা হল কেন? অন্যান্য অবতারের চেয়ে কৃষ্ণের লীলা মাধুর্য্যের আধিক্য বুঝাবেন বলে কৃষ্ণকে অবতারের মধ্যে গণনা করা হয়েছে।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোলকাধীশ শ্রীগোবিন্দ—তাঁর বিলাস-মূর্ত্তি হলেন বৈকুণ্ঠাধিপতি মহানারায়ণ। এই মহানারায়ণের চারটি কায়ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ব, অনিরুদ্ধ। এই মহানারায়ণের উৎপত্তিও কৃষ্ণ থেকে। কৃষ্ণই এই মহানারায়ণের আবির্ভাব স্থান। এখন প্রশ্ন হতে পারে ব্রহ্মা পৃথিবী এবং দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরসাগরের তীরে গেলেন কেন? এর উত্তরে বলা যায় গ্রামের মধ্যে মানত করে পূজা দিতে গেলে যেমন একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে—সেখানে গেলে পূজা দেওয়া সহজ হয় এবং দেবতার অনুগ্রহ লাভেও সহায়তা হয় তেমনি ভগবানের অনুগ্রহ সহজে আদায় করতে হলে এই ক্ষীরসাগরই হল উপযুক্ত স্থান। ক্ষীরসাগরের তীরে অনুগ্রহ তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। চতুর্দ্দশভুবনের মধ্যে মাঝখানে হল ভূলোক। ক্ষীরসাগর হল এই ভূলোকে। তাই মাঝখানে ক্ষীরসাগরের তীরে দেবতারা ব্রহ্মার সঙ্গে ভগবানের অনুগ্রহ লাভের জন্য মিলিত হয়েছেন। গ্রামের মাঝখানে যেমন চণ্ডীমণ্ডপ থাকে। মাঝখানে তাই পালনকর্ত্তা থাকেন। সব পুরুষকে একসঙ্গে করে পুরুষোত্তম আবির্ভূত হলেন। কাজেই এ সম্বন্ধে যে যা বলে

তাই ঠিক। শ্রীধরস্বামিপাদের মতও তাই। ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালকে বলছেন—তুমি পরিপূর্ণতম। তাই তুমি নারায়ণ নও। আর তুমি যে বললে জল পরিচ্ছিন্ন এবং সেই জলে যে নারায়ণ শায়িত তিনিও পরিচ্ছিন্ন তা হতে পারে না। কারণ কারণার্ণবের জল তো মায়িক নয়। এ জল হল চিৎ জল। চিৎ জল তো পরিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তাই এই জলে শয়ন করে আছেন যে নারায়ণ সেই জলশায়ী নারায়ণ পরিচ্ছিন্ন হতে পারেন না। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁর টীকায় এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম স্কন্ধে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ভূমাপুরুষের শ্বেত এবং কৃষ্ণকেশ বলা হয়েছে। শ্রীজীবপাদ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে এর বিচার করেছেন। ভূমাপুরুষ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বলেছেন—

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়ো র্দিদৃক্ষুণা
মায়াপনীতা ভুবি ধর্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনে র্ভরাসুরান্
হত্বেহভূয় স্ত্বরয়েতমন্তি মে॥ ভাঃ ১০।৮৯।৩২

এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের চৌদ্দভুবনের ওপরে প্রকৃতির অষ্ট আবরণ—তার ওপরে মুক্তিধাম। এই মুক্তিধামের অধিপতি হলেন এই ভূমাপুরুষ। ইনি হলেন কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষাবতারের অংশ। ভূমাপুরুষ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বলছেন—

পূর্ণকামাবপি যুবাং নরনারায়ণাবৃষী।
ধর্মমাচরতাং স্থিত্যৈ ঋষভৌ লোকসংগ্রহম্॥
ভাঃ ১০।৮৯।৬০

হে নরনারায়ণ! তোমরা পূর্ণকাম হলেও কেবল লোকসংগ্রহের জন্য ধর্মাচরণ করছ। কারণ ধর্ম ছাড়া জগতের স্থিতিলাভ হয় না। বলা আছে ভক্তি বিনা জগতের নাহি অধিষ্ঠান। সৃষ্ট জীব ধর্মকে তাড়াতে পারলেই বাঁচে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টি আরও সূক্ষ্ম। তিনি জানেন ধর্ম ছাড়া জগতের স্থিতি লাভ সম্ভব নয়। তাই

সূক্ষ্মদর্শী এবং দূরদর্শী ভগবান গণেশ এবং দুর্গাকে মন্ত্র জপের ভার দিয়ে রেখেছেন। মন্ত্র সংরক্ষক হলেন গণেশ এবং দুর্গা। কে কবে জগতে ধর্ম আচরণ করবে কি না করবে ঠিক নেই—তাই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা জগতের স্থিতিলাভের বিষয় চিন্তা করে আগে থেকেই পুরোহিত নিযুক্ত করে রেখেছেন। মা বাপ ছাড়া যেমন সন্তানের কদর কেউ বুঝে না তেমনি জগতের সমগ্র সৃষ্ট জীবের মাতাপিতা ভগবান তাদের রক্ষার জন্য সর্ব্বদা চিন্তিত। ভগবান বলেছেন—'মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।' শ্রুতি বললেন—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।' কাজেই তিনিই জগতের পিতামাতা। ধর্ম আচরণ যারা করে জগতের বিপক্ষদল তাদের কটাক্ষ করে এবং যারা সত্যিই অধর্ম আচরণ করে তাদের জগতে উন্নতি করতে দেখাও যায়। এটি হল কলির প্রভাব। কিন্তু অধর্ম বা অনাচারজনিত যে উন্নতি সেটি প্রকৃত উন্নতি নয়। এটি শোথের ফোলার মত। এ ফোলা যেমন স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয় এটি ব্যাধি। এ রোগ হলে চিকিৎসক ডেকে চিকিৎসা করতে হবে এবং সে ফোলা শুকিয়ে তাকে শীর্ণ করতে হবে। এর পরে আবার যখন সে মোটা হবে তখনই হবে প্রকৃত স্বাস্থ্য। ধর্ম প্রবর্ত্তক হলেন ভগবান নিজে। শরীরের জন্য যেমন ভোজন এবং উপবাস দুইই দরকার—ভোজনে রজঃ এবং তমঃ গুণ বৃদ্ধি পায় আর উপবাসের ফলে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়। রজ এবং তমঃ গুণ বৃদ্ধি পেলে ব্যাধির আক্রমণ হয় আর সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হলে সে ব্যাধি দূর হয়। সত্ত্বগুণকে বাড়াতে গেলে উপবাস করতে হবে। এখানেও তেমনি সত্ত্বগুণের ওপরেই জগতের স্থিতি।

ভূমাপুরুষ বলছেন,—হে নরনারায়ণ ঋষি, এ জগতে যারা ধর্ম আচরণ করছে তাদের মধ্যে তোমরা হলে শ্রেষ্ঠ। তোমরা নিজেরা পূর্ণ হয়েও লোক সংগ্রহের জন্য নিজেরা ধর্ম আচরণ করছ। কারণ মহাপুরুষ যা আচরণ করবেন সাধারণ লোক তাই গ্রহণ করবে। ভগবান গীতাবাক্যে বললেন—

যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্তে॥ গীঃ ৩।২১

শ্রীজীবপাদ টীকায় বিচার করেছেন—তোমরা যে কেবল কৃষ্ণার্জুন স্বরূপে জগতের কল্যাণ করছ তা নয় নরনারায়ণরূপেও কল্যাণ করছ।

নর অর্জ্জুনের (নিত্য সখারূপে অর্জ্জুনের নিত্যত্ব) অংশ এবং নারায়ণ ঋষি ক্ষীরোদশায়ী পুরুষের অংশ। তোমরা দুজনে ঋষভৌ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ—সকল অবতার এবং অবতারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সকল অবতার তাঁর থেকেই হয়েছে। কারণ শ্রীজয়দেব কবির দশাবতার স্তোত্রে বলা আছে—

কেশবধৃত মীন শরীর জয় জগদীশ হরে
কেশবধৃত কূর্ম্ম শরীর জয় জগদীশ হরে
কেশবধৃত বামন রূপ জয় জগদীশ হরে

তাহলে দেখা যাচ্ছে সকল অবতারই কেশবধৃত। ক বলতে ব্রহ্মাকে বুঝায় আর ঈশ বলতে শঙ্করকে বুঝায়—এই শিব ব্রহ্মাকে যিনি নিজের অধীন করে রাখতে পারেন তিনিই হলেন কেশব। শিব ব্রহ্মা যাঁর পদানত অন্য সকলে যে তাঁর পদানত হবে এ তো বলাই বাহুল্য। শাস্ত্র বললেন আপ্তকামঃ পূর্ণকামঃ যদুপতিঃ। উদ্ধবজী শ্রীগোবিন্দকে বলেছেন—তুমি স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকাম। কিন্তু ভগবানের আচরণে তো তা দেখা যাচ্ছে না। তিনি পূর্ণকাম হয়েও মা যশোদার কাছে ননী চাইছেন—মায়ের স্তনদুগ্ধে তাঁর লোভ —শাস্ত্র বললেন ভগবান স্তন্যকাম। ভগবান আপ্তকাম অথচ তিনি পরের ঘরে গিয়ে চুরি করছেন। সখাসঙ্গে গোচারণ রঙ্গে যখন আছেন, গোপবালাদের সঙ্গে যখন বিহার করছেন এ লীলা দেখে মনে হয় বুঝি এরা ভগবানের থেকে দ্বিতীয় বস্তু। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। সবাই তাঁর নিজেরই রাজ্য। রাজার পাচক যদি রন্ধন করে রাজাকে খেতে দেয় তাহলে সেটি যেমন তার দ্বিতীয় বস্তু হল না।

কারণ পাঁচক তার খাদ্যবস্তু সব রাজারই অর্থে কেনা হয়েছে। তেমনি মাতাপিতা, সখা, কান্তাবর্গ, বৃন্দাবনভূমি শ্রীযমুনা গিরিরাজ গোবর্দ্ধন সবই শ্রীকৃষ্ণের নিজেরই স্বরূপ। কেউই কৃষ্ণ থেকে দ্বিতীয় বস্তু নয়। উদ্ধবজী যা বললেন—স্থাস্নুচরিষ্ণুর্মহদল্পকং বা স্থাবর জঙ্গম মহৎ অল্প যা কিছু জগতে আছে—বিনাচ্যুতাৎ বস্তুতরাং ন বাচ্যম্। অচ্যুত ছাড়া অন্য কোন বস্তু জগতে নেই। সকলই কৃষ্ণের স্বরূপ। এ তো প্রাকৃত জগতের কথা। লীলাজগতেও সব উপকরণই কৃষ্ণের স্বরূপ; বাজারে জিনিষ কিনতে গেলে তবু অর্থের বিনিময় আছে কিন্তু কৃষ্ণের পক্ষে তাও নেই। সবই কৃষ্ণের স্বরূপ। এখানে কিছু বিনিময় নেই। কৃষ্ণের স্বরূপ হতে তারা উৎপন্ন তা নয় তারা কৃষ্ণেরই স্বরূপে। কৃষ্ণের স্বরূপই দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে এক লীলাময়রূপ আর দ্বিতীয় লীলার উপকরণরূপে। বৃন্দাবনভূমি, শ্রীযমুনা, সখা, মাতাপিতা গোপী সকলেই কৃষ্ণের নিজের স্বরূপ। এইজন্য ভগবান যে গোপরামাদের নিয়ে রাসক্রীড়া করেছেন তাতে পরদারাভিমর্ষণ হয় নি। গোপীদের অন্তরে এবং গোপীদের যারা পতি তাদেরও অন্তরে যিনি বিহার করেন তিনিই বাইরে গোপীদের সঙ্গে বিহার করেছেন, এতে তাহলে দোষ হবে কেন? শ্রীশুকদেব বললেন, মহারাজ, এটি কেমন জানেন? যথার্ভকস্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ। একটি বালক যেমন দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে অন্য একটি বালক বলে মনে করে তার সঙ্গে খেলা করে আদর করে এও তেমনি। কৃষ্ণ গোপীদের সঙ্গে বিহার করছেন অর্থাৎ নিজের স্বরূপের সঙ্গেই নিজে ক্রীড়া করছেন। তাই শাস্ত্র বললেন—আত্মারামোপ্যবীরমৎ। তিনি আত্মারাম হয়েও রমণ করেছেন। কৃষ্ণের আত্মাই গোপীরূপ ধারণ করেছে। প্রাকৃত জগতেও দেখা যায় রাগ রাগিণী সিদ্ধ কোন মহাপুরুষ তাঁর কণ্ঠের ভৈরবী রাগিণীকে রূপ দিয়ে বাইরে সুন্দরী যুবতীরূপে প্রকাশ করেছেন। এ যুবতী এ জগতের কেউ নয় তাঁরই কণ্ঠের ভৈরবী রাগিণী। কারণ সকলে দেখে যখন সন্দেহ

করছে তখন তিনি সেই যুবতীকে নিজের কণ্ঠের ভিতরে ধারণ করলেন।

ভূমাপুরুষ কৃষ্ণার্জ্জুনকে বলছেন,—তোমরা নরনারয়ণ ঋষি। ভগবান গীতায় বলেছেন—পাণ্ডবনাং ধনঞ্জয়ঃ নর অর্জ্জুনের অংশ, আর নারায়ণ কৃষ্ণের অংশ। শ্রীহরিবংশে উল্লেখ আছে ভূমাপুরুষ কৃষ্ণকে দেখবার জন্যই ব্রাহ্মণের বালকদের হরণ করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভূমাপুরুষ প্রসঙ্গের আগে তিনজন দেবতার পরীক্ষা প্রসঙ্গ আছে। ভৃগুমুনি পরীক্ষা করেছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন দেবতার মধ্যে কার আরাধনা করলে জীব শান্তি পাবে আনন্দ পাবে? বিচারে দেখা গেল বিষ্ণু অর্থাৎ কৃষ্ণ ভগবানই উপাস্য। কারণ যিনি নিষ্কিঞ্চন, মৃদু, দান্ত এইসব গুণ যাতে আছে তিনিই উপাস্য হবেন। শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় ব্যাখ্যা করেছেন জীবের উপাস্য একমাত্র কৃষ্ণই, কারণ এ সব গুণ একমাত্র কৃষ্ণ ছাড়া আর অন্য কোথাও নেই। স্বরূপ নির্ণয়ই কৃষ্ণার্জ্জুনের পরম মহিমাব্যঞ্জক। ভূমাপুরুষই কৃষ্ণের অংশ কৃষ্ণ হলেন সর্ব্বকারণকারণম্।

বক্তার অভিপ্রায় বুঝবার ধারা আছে। উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস এর দ্বারা তাৎপর্য্য বুঝতে হয়। ব্রহ্মস্তুতি একখানি স্বয়ং সম্পূর্ণ শাস্ত্র। এর উপক্রম এবং উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণই যে তত্ত্ব এইটিই পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে নানা বৈচিত্র্য আছে। তাই তাকে বুঝতে গেলে সাধনকে অপেক্ষা করে। ভাগবত আস্বাদন করতে গেলে ষট্সন্দর্ভ রূপ চশমার দরকার হয়। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে নানাস্থানে সংশয়সূচক মন্ত্র আছে—যাকে ব্যাসকূট শুককূট বলা হয়। যেমন জন্মলীলা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বললেন—

অথাহমংশভাগেন········

ভগবান বললেন—আমি অংশভাগের সঙ্গে অবতীর্ণ হব। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের পরিভাষা বাক্য কিন্তু 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—কৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং অর্থাৎ তিনি অংশও নন কলাও নন। লীলায় দেখা

গেছে বরুণদেব কৃষ্ণভগবানকে স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—ওঁ নমো ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে। তাতে বুঝা যাচ্ছে ভগবানের ভিতরে ব্রহ্মও আছেন পরমাত্মা আছেন। শ্রীস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্বদা ভক্তিধর্মকে রক্ষা করে গেছেন। শ্রীজীবপাদ টীকায় বলেছেন—স্বামিপাদের অস্ফুট অর্থাৎ না বলা বাণী আমি বলব শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ আবার বলেছেন—প্রভুর ভুক্তাবশেষ তো সেবক পায়। আমিও তেমনি গোস্বামী প্রভুদের আস্বাদনের ভুক্তাবশেষ আস্বাদন করব। তাঁদের টীকা রচনা ঔদ্ধত্য প্রকাশের জন্য নয় কিন্তু রস আস্বাদনের জন্য।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে সংশয়স্থল কেমন—তার একটি উদাহরণ দেওয়া যায়—ভূমাপুরুষকে দেখে অর্জ্জুনের নেত্র পীড়িত হল। যে অর্জ্জুনের কৃষ্ণরূপ দেখা অভ্যাস ভূমাপুরুষকে দেখে তার চক্ষু পীড়িত হল কেন? তাহলে কি এইটিই বুঝতে হবে যে ভূমাপুরুষ স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের চেয়ে উচ্চস্তরের? এই সংশয়ই এসে পড়ে। কৃষ্ণ ভূমাপুরুষের মুক্তিধামে যাবার সময় অন্ধকার ভেদ করে গিয়েছেন। সেই অন্ধকারে অশ্বকে পথ দেখাবার জন্য শ্রীসুদর্শন দিয়ে আলো দেখাতে হয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণের এই রথ তো বৈকুণ্ঠধাম থেকে এসেছিল। আসবার সময় তো তাকে আলো দেখাতে হয় নি। অথচ প্রকৃতির অষ্টধা আবরণ ভেদ করেই আসতে হয়েছিল। কৃষ্ণ এখানে নিজের ঐশ্বর্য্য সব প্রকাশ করেন নি—ঢাকা দিয়ে রেখে-ছিলেন। কারণ নরলীলার অনুকরণ করেছিলেন। যে সখ্যরসের চোখ নিয়ে অর্জ্জুনের সখা কৃষ্ণরূপ দেখা অভ্যাস তার পক্ষে বিরাট পুরুষের রূপ বিশ্বদর্শন এতো অতি সামান্য। কৃষ্ণস্বরূপের পর্য্যায় এবং বিশ্বরূপ পর্য্যায়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। বিরাটপুরুষের বিশ্বরূপ ঐশ্বর্য্যের রূপ—এই ঐশ্বর্য্যের চরম হলেন বৈকুণ্ঠধাম। তারপর অযোধ্যানাথ হয়ে যখন ভগবান অবতীর্ণ হলেন তখন তাঁর স্বরূপে প্রথম মাধুর্য্য প্রকাশ পেল। অযোধ্যানাথ অপেক্ষা দ্বারকা-

ধীশের মাধুর্য্য অধিক। আবার দ্বারকাধীশ অপেক্ষা গোকুলাধীশের মাধুর্য্য আরও বেশী। গোকুলাধীশের মাধুর্য্য সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেছেন আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর। এতই মাধুর্য্য যে কৃষ্ণ মণিময় ভিত্তিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে বিস্মিত হয়েছেন—মনে হয়েছে—আমি এত সুন্দর! এই মাধুর্য্য যদি আমি নিজে আস্বাদন করতে পারতাম। মথুরা নাগরীগণ কৃষ্ণকে দেখে বলেছেন যশের একান্ত ধাম হলেন এই কৃষ্ণ।

শাস্ত্রে ভক্ত হিসাবে ব্রজবাসীরই মহিমা কীর্ত্তিত হয়েছে। বিশ্বরূপদর্শনের মহিমা কীর্ত্তন করা হয় নি। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ ভগবৎ-সখা বিচক্ষণ মন্ত্রী শ্রীউদ্ধবজী যখন ব্রজে গিয়েছেন তখন তাঁর প্রার্থনা ব্রজে যদি একটি তৃণগুল্মে জন্ম পেতাম তাহলে ব্রজগোপীর চরণরেণু মাথায় পেয়ে ধন্য হতাম। তাই ব্রজগোপীর চরণরেণুর একটি কণাকে বারে বারে প্রণাম করেছেন। উদ্ধব ত্যে তত্ত্ববিদ্ শিরোমণি—তাই তিনি বুঝেই বলেছেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও ব্রজে একখন্ড পাথর বা একখানি কাঠের পাটার জন্ম প্রার্থনা করেছেন। এই প্রার্থনা পূরণ হয় নি—ব্রহ্মা সে জন্ম পান নি—তবে বলেছেন, 'প্রভু তোমার কৃপায় যদি সে জন্ম পাই তাহলে তার কাছে আমি আমার অন্য কোন ভাগ্যকেই গণনা করি না।

মুক্তিকামী অন্য সাধনের দ্বারাও তো মুক্তি পেতে পারে। তবে উদ্ধবজী ব্রজরামার চরণরেণু বন্দনা করে প্রার্থনা জানালেন কেন? কারণ অন্যসাধন কষ্টসাধ্য। যেমন পিত্তজ্বর ভাল করবার জন্য তিক্তকটু ঔষধ সেবনও আছে আবার সুন্দর রসালা মিছরির সরবৎ পানেও এ রোগ ভাল হয়। বুদ্ধিমান মানুষ তো তেতো ওষুধ না নিয়ে রসালা সরবৎই নেবে। তাই অন্য কষ্টসাধ্য সাধন না করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি গোপরামাদের প্রেমকণিকাই প্রার্থনা করবে। এইটিই জীবের অজ্ঞানতা রোগ নিবারণের পক্ষে সাধীয়সী। কৃষ্ণপাদপদ্মে অনুরাগ লেগে গেলে মুক্তি তো অনায়াসে হবে। তখন আর

সংসার তাপ তাকে কষ্ট দিতে পারবে না। তাই বলা হয়েছে—

দেহস্মৃতি নাই যার সংসার কূপ কাঁহা তার।

কৃষ্ণপ্রেম আমাদের অণু চৈতন্যে গিয়ে ভিতরে ভিতরে সকলের অলক্ষ্যে ভগবৎ সেবার উপযোগী দেহ তৈরী করে। তেমন মায়ের রক্ত মাংস মেদমজ্জায় পুষ্ট হয়ে গর্ভস্থ সন্তান সকলের অলক্ষ্যে বড় হয়ে ওঠে। উদ্ধব বলেছেন—এই ব্রজপ্রেম লাভের আকাঙ্ক্ষা কিন্তু সকলের আছে—মুমুক্ষু, মুক্ত এবং বয়ম্ অর্থাৎ ভগবানের যারা নিত্যপার্ষদ—যাঁদের স্থান মুক্তেরও উপরে। উদ্ধব নিজেও এই ব্রজপ্রেমলাভের ভিখারী। এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিশ্বরূপের ভক্তের কোন উল্লেখ নেই। দিব্যং দদামি তে চক্ষু—এই বাক্যের বিচারে যাঁরা বলেন কৃষ্ণস্বরূপ দর্শন অপেক্ষা বিশ্বরূপদর্শন শ্রেষ্ঠ—এর উত্তরে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেছেন ইতি তু বালকোলাহলঃ। অর্জ্জুনের দৃষ্টি সখ্যপ্রেমের দৃষ্টি—এ চোখ সাধনসিদ্ধ চোখ নয়। সাধন করবার পর সিদ্ধিকে লাভ করতে হয়। এখানে অর্জ্জুনের পক্ষে সাধনের কোন অপেক্ষাই নেই। অর্জুন তো নিত্য পরিকর সখা। নিত্য সিদ্ধ পরিকরের তো সাধনের অপেক্ষা থাকে না। প্রেম তো ঐশ্বর্য্য দর্শন করতে দেয় না। শ্রীবালগোপালের দাম-বন্ধনলীলা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলেছেন মা যশোদা অতদ্বীর্য্যকোবিদা। গোপালের বীর্য্য সম্বন্ধে মা যশোমতীর কোন বোধ ছিল না। শ্রীজীবপাদ এর সমাধান করেছেন—মায়ের বাৎসল্য প্রেম এত ঘন যে প্রেমের বিষয়ের ঐশ্বর্য্যকে বুঝতে দেয় না। বাৎসল্য এবং মধুর রসের স্বভাব এমনই যে প্রেমের বিষয়ের ঐশ্বর্য্যের অনুসন্ধানকে আবরণ করে রাখে।

অর্জ্জুনের যে সখ্যপ্রেমময়ী দৃষ্টি—এ বিশ্বরূপ দর্শনের দৃষ্টি তার চেয়ে অনেকাংশে ন্যূন। সখার চোখে বিশ্বরূপ দেখা যায় না। বিশ্বরূপ দর্শনের চোখ ঐশ্বর্য্য দর্শনের চোখ। তবে যে দিব্য চক্ষু বলা হয়েছে বিশ্বরূপদর্শন দেবতার দর্শন তো বটেই সে তো আর

খালি চোখে দেখা যাবে না। দেবদর্শন করতে হলে দেবচক্ষুই চাই। তাই দিব্যচক্ষু বলা হয়েছে তা না হলে কোনও উন্নতস্তরের দৃষ্টি—তা বোঝাচ্ছে না।

এইভাবে দেখা যায় শাস্ত্রমাত্রই সংশয়ে পরিপূর্ণ—আর এই সংশয় নিরসনের জন্য আচার্য্যের প্রয়োজন। আমাদের দেশের বিদ্যা তাই গুরুমুখী। এখানে বিদ্যা সয়মধিগতা নন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তাঁর নিজের ভগবত্তা সর্ব্বদা প্রকাশ করেন না—এটি লীলার অনুকরণে। লীলা অনুযায়ী স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। মুক্তি ধামে ভূমাপুরুষের কাছ থেকে ব্রাহ্মণ বালকদের উদ্ধার করতে যাবার সময় শ্রীকৃষ্ণজী নিজে সুদর্শন দিয়ে রথের পথ দেখিয়েছেন বা জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধে যে ভয় পেয়েছেন এই ভাব দেখিয়েছেন এ সবই হল তাঁর লীলা অনুযায়ী স্বরূপ প্রকাশ। ব্রহ্মসূত্রকার বললেন—লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যম্। এখানে লীলার বাধ্য ভগবান কিন্তু ভগবানের বাধ্য লীলা নন। ভগবানকে আনন্দ দেবার জন্য যোগমায়া লীলাশক্তি যিনি শ্রীকৃষ্ণের নিজস্ব শক্তি কিন্তু তিনি কৃষ্ণের অনুমতিকে অপেক্ষা না করে স্বয়ং নিজের স্বাধীনতায় কাজ করেন এবং এই লীলার অনুগত হয়ে ভগবানকে চলতে হয়। গিরিধারণ লীলায় ভগবান নিজে এক স্বরূপে ব্রজবাসীর কাছে আছেন আবার এক বৃহৎ গোপাল মূর্ত্তি স্বরূপে গিরিরাজের উপরে উঠেছেন। নিজেই নিজেকে প্রণাম করেছেন। এখানে তিনি নিজেই কর্ত্তা আবার নিজেই কর্ম। এটিও ভগবানের লীলা।

এখন প্রশ্ন হতে পারে ভূমাপুরুষ যদি শ্রীকৃষ্ণের অংশই হন তাহলে তিনি কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন না কেন? কৃষ্ণই তাঁকে প্রণাম করলেন। অর্থাৎ নিজেকেই নিজে প্রণাম করলেন। ভূমাপুরুষ প্রণাম করতে পারেন নি। কারণ অংশী পুরুষ কৃষ্ণ—তাঁর অংশ ভূমা-পুরুষের উপর আদেশ ছিল না। ভূমাপুরুষ যদি কৃষ্ণকে প্রণাম করতেন তাহলে অর্জুন বিস্ময় বোধ করতেন এবং তাতে লীলার

ব্যাঘাত হত। যাবৎ অধিকার তাবৎ বিধি এই হল নিয়ম। কৃষ্ণ ইচ্ছাতেই ভূমাপুরুষ প্রণাম করেন নি। শ্রীশুকদেব ভূমা পুরুষকে পুরুষোত্তমোত্তম বলেছেন। এখানে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ তার অপেক্ষাও উত্তম এ অর্থ করলে চলবে না। কিন্তু এইরকম অর্থ করতে হবে পুরুষ বলতে জীবকে বুঝাচ্ছে—তার চেয়ে উত্তম অর্থাৎ পরমাত্মা এই পরমাত্মা হলেন পুরুষোত্তম তার চেয়ে উত্তম ভগবৎ বিগ্রহ। পুরুষোত্তমোত্তম ভূমাপুরুষকে এই হিসাবে বলা হয়েছে যে তিনি ভগবৎ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ হলেন অংশীপুরুষ আর তাঁরই অংশরূপ হলেন ভূমাপুরুষ।

তচ্চাপি সত্যম্—এই বাক্যে ব্রহ্মা বলছেন জলশায়ী নারায়ণ স্বরূপ হলেন সত্য। এখন জল তো পরিচ্ছিন্ন কিন্তু পরিচ্ছিন্ন হলেও জলমপি সত্যম্। কারণ লীলা যখন সতা তখন তার উপকরণও সত্য। শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকের শেষ মন্ত্রে শ্রীসত্যব্রত মুনি দামকে প্রণাম করেছেন। দাম অর্থাৎ রজ্জুকে প্রণাম করছেন রজ্জু সত্যবস্তু বলে। রজ্জু সত্য হয় কি করে। কারণ এ রজ্জু হল দামবন্ধনলীলার উপকরণ। এ রজ্জু ছাড়া দামবন্ধন লীলা হয় না। তাই রজ্জু যদি সত্য অর্থাৎ নিত্য না হয় তাহলে দামবন্ধনলীলা নিত্য হয় না। তাই প্রথমে দামকে প্রণাম।

নারায়ণের স্বরূপ হল শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ। ভগবানের বিগ্রহ হল ব্রহ্মঘনবিগ্রহ—জীবের অনেক গুণ আছে কিন্তু তার একটি মহান্ দোষ যে সে ভগবানকে জানে না। ব্রহ্মা বলছেন—'প্রভু তোমার স্বরূপ জীবের বোধগম্য নয়। জগতের যে মায়িক সত্ত্বগুণ তাও অশুদ্ধতত্ত্ব। কারণ এ সত্ত্বগুণ প্রকৃতিজাত। মায়াজাত বস্তু কখনও চিৎ হতে পারে না। যেমন অন্ধকার থেকে যার জন্ম সে কখনও আলো হতে পারে না। কাজেই বিশুদ্ধ সত্ত্বকে লাভ করতে হলে মায়িক সত্ত্বকেও ত্যাগ করতে হবে। তা না হলে কেবল হওয়া যাবে না। এই কেবলের ভাবের নামই কৈবল্য। মায়িক

সত্ত্ব ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত কৈবল্য লাভ হবে না। রজঃ তমঃ গুণ থাকলে আসন পাতাই হবে ধ্যান হবে না। উপকরণ যোগাড় করাই হবে কিন্তু আসল পূজা হবে না। গীতাগ্রন্থে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ত্রিবিধ শ্রদ্ধা ত্রিবিধ দান ত্রিবিধ আহারের কথা বলা হয়েছে। এই উপায় থেকে শরীরে সত্ত্বগুণকে বাড়াতে হবে। এই সত্ত্বগুণই প্রথমে প্রয়োজন যা দিয়ে সাধন পথে অগ্রসর হতে হবে। শুদ্ধ আত্মা হল একক। সেখানে মায়িক সত্ত্বগুণেরও স্থান নেই। ভগবান শ্রীগোবিন্দ উদ্ধবজীকে বলেছেন জ্ঞানঞ্চ ময়ি সন্ন্যসেৎ। শ্রীগোবিন্দজী অর্জ্জুনদেবকে বলেছেন—নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন। সাধনার পথ তো ব্যথার পথ নয়। সাধনের পথ হল আনন্দের পথ। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে মানুষ যখন নিজের বাড়ীতে ফেরে তখন তো তার আনন্দ। সাধনের পথে অগ্রসর হচ্ছে অর্থাৎ ঘরের দিকে এগুচ্ছে। সাধনের চরম দশায় অর্থাৎ সিদ্ধিকালে নিজের ঘরে পেঁছুবে। তাই যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই আনন্দ। কৃষ্ণপাদপদ্মই নিজের ঘর। মহাজন বলেছেন—মন চল নিজ নিকেতনে। ভগবানও বলছেন—পরিশ্রমঃ মদ্দর্শনাবধি। দূষিত দুর্গন্ধযুক্ত কন্টকাকীর্ণ পথ ত্যাগ করে নিজগৃহে পেঁছুতে মানুষের যেমন সে ত্যাগের জন্য ব্যথা লাগে না তেমনি এই সংসার হল দূষিত কণ্টকাকীর্ণ। এই সংসার ত্যাগ করে কৃষ্ণ পাদপদ্মে যেতে আমাদেরও ব্যথা লাগা উচিত নয়। জ্ঞান, যোগ, কর্ম যে কোন সাধনে আগে ত্যাগ করে তবে যেতে হয়। সেখানে ত্যাগ করতে ব্যথা লাগে কারণ সেখানে আগে কিছু দেয় না। সেখানে ক্লেশ আছে। ভগবানও বললেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্— গীঃ ১২।৫

অন্যান্য সাধন বলে তোমার হাতের জিনিষটি ছেড়ে দিয়ে এস তাহলে কিছু পাবে। তাতে জীবের সংশয় হয়। ছাড়লে পাওয়া যাবে কি না—তাই সে ছাড়তে পারে না। কিন্তু ভক্তির পথ আগা-গোড়া আনন্দের পথ। ভক্তিমহারাণী বস্তু হাতে নিয়ে দেখিয়ে

বলেন যে দ্যাখ, তোর হাতে যে জিনিষ আছে সেটি বেশী সুন্দর না আমার হাতে যে জিনিষ সেটি বেশী সুন্দর। তখন জীব সেই ভক্তিমহারাণীর দেওয়া অপ্রাকৃত সম্পদ্ পেয়ে লুব্ধ হয়ে তাতে ডুবে যায় এবং নিজ হতেই নিজের সেই প্রাকৃত সম্পদকে সানন্দে ত্যাগ করে এ ত্যাগে তার কোন ব্যথাই লাগে না। ত্যাগ করতে যদি ব্যথা লাগে তাহলে বুঝতে হবে সাধনা কিছুই হয় নি। অন্য পথে সাধন ক্লেশজনক কেন ? কারণ সেখানে নির্ব্বিশেষ বস্তু ধ্যান করতে হয়। নির্ব্বিশেষ বস্তু নিয়ে জীবের তো কোন ব্যবহার নেই। জীব সবই সবিশেষের ব্যবহার করে। কিন্তু ভক্তিসাধনে নির্ব্বিশেষ ধ্যান করতে হয় না। সেখানে সবিশেষেরই ব্যবহার। কৃষ্ণপাদপদ্মই জীবের নিজের ঘর। তাই শাস্ত্র বলেছেন—ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি। যার চিত্ত শুদ্ধ সে কৃষ্ণপাদপদ্ম ছাড়তে পারে না। ছেড়ে থাকতে পারে না। ভক্তিতেও ত্যাগের কথা আছে। অন্য সাধনে আগে ত্যাগ করে আসতে হয়--তারা বলে খাবার ফেলে এস—তবে কিছু পাবে। কিন্তু ভক্তিমহারাণী আগে খাদ্য দিয়ে তবে ত্যাগ করান। ভজন শব্দের অর্থই হল ভগবানে আভিমুখ্য বিধান করা—অর্থাৎ ভগবানের দিকে মুখটিকে ফিরিয়ে দেওয়া। নাম ধরে কাউকে ডাকলে যে যেমন সেইদিকে ফিরে চায় তেমনি ভগবানের নাম ধরে যত ডাকা যাবে ততই তাঁর আভিমুখ্য বিধান করা হবে। এই ডাকার কাজটি নিরন্তর করতে হবে। এটি তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন। ভগবান তাঁর নিজের লীলারসে মেতে আছেন। তাই তাঁর তো জীবের দিকে কোন দৃষ্টি নেই। জীব ডেকে ডেকে তাঁর দৃষ্টি ফেরাবে। সাধক ক্রমশঃ ভগবানের পাদপদ্মের কান্তি হৃদয়ে অনুভব করবে। চেষ্টা থাকলেই বস্তু পাওয়া যায়। এই কান্তি জ্যোৎস্নার মত। জ্যোৎস্নার প্লাবনে যেমন অন্ধকার দূরে যায় তেমনি ভগবৎমাধুর্য্যকান্তির প্লাবনে প্রাকৃতবস্তুর প্রতি বাসনার তীব্রতা চলে যায়। এই বাসনাই হল অন্ধকার। বিশুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হলে প্রাকৃতসত্ত্বও চলে যায়।

তাই ভক্তিপথের সাধক মধ্যপথে (অর্থাৎ সংসারে থেকেও সংসারের বস্তু ত্যাজ্য জেনেও ত্যাগ করতে পারে না) ভক্তিমহারাণীর দেওয়া বিশুদ্ধ সত্ত্ব বস্তুতে লুব্ধ হয়ে তার মাধুর্য্য তরঙ্গে ডুবে গিয়ে আপনা থেকেই প্রাকৃত বস্তুকে ত্যাগ করতে পারে।

গর্ভোদশায়ী পুরুষের যে গর্ভোদ অর্থাৎ গর্ভস্থিত উদক তা তো পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ প্রাকৃত তাহলে জলশায়ী যে তুমি তুমিও তো নিত্য নও। এই যদি প্রশ্ন হয় তার সমাধানে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় বলেছেন—সৎ জগৎ বপু তোমার অর্থাৎ ব্রহ্মা বলছেন জলে থাকাই যদি ভগবানের সত্য হত তাহলে জলে গেলেই তো তাঁকে পাওয়া যেত। কিন্তু আমি তো কমলনালমার্গে একশত বছর ধরে তাঁকে খুঁজেছি কিন্তু তাকে তো আমি পাই নি। তারপয় যখন ব্রহ্মার ওপর 'তপ' 'তপ' আদেশ হল তখন সেই আদেশের পর হৃদয়ে তাঁকে সুস্পষ্টভাবে অনুভব করলাম। ব্রহ্মার এই দীর্ঘকাল অন্বেষণের ব্যর্থতা থেকে বুঝা যায় যে পথে পথে কৃষ্ণ অন্বেষণ করলে কৃষ্ণ পাওয়া যায় না আবার তাঁর কৃপা হলে হৃদয়ে তাঁর সুস্পষ্ট ধ্যান হয়। মহাজন বলেছেন—

বৃন্দাবনে কিম্ অথবা নিজমন্দিরে বা শ্রীকৃষ্ণভজনমৃতে ন সুখং কদাপি।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাও বা নিজের ঘরেই থাক শ্রীকৃষ্ণভজন ছাড়া কোথাও সুখ পাওয়ার কোন উপায় নেই।

ভগবানের কৃপা হলে তাঁর দর্শন অনায়াসে হবে। ভগবান হলেন অবিচিন্ত্যস্বরূপ। অচিন্ত্যশক্তি কারিগর তাঁকে বিচিত্রভঙ্গীতে গড়েছে। ভগবান জলেই ছিলেন কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ ব্রহ্মা তাঁকে দেখতে পান নি। তার উত্তরে যেন ব্রহ্মা বলছেন—আমি যদি অজ্ঞই হই তাহলে আবার হৃদয়ে ধ্যান করে কেমন করে তোমাকে দেখলাম—এইটিই হল কৃপা। ভগবানের স্বরূপে পরিচ্ছিন্নত্ব এবং অপরিচ্ছিন্নত্ব দুইই যুগপৎ দৃষ্ট হয় এইটিই ভগবানের লীলা। তাই অন্ডের

মধ্যে তিনি থাকলেও তিনি অনন্ত অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড উদরে নিয়ে আছেন। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, তোমার বিগ্রহ সর্ব্বব্যাপক। এ বিগ্রহ দর্শন বা অদর্শনের কারণ হল তোমার যোগমায়ার কৃপা। যোগমায়া যদি কৃপা করে জীবের চোখের ঢুলি খুলে দেন তাহলেই ভগবানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দর্শন হয়। হে প্রভু, তোমার এই অচিন্ত্যস্বরূপ তুমি আমাকে নিজেই কৃপা করে দেখিয়েছ।

ব্রহ্মার স্তুতিবাক্যের পরবর্ত্তী মন্ত্র—

তচ্চেজ্জলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ কিং মে ন দৃষ্টং ভগবংস্তদৈব।
কিংবা সুদৃষ্টং হৃদি মে তদৈব কিং নো সপদ্যেব পুনর্ব্যদর্শি॥

১০।১৪।১৫

ব্রহ্মা বলছেন,—প্রভু তোমার বপু জগতের আশ্রয়ভূত—অর্থাৎ তুমি হলে আশ্রয়তত্ত্ব আর সকলেই তোমাতে আশ্রিত। জলের ভিতরে তুমি থাক বলে তোমাকে পরিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমি তো পরিচ্ছিন্ন নও। যদি বলা যায় ভগবান যে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সসীম নন তার প্রমাণ কি? ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু আমিই তার প্রমাণ। কারণ আমি তোমার গর্ভোদশায়ী শ্রীবিগ্রহের নাভিকমল থেকে যখন জন্মগ্রহণ করলাম তখন আমার আবাসস্থানের পরিচয় জানবার জন্য নাভিকমল দর্শন করতে লাগলাম। শতবৎসর পরিভ্রমণ করেও তোমার সহস্রদল নাভিকমলের একটি দলেরও সন্ধান পেলাম না। তুমি যদি পরিচ্ছিন্ন হতে তাহলে তোমার সন্ধান তখনই পেতাম। কাজেই তুমি পরিচ্ছিন্ন নও। তারপরে আবার যখন নাভিকমলের মৃণাল অবলম্বন করে নীচের দিকে নামতে প্রবৃত্ত হলাম তখন শত বছরেও সেই নাভিকমলের মৃণালের অন্ত পেলাম না। অন্ত যে পেলাম না তাতে ভাল করেই বুঝেছিলাম যে আমি কত বড় অজ্ঞ। আমার মূর্খতার সীমা নেই। আমার বুদ্ধি দিয়ে তোমার স্বরূপ বুঝতে গিয়েছিলাম। আমার ক্ষুদ্রতায়, আমার অজ্ঞতায় যে তোমার

অপ্রাকৃত অসীমরূপ বোধ হয় না—এ বোধ আমার ছিল না। আমি অভিমানে মেতে ছিলাম। নিজের অহংকারে ডুবে ছিলাম। যেখানে অভিমান যত বেশী ভগবানের তত্ত্ববোধ তার কাছ থেকে তত দূরে। তাই মহাজন বাণী আছে—অভিমান মঞ্চে বসে রইলাম তাই একবিন্দু পরশ হল না রে। জগৎ ভেসে গেল ডুবে গেল শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমবন্যায় জগৎ ভেসে গেল ডুবে গেল কিন্তু আমি রইলাম বাকী রে। বন্যায় দেশ ভেসে গেলেও যে ব্যক্তি মাচার উপর বসে থাকে তাকে যেমন বন্যার জল স্পর্শ করে না—তেমনি মহাজন আমাদের কক্ষায় দাঁড়িয়ে আক্ষেপবাণী উচ্চারণ করছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমবন্যায় জগৎ ভেসে গেলেও আমি তো অভিমানমঞ্চে বসে আছি—এ কিসের অভিমান ? ধনী, মানী, কুলীন পণ্ডিত—এই অভিমানমঞ্চে বসে রইলাম তাই প্রেমবন্যার একবিন্দু স্পর্শ হল না। ব্রহ্মা বলছেন,—প্রভু তখন আমার হৃদয় অভিমানে ভরা। আমার বুদ্ধি দিয়েই তোমাকে বুঝতে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম তাতে কুলাবে না। তখন ঠকে শিখে বুঝলাম—আমার অজ্ঞতায় তোমার বিজ্ঞতা বুঝবার কোন উপায় নেই। আমার ক্ষুদ্রতায় তোমার বৃহৎ স্বরূপ ধরা পড়ে না। আমার মূর্খতা তোমার জ্ঞানঘন বিগ্রহকে স্পর্শ করতে পারে না। নিজের শক্তির অকিঞ্চিৎকরতা বুঝে তখন তোমার চরণে শরণাগত হয়ে ধ্যান করলাম তখন তোমার গর্ভোদশায়ী শ্রীবিগ্রহ আমার দৃষ্টি-গোচর হল এবং কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ আমার জ্ঞান ও দৃষ্টি হারিয়ে ফেললাম। তাই বলছি প্রভু তোমার বিগ্রহ যদি পরিচ্ছিন্ন হত তাহলে তো আমি তোমার সন্ধান পেতাম। আর যদি বল যে তুমি অপরিচ্ছিন্নস্বরূপ—কাজেই তোমার সন্ধান বা তোমার দর্শন পাওয়া তো সম্ভব হতেই পারে না। তাও বলতে পার না। কারণ তোমার কৃপায় আমি তো পরে তোমার শ্রীবিগ্রহ দর্শন পেলাম। অপরিচ্ছিন্ন-স্বরূপ হলে এ দর্শন পাওয়া সম্ভব হত না। সুতরাং তুমি পরিচ্ছিন্ন এবং অপরিচ্ছিন্ন দুইই। তাই বলি প্রভু তোমার শ্রীবিগ্রহ এবং

তোমার লীলাদি সম্বন্ধে যা কিছু অসামঞ্জস্য বা বিরোধী বলে মনে হয় তাতে তোমার যোগমায়া অচিন্ত্য মহাশক্তির কথা মনে করলেই সব সামঞ্জস্য হয়ে যায়। তোমার সমস্ত লীলা এবং শ্রীবিগ্রহেই পরিপূর্ণ-রূপে তোমার অচিন্ত্য মহাশক্তিরই খেলা। তাই যারা তোমার অচিন্ত্য মহাশক্তিতে বিশ্বাস করতে পারে না তারা কিছুতেই তোমার শ্রীবিগ্রহ এবং অপ্রাকৃত লীলার প্রকৃত তত্ত্ব ধারণা করতে পারে না। এ প্রকৃত তত্ত্ববোধ একমাত্র তোমার কৃপা সাপেক্ষ। সেইজন্য তোমার শ্রীচরণে শরণাগতি নিয়ে তোমার অযাচিত কৃপা প্রার্থনা করি।

ব্রহ্মস্তুতির পরবর্ত্তী মন্ত্র—

অত্রৈব মায়াধমনাবতারে হ্যস্য প্রপঞ্চস্য বহিঃস্ফুটস্য।
কৃৎস্নস্য চান্তর্জঠরে জনন্যা মায়াত্বমেব প্রকটীকৃতং তে॥

১০।১৪।১৬

বাক্‌পতি ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালকে স্তুতি প্রসঙ্গে বলছেন,—প্রভু তুমি মায়াধমন অবতার। তোমার এই অবতারে মায়া দূর হয়েছে। সূর্য্যের উদয়ে যেমন জগতের অন্ধকার নাশ হয় তেমনি কৃষ্ণসূর্য্যের উদয়ে মায়ার অন্ধকার নাশ হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে কৃষ্ণসূর্য্যের উদয় জীবের কাছে হবে কি করে? কানে ভগবানের কথা শ্রবণ করলে জিহ্বায় ভগবানের নাম উচ্চারণ করলে এবং মনে (চিত্তে) তাঁর পাদপদ্ম স্মরণ করলেই এই কৃষ্ণসূর্য্যের উদয় হবে। এইটিই সহজ পন্হা। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামিপাদ মহারাজ পরীক্ষিৎকে উপলক্ষ্য করে নববিধাভক্তি অঙ্গ যাজনের মধ্যে এই তিনটি ভক্তি অঙ্গ যাজন শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণেরই বিধান দিয়েছেন। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, তুমি জীবকে মায়াবন্ধন থেকে মুক্তি দান করবার জন্যই এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছ। সেইজন্য নানাভাবে লীলা প্রকাশ করেছ। তাই তোমার প্রতি লীলাতেই মায়ার বৈভব প্রকাশ পায়। মায়াকে শাস্ত্রে অন্ধকারই বলা হয়। কারণ মায়া অন্কারের মতই কাজ করে। অন্ধকারের দুটি শক্তি—আবরণ শক্তি আর বিক্ষেপ শক্তি। আবরণ

শক্তি দিয়ে বস্তুকে ঢেকে রাখে—বস্তু বলতে ঘরে যা আছে বাক্স বিছানা কাপড় চোপড়। কিন্তু অন্ধকার ঘরে ঢুকলে চোখ খোলা থাকলেও ঘরের জিনিষ দেখা যায় না। অন্ধকারের আবরণশক্তি তাকে ঢেকে রাখে। আর বিক্ষেপশক্তি দিয়ে অন্ধকার অবস্তুকে দেখায়। অবস্তু বলতে ঘরে যা নেই তাকে বুঝায়—যেমন সাপ, বিছা ভূত—এ সব তো ঘরে নেই। কিন্তু অন্ধকার ঘরে ঢুকলে মনে হয় ঐ বুঝি কোণে ভূত দাঁড়িয়ে আছে—পায়ের তলায় সাপের মত কি সড়সড় করল। এ সব তো অবস্তু—অর্থাৎ ঘরে নেই—এগুলি দেখাচ্ছে কে? অন্ধকারের বিক্ষেপ শক্তি। তাহলে অন্ধকার তার আবরণ শক্তি দিয়ে বস্তুকে ঢেকে রাখে আর বিক্ষেপ শক্তি দিয়ে অবস্তুকে দেখায়। মায়াও তাই করে। মায়ারও দুটি শক্তি। আবরণ শক্তি দিয়ে বস্তু অর্থাৎ ভগবানকে ঢেকে রাখে দেখতে দেয় না। কারণ প্রত্যেকের ভিতরে ভগবান অন্তর্য্যামিরূপে পরমাত্মারূপে আছেন—কিন্তু মায়া বুঝতে দিচ্ছে না—আবরণে রেখেছে। যদি এই বোধ হত যে প্রত্যেকের ভিতরে ভগবান আছেন তাহলে সংসারে এই অশান্তি মারামারি কাটাকাটি হানাহানি কিছুই থাকত না। আর মায়া তার বিক্ষেপশক্তি দিয়ে অবস্তুকে দেখায় অনুভব করায়। অবস্তু বলা হয় ভগবানকে বাদ দিয়ে আর যা কিছু। যা নিয়ে আমরা সংসারে মেতে থাকি। ধনী মানী কুলীন পণ্ডিত সবই অবস্তু। এসব অনুভব করায় মায়ার বিক্ষেপশক্তি। তাই মায়াকে বলা হয়েছে অন্ধকার। অন্ধকার যেমন আলোর কাছে যেতে পারে না—সূর্য্যের কাছ থেকে অন্ধকার বহু দূরে থাকে কারণ অন্ধকার জানে সূর্য্যের সান্নিধ্যে গেলে তার নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে যাবে। কারণ নিজের অস্তিত্ব স্বাতন্ত্র কেউ হারাতে চায় না। তেমনি মায়া ভগবানের কাছে ঘেঁসে না। কারণ ভগবানের সান্নিধ্যে গেলে মায়া তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে। মায়া অন্ধকার কৃষ্ণসূর্য্য—যেখানে ভগবান সেখানে মায়ার কোন সম্পর্ক নেই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাছে কলিরাজ (মায়া)

শরণাগতি নিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছেন—প্রভু যে তোমার নাম লয় তারে মোর নাহি দায়। যে তোমার নাম উচ্চারণ করবে তোমার চরণাশ্রয় করবে তার উপর আমি আমার কোন প্রভাব বিস্তার কখনও করব না—কথা দিলাম। তাই ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু তুমি মায়াধমন। তুমি মায়াবন্ধন মোচন করবার জন্যই এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছ। ভগবানের এই মায়াধমন অবতারে তাঁর কাছে শত্রু মিত্র বিচার নেই। মিত্রের মায়া যেমন নিরসন করেছেন শত্রুর মায়াও তেমনি নিরসন করেছেন। যেমন অঘাসুর—তার উদরে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র প্রবেশ করেছেন। শ্রীশুকদেব বলেছেন—বাইরে প্রতিমা (শ্রীবিগ্রহ) দেখে এসে মনে মনে তার রূপ যদি কেউ ধ্যান করে—এরই নাম মনোময়ী প্রতিমা তাহলেও তার মায়া অনায়াসে জয় হয়ে যায় সে ভাগবতী গতি লাভ করে। আর সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ অঘাসুরের উদরে প্রবেশ করেছেন তার তো মুক্তি লাভ হবেই। এর থেকে কি বুঝতে হবে যে প্রতিমা অর্থাৎ বিগ্রহের চেয়ে সাক্ষাৎ স্বরূপের বৈশিষ্ট্য বেশী? না, তা হতে পারে না। কারণ স্বরূপ ও বিগ্রহের মধ্যে তো কোন পার্থক্য করলে চলবে না। কারণ স্বরূপ এবং বিগ্রহ তো অভিন্ন। বলা আছে—

যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ।

আরও বলেছেন—বিগ্রহ এব ভগবান্, ভগবান্ এব বিগ্রহঃ।

এখন মায়া নিরসনের জন্য কোন স্বরূপ কতটুকু শক্তি ব্যয় করেছেন এই নিয়েই ভগবত্তার তারতম্য। কৃষ্ণ অবতারে মায়ামুক্তি যত হয়েছে এমন আর কোন অবতারে হয়নি। আর প্রকৃতপক্ষে মায়ামুক্তি ছাড়া জীবকে অন্য কিছু দান দানের মধ্যে গণ্য হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্ত—তাকে গলায় চেপে কেউ ধরেছে তখন তার পরিত্রাণের উপায় হল গলার বন্ধন থেকে তাকে ছাড়ান। তখন খাদ্য পানীয় দিলে তার প্রকৃত উপকার করা হল না। মায়া বলতে এখানে অচিন্ত্যলীলত্ব—যার কথা চিন্তা করা যায় না।

এবারে ব্রজরাজনন্দনরূপে অবতীর্ণ হয়ে যে মায়াবৈভব প্রকাশ করেছেন তা অন্য কোনও অবতারে প্রকাশ করেন নি। কৃষ্ণ মৃদ্‌ভক্ষণ লীলায় যে মায়াবৈভব দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না। মা যশোমতী গোপালের মুখবিবরে কোথাও মাটি লেগে আছে কি না দেখতে গিয়ে দেখলেন অনন্তকোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। মা তখন মনে মনে ভাবছেন এ আমি কি দেখছি? গোপালের মুখের ভিতর তো কতবার দেখেছি কিন্তু কখনও তো এ সব দেখি নি। তখন মা বিকল্প করেছেন।

কিং স্বপ্ন এতদুতদেবমায়া কিংবা মদীয়ো বত বুদ্ধিমোহঃ
অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্য যঃ কশ্চনৌৎপত্তিক আত্মযোগঃ।

ভাঃ ১০।৮।৩০

মা যশোমতী গোপালের মুখবিবরে অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করবার পরে নানা বিকল্প করছেন। এ আমি কি দেখছি? এ কি স্বপ্ন? তখন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ টীকার মাধ্যমে বলেছেন—মা তুমি স্বপ্ন দেখছ কি করে ভাবতে পারলে? স্বপ্ন তো মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে। তুমি তো ঘুমিয়ে নেই। তুমি তো জেগে আছ। জেগে জেগে তো কেউ স্বপ্ন দেখে না। তাই এটি স্বপ্ন নয়। তাহলে কি এ কোন দেবতার মায়া? কোন দেবতা কি মায়া বিস্তার করে আমাকে এই সব দেখাচ্ছে? চক্রবর্ত্তিপাদ বলছেন—না দেবতার মায়াও হতে পারে না। কারণ মম নিকৃষ্টায়া মোহনে দেবানাং প্রয়োজনাভাবাৎ। আমার মত নিকৃষ্টা জ্ঞানহীনা গোয়ালিনীর ওপরে দেবতারা কেন মায়া বিস্তার করতে আসবেন? এটি মায়ের স্বাভাবিক দৈন্য। এমন দৈন্য না থাকলে কি গোপালের মা হওয়া যায়? আমাদের তো দৈন্য স্বাভাবিক হয় না। মায়ের দৈন্য স্বাভাবিক তবু কৃত্রিম দৈন্য অভ্যাস করতে পারলেও লাভ আছে। কৃত্রিম দৈন্য অভ্যাস করতে করতে যদি কোনদিন সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টি পড়ে তাহলে ঐ কৃত্রিম দৈন্যও স্বাভাবিক দৈন্যে পরিণত হতে পারে। মা আর একটি বিকল্প করছেন। তবে কি আমার

এটি বুদ্ধির বিভ্রান্তি ? কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে ? মা ভাবছেন—আমার শরীর তো সম্পূর্ণ সুস্থ সুতরাং বুদ্ধির বিভ্রান্তি হওয়া তো সম্ভব নয়। যখন কোন বিকল্পই টিকল না—তখন অগত্যা মা সিদ্ধান্ত করছেন এটি বোধহয় আমার গোপালের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মায়ের এ সিদ্ধান্তে আমাদের মনে হতে পারে মা কি করে গোপালের ঐশ্বর্য্যের কথা ভাবতে পারলেন ? কারণ ব্রজবাসী তো কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের গন্ধও সহ্য করতে পারে না। বলা আছে 'ঐশ্বর্য্য দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে।' কৃষ্ণস্বরূপে কোন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ চোখে দেখলেও তাকে কৃষ্ণ বলে মানে না। যেমন ভগবান একবার পরীক্ষা করবার জন্য অন্য কোনও ঐশ্বর্য্য নয়—কেবলমাত্র দুটি হাত বেশী প্রকাশ করেছিলেন—স্বাভাবিকভাবে তাঁর তো দুটি হাত আছেই—আর দুটি হাত বেশী প্রকাশ করে চতুর্ভুজ হয়ে বসে আছেন। ব্রজরমণীরা যখন কৃষ্ণ খুঁজতে খুঁজতে সেইখানটিতে উপস্থিত হয়ে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করলেন তখন কৃষ্ণ চরণে প্রণাম করেছেন নারায়ণজ্ঞানে (কারণ নারায়ণের তো চতুর্বাহু—নারায়ণ হলেন ব্রজবাসীর দেবতা) জিজ্ঞাসা করলেন ওগো, আমরা কৃষ্ণ হারিয়ে ফেলেছি তুমি আমাদের কৃষ্ণ কোথায় বলে দিতে পার ? কৃষ্ণ তো শুনে অবাক্ হয়ে গেলেন। মোটে দুটি হাত বেশী প্রকাশ করেছি এতেই এরা আমাকে কৃষ্ণ বলে মানতে চায় না। এর পরে যখন রাধারাণী এলেন তখন কৃষ্ণ তো বাড়তি হাত দুটি রাখতেই পারলেন না। গোপন করতে হল। কারণ রাধারাণীর প্রেমের এমনই প্রাবল্য যে সেখানে বাড়তি দুটি হাতও প্রকাশ করা চলে না। তাহলে মা যশোমতী এখানে কি করে ভাবতে পারলেন যে গোপালের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পেয়েছে ? এখানে মা যে ঐশ্বর্য্যের কথা বলেছেন—সেটি অগত্যা। যখন কোন বিকল্পই টিকল না—তখন মায়ের সর্ব্বজ্ঞ মুনি গর্গাচার্য্যের বাক্য মনে পড়েছে। গর্গাচার্য্য তো বলেছেন গোপালের নারায়ণের সমান গুণ আছে। গর্গমুনি

গোপালের নামকরণ ও জাতকর্ম করতে এসে এ কথা বলেছিলেন। নারায়ণের তো ঐশ্বর্য্য আছে তাহলে সেই ঐশ্বর্য্য বোধহয় কিছু আমার গোপালে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এটি গোপালের ঐশ্বর্য্য বলে মা বললেও এতে গোপালের কোন মহিমা কোন উৎকর্ষ বেশী গুণ বলে মা মনে করেন নি। বরং তাঁর মনে হয়েছে—গোপালের মুখের মধ্যে আমি এ সব কি যা তা দেখছি? গোপালকে ভূতে পায় নি তো? তাকে বাতাস লাগে নি তো? তার কোন অনিষ্ট হয় নি তো? তার শরীর অসুস্থ হয় নি তো? এই সব নানা অমঙ্গল আশঙ্কা। এ ঐশ্বর্য্য চোখের সামনে দেখেও মা গোপালের সম্বন্ধে নিজের সম্বন্ধ বোধটি ত্যাগ করতে পারেন নি—বলেছেন মমার্ভকস্য—আমার পেটের ছেলে। সুতরাং মায়ের বাৎসল্য রস আস্বাদনে কোন বাধা পড়ে নি। এর নাম বিশুদ্ধ প্রেম। আর ঐশ্বর্য্য দেখে যদি নিজের সম্বন্ধ বোধ হারিয়ে যায় বা সঙ্কোচ আসে তাহলে বুঝতে হবে যে প্রেম খাঁটি নয়। যেমন অর্জ্জুনের সখ্যরস। অর্জ্জুন ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করে সংকুচিত হয়েছেন। নিজের সম্বন্ধ বোধ হারিয়ে ফেলেছেন—বরং সখা হিসাবে যে আচরণ করেছেন একপাত্রে ভোজন করেছেন—এক আসনে উপবেশন করেছেন—এক শয্যায় শয়ন করেছেন—এ চিন্তা করে লজ্জাবোধ করেছেন—শ্রীকৃষ্ণচরণে স্তুতি করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এতে বুঝা যাচ্ছে—অর্জ্জুনের সখ্যরস খাঁটি নয়—ঐশ্বর্য্যের মিশ্রণ আছে। মায়ের বিশ্বরূপ দর্শন এবং অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন—এই দুইএর মধ্যে এইখানে তফাৎ।

মা মনে করছেন—নারায়ণের কোন ঐশ্বর্য্য আমার গোপালে প্রকাশ পেয়ে থাকবে। ব্রহ্মমোহন লীলায় যেমন কৃষ্ণতত্ত্ব মূর্ত্তিমান শ্রীবলদেব মনে করেছিলেন—আমার ওপর তো অন্য কোন মায়া প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। এ যদি কোন মায়া হয় তাহলে আমার ভর্ত্তা কৃষ্ণের মায়া। তাই মা যশোদা বলছেন—

অথো যথাবন্নবিতর্কগোচরং চেতোমনঃ কর্মবচোভিরঞ্জসা।

যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে সুদুর্বিভাব্যং প্রণতাস্মি তৎপদম্ ॥

ভাঃ ১০।৮।৪১

মা এখানে শ্রীমন্নারায়ণের চরণে বার বার প্রণাম করে গোপালের মঙ্গল কামনা করছেন---'ঠাকুর তোমার কৃপাতেই গোপালকে কোলে পেয়েছি তুমিই তাকে রক্ষা করো---তার যেন কোনও অমঙ্গল না হয় কোনও অনিষ্ট না হয়। পর পর দুটি বাক্যে মায়ের সিদ্ধান্ত তা পরস্পর বিরোধী নয়। এটিও ভূমাপুরুষের প্রসঙ্গের মত ব্যাসকূট। এ বিষয়ে স্বামিপাদ এবং তোষনীকার গোস্বামিপাদের মধ্যে মতভেদ আছে। স্বামিপাদ বলেছেন নিজপুত্রকেই পরমেশ্বর জেনে মা প্রণাম করেছেন। কিন্তু তোষনীকার গোস্বামিপাদ বলেছেন—মা যদি কৃষ্ণকেই পরমেশ্বর জানেন তাহলে প্রণতাস্মি তৎপদম্—এখানে 'তৎ'পদ বসালেন কেন? দৃশ্যমান আশ্চর্য্যবস্তু যাকে আশ্রয় করে হয়েছে অর্থাৎ যে অধিষ্ঠান (৭মী) যেন প্রতীয়তে যার দ্বারা প্রতীত হচ্ছে (করণ ৩য়া) এবং যার থেকে প্রতীত হয়েছে (অপাদান ৫মী) শ্রুতিও বলেছেন—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যস্মিন্ অভিসংবিশন্তি এই বস্তুটি সুদুর্ব্বিভাব্যম্—থাকলেও দেখা যাচ্ছে না। এটি যথাযথরূপে তর্কগোচর নয়। চরম পক্ষ অবলম্বন করেও মা গোপালের অঙ্গের কোমলত্ব স্বভাবের চাঞ্চল্য দর্শন করে তা যেন মানতে চাইছেন না। কারণ প্রেমের স্বভাবই এই। তাই প্রেমকে সস্তা করে বুঝলে হবে না। বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমে মা জয়ী হয়েছেন। এমন জয় আর কারও হয় নি। যার অন্তর নেই, বাহির নেই, পূর্ব্ব নেই, পশ্চিম নেই সেই চিৎপুঞ্জকে মা বেঁধে দিয়েছেন। প্রাকৃত বালককে যেমন করে মায়েরা এ জগতে বাঁধে—শ্রীশুকদেব তো তাই বললেন।

ববন্ধ প্রাকৃতং যথা।

মা যশোদা যে কৃষ্ণকে বেঁধেছেন—তাতে সামর্থ্য চাই। কারণ

একতো ধৃত্বা পরতো পরিবেষ্টনেন বন্ধনং ভবতি। দড়ি একদিকে ধরে বেষ্টন করে ঘুরিয়ে এনে দুটি মুখ জোড়া দিলে তবে তো বন্ধন হবে। কিন্তু যাকে বাঁধতে যাচ্ছেন মা তার তো অন্তর নেই বাহির নেই—দড়ি ঘোরাবার তো জায়গা নেই—আর তা ছাড়া সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দিয়েও তাকে বাঁধা যায় না—সেই ব্রহ্মাণ্ডের একাংশ হল রজ্জু—তাই তা দিয়ে বাঁধা কেমন করে সম্ভব হবে? এখন প্রশ্ন হতে পারে মা গোপালকে কিসের প্রভাবে বাঁধলেন? মা গোপালকে বাৎসল্য প্রেমের রজ্জু দিয়ে বেঁধেছেন। ভগবানের যত যত গুণ আছে তার মধ্যে গুণসম্রাট হল ভক্তবাৎসল্য গুণ। ভক্তের প্রতি বাৎসল্য যদি না থাকে তাহলে ভগবানের কোন গুণ কাজে লাগে না। ভক্তানুগ্রহ গুণ না থাকলে ভগবানের অন্য গুণও দোষে পরিণত হয়। গুণের লক্ষণ হল জনসুখহেতু যে ধর্ম তার নামই গুণ আর নির্দ্দয়তাই হল দোষ। অন্য সব গুণকে সার্থক করবার জন্যই গুণসম্রাট ভক্তানুগ্রহ গুণটি ভগবানের আছে। ভক্তের ভক্তোচিত গুণ হওয়া উচিত। যে যে রকম ভক্তি করে তাকে ভগবান সেইরকম অনুগ্রহ করেন। গীতাবাক্যে ভগবান বলেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। গীঃ ৪।১১

ভগবানকে বশ করতে পারে এমন বশীকারিণী ভক্তি যদি কেউ লাভ করতে পারেন তাহলে ভগবান তার বশীভূত হন। কারণ বলা আছে ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভগবান ভক্তির বশীভূত। অধীনতা শব্দের অর্থ হল অন্তর্বাহি ঈহাময়ী চেষ্টা—অর্থাৎ অন্তরে বাইরে দুইদিক্ দিয়েই চেষ্টা দেখাতে হবে। কাজে অধীনতা দেখাতে হবে শুধু মুখে বললে চলবে না। ভগবান মায়ের কাছে বন্ধন স্বীকার করে দেখালেন আমি অধীন হয়েছি। এ অধীনতা স্বীকার ভগবানের অভিনয় নয়। অভিনয় করলে ভক্তির কাছে প্রতারণা হয়। প্রতারণা ভগবান করতে পারেন না। কারণ প্রতারণা হল মায়িক গুণ। ভগবান চাতুরী করেন কিন্তু প্রতারণা করেন না। যশোদা মায়ের

প্রেমরজ্জুই শ্রীবালগোপালকে বেঁধেছে। বৈকুণ্ঠনাথ আগেও বলেছেন অহং ভক্তপরাধীনঃ—লেখাপড়া করেছেন কিন্তু দখল দেন নি। যশোদা মায়ের বন্ধন স্বীকার করে এ বাক্যের সম্পূর্ণতা দেখালেন। উদ্ধবজীও বলেছেন—

বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ— ভাঃ ১০।৪৭।৫৮

যে প্রেম মুনিরাও বাঞ্ছা করে—আবার মুনিদের ওপরে যে আমরা আমরাও বাঞ্ছা করি। তাই বুঝা যাচ্ছে প্রেম সস্তা নয়। প্রেম অতি দুর্লভ বস্তু। প্রেম ভগবানকে অধীন করে এইটিই হল প্রেমের গৌরব। লীলার সমাবেশ—মা যদি গোপালকে পরমেশ্বর ভেবে বন্দনা করেন তাহলে ব্রজপ্রেমের মহিমা চলে যায়। ভগবত্তা যদি ব্রজবাসীর কাছে মাথা তুলে দাঁড়ায় তাহলে ব্রজপ্রেমের মহিমা থাকল না। গোস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করেছেন মা যশোমতী গোপালে ঈশ্বর জ্ঞান করেছেন তা নয়। তাহলে যেন যতঃ যৎ—এসব পদ কেন? সোজাসুজি কৃষ্ণ বললেই পারতেন। সেই দুর্ব্বিভাব্যকে প্রণাম করেছেন শ্রীশুকদেব খুব চতুর। তাই মাকে দিয়ে গোপালকে প্রণাম করান নি। মায়ের পক্ষে বিশ্বরূপ দর্শন খুব গৌরব নয়। বিশ্বরূপ দর্শন সাধনার প্রথম সোপান। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে দ্বিতীয় স্কন্ধে বলা হয়েছে স্থূল বিরাটের ধ্যান অতি নূ্যন কক্ষার জিনিষ। কৃষ্ণে পরমেশ্বরের জ্ঞানও যশোদার হয় নি। বসুদেব দেবকীর সে জ্ঞান হয়েছিল। কৃষ্ণ আমাদের পুত্র বটে কিন্তু তিনি স্বরূপে ভগবান। বসুদেব দেবকীর এই ভগবত্তার বোধটিই পুত্রভাবের ওপরে জেগে আছে। তাই কংসের কারাগারে বসুদেব দেবকী ভগবানকে স্তুতি করেছেন। কিন্তু বিশুদ্ধ বাৎসল্য প্রেমময়ী জননী যশোদা কৃষ্ণকে স্তুতি করেন নি। পূর্ব্ববাক্যে যে কশ্চন আত্মযোগ বলেছেন পরবর্ত্তী বাক্যে তা খণ্ডন করেছেন। জগৎ যে কৃষ্ণমুখবিবরে প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাও বলা যাবে না। কারণ তাহলে বিলোমতয়া দৃশ্যতে। যশোদা গোপালের মুখবিবরে গোপালকেও দর্শন

করেছেন। তাই প্রতিবিম্ব নয়। মা যশোদা ভাবছেন এ অঘটনের কারণ একমাত্র পরমেশ্বর নারায়ণ। যাকে আশ্রয় করে জগৎ থাকে যার থেকে উৎপত্তি এবং যার দ্বারা পালন এ সবই আমাদের মত গোপজাতির ধ্যানের অগোচর। মা কেবল তৎ পদে প্রণাম করছেন। কেন? শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বললেন—সুতস্বাস্ত কামনা করে। ছেলের মঙ্গল কামনা করে। কারণ পুত্রকামনা করে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেছিলেন নন্দমহারাজ কিন্তু তাতেও পুত্র হয় নি। যজ্ঞ নিষ্ফল হয়েছে। এর তাৎপর্য্য হল যজ্ঞের ফলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ভগবানকে পাওয়া যায় প্রেমে। কুলদেবতা নারায়ণের কৃপাতেই গোপালকে কোলে পেয়েছি। তাই নারায়ণই তাকে রক্ষা করবেন। মাঝখান থেকে আমি কেন উদ্বিগ্ন হচ্ছি—মায়ের মনের এই ভাব। আমি গোপালের পালয়িত্রী—এ অভিমানও তো আমার ঠিক নয়। মায়ের মনের এই রকমের অবস্থা—মা বলছেন—

অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো ব্রজেশ্বরস্যাখিলবিত্তপা সতী
গোপ্যশ্চ গোপাঃ সহ গোধনাশ্চ মে যন্মায়য়েত্থং কুমতিঃ
স মে গতিঃ॥

ভাঃ ১০।৮।৩২

ব্রজের বলতে যা কিছু সবই নারায়ণের কৃপায় পাওয়া। তাই আমি আমার এ অভিমান তো আমার ঠিক নয়। এটি মায়া থেকে উত্থিত কুমতি। সবই নারায়ণের। মাঝথেকে আমি এসব আমার বলে কেন অভিমান করি? এই বিবেক গ্রহণটি মায়ের ক্ষণিকী। এই তত্ত্বজ্ঞানটি বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নি। কাজেই সত্য করে একে বিবেক বলা চলে না। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ তাই বললেন এটি বিবেক নয়—কিন্তু বিবেকজিঘৃক্ষা। বিবেকের মত বলে মনে হচ্ছে। শ্মশানবৈরাগ্যের মত। শ্মশানে মানুষের মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় কিন্তু ঐ যতক্ষণ শ্বশানে থাকে ততক্ষণ। এটি স্থায়ী হয় না। মায়ের এ তত্ত্ববোধও স্থায়ী হয় নি। শ্রীশুকদেব বললেন—

ইত্থং বিদিততত্ত্বায়াং গোপিকায়াং স ঈশ্বরঃ।
বৈষ্ণবীং ব্যতনোন্মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ॥

ভাঃ ১০।৮।৩৩

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় বলেছেন—তৎপাদপদ্মভক্তিহীনা যে আমি মা ভাবছেন—তাই পরমেশ্বরের মায়ায় আক্রান্তা হয়ে আমার এই কুমতি এসেছে যে এই ঐশ্বর্য্য গোপালের এ আত্মযোগ আমারই বালকের। চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন—মহামোহান্ধানামপি ব্যবহারিক—লোকানাং কদাচিৎক পারমার্থিকপ্রসঙ্গভবাৎ স্ত্রীপুত্রাদ্যাসক্তি-জিহাসেতি জ্ঞেয়ম্। জগতের লোক যেমন মহামোহরূপ অন্ধকারে ডুবে থেকে কখনও পরমার্থিক ভগবৎ প্রসঙ্গের ফলে স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্তি ত্যাগের ইচ্ছামাত্র করে কিন্তু সেটি স্থায়ী হয় না। মায়ের এ তত্ত্ববোধও তেমনি ক্ষণিক। এটি স্থায়ী হল না।

যশোদা মায়ের মনে যেই তত্ত্বজ্ঞানটি এসেছে তখনই গোপালের চিন্তা হয়েছে মায়ের যদি এইরকম তত্ত্বজ্ঞান হয় তাহলে আমাকে লালন পালন করবে কে? আবার মায়ের এই তত্ত্বজ্ঞানে নারায়ণও চিন্তিত হয়েছেন—তাই মায়ের প্রার্থিত সেই ঈশ্বর মমত্বত্যাগময়ী মায়া সরিয়ে নিলেন। মায়ের ওপরে পুত্রস্নেহময়ী মায়া অর্থাৎ বাৎসল্য প্রেম আরও বেশী করে ঘন করে বিস্তার করলেন। এখন কথা হচ্ছে ভগবৎ সম্পর্কে তো মায়া হতে পারে না। তবে একে মায়া বলা হল কেন? এটি প্রকৃতপক্ষে মায়া নয়। কিন্তু মায়া যেমন মোহ ঘটায় এও তেমনি মোহসাধক বলে একে মায়া বলা হচ্ছে। প্রেমকে যে মায়া বলা হচ্ছে তার কারণ হল ঐশ্বর্য্য অনুসন্ধান পদ্ধতিকে আবৃত করেছে। এইজন্য মাকে অতদ্বীর্য্য কোবিদা বলা হয়েছে। মায়া আক্রমণে জীবের মোহ হয় কিন্তু বুঝা যায় না।

এইরূপে বিদিততত্ত্ব মায়ের ওপর বিষ্ণুর স্বরূপভূত বৈষ্ণবী মায়া পুত্রস্নেহরূপ বাৎসল্য প্রেম ঘন করে বিস্তার করলেন। এটি মহামায়ার কাজ নয়। কারণ মহামায়া প্রাকৃত পুত্রে স্নেহ দিতে পারে

কিন্তু ভগবান পুত্রে স্নেহ দিতে পারে না। মা যশোদার বাৎসল্যপ্রেম হল স্বাভাবিক। তত্ত্বজ্ঞানের আভাসটি ক্ষণিক। সেটি নারায়ণ সমাধান করলেন। এই ব্যাসকূটের গ্রন্থিমোচন করেছেন গোস্বামিপাদ।

ব্রহ্মা বললেন, হে বালগোপাল, তুমি তোমার মুখবিবরে যে ব্রহ্মাণ্ড মাকে দেখালে সেটি একটি আর বাইরে যে ব্রহ্মাণ্ড দেখা যাচ্ছে সেটি অপরটি—এই দুই ব্রহ্মাণ্ড সত্য হয় কি করে? তাহলে তোমার উদরে যে ব্রহ্মাণ্ড সেটি মায়া। ভগবান অর্জুনদেবকেও বলেছিলেন—'পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।' এই যোগ শব্দের ব্যাখ্যা প্রমেয়রত্নাবলীতে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ করেছেন অচিন্ত্যাশক্তি-রস্তি ঈশে বিরোধভঞ্জিকা সা স্যাৎ—ইতি তত্ত্ববিদাং মতম্। ভগবান যে অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে সমস্ত বিরুদ্ধগুণ তাঁর স্বরূপে নিহিত রাখেন তারই নাম যোগ।

যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধসত্ত্ব পরিণতি তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
অপ্রাকৃত রূপরতন ভক্তগণের গূঢ়ধন প্রকট কইল নিত্যলীলা হইতে॥

ভগবৎ স্বরূপে সবই বিরুদ্ধ—কোনটি সহজ নেই। জগতেও দেখা যায় কোন লোক মত্ত অবস্থায় বেতাল হলে তাকে ঠিক রাখবার জন্য সঙ্গে লোক দরকার হয়—ভগবানও তেমনি ভক্তের প্রেমমদিরা পানে এমনই মত্ত হয়েছেন যে তিনি বেতাল হয়ে পড়েছেন—তাই তাঁকে ঠিক রাখবার জন্য যোগমায়া সঙ্গে আছেন। শ্রুতি ভগবানকে বলেছেন—পূর্ণকাম। কোটি লক্ষ্মী যাঁকে সম্ভ্রমের সঙ্গে সেবা করেন। সেই ভগবানকে শ্রীশুকদেব যেমনটি দেখেছেন তেমনি বর্ণনা করছেন। তিনি বলছেন—সেই আপ্তকাম পূর্ণকাম ভগবান স্তন্যকাম। এই স্তন্যকাম ভগবানকে বলতে গিয়ে ব্রহ্মা গরব করে বলেছেন—

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা যত্তৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ॥
ভাঃ ১০।১৪।৩১

ব্রজের গাভী এবং গোপরামাগণ ভগবানকে স্তন্যপান করিয়ে যে ধন্যতাকে লাভ করেছিল ব্রহ্মাকে সে ধন্যতা স্পর্শ করতে পারে নি। এ বাক্য ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালের সামনেই বলেছেন। কাজেই এতে গোপালেরও অনুমোদন আছে বুঝতে হবে। ব্রহ্মা বললেন ভগবান যে এই স্তনদুগ্ধ পান করেছেন—সেটি পরিপূর্ণ ক্ষুধা নিয়ে—ক্ষুধায় তৃপ্তি পাওয়ার জন্য পান করেছেন—এ অনুরোধে পড়ে পান করা নয়। আবার বললেন মুদা অর্থাৎ ঔদরিকের (পেটুক) মত অত্যন্ত আনন্দ করে পান করেছেন। ভগবান যেন জিজ্ঞাসা করতে চাইছেন—ব্রহ্মন্‌, আমি যে অত্যন্ত আনন্দ করে পান করেছি তার প্রমাণ কি ? সেটি ভগবানের আচরণ দেখেই বুঝা যাচ্ছে। ভগবান ব্রজের গাভী এবং ব্রজরমণীদের মনের কথা জেনেই তাদের বাসনা পূরণ করেছেন। কারণ

আপন ইচ্ছায় জীব কোটি বাঞ্ছা করে।
কৃষ্ণের যে ইচ্ছা সেই ফল ধরে॥

এখন কথা হচ্ছে ভগবান জীবের কোন বাসনাটি পূরণ করেন ? এর মধ্যে দুটি হেতু আছে। (১) স্বার্থ অনুসন্ধান (২) দয়াপরবশ। জীবকে দয়া করবার জন্য তিনি তার বাসনা পূরণ করেন। যে ইচ্ছা পূরণে জীবের কল্যাণ হবে ভগবান সেই ইচ্ছা পূরণ করেন। পুত্র লাভে আমরা কল্যাণ ভাবি কিন্তু পুত্র চলে গেলেও যদি সমানভাবে কল্যাণ বলে ভাবতে পারি তবেই বুঝতে হবে সাধনা ঠিক হয়েছে। পুত্র দেওয়া এবং পুত্রকে নিয়ে নেওয়া দুটিই তাঁর করুণা—কবি বললেন—

তোমারই দেওয়া নিধি তোমারই কেড়ে নেওয়া

এই ভাবনাই সারাজীবনে অভ্যাস করতে হবে। পুত্র পাওয়া এবং হারান এই দুইএর মধ্যে যদি হৃদয়ে কোন দাগ না লাগে তবে সাধন ভজন ঠিক হয়েছে বুঝতে হবে। যার মনে এটি হয় নি—তার প্রথমে মুখে বলা অভ্যাস করতে হবে। তাহলেও কাজ হবে।

প্রলেপের মত। মুখে বলা অভ্যাস হলে দেখতে হবে অন্তর সে কথা স্বীকার করছে কি না। কারণ আত্মপ্রতারণা করলে চলবে না। দুটি কারণে ভগবান কৃপা করেন—(১) আমার কল্যাণ (২) তাঁর কল্যাণ। জীবের কল্যাণের জন্য গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রকেতুকে কৃপা করেছিলেন। দেবর্ষিপাদ নারদ চিত্রকেতুকে মন্ত্রদীক্ষা দেন। মৃত-পুত্রতে জীবাত্মাকে ডেকে বললেন তুমি পিতামাতাকে ছেড়ে চলে গেছ—তারা তোমার জন্য কাতর—তাদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করতে সেইরকম ব্যবহার কর। নারদ সাধু লোক তাই ন্যায় অন্যায় বোঝেন। পিতামাতাকে বললেন দেহের মধ্যে যিনি থাকলে দেহ চলে ফিরে বেড়ায় কথা বলে—তার সন্ধান তো কোন দিন করেন নি মহারাজ। অত্যন্ত বিস্মৃতির নাম হল মৃত্যু। আত্মা হল ধানের বীজের মত। এর শেষ হয় না। জীবাত্মা বললেন—আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে সুখে যাচ্ছি। সুখ না হলে অন্যত্র যাব কেন? নারদ রাজাকে পারমার্থিক সম্পদ দান করলেন। এই সম্পদ দিয়েই কৃষ্ণ কেনা যায়। নারদ যদি রাজাকে প্রথমেই পারমার্থিক সম্পদ দিতেন তাহলে ঠিক হত না। কারণ রাজার চিত্ত তখন পুত্র লাভের জন্য কাতর কাজেই ভক্তির অনুকূল চিত্ত নয়। চিত্ত তখন আগাছায় পূর্ণ তাই তখন ভক্তিবীজ অংকুরিত হবে না। এখানে দেখা যাচ্ছে রাজাকে পুত্র দেওয়ার জন্য নারদের পুত্র দেওয়া নয় কিন্তু পুত্র বাসনার বীজ নষ্ট করবার জন্য পুত্র দেওয়া। ভগবান যখন জীবকে কোন প্রাকৃত সম্পদ দান করেন তখন বুঝতে হবে সে প্রাকৃত সম্পদ দানের জন্য প্রাকৃত সম্পদ দান নয় কোনও অপ্রাকৃত সম্পদ দানের জন্য সে প্রাকৃত সম্পদ দান করছেন। পরে রাজার যখন পুত্র বাসনা নির্ম্মূল হয়ে গেল তখন তাঁকে সঙ্কর্ষণ মন্ত্র দান করলেন। এর পরে একুশ দিন সেই মন্ত্র জপ করেই রাজা সিদ্ধি লাভ করলেন। বস্তু দান না করলে তার জ্বালা শেষ হবে না। প্রাকৃত কল্যাণ কখনও পারমার্থিক (আত্যন্তিক) কল্যাণ দান করে না।

ভগবানের পাদপদ্মে দাসত্ব চাওয়া ছাড়া জগতে অন্য কোনও উত্তম বস্তু নেই। প্রাকৃত সম্পর্ক যেখানেই থাকবে সেখানেই কাঁটা থাকবে। প্রাকৃত সম্পদ যত বাড়বে কাঁটার পরিমাণও তত বাড়বে। এ জগতে যতগুলি ভালবাসা (মমতা) ততগুলি ব্যথা। ভগবানের এই মায়ার জাল কে এড়াতে পারে? একমাত্র ভগবান যাকে কৃপা করেন সেই তাঁর জাল এড়াতে পারে। এইটি হল পরার্থে কৃপা। আর কৃষ্ণ যখন নিজের স্বার্থের জন্য কৃপা করেন সেটি হল উঁচু পর্দা। মনে হতে পারে আপ্তকাম পূর্ণকাম যদুপতির আবার নিজের স্বার্থ কি হতে পারে? অপূর্ণ যে সে স্বার্থ আদায় করে। ভরা কলসী কি জল চায়? ব্রজরমণী ও গাভীদের দয়া করবার জন্য যে তিনি তাদের স্তন্যপান করেছিলেন তা নয়। কারণ ব্রজবাসী কৃষ্ণের দয়া চায় না। তারাই কৃষ্ণকে দয়া করতে পারে—নন্দবাবার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে কৃষ্ণ প্রতিদিন গোচারণে যান। যেদিন চরণধূলি নিতে দেরী হয়ে যায় বাবা মার মনে শঙ্কা জাগে—গোপালের কোন অমঙ্গল হবে না তো? তাই তারা নিজেরাই নিজেদের চরণধূলি হাতে নিয়ে গোপালের গায়ে মাথায় মাখিয়ে দেন। সেই ব্রজবাসীকে দয়া করবার জন্য কৃষ্ণ স্তন্য পান করেছেন—একথা বলা চলে না। এখানে কৃষ্ণস্বরূপে অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে পূর্ণস্বরূপেরও প্রার্থিতা দেখান হয়েছে। এ জগতেও দেখা যায় মানুষের তৃপ্তি করে ভোজনের পরেও কেউ যদি প্রীতি করে কিছু দেয় তাহলে সে খায়। এখানে সামর্থ্য না থাকলেও খায়, আর ভগবানের তো সামর্থ্য আছে কিন্তু তাঁকে খেতে দেবার লোক কম। উট যেমন কয়েক দিনের খাদ্য জল নিজের দেহে সঞ্চিত করে রাখে ভগবান তেমনি চিরকালের খাদ্য স্বরূপে সঞ্চয় করে রেখেছেন শ্রুতি তাঁকে অপিপাস অজিঘৎস বলেছেন—অর্থাৎ তাঁর ক্ষুধা নেই পিপাসা নেই—খেতে দেবার লোক নেই বলে। কিন্তু বৃন্দাবনে তাঁকে খেতে দেবার লোক মিলেছে। কৃষ্ণের একমাত্র খাদ্য হল প্রেম। ব্রজবাসীর স্বরূপ তো

প্রেম দিয়ে গড়া। তাই তাদের গড়ন, চলন, বলন সবই প্রেমোত্থ অর্থাৎ প্রেমময়। মিছরির রসের যেমন পাতলা ঘন সবই মিষ্টি। ভগবানের খাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রাণ যেমন বায়ুর বিকার—তাই খেতে না পেলে প্রাণ চলে যায়—কিন্তু ভগবানের প্রাণ তো বায়ুর বিকার নয়—তাই খেতে না পেলে তাঁর প্রাণ চলে যায় না সত্য কিন্তু খাওয়ার ইচ্ছা তো তাঁর হয়। ব্রজবাসী তাই তাদের প্রেমোত্থ দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর এই চার রসের খাবার থরে থরে সাজিয়ে বসে আছে—কৃষ্ণ তা আস্বাদন করবেন এই আশায়। সান্নিপাতিক রোগী যেমন পিপাসায় সাগর শুষতে চায় ভগবান তেমনি ব্রজবাসীর প্রেম খাদ্যের লোভে পড়েছেন এক মুখে আস্বাদন করতে না পেরে তাই নিজ স্বরূপকে বহুরূপে প্রকাশ করেছেন। এতই লোভ যে লোভে পড়ে বাছুর পর্য্যন্ত হয়েছেন।

ব্রহ্মা বলছেন,—হে ভগবান্, তোমাকে তো তৃপ্তি দেওয়া যায় না। ব্রহ্মালোক থেকে যে যজ্ঞানুষ্ঠানের আরম্ভ সেই যজ্ঞাপিণ্ডে তোমাকে তৃপ্তি দেওয়া যায় না। ভগবান তৃপ্ত হলে তবে সাধককে নিজপাদপদ্মে প্রেমলক্ষণা ভক্তি দান করেন। কিন্তু যজ্ঞের ফলে ভক্তি লাভ হয় না। কাজেই বুঝা যাচ্ছে যজ্ঞ দিয়ে তাঁকে তৃপ্তি দেওয়া যায় না।

যোগমায়া যোগশক্তি এই বিরোধের সমাধান করেন। ব্রহ্মা বলছেন, হে বালগোপাল তুমি এই যোগশক্তি মায়ের কাছে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাবার সময় প্রকাশ করেছিলে। এটি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবিম্ব নয়। তাহলে বিলোম দৃষ্টি হত। এখানে মায়াত্ব বলতে যোগশক্তি।

ভক্তকে আনন্দ দান করেই ভগবানের আনন্দ। এইটিই ভগবানের স্বার্থবুদ্ধি। মা যেমন ছেলের আনন্দে আনন্দিত হন ভগবানও তেমনি ভক্তকে আনন্দ দিয়ে নিজে আনন্দিত হন। ভক্ত সুখী না হলে ভগবান আনন্দিত হন না।

ভগবানের ইচ্ছাকেই আত্মমায়া বলা আছে আর গুণমায়া জড়াত্মিকা। ভগবানের কার্য্যের সুবিধার জন্য যোগমায়া চিচ্ছক্তি

রয়েছেন। অপ্রাকৃত সম্পদের ভাণ্ডারী হলেন যোগমায়া। আর তাঁরই ছায়া হলেন মহামায়া। যোগমায়ার আবরিকা শক্তি হলেন মহামায়া। ভগবানের এই দুই মায়ার দুটি কাজ। ভগবানের পাদপদ্মে উন্মুখ জীবকে লীলানুরোধে মুগ্ধ করে রাখা যোগমায়ার কাজ। গোলোকের যোগপীঠ ধরে আছেন দুর্গা যোগমায়া। আর এ জগতে মহামায়ার কাজ হল ভগবানের পাদপদ্মে বিমুখ জনকে প্রাকৃত সম্পদ দিয়ে ভুলিয়ে রাখা। তাই এই মহামায়াকে যোগমায়ার আবরিকা শক্তি বলা হয়েছে। লীলাশক্তি যোগমায়ার কৃপাতেই আদিদেব অখিলেশ্বরকে জানতে পারা যায়। যোগমায়া হলেন কায়া আর মহামায়া হলেন তার ছায়া। ছায়া অর্থাৎ ছবি। ছবিতে যেমন কায়ার সাদৃশ্য থাকলেও তাতে কাগজ আর রং ছাড়া অন্য কোন বস্তু মেলে না তেমনি যোগমায়ার স্বরূপ সৎ চিৎ আনন্দ দিয়ে গড়া—সচ্চিদানন্দের লহর রয়েছে সেখানে। মহামায়াতেও ত্রিবিধ উপাদান। সত্ত্ব রজঃ তমঃ—রজঃ থেকে প্রকৃতি, তমঃ থেকে অবিদ্যা এবং সত্ত্ব থেকে বিদ্যা। রজোগুণের কাজ হল বাসনার উদ্রেক করা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা আছে—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ। গীঃ ৩।৩৭

প্রকৃতি বলতে এখানে স্বভাব নয়। সাংখ্য মতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব অর্থাৎ চব্বিশটি তত্ত্ব দিয়ে জীবদেহ গঠিত হয়েছে—এর মধ্যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চমহাভূত পঞ্চবিষয় (পঞ্চতন্মাত্র) মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার। প্রকৃতিকে বাদ দিলে চব্বিশটি বস্তু দিয়ে জগৎ তৈরী। জগতের উপাদান এইগুলি। এই জগতৎকে যিনি প্রসব করেছেন তাঁর নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি তো এই চব্বিশটি জিনিষ দিয়ে জগৎ সাজাল এখন দোকান তো সাজান হল কিন্তু দোকানের ক্রেতা কে? কারণ এরা তো সব অচেতন—কিন্তু অচেতন তো ক্রেতা হতে পারে না। মাটির বাসনের দোকানদার ঘট, সরা, কলসী, হাঁড়ি—মাটির নানারকমের ফল আম আতা কলা

কমলালেবু আবার মাটির হাতি, ঘোড়া সব দোকানে সাজিয়ে রেখেছে
কিন্তু এরা সব তো অচেতন—এরা তো ক্রেতা হতে পারে না। যে
এগুলি কিনবে তাকে তো চেতন হতে হবে। তখন মহামায়ার আর
একটি বৃত্তি অবিদ্যা খরিদ্দার খুঁজতে বেরুল। কারণ জগতে চেতন
তো বেশী নেই। সবশুদ্ধ দুজন আছে। একজন হলেন বিভুচৈতন্য
ঈশ্বর আর একজন হলেন অণু পরিমাণ জীব। এখন বিভুচৈতন্য
ঈশ্বর তো মায়ার জিনিষ স্পর্শ করবেন না—তাঁর কাছে তো এসব
নিয়ে যাওয়া যাবে না। আর একজন চেতন আছে সে হল অণু
চৈতন্য জীব। অবিদ্যা কোনও রকমে এই অণুচৈতন্য জীবকে
ভুলিয়ে খরিদ্দাররূপে নিয়ে এল। জীবকে অবিদ্যা ভুলাচেছ—দেখ,
এ জগতে কত রূপ আছে, তোমার তো চোখ নেই তুমি তো দেখতে
পাও না, কত সুন্দর শব্দ আছে তোমার তো কাণ নেই শুনতে
পাও না। কত সুন্দর রস আছে তোমার তো জিহ্বা নেই তাই
আস্বাদন করতে পার না। কত রকম সুগন্ধ আছে তোমার তো
নাসিকা নেই তাই আঘ্রাণ করতে পার না। কত সুন্দর শীতল
কোমল স্পর্শ আছে তোমার তো ত্বগিন্দ্রিয় নেই, তুমি স্পর্শসুখ
অনুভব করতে পার না। এই দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি নাও তখন
দেখবে জগৎটা কত সুন্দর। অবিদ্যা এইভাবে জীবকে ভুলিয়ে এই
পচা চব্বিশটি জিনিষ জীবকে গছিয়ে দিল। জীবও মায়ার কুহকে
পড়ে দেহকে আমি বলে গ্রহণ করল এবং দৈহিক ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধিকে
আমার বলে গ্রহণ করল। শ্রীতৃতীয়ে কপিল ভগবান বলেছেন—

তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্। ভাঃ ৩।২৬।৭

দেহেতে আমি বুদ্ধি এবং দৈহিক বস্তুতে আমার বুদ্ধি—এর
নামই বন্ধন, এর নামই সংসার। অণু পরিমাণ জীবচৈতন্য দেহেতে
অহং বুদ্ধি এবং দৈহিক বস্তুতে মহত্ব অর্থাৎ আমার বুদ্ধি করে
ফেলল। এখন কথা হল জীবাত্মা চিৎ আর দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি
অচেতন জড়। এদের সম্বন্ধ সম্ভব হল কি করে? পিতার ওপর

অভিমান করে পুত্র যদি পিতার কাছ থেকে সরে এসে পথে নামে তাহলে তার জালিয়াতের পাল্লায় পড়বার সম্ভাবনা থাকে তেমনি ভগবানের অংশ জীবচৈতন্য সেই পরমপিতা ভগবান থেকে বিচ্যুত—শ্রীযোগীন্দ্র বলেছেন—ঈশাদপেতস্য—ঈশ অর্থাৎ পরমেশ্বর থেকে অপেত অর্থাৎ বিযুক্ত। অর্থাৎ অনাদিকাল থেকে জীব ভগবানকে ভুলে বসে আছে। এই অনাদি ভগবদ্বিমুখতা অপরাধে ভগবৎ পাদপদ্ম থেকে সরে এসে পচা দেহকে আমার বলে গ্রহণ করল। জীবের এই দেহাভিমান অবিদ্যা ঘটিয়েছে। বিদ্যার উৎপত্তি সত্ত্বগুণ থেকে। এই বিদ্যাবৃত্তির যদি কৃপা হয় তাহলে বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা দূর হয়। চন্ডীকার বললেন—

সা বিদ্যা পরমামুক্তে হেঁতুভূতা সনাতনী।

কিন্তু বিদ্যাবৃত্তির কৃপা হওয়া কঠিন। কারণ রজঃ ও তমঃ গুণের এতই বলবত্তা—তাদের কাছে সত্ত্বগুণোত্থা বিদ্যা দুর্ব্বল। তাই বিদ্যা বৃত্তির কৃপা পেতে হলে আমাদের সত্ত্বগুণকে বাড়াতে হবে। যাতে করে সত্ত্বগুণ বলবান হয়ে রজঃ ও তমঃ গুণকে জয় করতে পারে। সুতরাং বিদ্যাবৃত্তির কৃপা পাওয়া আমাদের ওপর মায়াতরণের জন্য নির্ভর করছে। আমাদের দেহ মায়ার সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিন গুণ দিয়ে তৈরী। তাই জীবকে মায়া আক্রমণ করেছে। ভগবান যে বললেন—আত্মমায়য়া সম্ভবামি। এখানে মায়া কেমন করে লাগবে? এখানে আত্মমায়া বলতে ভগবানের ইচ্ছাকেই বুঝাচ্ছে। তাই বলা হয়েছে—আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎ গুণমায়া জড়াত্মিকা। ভগবানের ইচ্ছাতেই ভগবানের আবির্ভাব। মায়া তো ভগবানের দাসী। সে কি প্রভুকে আকর্ষণ করতে পারে? ভগবানের ইচ্ছাকেই এখানে মায়া বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে কেন বলা হল? কারণ ইচ্ছা হওয়া মাত্রই ভগবান ইচ্ছার বশীভূত হয়ে পড়েন এবং মায়ার মত মোহিনী শক্তি ইচ্ছার আছে। যার ফলে ভগবানকে সে বশীভূত করে। তাই ইচ্ছাকে মায়া বলা হয়েছে।

ভগবানের দেহ মায়া তৈরী করে নি। তাই এ বিগ্রহ নিত্য। ভগবান বললেন তদাত্মানং সৃজাম্যহম্। আমি আমাকে সৃষ্টি করি। কিন্তু কর্তা ও কর্ম তো সৃষ্টি কাজে এক হতে পারে না। অন্যত্র হতে পারে। কাজেই এখানে আত্মানং বলতে অন্য স্বরূপকে বুঝাচ্ছে। অংশাংশিরূপে তাদের অভিন্নতা রয়েছে। এখানে সৃষ্টি করি এর অর্থ হল জগতে প্রকাশ করি। তাই যদি হয় তাহলে প্র পূর্ব্বক কাশ্ ধাতুর প্রয়োগ করলেই হত, সৃজ্ ধাতুর প্রয়োগ করা হল কেন? জগতে তো এর আগে এ স্বরূপকে আর কেউ দেখে নি। তাই অভূতপূর্ব্ব বলে সৃষ্টিবৎ সৃষ্টি। ভগবানের যত বিগ্রহ আছে সবই নিত্য এবং শাশ্বত।

ভগবানের আবির্ভাবের কারণ নির্দ্দেশ করা হয়েছে শ্রুতিস্তুতিতে। বেদশাস্ত্র মূর্ত্তিমতী শ্রুতির অবয়বমাত্র। বেদে দেহ আছে বাক্য নেই। দেহের সারাংশ হল বাক্য। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে দশমস্কন্ধে সাতাশি অধ্যায়ে শ্রুতির বাক্য প্রকাশ পেয়েছে। এই শ্রুতিবাক্য জগতে প্রকাশ হওয়ার কথা নয় শ্রীশুকদেব কৃপা করে দিয়েছেন। প্রলয়কালে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত অবস্থায় ভগবানের নিদ্রাভঙ্গের জন্য শ্রুতিগণ স্তুতি করেন—সেই শ্রুতি বক্তা আর ভগবান শ্রোতা। এঁরাই কেবল সেখানে আছেন—আর কেউ সেখানে নেই। তারা অমর বলে সেখানে আছেন। ব্রহ্মলোকের নীচে যে তপোলোক সেখানে ব্রহ্মার পুত্রগণ থাকেন। এখানে কেবল জ্ঞানচর্চ্চা হয়। সেখানে ব্রহ্মসত্র হয়েছিল। একজনকে তাঁরা বক্তা করে অন্যেরা শ্রোতা হয়ে শোনার সুখ ভোগ করলেন। সেখানে প্রশ্ন হয়েছিল—সগুণ বেদ নির্গুণ ব্রহ্মে কেমন করে বিচরণ করে? শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন—

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। গীঃ ২।৪৫

বেদের কর্মকাণ্ড ও দেবতাকাণ্ড সগুণ কিন্তু জ্ঞানকাণ্ড অর্থাৎ উপনিষদ্ ভাগ হল নির্গুণ। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রুতিস্তুতির যথাযথ

অর্থ যদি হৃদয়ে ধারণ করতে পারা যায় তাহলে বেদ সগুণ হয়েও নির্গুণ ব্রহ্মে কেমন করে বিচরণ করে তা জানা যাবে। তপোলোকের ঋষিরা তাঁদের আর্ষপ্রজ্ঞার দ্বারা এটি ধরেছেন। অতীত অনাগত বস্তু দেখার চশমা হল আর্ষপ্রজ্ঞা। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে দূরের কথা যন্ত্র দিয়ে শোনা যায়। ভাল যন্ত্র হলে অতীতও জানা যাবে। বেদব্যাস সেই আর্ষপ্রজ্ঞার দ্বারা দ্বাপরে বসে কলির জীবের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন।

শ্রুতি স্তুতি করে বললেন—হে আত্ততনু, অর্থাৎ গৃহীততনু তুমি যে দেহ ধারণ করেছ—এর ওপরে অদ্বৈত বেদান্তী আপত্তি তুলবেন তাহলে ভগবান তনুকে গ্রহণ করলেন যখন বলা হল তখন তনু তো নিত্য নয়—অর্থাৎ আগে ছিল না। কিন্তু এ আপত্তি উঠতে পারে না। এই আপত্তি উঠতে পারে ভেবেই শ্রীধর স্বামিপাদ বললেন একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তঃ। ভগবানের লীলা নিত্য। তিনি নিত্য লীলাময়। কিন্তু দেহ না থাকলে তো লীলা হয় না। লীলার নিত্যতা স্বীকার করলে দেহের নিত্যতা স্বীকার করতে হয়। ভগবানের দেহ নিত্যই ছিল কিন্তু তাকে প্রপঞ্চ জগতে আনাই হল আত্ততনু পদের অর্থ। আত্ততনু অর্থাৎ প্রপঞ্চানীতং তনু। শ্রুতিগণ বলছেন—প্রভু তুমি অপ্রপঞ্চস্বরূপ হয়েও প্রপঞ্চ জগতে তোমার তনুকে প্রকাশ করিয়েছ। শ্রীদশমে দেবস্তুতিতে বলা হয়েছে —শরীরিণাং শ্রেয়ঃ উপায়নং বপুঃ। জীবের শ্রেয় উপায়ন হল তোমার শরীর। তোমার শরীরের যদি আবির্ভাব না হত তাহলে বেদ ক্রিয়াযোগ সমাধি অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বাণপ্রস্থ ও যতি (সন্ন্যাস) এই চারপ্রকার আশ্রমবাসীর পক্ষে তোমার পূজা করা কিছুতেই সম্ভব হত না। শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আনন্দের ঝরণা। তাতে অর্হণ সংযোগ করলেই কল্যাণ আসবে। মধুচক্রে খোঁচা দিলেই মধু ঝরবে। এই খোঁচাই হল পূজা। দেবর্ষিপাদ নারদ বলেছেন ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ এ জগতে যে কোন বস্তু চাওয়া যাক্ না কেন

হরিপাদপদ্ম আরাধনা না করলে কিছুই পাওয়া যাবে না। সকলের মূল হল তাঁর চরণ অর্চ্চন। এই অর্চ্চন সম্ভব হত না যদি তাঁর তনুর আবির্ভাব না হত। এখন প্রশ্ন হতে পারে ভগবানের তনু যিনি সকল মঙ্গলের মঙ্গল তাকে এ জগতে ভগবান আনেন কেন? শ্রুতিগণ বলছেন—তোমার তনু এ জগতে না এলে তোমার তত্ত্ববোধ হবে না। সৃজামি বলতে যদি সৃষ্টি বুঝায় তাহলে ভগবদ্বিগ্রহে অনিত্যতা দোষ আসে। ভগবানের যে কোন বিগ্রহই নিত্য শাশ্বত, আনন্দঘন জ্ঞানঘন।

উদরে মলের আধিক্য যেমন জিহ্বায় প্রকাশ পায় এবং চিকিৎসক তার থেকেই বিচার করেন তেমনি আমাদের হৃদয়রূপ জিহ্বায় মল জমা হয়ে আছে। সাধুগুরু বৈষ্ণব চিকিৎসক বুঝতে পারেন—তাই উপদেশ করেন প্রতিটি মুহূর্ত্ত আমাদের ভগবানের আরাধনায় লাগান উচিত। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের এইটিই মহিমা যে কোন অংশ পাঠ করলে বা শুনলে বুদ্ধি হরি পাদপদ্মকে স্পর্শ করে। এ জগতের সৃষ্টি মায়া থেকে তাই তার কোন সত্তা নেই। তবে ভগবানে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে বলে একে সৎ বলে মনে হয়। ব্রহ্মা তাই বললেন—সদিবাবভাতি। ভগবান অধিষ্ঠিত আছেন বলেই জগৎ আজও বেঁচে আছে। মায়ের কাছে শ্রীবালগোপাল যে মুখবিবরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়েছিলেন এটি কি তাঁর নূতন সৃষ্টি? জলশায়ী নারায়ণের বিগ্রহ অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ব্যাপক হয়েছেন। তা না হলে ঘরের মধ্যে ঘট যেমন ঘরকে ব্যাপ্ত করতে পারে না তেমনি ব্রহ্মাণ্ড ঘটে জল তাতে রয়েছেন নারায়ণ তিনি কেমন করে ব্যাপক হবেন? কিন্তু তিনিই ব্যাপক হবেন তাঁর অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে। এইটিকেই ব্রহ্মা মায়া বলেছেন। শ্রীবালগোপাল যে মাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেছিলেন সেটিও এই অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে।

যস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা।
তত্ত্বয্যপীহ তৎ সর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা॥ ভাঃ ১০।১৪।১৭

ব্রহ্মা শ্রীগোপালকে বলছেন, প্রভু, তুমি মা যশোদার কাছে তোমার মুখবিবরে যে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়েছিলে সেটি মায়া। তখন ভগবান যেন প্রশ্ন করছেন---কেন ব্রহ্মন্ তুমি এটিকে মায়া বলছ কেন ? এটি বাইরের ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিবিম্বও তো হতে পারে।

তার উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—যথা তথা অর্থাৎ যাথাতথ্যেন যথাযথ-রূপে বাইরে যে ব্রহ্মাণ্ড দেখা যাচ্ছে যথাযথরূপে তোমার মধ্যেও সেটি দেখা যাচ্ছে। শ্রীধর স্বামিপাদ বললেন—এটি প্রতিবিম্ব নয়। কারণ প্রতিবিম্ব হলে বিলোমতয়া দৃশ্যতে—বিপরীতভাবে প্রতিবিম্বে দেখা যায়। আর তাছাড়া এটি যে প্রতিবিম্ব নয় তার আর একটি প্রমাণ এতে তো তোমাকেও দেখা যাচ্ছে। তুমি স্বচ্ছ দর্পণের মত। কাজেই জগতের প্রতিবিম্ব তোমাতে পড়তে পারে, এটি কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু তোমাতে তো আর তোমার প্রতিবিম্ব পড়বে না। মুকুরে (আয়নায়) বাইরের সবকিছুর প্রতিবিম্ব পড়ে কিন্তু মুকুরে মুকুরস্য প্রতিবিম্বনং ন দৃশ্যতে। আয়নায় তো আয়নার ছবি পড়ে না। কাজেই এ দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড প্রতিবিম্ব হতে পারে না।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ টীকায় বললেন,—সাত্মং ভাতি এখানে আত্মা বলতে অন্তর্যামীকে বুঝাচ্ছে। ব্রহ্মা তো বালগোপালকে এ কথা বলছেন। যদি অন্তর্যামী পদের দ্বারা বালগোপালকে বলাই তাঁর উদ্দেশ্য হত তাহলে ত্বয়া সহ ভাতি এইরকম বললেই পারতেন —এখানে আবার আত্মা পদের প্রয়োগ কেন ? আত্মা চিৎস্বরূপ, জগৎ কিন্তু জড়াত্মক চব্বিশটি উপাদানে গঠিত। এখন এখানে যে ব্রহ্মাণ্ডের দর্শন হচ্ছে তা চিৎ আত্মা এবং চব্বিশতত্ত্বযুক্ত যে জড়াত্মক জগৎ সবই দর্শন হচ্ছে। এইটিই ব্রহ্মার বলবার উদ্দেশ্য। শ্রীজীব পাদ বললেন—আত্মা অন্তর্যামী অর্থাৎ পরমাত্মা। কারণ পরমাত্মার অংশ জীবাত্মা হলেও জীবাত্মার কর্তৃত্ব স্বাধীন নয়। পরমাত্মারই কর্তৃত্ব। কারণ প্রাধান্যেই কথা বলতে হবে। জীবাত্মার কর্তৃত্ব পরমাত্মার কর্তৃত্বের অধীন। যস্য কুক্ষাবিদং এখানে যস্য পদের

দ্বারা কৃষ্ণকে বুঝাচ্ছে না। পূর্ব্বের শ্লোকে ব্রহ্মা উল্লেখ করেছেন তব সজ্জগদ্বপুঃ। এখানে যস্য পদের দ্বারা নারায়ণকে বুঝাচ্ছে তৎ ত্বয়ি ভাতি। যে নারায়ণের কুক্ষিতে সর্ব্ব জগৎ অবস্থান করছে সেই নারায়ণ তোমাতে শোভা পাচ্ছে। নারায়ণ হলেন অঙ্গ আর কৃষ্ণ হলেন অঙ্গী। সেই নারায়ণকে ইদম্ শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নারায়ণে সর্ব্ব জগতের অধিষ্ঠান সেই নারায়ণ যদি তোমাতে থাকেন তাহলে বলা যায় সর্ব্বাংশে পরিপূর্ণ জগৎ তোমাতেই অবস্থান করছে। কারণ সিদ্ধান্ত তো এইটিই—

স্বয়ং ভগবানের অবতার হয় যেই কালে।
আর আর অবতার তাতে আসি মেলে॥

ব্রহ্মার এ বাক্য থেকে শাস্ত্র তাৎপর্য্য পাওয়া গেল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই স্বয়ং ভগবান। সূতমুনির বাক্য—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। ভাঃ ১।৩।২৮

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর ভিতরে অবস্থান করছে সেই তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে গোকুলনগরীর একটি প্রকোষ্ঠে কেমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে পার? কিমিদং মায়য়া বিনা? মায়া বলতে প্রকাশিতা শক্তি। এটি তোমার অচিন্ত্য শক্তিরই প্রভাব। এটি প্রকৃত মায়া অর্থাৎ কুহক নয়। অথবা শ্রীজীব গোস্বামিপাদ অপরপক্ষে ব্যাখ্যা করেছেন—যস্য অর্থাৎ তব সাত্মম্ অর্থাৎ সা জননী আ আত্মম্ আত্মানং ব্যাপ্য (অব্যয়ীভাব) বাইরেও যা দেখা যায় তৎ তু ত্বয়ি। হে শ্রীকৃষ্ণ কিমিদং মায়য়া বিনা। মায়া বলতে বৈভবকে বুঝাচ্ছে। এ তোমার বৈভব ছাড়া আর কিছু নয়। যদ্বা শ্রীজীবপাদ বলছেন—অথবা কিমিদং—অর্থাৎ এটি কি? এইরকম সন্দেহ হল। দু জায়গায় ব্রহ্মাণ্ড দেখে ব্রহ্মার মনে সন্দেহ হল এটি কি? অর্থাৎ এটি যে মায়া নয় তা তো বুঝতে পারছি তাহলে মায়া ছাড়া আর যা হতে পারে এটি তাহলে তাই। সাত্মম্ অর্থাৎ আত্মনা সহিতম্। এখানে আত্মা শব্দের দ্বারা কি বুঝাচ্ছে? 'তচ্চেজ্জলস্থং শ্লোক থেকে নারায়ণের প্রসঙ্গ চলছেন।

আত্মা বলতে তাহলে নারায়ণ। কারণ নারায়ণই সজ্জগদ্বপুঃ। সেই নারায়ণের সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমাতে আছে। অর্থাৎ তোমার উদরে সব আছে। তোমার উদরে যে সব বস্তু আছে ইহাপি তৎ সর্ব্বম্—বাইরেও সেই সব আছে। এটি মায়া ছাড়া আর কি? মায়া বলতে এখানে মিথ্যা নয়। মায়া তু অত্র ন মিথ্যাপর। মায়া বলতে ঐচ্ছিকী ভগবানের ইচ্ছা থেকে উৎপন্ন। প্রকাশিকা শক্তির বিলাস। বলা আছে আত্মমায়া তদিচ্ছা স্যাৎ। এটি তোমার ইচ্ছা থেকে উৎপন্ন প্রকাশিকা শক্তির বিলাস। এটি প্রতিবিম্ব নয়। যোগশক্তি বিলসিত-মেতৎ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন—বাইরের ব্রহ্মাণ্ডে এবং তোমার ভিতরে যে ব্রহ্মাণ্ড দেখা যাচ্ছে দুই জগৎই এক। দুইএরই একতা দেখা যাচ্ছে। কুক্ষিগত জগতের যদি মায়িকত্ব বলা যায় শ্রীবালগোপাল যেন প্রশ্ন করছেন—এটি প্রতিবিম্ব—না তা নয়। এ জগৎ যে দেখা যাচ্ছে সেটি সাত্মম্। তোমার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। দর্পণে তো দর্পণ দেখা যায় না। বাইরের জগৎ তোমাতে দেখা যাচ্ছে। উদরের জগতের অধিকরণ তুমি আবার বাইরের জগতের অধিকরণও তুমি। সকল জগতের তুমিই হলে আধার কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই আধার আজ আধেয় হয়েছ। ঘরের ভিতরে ঘট, ঘটের আধার ঘর সে ঘর কখনও ঘটে আধেয় হতে পারে না। যেমন মা সন্তানের আধার তাই মা কখনও সন্তানে আধেয় হতে পারে না। ব্রহ্মাণ্ডের অধিকরণ তুমি। আবার সেই তুমি কেমন করে ব্রহ্মাণ্ডে আধেয় হলে এটি বড়ই বিস্ময়কর। ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ভগবানের এই আবির্ভাব তাঁর অচিন্ত্যযোগশক্তি প্রভাবে। দুই জগতের ঐশ্বর্য্য মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য নেই। জঠরগত জগৎ মায়া ছাড়া কিছু নয়। এটি যে মায়া তা মা যশোমতী এবং ব্রহ্মা দুজনেই অনুভব করেছেন। ব্রহ্মার উক্তির এখানে তাৎপর্য্য হচ্ছে হে বালগোপাল, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। সকলের আধার যখন

তুমি তাহলে জগতের মাতা ও পিতা তুমি। তোমা হতেই জগতের উৎপত্তি যখন তখন জগৎ তোমার পুত্র এবং আমি যখন সেই জগৎ ছাড়া নই, আমিও তো জগতের মধ্যে। অতএব আমিও তোমার উদরে আছি। উদরগত শিশুর পদবিক্ষেপে মাতা যেমন অপরাধ নেয় না বরং জীবিত আছে শিশু এই বোধে আনন্দ করে তেমনি আমিও যদি অজ্ঞানতাবশতঃ তোমার প্রতি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করে থাকি তাহলে তুমি সে অপরাধ নিও না। আমার চাঞ্চল্য তুমি ক্ষমা কর। এটি তোমার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব। ব্রহ্মা বলছেন—আমিও এটি অনুভব করেছি।

অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত—
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽসি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা—
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে॥

ভাঃ ১০।১৪।১৮

এই শ্লোকে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলেছেন—ব্রহ্মা ভগবানকে বলছেন, ব্রহ্মাণ্ড তোমার মুখবিবরে আছে। জগৎ তোমার উদরে আছে। জগতের উপাদান মায়া। মায়াময় জগৎ। ভগবান তাঁর স্বরূপশক্তির দ্বারা চিন্ময় জগৎ সহস্র প্রকাশ করেছেন। অনন্তকোটি চিৎ ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মা দর্শন করেছেন। ব্রহ্মা যে শ্রীবালগোপালের বালক বাছুর চুরি করেছেন তার দুটি কারণ দেখান হয়েছে। প্রথম হল উল্লিখিত কারণ আর দ্বিতীয় হল প্রসঙ্গত কারণ। প্রসঙ্গত কারণ বলা হচ্ছে—কৃষ্ণের ভগবত্তা পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মা চুরি করেছেন। 'অম্ভোজজন্মযোনি'—এই শ্লোক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—অম্ভোজ—অম্ভ অর্থাৎ জল এটি জড় সেই জলে যার জন্ম পদ্ম সে তো আরও জড় এই জড় পদার্থ থেকে যার জন্ম সেই ব্রহ্মা অত্যন্ত মূর্খ। তিনি অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দের গোচারণরঙ্গ দেখে সন্দেহ করেছেন—কিময়ং সঃ? ইনি কি সত্যই ভগবান? আবার অঘাসুরের আত্মা যখন

ঐ গোপবালক কৃষ্ণচরণে লীন হল সেটি দর্শন করেও ব্রহ্মার বিস্ময়ের সীমা নেই—ব্রহ্মার সন্দেহ হয়েছে একজন গোপবালকের চরণে অঘাসুরের আত্মা লীন হয় কি করে? আত্মা তো ভগবানের চরণে লীন হবে। তাহলে কৃষ্ণ কি খাঁটি ভগবান? কিন্তু কৃষ্ণকে দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। ব্রহ্মা ভগবানের মাধুর্য্যে তাঁর ভগবত্তা বুঝতে পারছেন না। তাই বিস্ময়বোধ হচ্ছে। মাধুর্য্যের আলোড়নে ব্রহ্মার সংশয় ছিন্ন হল না। তাই ভগবানের মঞ্জু মহিমা দর্শনের জন্য ব্রহ্মা বালক বাছুর চুরি করলেন। এখানে মহিমার মঞ্জুত্ব অর্থাৎ মনোহারিত্ব কি? দ্রষ্টার মন হৃত হবে। অর্থাৎ ভগবানের মহিমা দেখে যেন কোন সংশয় না হয়। ব্রহ্মার মনকে হরণ করবে এমন লীলা তাই মঞ্জু লীলা মনোহারিণী। ব্রহ্মার ভগবানকে পরীক্ষার বিষয় কি? বালকবাছুর চুরি করলে দেখি তো কৃষ্ণ জানতে পারে কি না। কারণ কৃষ্ণ যদি খাঁটি ভগবান হন তাহলে তো সর্ব্বজ্ঞ হবেন—তাহলে কি করেন দেখি তো। কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হলে জানতে পারবেন যে আমি তাঁর বালক বাছুর চুরি করেছি—তখন আমার কাছে প্রার্থনা করেন কি না দেখি তো—বলেন, ওগো ব্রহ্মন্‌ দয়া করে আমার বালক বাছুর ফিরিয়ে দাও। কিংবা কৃষ্ণ অন্য কোন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন কি না? ব্রহ্মার যে কৃষ্ণ সম্পর্কে এত সংশয় তাতেই বুঝা যাচ্ছে যে কৃষ্ণমায়া আগেই তাকে মুগ্ধ করেছে। কারণ মায়ামুগ্ধ না হলে ভগবৎস্বরূপে সংশয় আসে না। ভগবান গীতা-বাক্যেও বলেছেন—অর্জুন, যারা আমার প্রকৃত তত্ত্ব জানে না—তারা আমার মানুষ আকৃতি দেখে মানুষ বুদ্ধি করে তারা মূর্খ।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্‌॥ গীঃ ৯।১১

ব্রহ্মার সংশয় হচ্ছে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড কি তোমা বিনা? না এসব তোমারই স্বরূপভূত? ব্রহ্মা বলছেন, হে কৃষ্ণ, তুমি তো মায়াময় জগৎ আমাকে দেখাও নি। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড যা আমাকে

দর্শন করিয়েছিলে তা সবই চিন্ময়। কুতঃ? ব্রহ্মা বলছেন যুক্তির দ্বারা বলি। প্রথমে যখন তোমাকে দেখেছিলাম তখন তুমি একা ছিলে। পরে তোমারই স্বরূপশক্তির দ্বারা সৃষ্ট বালক বাছুর দেখালে —এ মায়ার তৈরী নয়। কারণ মায়ার তৈরী হলে তারা ব্রজে প্রবেশ করতে পারত না। কারণ ব্রজবাসী মায়া ভাল করেই চেনে। তারা কৃষ্ণ নিয়ে কারবার করে। হীরে চেনে যে জহুরী তার কাছে কাঁচ যেমন চলে না সেইরকম কৃষ্ণ নিয়ে যাদের সংসার মায়ার সংসার তাদের সম্ভব নয়। পূতনাবধ প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলেছেন—

তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্ব্বতীনাং সুতেক্ষণম্।
ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ॥

ভাঃ ১০।৬।২৭

বালক বাছুর যদি মায়াকল্পিত হত তাহলে ব্রজবাসীর স্নেহের আধিক্য হত না। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান হয়েও এই স্নেহের আধিক্যের সমাধান করতে পারেন নি। এর থেকে এই তাৎপর্য্য উঠছে যে প্রেমের ওপর কৃষ্ণেরও কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। কৃষ্ণ নিজে প্রেমের অধীনে। কিন্তু প্রেম কৃষ্ণের অধীন নয়। যোগমায়া শক্তি দিয়ে আচ্ছাদন করলে আমারই মত ব্রহ্মা (আমি নই ময়া সদৃশেন সাকং ময়া) তোমার উপাসনা করেছে। তুমিই চতুর্ভুজ হয়ে প্রকাশ পেয়েছ। তুমিই চিন্ময় ব্রহ্মা সৃষ্টি করে তাকে দিয়ে তোমার উপাসনা করালে। সব চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ড তুমিই হলে। তোমারই ইচ্ছায় যোগমায়া আবার সব আবরণ করলেন। এখানে অদ্বয় ব্রহ্ম শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন অনুপম সৌন্দর্য্যশালী। সম্প্রতি যোগমায়া কৃপায় আমি অনাবৃত দৃষ্টি হয়ে এখনও তোমাকে দর্শন করছি। মায়া দ্বারা বালক বাছুর তৈরী করেছ এ কথা বলা হয় নি। তুমিই বালক বাছুর হয়েছ এই কথাই বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ সবই তোমার স্বরূপ শক্তির কাজ। যোগমায়ার দুটি আবরণ আছে—একটি চোখের ওপর আবরণ অপরটি বস্তুর ওপরে আবরণ। ভগবান নিজেও বলেছেন—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃত। গীঃ ৭।২৫

ব্রহ্মা বলছেন—তোমার যে চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ড আছে এ কে বিশ্বাস করবে? তোমার নিজের স্বরূপই তো বিশ্বাস করতে চায় না। বহির্ম্মুখ যারা তাদের মতে তোমার স্বরূপ মায়িক। তারা তোমার চিন্ময় স্বরূপের উপলব্ধি করতে পারে না। তোমার মানুষের মত আকৃতি দেখে সে আকার মায়িক বলে মনে করে—কারণ তারা জানে যে জগতে যত আকার (রূপ) আছে সবই মায়িক। তাই তোমার আকার (রূপ) দেখে তাকেও মায়িক বলে মনে করে। কিন্তু তোমার রূপ যে প্রকৃতির অতীত তা তারা বোঝে না।

অজানতাং তৎপদবীমনাত্মন্যাত্মাঽত্মনা ভাসি বিতত্য মায়াম্।
সৃষ্টাবিবাহং জগতো বিধান ইব ত্বমেষোঽন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ॥

ভাঃ ১০।১৪।১৯

এখানে পদবী বলতে তত্ত্বকে বুঝাচ্ছে। সৃষ্টির জন্য পরমেশ্বর যেমন ব্রহ্মা স্থিতির জন্য বিষ্ণু এবং সংহারের জন্য রুদ্র (মহেশ্বর) হয়েছেন তেমনি ভূভারহরণের জন্য সেই পরমেশ্বরই কৃষ্ণ হয়ে এই ভূলোকের লীলায় এসেছেন। যারা তত্ত্ব জানে না তারা তোমার দেহকে মায়িক বলে। তত্ত্ব বলতে ভগবানের যথাযথ রূপকে বুঝাচ্ছে। যথাযথ অবস্থা বলতে ভগবানের স্বরূপ, ধাম, স্বভাব পরিকর লীলা বিগ্রহ নাম সকলকে বুঝাচ্ছে। চতুঃশ্লোকী ভাগবতে ভগবান ব্রহ্মাকেই বলেছেন—

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥ ভাঃ ২।৯।৩১

বিজ্ঞান বলতে সাক্ষাৎ অনুভূতি। ভগবানের আনন্দের অনুভূতি ভগবানের আনন্দকে ছুঁতে হবে তা না হলে আনন্দ হবে না। কীর্ত্তনের ধারে ধারে ঘুরলে আনন্দ নেই—কীর্ত্তনে কণ্ঠ দিলে তবে আনন্দ। ব্রহ্মার এ সাক্ষাৎ অনুভূতি নেই কিন্তু কথা হল কেমন করে এ অনুভূতি হবে? ভগবান বললেন—'গৃহাণ গদিতং ময়া।'

এখানে ব্রহ্মা জীবের প্রতিনিধি হয়ে বসেছেন ব্রহ্মাকে উপদেশ দিতে গিয়ে ভগবান দেখালেন জীবের কর্ত্তব্য হল শুধু আঁচল পাতা—তারপর যা দেবার আমিই দেব। আমি যাবান্ অর্থাৎ পুরুষ অথবা স্ত্রী অথবা ক্লীব যথাভাব তাঁর স্বভাব অর্থাৎ স্থিতি কি ঠিকানা কি? অর্থাৎ কোথায় তিনি থাকতে ভালবাসেন। ভাব অর্থাৎ বিদ্যমানতা তাঁর রূপ গুণ কর্ম এইগুলিই স্বরূপ। ভগবানের স্বরূপ দ্বিভুজ মুরলিধর নবকৈশোর নটবর গোপবেশবেণুকর। ব্রজবাসীর কাছে তাঁর নিত্য স্থিতি। ব্রজবাসীর অধীন হওয়াই তাঁর স্বভাব। তাঁর স্বরূপের প্রকাশ স্বাভাবিক—কোন শাসনের অপেক্ষা করে না। উচ্ছিষ্ট ভোজন হল তার কর্ম। এ তাঁর স্বরূপশক্তির বিলাস। হরিবিরিঞ্চিহর—ত্রিনেত্রের মত মায়াকে বিস্তার করেই তোমার আবির্ভাব হয়েছে এইটিই বহির্মুখ যারা তাদের মত। যারা তোমার তত্ত্ব ঠিক ঠিক জানে না—তারা এই কথা বলে।

কোন বস্তুর যথার্থ স্বরূপ না জানলে অনেক কিছুই মনে হয়। শ্রীজীবপাদ টীকায় বলেছেন—যারা তোমার মহিমা (পদবী) জানে না তারা বলে এ তোমার মায়া। তোমার অনির্ব্বচনীয় যোগশক্তির যে বিলাস আছে তা তারা জানে না। তোমার যোগশক্তি হল অঘটন ঘটন পটীয়সী। সসীমতা, অসীমতা, পূর্ণকামতা স্তন্যকামতা শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপে ক্রোধ সচ্চিদানন্দময়ের রোদন—সর্ব্বব্যাপকের বন্ধন, আত্মারামের বুভুক্ষা, পূর্ণকামের অতৃপ্তি, মহাভয়ের ভয়দাতার ভয়ে পলায়ন—মনের থেকেও অগ্রগতি যাঁর তাঁকে মা ধরে ফেললেন—এসব পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ ভগবৎস্বরূপে যুগপৎ দেখা যায় তাঁর অচিন্ত্য যোগশক্তির প্রভাবে। যদি বলা যায় অভিনয়ে তো দরিদ্র ব্যক্তি রাজা সাজে—সেখানেও তো ধনবত্তা ও দরিদ্রতা একই স্বরূপে দেখা যাচ্ছে। তাহলে সেখানে যদি এই বিরুদ্ধগুণ সম্ভব হয় তাহলে ভগবৎ স্বরূপেই বা সম্ভব হবে না কেন? কিন্তু এ দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। যাত্রাদলে অর্থাৎ অভিনয়ে মিথ্যা বস্তু। সেটি তাই যে কেউ

করতে পারে। কিন্তু ভগবৎস্বরূপে যে পরস্পর বিরুদ্ধ গুণ সেটি যাত্রাদলের অভিনয় নয়—এ হল খাঁটি সত্য বস্তু। মিথ্যা বস্তু যে কেউ করতে পারে কিন্তু সত্য বস্তু মিলান কঠিন। শ্রীবালগোপালের কটিদেশে বাঁধা মা যশোদার নিমফলটি ঠিক আছে অথচ পাড়ার এবং বাড়ীর যত দড়ি ছিল সব জোড়া দিয়েও উদরে বাঁধা যাচ্ছে না—এটি দেখে মা বিস্মিত হলেন। শ্রীশুকদেব বললেন—মহারাজ,

এবং সন্দর্শিতা হ্যঙ্গ হরিণা ভৃত্যবশ্যতা।
স্ববশেনাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে ॥

ভাঃ ১০।৯।১৯

ভগবান এইভাবে ভৃত্যবশ্যতা দেখালেন। যারা তার লীলা জানে স্বরূপ চেনে তাদের কাছেই দেখালেন। কারণ যারা অজ্ঞান কিছু বোঝে না তাদের কাছে দেখিয়ে কোন লাভ নেই। এটি যদি ভগবানের অভিনয় হত তাহলে সন্দর্শিতা পদে সম্‌ উপসর্গটি লাগত না। ভগবানের বলবার অভিপ্রায় হচ্ছে—আমার বশে সব জগৎ সেই আমি কেমন ভৃত্যের কাছে বশ্যতা স্বীকার করি তোমরা দেখে যাও। যারা তত্ত্ব জানে তারাই এই ভৃত্যবশ্যতা উপলব্ধি করবে এবং আস্বাদন করবে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ টীকায় বলেছেন—এ অধীনতা শুধু মুখে বললে হবে না। কাজে দেখাতে হবে। আন্তর এবং বাহিরে আনুকূল্য চেষ্টাই অধীনতা। অন্তরের অধীনতা তো দেখা যায় না—তাই বাইরেও অধীনতা দেখাতে হবে। ভগবান মায়ের বন্ধন স্বীকার করে দেখালেন বাইরেও তিনি ভক্তাধীন। শুধু মুখের অধীনতা নয়। ভগবানের লীলার গাম্ভীর্য্য এইখানে যে তাঁর পূর্ণকামতা এবং ক্ষুধা দুইই সত্য। কিন্তু ক্ষুধা তো অপূর্ণতার চিহ্ন। পূর্ণকাম হয়েও তাঁর ক্ষুধা কেন? বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মক বিগ্রহের ক্রোধ আনন্দঘনবিগ্রহের রোদন এ যদি অভিনয় বলা হয় তাহলে ক্ষতি কি?

ভগবানের ক্ষুধা সাজা ক্ষুধা বললে দোষ কি? না তা বলা যাবে না। কারণ শ্রীগোবিন্দ গীতাবাক্যে বলে এসেছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। গীঃ ৪।১১

যে আমাকে যেমন করে ভজবে অর্জুন, তার ভজনের আমি তেমনি করে প্রতিদান দেব। এটি হল অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দের চিরকালের প্রতিজ্ঞা। এখন কোন সাধক সারা জীবন সাধন করেছেন ক্ষুধার্ত ভগবানকে খাওয়াবেন। কিন্তু ভগবান যদি সাধকের কাছে সাজা ক্ষুধা বা মিথ্যা ক্ষুধা নিয়ে এসে দাঁড়ান তাহলে ভগবানকে তো মিথ্যাবাদী বলা হবেই আর সাধকের সাধনকেও ঠকান হল। সাধকের সাধন তো মিথ্যা নয়। তাই ভগবানের ক্ষুধা কি করে মিথ্যা হবে? ভগবানের পূর্ণকামতা এবং ক্ষুধা যুগপৎ যোগশক্তির বিলাস। এই বিলাস লীলা যুগ যুগ ধরে সাধক খুঁজছে। কিন্তু তার পার পাচ্ছে না। ভগবান ননী চুরি করছেন এটি মিথ্যা নয় অভাবে তো মানুষ চুরি করে কিন্তু কোটি লক্ষ্মী যাঁকে সম্ভ্রমের সঙ্গে সেবা করেন তিনি কেমন করে চুরি করেন। এটি যোগশক্তির বিলাস। এ হল অনির্ব্বচনীয়। ভগবানের যোগশক্তির এ বিলাস জানা যায় না—কিন্তু কৃষ্ণকৃপায় একমাত্র জানা যায়। তাই ব্রহ্মা সিদ্ধান্ত করেছেন—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।
ভাঃ ১০।১৪।২৯

এখানে 'ন চান্যঃ' বললেই তো যথেষ্ট হত আবার একোঽপি পদ কেন? বাক্‌পতি ব্রহ্মা স্তুতি করছেন—তাঁর বাক্যে অধিকপদতা দোষ কেন? 'অন্য' বলতে যে কৃপা পায় নি তাকে বুঝাচ্ছে অথবা সব ছেড়ে যদি একা হয়—সব রিপুর তাড়না যদি ত্যাগ করে ব্রহ্মা বলছেন সেও তোমার তত্ত্ব জানতে পারে না। তৎ পদবী বর্ত্ম অর্থাৎ পথ যে পথে গেলে তোমায় পাওয়া যায়—তোমার পথ এটি জীবের

পথ নয়। এটি তোমার পথ অর্থাৎ যে পথে তুমি যাওয়া আসা কর সেই পথই তো আমার হওয়া উচিৎ। কারণ প্রেমের পথে ভক্তির পথেই তো তাঁর যাওয়া আসা। অজানতাং—এখানে অনাদরে ষষ্ঠী —এ পথ যারা জানে না—তারা অনাত্মনি অর্থাৎ প্রকৃতিতে আত্মা অর্থাৎ নিজস্বরূপকে আত্মনা মায়ার দ্বারা কৃষ্ণরূপে প্রতীতি করে—এটি তুমিই করাও। এটি হল অজ্ঞজনের বোধ। ব্রহ্মা বলছেন—তারা যা বলে বলুক আমি বলি—অনা অর্থাৎ অপুরুষ ঈশ্বর (না বলতে নর অর্থাৎ পুরুষ) জীব হল পুরুষ আর তুমি হলে অপুরুষ অর্থাৎ জীবধর্ম তোমাতে নেই, তুমি জীবধর্মবর্জিত। তুমি আত্মনা অর্থাৎ তোমার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আত্মনি অর্থাৎ স্বভাবে মায়া শব্দের অর্থ এখানে যোগমায়া ঐচ্ছিকী শক্তি। ভগবানের ষোলহাজার একশত আট ঘরে যুগপৎ বিবাহ এও তাঁর ইচ্ছাশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে। এই ইচ্ছাশক্তিরই অপর নাম প্রকাশিকাখ্যা শক্তি। যোগমায়া হলেন বহুশক্তির মিলিত অবস্থা। লোকলোচনের কাছে প্রকাশ ইচ্ছা—আত্মা স্বভাবে নিজসত্তায় আবির্ভূত নিজ আসনে। শ্রুতিতে প্রশ্ন করা হয়েছে স ভগবান কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত—উত্তর দেওয়া হয়েছে স্বে মহিম্নি। এই মহিমাই হল স্বভাব। ভগবানের ধামই তাঁর আসন। এইটিই তাঁর আসার পথ।

শ্রীজীব গোস্বামিপাদ হলেন দোভাষী অর্থাৎ দুইপক্ষে কথা বলেন। একবার ব্রহ্মার হয়ে কথা বলেছেন আবার শ্রীবালগোপালের পক্ষ হয়ে কথা বলেছেন। ভগবানের যোগশক্তির বিলাসই যদি তাঁর নিজপ্রকাশ হয় তাহলে এই বিশ্বসৃষ্টিও তাই হোক্। জগৎ ও তাঁর যোগশক্তির বিলাস এ বললে ক্ষতি কি? ভগবানের নিজ তনু, ধাম পরিকর বিগ্রহ নাম সব যোগশক্তির বিলাস—জগৎও যদি তাই হয় তাহলে ভগবৎ তনুর মত প্রাকৃত জগৎও উপাস্য হয়ে যায়। বিশ্বসৃষ্টি যোগশক্তির বিলাস বলা যাবে না। এটি ভগবানের আবরিকাশক্তির কাজ—না তাও বলা যাবে না। ব্রহ্মাকে উত্তর দেওয়ার সামর্থ্য দিয়েই

ভগবান প্রশ্ন করেছেন। ব্রহ্মা বলছেন, আমার যে সৃষ্টিকর্ত্তার অভিমান বিষ্ণুর যে পালনকর্ত্তার অভিমান রুদ্রের যে সংহারকর্ত্তার অভিমান এ সবই আবরিকাশক্তির প্রভাব। সৃষ্টি স্থিতি লয় কাজ তুমিই আমাদের রূপ ধারণ করে করছ। এটি লীলার কুহক নয়। ভগবানই সব করছেন। সৃষ্টি প্রভৃতি কাজ ভগবানেরই প্রকাশিকা শক্তির কাজ। কেবল ব্রহ্মাদির যে সৃষ্টিকর্ত্তার অভিমান সেটি আবরিকা শক্তির কাজ। ভগবান যে বালক বাছুর হয়েছেন এটিও তেমনি কুহক নয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং রুদ্র এই তিনের মধ্যে আবার বিষ্ণুর সঙ্গে ভগবৎস্বরূপের অভিন্নতা। ব্রহ্মা বলছেন,—হে বালগোপাল, তুমিই তো সৃষ্টি প্রভৃতি কাজ করছ কিন্তু কই আমি তো প্রাণখুলে বলতে পারলাম না যে তুমিই সৃষ্টিকর্ত্তা। সৃষ্টিকর্ত্তার অভিমানটি আমার বেশ আছে। এইটিই মায়া এইটিই আবরিকা-শক্তির কাজ।

ব্রহ্মা বললেন—তব বর্ত্ম অন্যের পথ অন্য আর তোমার পথ অন্য। সাধারণ যে পথ সেটি জীবচৈতন্যের আবির্ভাবের পথ। প্রথমে জীবচৈতন্য সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে পরে মায়া মমতা বশে স্থূলদেহ ধারণ করে। কর্ম মূল্য দিয়ে এই দেহটি কেনে বলে জীবচৈতন্যের দেহের ওপর এত মমতা। কিন্তু তোমার আবির্ভাব তো মায়াশক্তির কাজ নয়। এটি চিচ্ছক্তি যোগমায়ার প্রভাব। তোমার স্বরূপ চিচ্ছক্তি আবির্ভূত স্বরূপ। যে আবির্ভূত যার দ্বারা আবির্ভূত এবং যেখানে আবির্ভূত সবই চিচ্ছক্তি-বিলাস। তুমি কখনও দ্বিতীয় বস্তুতে আবির্ভূত হও না। জীবচৈতন্যের পথ কিন্তু তা নয়। তাকে মায়াশ্রিত না হলে দেখা যায় না। যদি বলা যায় জীবচৈতন্য যেমন মায়াকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হয় তুমিও তেমনি যখন এই জগতে আবির্ভূত হও তখন মায়াকে অবলম্বন করেই আবির্ভূত হও। তা বললে চলবে না। এ বললে ভুল হবে। শ্রীরাসলীলা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বললেন

সম্ভবামি আত্মমায়য়া—আত্মমায়া বলতে ভগবানের ইচ্ছাকেই বুঝায়। প্রভু যোগ্য গুণ আছে বলেই তিনি ঈশ্বর। চিচ্ছক্তির বিলাস বলতে সন্ধিনী শক্তি চিচ্ছক্তি শ্রীবলদেব তাঁর সত্তায় জগতের সত্তা। সংকর্ষণ শ্রীবলদেব যদি জীবের হৃদয়ক্ষেত্রকে সংকর্ষণ করেন তবেই শ্রীভগবানের কৃপা সে ক্ষেত্রে অংকুরিত হয়। শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেছেন—নিত্যানন্দ বলদেব তাঁর সত্তায় জগতের সত্তা। বলদেব কৃপার পরে কৃষ্ণকৃপা নিতাই কৃপার পরে গৌর কৃপা। ভক্তকৃপার পরে ভগবৎকৃপা। ভক্তসমষ্টির মূল বিগ্রহ হলেন শ্রীবলদেব।

শ্রীশুকদেব যখন বললেন দেহধারী ভগবান তখন মহারাজ পরীক্ষিতের মনে সন্দেহ জেগেছে—দেহধারী তো মানুষ (জীব)—ভগবানও যদি দেহধারী হন তাহলে তো মানুষের সঙ্গে ভগবানের সজাতীয়তা হল তাহলে সজাতীয়ের উপাসনায় আমাদের দেহধারণ নিবৃত্ত হবে কেমন করে? শ্রীশুকদেব বললেন তদ্ভবেদেব। দেহ-ধারণ করলেও সেই দেহধারী ভগবানের আরাধনা করলে জীবের দেহধারণ নিবৃত্ত হবে। স্বামিপাদ টীকায় বললেন জীবের বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান দাসভূতো হরেরেব—জীবের তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ জীব যে নিত্য-শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ—এ জ্ঞান ভগবদ্ভজন ছাড়া হয় না। শ্রীজীবপাদ টীকায় বললেন—অনাদিকালের ভগবদ্বিমুখতার ফলে মায়া জীবকে আক্রমণ করেছে। শ্রীযোগীন্দ্র বললেন—ঈশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতি। অনাদিকালের ঈশ্বরবিমুখতাই মায়া আক্রমণের কারণ। কাজেই ঈশ্বর উন্মুখতা না আসা পর্য্যন্ত এ অপরাধের ক্ষালন হবে না। আর এ অপরাধ ক্ষালন না হলে মায়াও ছাড়বে না। কারণ মায়া আক্রমণের পরে জীবের আত্মজ্ঞান লোপ হয়েছে। তাই আত্মজ্ঞান ফিরে পেলেও মায়া ছাড়বে না। ভগবদ্বিমুখতা যদি ব্যাধি হয় তাহলে ভগবৎ উন্মুখতাই হবে চিকিৎসা। এটি ভিত্তিগাঁথা শ্লোক। ভগবৎ উন্মুখতাই চিকিৎসা। এইটিই তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ হলে তখন মায়া ছাড়বে। উন্মুখ হলেও মায়া

সম্পূর্ণ ছাড়ে না। কারণ অনাদিকাল থেকে জীবকে সে দেখছে যে জীব অতি দুষ্ট স্বভাব। প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হলে ভব নাশ হয়। তাই প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হলে তবে মায়া সম্পূর্ণ ছাড়বে। কন্যা সচ্চরিত্রা পিতামাতা জানে কিন্তু কন্যাকে পতিগৃহে না পাঠানো পর্য্যন্ত পিতা-মাতা নিশ্চিন্ত হতে পারে না। পতিগৃহে পাঠালে তবে নিশ্চিন্ত। মায়া অর্থাৎ মা যাতি। অর্থাৎ মায়া কখনও যেতে চায় না। ভগবানে যেমন যেমন উন্মুখতা তেমনি তেমনি মায়া ছাড়ে। মায়া হলেন মা আর তাঁর কন্যা জীব হল কৃষ্ণপত্নী। তাই কৃষ্ণের হাতে সমর্পণ না করা পর্য্যন্ত মায়ার নিশ্চিন্ততা নেই। কৃষ্ণপদে যখন জীব সমর্পিত হয় তখন মায়া নিশ্চিন্ত। আমি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব এইটিই ঠিক খাঁটি আত্মজ্ঞান নয় কিন্তু আমি নিত্য কৃষ্ণদাস এই জ্ঞানটিই হল বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান। ভগবান নিজের রূপ অর্থাৎ বিগ্রহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়ে বললেন—ব্রহ্মন্, আমার এই দেহের উপাসনা করলে জীব বিদেহমুক্তি লাভ করবে। নিজের চিদ্ঘন বিগ্রহ ভগবান ব্রহ্মাকে দেখালেন। এ দর্শন করানোর কারণ কি? ভগবানের রূপদর্শনে যদি কেউ অব্যলীক ব্রত অর্থাৎ অকপটব্রত গ্রহণ করে অর্থাৎ অকপটে দর্শন করে তাহলে তার বিদেহমুক্তি হয়—অর্থাৎ তার দেহ নাশ হয়। প্রাকৃত দেহ নাশ হয়ে চিন্ময় দেহ লাভ করে। জীবের যে দেহ সম্বন্ধ সেটি মিথ্যাভূত—কারণ এই দেহ সম্বন্ধ অবিদ্যাবশে হয়। দেহ হল প্রাকৃত আর জীবাত্মা চিন্ময়। তাই এদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ হতে পারে না। কারণ একগাছের ছাল আর এক গাছে জোড়া লাগে না। জীব (আত্মা) হল চৈতন্যস্বরূপ আর দেহ হল মায়ার অর্থাৎ জড়। মায়া চুরাশি লক্ষ যোনি দেহ দিয়ে দোকান সাজিয়ে বসেছেন। জীব কর্মফল মূল্য দিয়ে এই দেহ কিনেছে। নিজের মূল্য দিয়ে কেনা তাই এত মমতা। জীব এই দেহকে তাই কিছুতেই ছাড়তে পারে না। নরকে গেলেও জীব দেহ ছাড়তে চায় না। দেহের সঙ্গে জীব-চৈতন্যের জ্ঞাতিসূত্রেও সম্বন্ধ নেই। ঈশ্বরের লীলাবিগ্রহ যোগমায়া

চিচ্ছক্তি। সুতরাং ভগবানের দেহ এবং মানুষের দেহ—এই দুই দেহের মধ্যে মহান্ ভেদ। জীবের দেহ গুণময় সুতরাং নশ্বর। আর ভগবানের দেহ চিন্ময় সুতরাং অবিনশ্বর অতএব ভগবানের দেহের আরাধনা করলে জীবের দেহযোগ থেকে নিষ্কৃতি হবে। তাই ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু তোমার পথ হল ভিন্ন। অর্থাৎ অন্যের পথের থেকে ভিন্ন। যারা তোমার পথ জানে না তারাই বলে তোমার দেহ মায়ানির্মিত। তারা যা জানে তাই বলে। চারপয়সার হার যারা পরে সোনা তারা চেনে না। সোনার হারকেও তারা চার পয়সা দামই বলে। তাই দেহকে যারা মায়িক বলে জানে তারা তোমার দেহকেও মায়িক বলে। অনাত্মনি—প্রকৃতিতে আত্মা তুমি আত্মনা স্বাতন্ত্র্যেণ এইটুকু গৌরব রেখেছে—তুমি মায়াকে আশ্রয়ই কর না। মায়ার কোন গুণ তোমাকে স্পর্শই করতে পারে না।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোহপি তদ্‌গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থো যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥ ভাঃ ১।১১।৩৮

এই মন্ত্রটি ভগবানের দেহরক্ষীর কাজ করছে। যেমন প্রাকৃত বুদ্ধি আত্মাতে আশ্রিত হয়েও আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না—তেমনি প্রকৃতি (মায়া) নিয়ে সৃষ্টি কাজ করলেও প্রকৃতির কোন গুণ ভগবানকে স্পর্শ করতে পারে না। এটি হল ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব। কিন্তু বুদ্ধি ও ভগবানের মধ্যে তফাৎ হল বুদ্ধি আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে না আর ভগবান প্রকৃতিকে স্পর্শ করেন না। বলদেব প্রতিটি বালক বাছুরকে কৃষ্ণস্বরূপ দেখে বলছেন এটি তোমার পরাখ্য শক্তির বিলাস। সৎ চিৎ আনন্দের বিলাস। এই চিচ্ছক্তিই নানা আকারে দেখা যায় ধাম পরিকর ইত্যাদি। বাজিকরের বাজীর মত। এটি হল কৃতিশক্তির বিলাস। যারা জানে না তারা বলে মায়াকে অবলম্বন করে ভগবান আবির্ভূত হন। যেমন ব্রহ্মা রজোগুণকে অবলম্বন করে এবং মহেশ্বর তমোগুণকে অবলম্বন করে সৃষ্টি এবং লয় কাজ করেন আর বিষ্ণুভগবান তো সত্ত্বগুণেই

অধিষ্ঠিত আছেন—তাঁকে আর সত্ত্বগুণ অবলম্বন করতে হয় না—এই সত্ত্বগুণে পালন কাজ করেন—কারণ সত্ত্বগুণে পালন কাজ হয়। আর সৃষ্টি এবং লয় কাজ রজঃ এবং তমঃ গুণ ছাড়া হয় না—তাই ব্রহ্মা এবং মহেশ্বরকে রজঃ এবং তমঃ গুণ অবলম্বন করতে হয়। ভগবানের তনুকে মায়িক মনে করলে মহান্ অপরাধ। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজে বলেছেন—

প্রাকৃত করিয়া মনে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥

ভগবান শ্রীগোবিন্দও বলেছেন—

'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম॥ গীঃ ৯।১১

ভগবান ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে বলছেন—অর্জুন যারা আমার এই মানুষ আকৃতি দেখে আমাকে মানুষ বুদ্ধি করে তারা আমাকে অবজ্ঞা করে। তারা আমার প্রকৃত তত্ত্ব জানে না—তারা অতি মূর্খ। তারা এই বুদ্ধি করে অপরাধ করে। এখন এই অপরাধ ক্ষালনের উপায় কি? কৃষ্ণকে তো জগদ্ধিতায় বলে প্রণাম করা হয়—এখন এরা যদি অপরাধী থেকে যায় তাহলে তো ভগবানকে জগদ্ধিতায় বলা চলে না। জগতের হিত তো হল না। হিত অর্থাৎ তাদের বুদ্ধি কেমন করে শুদ্ধ হবে? প্রভু তুমি বার বার ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে জীবকে বুঝাচ্ছ যে তোমার দেহ মায়িক নয়। তোমার কথা শুনলে মায়া পালায়। অন্ধকার সরাবার জন্য আলো দরকার। কিন্তু আলো যদি কেউ না চেনে—আলোকে এনে যদি কেউ রেখে দেয় তাহলেই অন্ধকার নাশ হবে। আলো চিনবার দরকার নেই। আলো রাখলেই কাজ হয়। অন্ধকার নাশ হলেই তাকে আলো বলে আপনা থেকেই চেনা যাবে। ব্রহ্মা বলছেন,—হে ভগবন্ জগতে মায়া অন্ধকার নাশ করবার জন্য আলো প্রকাশের জন্য তুমি সর্বত্র আবির্ভূত হও।

সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি তির্যক্ষু যাদঃস্বপিতেঽজনস্য।

জন্মাসতাং দুর্মদনিগ্রহায় প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ।

ভাঃ ১০।১৪।২০

ব্রহ্মা বলছেন,—যারা ভগবানের তনুকে মায়িক বলে তাদের ভগবানের সুখের অনুভূতি বিলাসের অনুভূতি নেই।

এর আগে গোচারণলীলা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বলেছেন যে বালকেরা ভগবানের সঙ্গে গোচারণলীলায় আছে সে ভগবান কেমন জানেন মহারাজ, ঐ কৃষ্ণকে ব্রহ্মজ্ঞানীরা শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করেন মাত্র।

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সাকং জিহ্রুযঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥

ভাঃ ১০।১২।১১

সুখানুভূত্যা এখানে সহার্থে তৃতীয়া দেওয়া হয়েছে। বালকেরা সেই সুখানুভূতির সঙ্গে খেলা করছে। যেমন কালো চশমা চোখে দিলে মেঘ না থাকলেও মেঘের মত দেখায়, তেমনি মায়ার অঞ্জন চোখে লাগান থাকলে মায়ার চশমায় চিৎ বস্তুকেও মায়া বলে মনে হয়। ভগবানের তনুকে মায়িক মনে করাই অপরাধ। এখন কৃষ্ণ মানুষী তনুকে আশ্রয় করেছেন—যদি সত্যি করেই থাকেন তাহলে তা বললে অপরাধ হবে কেন? ভগবান বললেন যারা তা মনে করে অর্জুন তারা মূর্খ। মূর্খদের এটি মনে করা অবজ্ঞা হবে কেন? মূর্খেরা এটি বলে কিন্তু সত্যি করে ভগবান মানুষী তনুকে আশ্রয় করেন নি। অর্জুন যেন তার উত্তরে বলছেন, কেন, তুমি তো মানুষী তনুকেই আশ্রয় করেছ। ভগবানের তনুকে মানুষী তনু বলা যাবে না। শ্রীবলদেব তাঁর গীতাভাষ্যে বলেছেন—সোনা দিয়ে তৈরী মানুষকে যেমন মানুষ বলা যায় না। কারণ উপাদানে বৈষম্য আছে। সোনা দিয়ে তৈরী মানুষের দেহের উপাদান হল সোনা আর মানুষের দেহের উপাদান হল রক্তমাংস মেদ মজ্জা অস্থি চর্ম। ভগবানের দেহ মানুষের মত

দেখতে কিন্তু মানুষ নয়। মানুষসন্নিবেশিত তনু অর্থাৎ মানুষের যে দেহ সন্নিবেশ হলে তাকে মানুষ বলা যায় সেইরকম অঙ্গ সন্নিবেশ ভগবানের কিন্তু মানুষের দেহের উপাদান ভগবানের দেহে নেই। ভগবানের দেহ সচ্চিদানন্দঘন। ভগবানের দেহের আকার মানুষের মত। কিন্তু তিনিও তো অঙ্গে রক্তধারা অঙ্গীকার করেছেন। পিতামহ ভীষ্ম স্তুতি করেছেন—'আমার নিশিত (তীক্ষ্ন) বাণে তোমার যে অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয়েছে সেই কৃষ্ণচরণে আমার রতি মতি লাভ হোক্। নিত্যানন্দ ললাটে রক্তধারা—এটি কি করে হয়। মহাজন বললেন—এ উপাদান নয়—এটি ভগবানের অসুরমোহন লীলা। ভগবান নিজের স্বরূপে এগুলি দেখান ভক্তের দর্শনের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্য। আর একটি কারণ পাপীর পাপমোচন। ভগবানের অঙ্গে রক্তধারা দেখে তারা ভগবান বলে তাঁকে চিনতে পারল না মানুষ বলেই মনে করবে। এতে অসুরের বিপরীত বুদ্ধি বেঁচে রইল। এই আসুরী বুদ্ধি না থাকলে তো সংসার থাকবে না—সৃষ্টি থাকবে না। কারণ আসুরী বুদ্ধি নিয়েই তো সংসার। যেমন মা ছেলের জন্য দুধ খাবার ঢেকে রেখে কোনও কাজে গেছেন। ছেলে আসার আগেই একটি বেড়াল ঘরে ঢুকেছে—সে তো ঢাকা দেখে ফিরে গেল কিন্তু ছেলে এসে ঢাকা তুলে খেয়ে নিল। তেমনি ভগবান নিজের স্বরূপকে যোগমায়া লীলাশক্তির আবরণে রাখেন। অভক্ত মার্জার সে ঢাকা তুলে স্বরূপ অনুভব করতে পারে না। কিন্তু ভক্তপুত্র আবরণ উন্মোচন করেই তাঁর স্বরূপ অনুভব করে। ব্রহ্মার বালক বাছুর চুরি ভগবান যেন জানতে পারেন নি। ভগবান এইভাবে দেখালেন তাতে ব্রহ্মা মনে মনে আনন্দ পেলেন। কারণ কথা আছে—

যার লাগি করি ভয় সে যদি না জানে।
ইহা বই কিবা সুখ আছে এ ভুবনে ?

এখন কথা হল অসুর যদি ভগবানকে না ভজে তাহলেই ভাল।

কিন্তু যাদের এই বিপরীতবুদ্ধি তাদের অপরাধ ক্ষালনের কি উপায় ? কারণ ভগবান বলেছেন আমি তাদের বার বার আসুরী যোনিতে ক্ষেপণ করি। আসুরী জন্ম হল অশুভ জন্ম অর্থাৎ আত্মবঞ্চনার জন্ম। আমাকে যে ভোলে বা আমাকে যে বিদ্বেষ করে তাকে এইরকম শাস্তি দিই। গীতায় ভগবান বড় কড়া। সেই ভগবানই ব্রজে প্রেমের রাজ্যে কড়া নন। স্নেহের রাজ্যে যেমন পিতামাতার কাছে সন্তানের শাসন নেই। তাই গোকুলে ভগবানের একান্ত প্রেমের রাজ্যে মাতৃবেশে এসে জিঘাংসাবৃত্তিসম্পন্না লোকবালঘ্নী রুধিরাশনা পুতনাও ক্ষমা পেয়েছে। পুতনাই প্রথম উদাহরণ। সদ্গতি পদে ব্যাখ্যা করেছেন সতীমাতা তার গতি। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ রাজনীতির ভিতরে পড়ে গেছেন তাই তিনি কাউকে ক্ষমা করেন না। ব্রজের কৃষ্ণ নিরক্ষর—তখনও তার অক্ষর পরিচয় হয় নি। তাই তিনি বিধিবিচার করেন না। সেইজন্য ব্রজে যে কোন অবস্থাতে গেলেই সে ক্ষমা পাবে। ব্রজের কৃষ্ণ প্রেমে ডগমগ প্রেমে ভরপুর হয়ে দিল-দরিয়া। তাই সেখানে যে কোন ক্লেশই হোক্ না কেন দূর করেন। সব অন্ধকার কৃষ্ণসূর্য্য নাশ করেন।

কৃষ্ণের মত বদান্য তো আর কেউ নেই। বলা আছে—

কৃতজ্ঞ শুচি বদান্য কৃষ্ণ বিনা কে বা অন্য।

মায়াকে ভগবান স্পর্শ করেন না। তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ। মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে গেলেই বিনাশ পায়। অন্ধকার যেমন অন্ধকারের উপাদানে তৈরী কোন সামগ্রী আলোর কাছে উপহার দিতে পারে না মায়াও তেমনি মায়া উপাদানে তৈরী কোন উপহার কৃষ্ণকে দিতে পারে না। এখন ব্রহ্মা বলছেন, যারা তোমার দেহকে মায়াশ্রিত বলে তাদের তো অপরাধ হল কিন্তু তাদের এ অপরাধ ক্ষালন করে উদ্ধারের উপায় কি ? যদি তাদের শাস্তিই দিতে হয় তাহলে তো ভগবানকে জগদ্ধিতায় বলে প্রণাম করা যায় না কারণ এই অপরাধীরা তো জগৎ ছাড়া নয়। তাদেরও তো—ভগবান হিত

করেন। তাদেরও হিতের জন্য ভগবানের আবির্ভাব। ভগবানকে গাল দিলেও ভগবান তার হিত করেন—এটি তাঁর নিরুপাধিক করুণা। ভগবান কোন কারণ দেখে আবির্ভূত হন না তাই কোন কারণে তাঁর আসা বন্ধও হয় না। কোনও শুভ পুণ্যে করুণা আসে না তাই কোন অশুভ পাতিত্যে বন্ধও হয় না।

জন্মলীলা প্রসঙ্গে বলা আছে অজনজন্মার্ক্ষ—অজন অর্থাৎ বিষ্ণু তার থেকে জন্ম যার অর্থাৎ ব্রহ্মা তাঁর জন্মনক্ষত্র অর্থাৎ রোহিণী নক্ষত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীজীবপাদ টীকা করছেন —জীবাত্মাহিত অজ পরমাত্মা অজন। এতো তাঁর স্বরূপ। তাহলে অজনের জন্ম বললে আর স্তুতি বুঝাবে কেমন করে? জন্ম বলতে সংসার বন্ধনকে বুঝায় শুধু ভূমিষ্ঠ হওয়া নয়। তোমার আশ্রয়ে ভক্তের সংসার বন্ধন থাকে না। কারণ ভক্তের জন্ম কর্মফলে হয় না। অভক্তের জন্ম কর্মফলে হয়। ভক্তের জন্ম ভগবানের ইচ্ছায়। তাই ভক্তকে জন্ম বন্ধের ক্লেশ সহ্য করতে হয় না। বিড়ালীদন্ত স্পর্শের মত। বিড়ালীর দাঁতে ইঁদুর ব্যথা পায় তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয় কিন্তু সে দাঁতের স্পর্শে তার বাচ্চারা ব্যথা পায় না বরং মায়ের স্পর্শে আনন্দ পায়। এখানেও তাই জন্মমৃত্যুর কষ্ট অভক্তকে ভোগ করতে হয় কিন্তু ভক্তকে কষ্ট ভোগ করতে হয় না—ভক্ত আনন্দ করে আসে আনন্দ করে চলে যায়। অথচ জন্মমৃত্যু দেখতে একই রকম। যেমন বিড়ালীর দাঁত একই রকম—যে দাঁত দিয়ে ইঁদুর ধরে সেই দাঁত দিয়েই তো বাচ্চাদের ধরে। এখন কথা হল ব্রত করে উপবাস আর অভাবে উপবাস কিন্তু ক্ষুধার জ্বালা তো সমান হবে। তাহলে জন্মমৃত্যুর ক্লেশ ভক্তকে সহ্য করতে হয় না কেন? ভগবানের ইচ্ছায় ভক্তের আসা যাওয়া তাই তাদের সংসার বন্ধন থাকে না ব্রহ্মা বলছেন—তোমার আশ্রয়ে সংসার বন্ধন থাকে না তাই তুমি অজন।

কৃপা হলে মায়া ত্যাগ হবে আবার মায়া ত্যাগ হলে কৃপা পাবে।

এটি বীজাঙ্কুরন্যায়ে সিদ্ধ হয়। তাই কোনটি আগে কোনটি পরে বলা যায় না। বীজ আগে না অঙ্কুর আগে—এ যেমন মীমাংসা করা যায় না। তবু বিচারে দাঁড়ায় কৃপাই আগে হয়। যেমন কোন দরিদ্র কন্যা বিবাহে যৌতুক দিতে অক্ষম হলে পিতা তাকে আগে থেকে টাকা পাঠিয়ে দেন সেইটিই যৌতুক হয়ে তার কাছে ফিরে আসে। এখানেও তেমনি দরিদ্র জীবকন্যার কাছে পিতা ঈশ্বর কৃপা লৌকিকতা আগেই পাঠিয়ে দেন সেইটিই ভক্তি হয়ে ভগবানের কাছে ফিরে আসে। এই কৃপা পেয়ে তারা মায়াকে ত্যাগ করে। দেহে মমতা থাকা কালে মায়া ত্যাগ হয় না। ব্রহ্মা বলছেন, হে ভগবন্ তুমি অজন হয়েও আবির্ভূত হও তাদেরও হিতের জন্য। তারা তো বিচার করে দৃষ্টি দিতে পারে না তাই তাদের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে তাদের দৃষ্টি যেখানে যেখানে পড়তে পারে সর্ব্বত্র তুমি আবির্ভূত হও। দেবতার মধ্যে, ঋষির মধ্যে, মানুষের মধ্যে, তির্যক প্রাণীর (মৎস্য কূর্মাদি) মধ্যে জলজন্তুর মধ্যে সর্ব্বত্র তুমি এই জন্যই আবির্ভূত হও। প্রহ্লাদজীও শ্রীনরসিংহদেবের স্তুতি প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন—

ইত্থং নৃতির্যগৃষি দেব ঝষাবতারৈর্লোকান বিভাবয়সি হংসি জগৎ প্রতীপান্।

ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥ ভাঃ ৭।৯।৩৮

এখন ভগবানের আবির্ভাব কি কারণে হয় ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু তোমার আবির্ভাবের দুটি কারণ প্রধান—অসতাং দুর্ম্মদ নিগ্রহায় আর সতাং অনুগ্রহায়। মদ বলতে অহঙ্কার বুঝায় আর দুর্ম্মদ অর্থাৎ দুষ্ট অহঙ্কার। ভগবৎস্বরূপকে যারা প্রাকৃত বুদ্ধি করে তাদেরই অহঙ্কার হল দুষ্ট। এটি শুদ্ধ অহঙ্কারের ওপরে। তাই তাড়াতাড়ি এ বুদ্ধি যায় না। এ অহঙ্কার নিবারণ করার একমাত্র উপায় লীলাকথা শ্রবণ। কারণ বলা আছে কিছুই না জানে যেহ

শুনিতে শুনিতে সেহ কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত। আবার শুনিলেই বড় হয় হিত। গোপরামারা বললেন—শ্রবণমঙ্গলম্। শুনতে শুনতেই সমাধান হয়ে যাবে। প্রশ্ন করে সমাধান করা যাবে না। কারণ কত প্রশ্নই বা আমরা করতে জানি। মহারাজ পরীক্ষিৎ বলেছেন—আমি যে প্রশ্ন করলাম তারও উত্তর দিন আর যে প্রশ্ন আমি করতে জানি না তারও উত্তর দিন।

আবার প্রশ্ন করলেও ঠিক হবে না। কারণ হৃদয় প্রস্তুত নয়, বস্তু গ্রহণ করতে পারে না—আধারের অভাব। প্রশ্ন করতে গেলে আর তার শোনা হয়ে উঠবে না। শুনতে শুনতে নিজেকে বিকিয়ে দিতে হবে। তারপর প্রশ্নের যেমন যেমন অধিকারী হবে তেমনি তেমনি প্রশ্ন করবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে ভগবান বললেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। গীঃ ৪।৩৪

এখানে প্রদৃষ্টরূপের নতি স্বীকারের নামই প্রণিপাত। আর অধ্যাত্মবিষয়ে প্রশ্নের নামই পরিপ্রশ্ন। প্রণিপাত এবং পরিপ্রশ্ন না হয় হল কিন্তু এর ওপরে আবার সেবার কথা বলা হল কেন? শ্রীগুরুদেব কি তাহলে সেবার অপেক্ষা করেন? কিন্তু গুরুস্বরূপের তো কিছুতেই অপেক্ষা নেই। লাভ লোকসান জয় পরাজয় মান অপমান সব তো তাঁর কাছে সমান। তাঁর সুখের জন্য আমার সেবা নয় আমার সুখের জন্যই তাঁর সেবা। সেবার দ্বারা হৃদয় আধারযোগ্য হবে। সেবা ছাড়া তত্ত্ব উপদেশ গ্রহণ করবার সামর্থ্য আসে না। সাধারণ জগতেও দেখা যায় কোন কথা বুঝবার জন্য বয়স ও সামর্থ্যের অপেক্ষা আছে। গুরুদত্ত বস্তু হৃদয়ে ধারণ করবার জন্যও তেমনি গুরুসেবার অপেক্ষা আছে। বিনা সাধনে শাস্ত্রের কথা শুনবার জন্য গুরুসেবার অপেক্ষা।

প্রাকৃত বিষয় বস্তু সব ছেড়ে চরণাশ্রয় করলে তবে কৃপা পাওয়া যায়। তারপর এই কৃপা রাখবার সামর্থ্য অর্জন করতে হবে গুরু-বাক্য পালনে। গুরুসেবাই বৃক্ষ ভগবৎ প্রাপ্তি বা অন্য যা কিছু

প্রেমসম্পত্তি প্রাপ্তি সব তার ফল। গাছ বেঁচে থাকলে তবে ফল বেঁচে থকেবে। আমার বলতে যা কিছু তা সব গুরুচরণে সমর্পণ করতে হবে। আধার তৈরীর জন্য গুরুসেবা। শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেছেন—এমন ভজন নিষ্ঠা না হইলে শুধু মুখের কথায় কি গৌর মেলে? এমন তিলে তিলে না ভজিলে শুধু মুখের কথায় কি গৌর মেলে? সকল প্রাপ্তির মূল হল অকপটে গুরুপাদপদ্মে সেবা। প্রাকৃত বিষয় সেবা করতে করতে অপ্রাকৃত প্রেমসম্পত্তি লাভের সামর্থ্য জীব লাভ করতে পারে না। কারণ প্রাকৃত কাল বা উপকরণ অপ্রাকৃত সম্পদ লাভের উপযোগিতা দিতে পারে না। নিরন্তর লীলা কথা শুনতে হবে। আলোর দম বাড়াতে হবে। শুনতে শুনতে দুষ্ট মাত্রা কমে যাবে। আলোর দম বাড়ালে অবিশ্বাস অন্ধকার কমে যাবে। লীলা হলেন অপ্রাকৃত তাই আলোর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রাকৃত অন্ধকার নাশ হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভগবান অসতের প্রতি কৃপা করবেন কেন? কিন্তু প্রভু তো স্বতন্ত্র। অসৎকে যদি তিনি কৃপা করেন তাহলে কেউ তো আপত্তি করতে পারবে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মাকেও সৃষ্টি করেছেন তাই তিনি বিধাতা। সকল লীলাবতারের তিনিই হলেন সৃষ্টিকর্ত্তা। ব্রহ্মার সম্বোধনে বালগোপাল যেন প্রশ্ন করছেন—আমি যদি বিধাতা হই তাহলে কুৎসিৎ মৎস্যাদি অবতারে জন্মগ্রহণ করি কেন? বামন অবতারে বলিরাজের কাছে যাচঞা করি কেন? শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে প্রসঙ্গ আছে দেবরাজ ইন্দ্র নারদকে বলেছেন—আমার জন্য যে ভগবান বলিরাজের কাছে ভিক্ষা করেছেন তাতে আমি লজ্জায় মরে যাই। ভগবান তো অভয় তবে মায়ের ভয়ে পালাচ্ছেন কেন? বালগোপাল বলছেন হে ব্রহ্মন্, তোমার পূর্ব্ব এবং পরের কথার মধ্যে তো কোন সামঞ্জস্য নেই। আগে বলে এসেছ পৃথিবীর ভার হরণের জন্য আমার আবির্ভাব—আবার এখন বলছ অসতের

দুর্মদ নিগ্রহ ও সতের অনুগ্রহের জন্য আমার আবির্ভাব। সাধুদের আবার অনুগ্রহ কি? এখানে সম্পদ দেওয়া অনুগ্রহ নয়। প্রাকৃত সম্পদ বেশী পেলে কৃষ্ণকৃপা থেকে বঞ্চিত হলাম এই বুদ্ধি না করা পর্য্যন্ত কৃষ্ণকৃপা আস্বাদন হয় না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেছেন—

কৃষ্ণকৃপার হয় এক স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
রাজ্য ছাড়ি করায় তারে ভিক্ষুকের কর্ম্ম॥

এর উদাহরণ রাজর্ষি ভরত। যিনি শত্রুপুরীতে ভিক্ষা করেছেন—চণ্ডালের পায়ে পড়ে বলেছেন—ওগো! তুমি আমাকে হরি মিলিয়ে দিতে পার?

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে প্রহ্লাদজী দেবর্ষিপাদ নারদকে বলেছেন—ভগবান পরমাকিঞ্চনশ্রেষ্ঠ। সেরা প্রাপ্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির চিহ্ন। ভগবান যে নিজের দর্শন দান করেন এইটিই সাধুদের প্রতি অনুগ্রহ। ভগবান সাধুদের দর্শনামৃতদানে সিঞ্চিত করবার জন্যই এই ধরাধামে আবির্ভূত হন। এইটিই সাধুদের প্রতি অনুগ্রহ। দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন—এই তো ভগবানের কাজ। গীতায় ভগবান বলেছেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।

সাধুদের পরিত্রাণ বলতে তাঁদের দর্শন দিয়ে আনন্দ দান এইটিই বুঝাচ্ছে।

ব্রহ্মা পরবর্ত্তী স্তুতিবাক্যে বলছেন—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্ যোগেশ্বরোতোভবতস্ত্রি লোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্।
ভাঃ ১০।১৪।২১

ভগবানের অবতার কখন এবং কেন হয় তা কেউ বলতে পারে না। ভগবানের লীলা যে দুর্ব্বোধ—এই হেতু বুঝাবার জন্য ব্রহ্মা ভগবানকে সম্বোধন করলেন—'হে ভূমন্! এর পরেও পর পর

সম্বোধন পদ পরাত্মন্ ভগবন্ যোগেশ্বর। এখানে সম্বোধন পদ পরের পরেরটি পূর্ব্বের পূর্ব্বের চেয়ে বলবান্। ভগবানের কোন কাজের কি যে ইচ্ছা তা বুঝা যায় না। ভগবানের ইচ্ছাই তো তাঁর কাজ। পিতামহ ভীষ্ম কৃষ্ণকে বলেছেন—তোমার নিজের কাজে যে কাজ হল না—তুমি নিজে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বুঝিয়েছ তাতে তাঁর চিত্ত প্রশান্ত হল না আর তোমার আদেশের দ্বারা আমাকে দিয়ে সেই কাজ হবে? আমার কাছে নিয়ে এসেছ আমি উপদেশ দিয়ে মহারাজের চিত্ত প্রসন্ন করব? তাহলে বুঝলাম কৃষ্ণ তোমার কাজ তোমার কাজ নয় তোমার ইচ্ছাই তোমার কাজ। বেশ তাই হবে। তোমার কাজের চেয়ে তোমার আদেশ বলবান। কৃষ্ণের সামনেই ভীষ্ম বলেছেন—কৃষ্ণ ইচ্ছাতেই পান্ডবদের যা কিছু বিপদ। এতে ভগবান তো আপত্তি করেন নি। তাহলে বুঝা গেল এ বাক্যে কৃষ্ণের সম্মতি আছে। এখন যদি প্রশ্ন হয় পাণ্ডবদের বিপদ দেওয়া কৃষ্ণের ইচ্ছা কেন? বিপদে পড়লে পাণ্ডবদের ধৈর্য্য ধর্ম তিতিক্ষা সংযমের পরীক্ষা হবে—তাতে জগতে তাদের মহিমা প্রচারিত হবে। যে যাকে ভালবাসে তার মহিমা জগতে প্রচার করতে চায়। কৃষ্ণ তো পাণ্ডবদের ভালবাসেন—তাই কৃষ্ণও চান পাণ্ডবদের মহিমা যাতে প্রচারিত হয়। কারণ বিপদই তো ভক্তসোনা যাচাই করার কষ্টিপাথর। ভীষ্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—মহারাজ আমার চিত্ত যদি প্রসন্ন হয় তাহলে কৃষ্ণ ইচ্ছাতেই হবে—আমার উপদেশে হবে না। আর মহারাজ, কৃষ্ণ আপনাকে উপদেশ দেওয়াবার জন্য এখানে এসেছেন—এটিও আসল কথা নয়। আমি শরশয্যায় শায়িত মুমূর্ষু—আমার একান্ত বাসনা দেহত্যাগের সময় ভগবানের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত চরণচিহ্ন দর্শন করতে করতে দেহত্যাগ করব। আমার ওপরে তো ইচ্ছামৃত্যু বর। আমি যখন ইচ্ছা দেহত্যাগ করব। আজ আমার সেই দেহ-ত্যাগের দিন। আমার মনের বাসনা তো কাউকে বলি নি—কৃষ্ণকেও বলি নি—কিন্তু কৃষ্ণ তো অন্তর্য্যামী। তাই আমার সেই বাসনা

পূরণের জন্য কৃষ্ণ আমাকে দর্শন দেবার জন্য আজ এখানে এসেছেন—মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দেওয়া—ওতো বাইরের কথা। ওতো ছল।

তথাপ্যেকান্তভক্তেষু পশ্য ভূপানুকম্পিতম্।
যন্মেঽসূংস্ত্যজতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণো দর্শনমাগতঃ॥ ভাঃ ১।৯।২২

মহাভারতে কৃষ্ণের আসল হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া হয় নি। শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের দরদী হৃদয়ের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ব্রহ্মা বলছেন, ভগবন্ এই পৃথিবীতে তুমি অবতীর্ণ হও কিন্তু তোমার আসার কারণ কেউ বুঝতে পারে না। ত্রিভুবনে কারো সে ক্ষমতা নেই। জীবজগৎ মায়াকে অবলম্বন করে ক্রীড়া করে আর তুমি তো এ যোগমায়াকে অবলম্বন করে লীলা কর। যোগমায়ার সঙ্গে মায়ার জগতের সম্বন্ধ নেই। তাই মায়ার জগৎ তোমাকে বুঝতে পারে না। জলচর প্রাণী যেমন স্থলচর প্রাণীর খবর রাখতে পারে না তেমনি মায়াজলের প্রাণী চিৎ জগতের খবর রাখতে পারে না।

ভগবানের লীলা গুণময়ী মায়াশ্রিতা নয়। তা যদি হত তাহলে ভগবানের লীলা কথা শুনে জীবের মায়া দূর হত না। ভগবানের লীলাকথা সম্পূর্ণ করে বলা যায় না। তাহলে তাঁর অনন্তত্বের হানি হয়। ভগবানের লীলা ব্রহ্মাও সমগ্রভাবে বলতে পারেন নি। সনকাদি ঋষিও পারেন নি। এমনকি শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ তাঁর সহস্রবদনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলাগুণ গাইছেন আজও গাইছেন কিন্তু লীলাসাগরের পারে যেতে পারেন নি। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে বলাই যদি না যায় তাহলে বলবার প্রয়োজন কি? তার উত্তরে বলা যায় অগত্যা বলতে হয়। কারণ না বললে সংসার সাগর পারের অন্য কোন উপায় নেই। যেমন আলো জ্বালা ছাড়া অন্ধকার দূর করার অন্য কোন উপায় নেই। এ জগতে দুঃখের চেহারা কত প্রকার। জীব কতভাবে দুঃখের সাগরে পড়েছে। ভগবান নিজে বললেন—মম মায়া দুরত্যয়া

—আমার মায়া পার হওয়া কঠিন। ভগবানের অপ্রাকৃত লীলারস আস্বাদনই একমাত্র সংসার সাগর পারের উপায়। দেবর্ষিপাদ নারদ বলেছেন—

এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনম্॥ ভাঃ ১।৬।৩৫

দেবর্ষিপাদ নারদ বেদব্যাসকে বললেন—তুমি তো জগতে পরমার্থ সম্পদ দান করতে এসেছ। ধর্ম উপদেশ করতে এসেছ। এখন এই ধর্ম কাকে বলে? সংসার সাগর পারের যে উপায় তার নামই ধর্ম। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রে মহাভারতে যা উপদেশ করেছ তা তো সংসার সাগর পারের উপায় নয়। সংসার সাগরে ডোবার অর্থ কি? প্রাকৃত বিষয়ে যেমন যেমন আসক্তি তেমনি তেমনি ডোবা। তুমি ডুববার পথ-নির্দ্দেশ দিয়েছ। তাই এসব অধর্ম উপদেশ হয়েছে, ধর্ম উপদেশ হয় নি।

দেবর্ষিপাদের পক্ষেই একমাত্র এ কথা বলা সাজে। নারদ বলছেন—আচার্য্য তোমারও মোহ? বৈকুণ্ঠ হতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র আমার গতি। তার মধ্যে যারা সংসার সাগর পার হয়ে যায় তাদের আমি চোখে দেখেছি—এটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ—দৃষ্টঃ ন তু শ্রুত অনুমিতো বা। এটি কানে শোনা বা অনুমান নয়। যারা মাত্রাস্পর্শ —বিষয়ের সঙ্গে যোগ থাকলে তবেই আকর্ষণ। বিষয়াসক্ত জীব যারা একটু প্রাকৃত বিষয় ভোগের জন্য কুকুরের মত কাঙ্গাল হয়ে চেয়ে থাকে তারা কেমন করে সংসার সাগর পার হয় তা আমি চোখে দেখেছি। নারদের পূর্ব্বকথা স্মরণ হচ্ছে—(১) স্বানুভূতি (২) পরানুভূতি। সাধুদের কাছে বসে নারদ ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করেন এইভাবে সাধুদের অনুগ্রহ লাভ করেন। লীলাকথা শুনতে দেওয়াটাই হল তাঁদের অনুগ্রহ। সংসার সাগরে জীব ডুবে আছে। এদের মধ্যে যারা পার হয়ে বৈকুণ্ঠে যায় তাদের নারদ চোখে দেখেছেন। আলোর দ্বারা অন্ধকার নাশ হয়। অন্ধকার দ্বারা

অন্ধকার নাশ হয় না। তেমনি ভগবানের দেহ বা গুণলীলা যদি মায়াশ্রিত হত তাহলে তাঁর দ্বারা মায়া বিনাশের কোন ব্যবস্থা হতে পারত না। মায়ার দ্বারা মায়ার বিনাশ হয় না। যোগমায়ার দ্বারা মায়ার বিনাশ হয়। ব্রহ্মা বলছেন—কখন, কেমন কত পরিমাণ তোমার লীলার ধারা কেউ তা বুঝতে পারে না। শ্রীবালগোপাল প্রশ্ন করছেন,—আচ্ছা ব্রহ্মন্ ভগবানের অবতারের চেষ্টা লৌকিকী অর্থাৎ এ জগতে মানুষের আচরণের মত হবে কেন? রামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম হয়েও লৌকিক আচরণ করলেন কেন? আনন্দঘন বিগ্রহ হয়েও সীতাবিরহে রামচন্দ্রের বুকফাটা আর্ত্তনাদ। পূর্ণব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ রামচন্দ্র অথচ তিনি সীতাহারা হয়ে সীতা অন্বেষণে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচয় দিলেন। এসব আচরণ কেন? ব্রহ্মা তার উত্তরে বলছেন—প্রভু, তোমার লীলা যে কখন কি উদ্দেশ্যে হয় তা কেউ বুঝতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রে বলা আছে 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্।' ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা অধরা বস্তু—তাই লৌকিকের মত হয়ে আমাদের কাছে না এলে আমরা তা ধরতে পারি না। যেমন এ জগতে রাজা মানুষই বটে কিন্তু যখন তিনি তাঁর নিজ ঐশ্বর্য্যে সরগরমে থাকেন তখন তাঁর কাছে যাওয়া যায় না। ভগবানের ভগবত্তাও তেমনি দেখতে লৌকিকের মত হলেও বস্তুত লৌকিক নয়। যেমন আতা সন্দেশ দেখতে আতা হলেও স্বাদে যেমন আতা নয়—সেটি সন্দেশ। তেমনি ভগবানের লীলা প্রাকৃত গুণময়ীর মত দেখতে হলেও বস্তুত তা নয়। এটি সচ্চিদানন্দময়ী যোগমায়াশ্রিতা। এখানে মায়ার কোন সম্পর্কই নেই। এ লীলার উপাদান প্রেমরসঘন সচ্চিদানন্দ। সন্দেশের কমলালেবুর যেমন খোসা বাদ দিতে হয় না—সবটাই আস্বাদ্য তেমনি ভগবানের লীলার কোনও অংশই ত্যাজ্য নয় সবটাই আস্বাদ্য। অলৌকিকী চিন্ময়ী লীলা মাটির জগতে গঙ্গাধারার মত নেমে এসেছেন—তিনি যদি পাবনী না হন তাহলে তো তাঁর গৌরব থাকে না—তিনি পাবনী বলেই তাঁর গৌরব। ভগবানের লীলা

কথার শ্রবণ কীর্ত্তনে মানুষ পবিত্র হয় এইটিই তাঁর পাবনত্ব—এতেই তাঁর গৌরব।

ব্রহ্মা ভগবানকে ভূমন্ বলে সম্বোধন করেছেন। এতে ভগবানের অপরিচ্ছিন্ন স্বরূপ বুঝাচ্ছে। আবার সম্বোধন করলেন ভগবন্ অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী আবার বললেন পরাত্মন্ সকলের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন—তিনি যোগেশ্বর অর্থাৎ দুর্ঘটঘটন-সমর্থ অঘটন ঘটাতে পারেন। সচ্চিদানন্দের বিলাস শক্তি যোগমায়া জন্মাদি লীলাও সত্য। কারণ বিলাস থেকেই লীলার প্রকাশ। যোগ বলতে ঐশ্বর্য্য বুঝায়। তদ্‌যুক্তাং মায়া তাই যোগমায়া। এখানে মায়া শব্দের দ্বারা ভক্তকে কৃপা বুঝাচ্ছে। মায়া কৃপা অর্থেও হয়। এই যোগমায়া যদি ভক্তকে কৃপা না করেন তাহলে ভক্ত ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে কেমন করে? ঘরে থেকে যা পেয়েছিল তার চেয়ে বেশী পাচ্ছে বলেই তো ঘর ছেড়ে ভক্ত যায়। ভক্তি মহারাণীর কাছে কোনও ধারে কারবার নেই। তাঁর নগদ নগদ দান। যেমন যেমন ভক্তিঅঙ্গ যাজন তেমনি তেমনি প্রেমসুখ আস্বাদন। ঘরে থেকেই ভক্ত প্রাকৃত বিষয়ভোগের চেয়ে বেশী পায় ভক্তিরস আস্বাদনে আবার তার থেকেও বেশী পাবার জন্য ঘর ছেড়ে যায়। ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা এই প্রাকৃত জগতে আবির্ভূত করানর মূল উদ্দেশ্য হল ভক্তকে সুখ দেওয়া। ব্রহ্মা বলেছেন—প্রপন্নাজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো। ভক্তজনকে আনন্দ দেওয়াই তোমার লীলা প্রকাশের কারণ।

ব্রহ্মা প্রথমে বললেন, কো বেত্তি অর্থাৎ কে জানে—কেউ জানে না আবার পরে বললেন—ভক্তরাই তোমার লীলার খবর জানে। স্তুতির আরম্ভে ব্রহ্মার যে জ্ঞান ছিল তা ক্রমশ বাড়ছে। তাই পরে বলতে পারলেন ভক্তরা জানতে পারে। কারণ যেমন যেমন কৃষ্ণপাদপদ্ম দর্শন হচ্ছে তেমনি তেমনি ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের কৃপা হচ্ছে আর ব্রহ্মার তত্ত্ববোধও তেমনি তেমনি বাড়ছে। ব্রহ্মা বলছেন, হে বালগোপাল, এই মায়ার জগতে পুত্রের মত তুমিও চেষ্টা কর

প্রপন্নজনের আনন্দদানের জন্য। তুমি যেমন ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও অনন্ত তোমার লীলাও তেমনি ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও অনন্ত। এখন কথা হচ্ছে, অসতের দুর্মদ নাশের জন্যই যদি তোমার আবির্ভাব হয় তাহলে আজও দুর্ব্বাসনাগ্রস্ত জীব কেন থাকে? অসতের মদ এখনও নাশ হয় নি কেন? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন, কো বেত্তি? ক অর্থাৎ ব্রহ্মা—তোমার ইচ্ছায় জগৎ পরিচালিত সুতরাং তুমি কাকে উন্মুখ করবে তা কেমন করে কে বলবে? বালগোপাল যেন প্রশ্ন করছেন—কেন, এটি বুঝতে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি নেই? না, তোমার লীলা যোগমায়াশ্রিত অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব। শ্রুতিবাক্য আছে—'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।' অচিন্ত্য কাকে বলে? 'প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদ্‌চিন্ত্যস্য লক্ষণম্‌।' জীব মায়াশ্রিত সুতরাং সে কেমন করে তোমার এই অচিন্ত্যশক্তির লীলা বুঝবে? জীবের পক্ষে তোমার লীলা না বুঝাই উচিত। জীব যদি তোমার লীলা বুঝতে পারে তাহলে তোমার লীলাকে ছোট করা হয়। ভগবানের কথাই বুঝা যায় না—তাঁর আচরণ কি করে বুঝা যাবে? কৃষ্ণ এক ভাবেন আর একরকম বলেন। অশ্বত্থামা বধ প্রসঙ্গে অর্জ্জুনের প্রতি কৃষ্ণের আদেশে অর্জ্জুন বিপাকগ্রস্ত হয়েছিলেন। দ্রৌপদী পুত্রহন্তার প্রতিশোধ নিতে চান নি। বলেছিলেন—আমি যেমন পুত্রশোকে কাতর হয়েছি অশ্বত্থামার মা কৃপী যেন সেইরকম পুত্রশোকে কাতরা না হন। দ্রৌপদীর এই মহিমার জন্যই তিনি কৃষ্ণপ্রেয়সী হতে পেরেছিলেন। কৃষ্ণ তাকে আনন্দে সখী সম্বোধন করেছেন। অর্জ্জুন যখন বিহ্বল হয়ে পড়েছেন তখন কৃষ্ণের মুখের দিকে তাকালেন। সখার মুখের দিকে ছাড়া আর কোথায় তাকাবেন? কৃষ্ণের আশয় বুঝা বড় কঠিন। তবে তাঁকে আশ্রয় করে যদি থাকা যায় তাহলে তিনিই বুদ্ধি দেন। ভগবান বলেছেন—'দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে।' ভগবান বলেছিলেন,—'অর্জ্জুন-আততায়ীকে বধ করা উচিত কিন্তু ব্রাহ্মণের পুত্রকে বধ করা উচিত নয়। কৃষ্ণকে

আশ্রয় করে অর্জ্জুন আছেন তাই তাঁর কৃপায় ভগবানের বাক্য বুঝে নিয়ে অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে প্রাণে বধ করেন নি কিন্তু তার বৈরূপ্য সাধন করেছিলেন—মস্তকের মণি ছেদন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ বা কুটুম্বের বৈরূপ্যসাধনই হল বধের তুল্য। তোমার লীলার তত্ত্ব জানবার জন্য তোমার ভক্তের শরণাগত হতে হবে। তা না হলে জানবার কোন উপায় নেই।

ব্রহ্মার এই স্তুতিবাক্যের ওপরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ আস্বাদন করেছেন—হে ভগবন্ তোমার জন্মাদিলীলা যে কি কারণে হয় বা কি প্রয়োজনে হয় তা সম্পূর্ণ করে কেউই জানতে পারে না। শাস্ত্র এ সম্বন্ধে যা পেয়েছে তাই দিয়েছে। ব্রহ্মা চারটি সম্বোধন করেছেন, হে ভূমন্, ভগবন্, পরাত্মন্, যোগেশ্বর। ভূমন শব্দের অর্থ করলেন,—বিশ্বব্যাপক অনন্তমূর্ত্তি, ভগবন্ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, পরাত্মন্—ভগবত্ত্বেঽপি পরাত্মন্ অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হয়েও তিনি সকলের অন্তরে বিরাজ করেন। পরমাত্মা স্বরূপ তো কৃষ্ণের অধীন। ভগবৎ স্বরূপ সকলের দর্শনযোগ্য। যোগীদের ধ্যানের যোগ্য—তাঁরা কেবল ধ্যান করেন—দর্শন পান না। কিন্তু ভগবান ভক্ত ও অভক্তের দৃশ্য হন—এটি তাঁর অযাচিত করুণা। ভগবান অবতারী তিনি যে অবতার হয়ে আসেন এটিতে তাঁর বাহাদুরী আছে। তিনি মানুষ না হয়েও মানুষের মত দেহ ধারণ করে আসেন জীবকে করুণা করবার জন্য। তাই ব্রহ্মা বললেন দেহী ইব আভাতি মায়য়া। মায়া শব্দের অর্থ এখানে কৃপা। যোগেশ্বর শব্দের অর্থ—এর মধ্যে সব ঐশ্বর্য্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। এটি কেবলমাত্র যোগমায়ার দ্বারা অনুভবের যোগ্য। অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বরে—এরই নাম যোগ।

অচিন্ত্যাশক্তিরস্তীশে যোগশব্দেন চোচ্যতে।
নিরোধভঞ্জিকা সা স্যাদিতি তত্ত্ববিদাং মতম্ ॥

যে অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে ভগবৎস্বরূপে বিরুদ্ধ গুণ শত শত একসঙ্গে অর্থাৎ যুগপৎ প্রকাশিত হয়। এর নামই যোগশক্তি। এ

জগতের বস্তুতেও কিছু কিছু বিরোধ দেখা যায়। যেমন শঙ্কর শঙ্করীর বৃষ ও সিংহ, যাদের খাদ্য খাদক সম্পর্ক তারা একজায়গায় আছে। সমুদ্রে জলে বাড়বানল (অগ্নি) কার্ত্তিক ও মহাদেবের ময়ূর ও সর্প—শিবললাটে বহ্নি মাথায় গঙ্গা—এই বিরুদ্ধ বস্তু একসঙ্গে এক জায়গায় কি করে থাকতে পারে এ যদি যুগ যুগ ধরে বসে চিন্তা করা যায় তাহলেও সমাধান করা যাবে না। নারায়ণের পাদপদ্ম বর্ণনায় বলা আছে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর নারায়ণের পাদপদ্মে লোভ আছে কিন্তু দাস পুরুষভক্ত তাঁকে এমন করে ঘিরে আছে যে লক্ষ্মী নারায়ণের কাছে যেতে পারছেন না কিন্তু নারায়ণের পাদপদ্মের মাধুর্য্য এতই বেশী যে লক্ষ্মী স্ত্রীজনোচিত শালীনতা ভঙ্গ করেও সে পাদপদ্মে উপস্থিত হয়েছেন। মহান্ আধারে থাকবার লোভে বিরোধী বস্তুগুলি তাদের নিজেদের মধ্যেই বিরোধগুলি মিটিয়ে ফেলে। ভগবৎ স্বরূপের এই অচিন্ত্যশক্তির খেলা বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য অভিমান কোন কিছু দিয়েই উপলব্ধি হয় না। একমাত্র যোগমায়ার করুণায় এই অচিন্ত্যশক্তির অনুভূতি হয়। এই যোগমায়ার করুণার মুখাপেক্ষী যে শুধু জীব তা নয় ভগবান নিজেও তাঁর করুণার মুখাপেক্ষী। ভগবানের লীলা সংঘটনের জন্য যোগমায়ার ওপরে ভগবানের আদেশ দেওয়া আছে—তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন করে চালাতে পারেন তবে তাতে যদি কৃষ্ণের সুখবিধান হয়। এতে ভগবানের স্বাধীনতা নেই। যোগমায়ার এই স্বাধীনতার ফলেই শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কভু মিলন কভু বিরহ—কখনও মিলন কখনও ভঙ্গ। কভু মিলা কভু অমিলা। কৃষ্ণের আনন্দিনী শক্তি রাধারাণী। অগ্নির যেমন দাহিকাশক্তি ছেড়ে থাকা সম্ভব নয়, দুগ্ধ যেমন তার শুভ্রতা, মধু যেমন তার মাধুর্য্য, চন্দ্র যেমন তার চন্দ্রিকা ত্যাগ করে থাকতে পারে না ভগবান তেমনি সচ্চিদানন্দঘন-বিগ্রহ তাঁর আনন্দিনী শক্তি বা হ্লাদিনী শক্তি রাধারাণীকে ছেড়ে থাকতে পারেন না—তাই তাঁদের বিরহ কখনই সম্ভব নয়। প্রাকৃত

জগতেই যদি শক্তিমান শক্তিকে ত্যাগ করতে না পারে তাহলে অপ্রাকৃত রাজ্যে সেটি কেমন করে সম্ভব হবে ? কিন্তু এই অসম্ভব রাধাবিরহও কৃষ্ণের পক্ষে সম্ভব হয় একমাত্র যোগমায়ার অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার তাই বলেছেন—স্বয়ং ভগবানের নাই বিরহের জ্বালা। তত্ত্বপক্ষে দেখতে গেলে শক্তিমান শক্তিকে ছেড়ে থাকে না কিন্তু তত্ত্বের ওপরে লীলার খেলা চলে। লীলা তত্ত্বের খাতির রেখে চলে না। লীলাশক্তি নিজের সামর্থ্যে কৃষ্ণ শক্তিমান ও তাঁর শক্তি রাধারাণীর মধ্যেও বিরহ সৃষ্টি করেছেন। কৃষ্ণ সখাদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন—রাধার দর্শন কেমন করে পাব ? মধুমঙ্গল রাধানামাক্ষর লিখিত পত্র কৃষ্ণকে দিয়ে বললেন এই নাও তোমার রাধা। কৃষ্ণ তাতে তৃপ্ত হলেন—এ তৃপ্তি কিন্তু তাঁর অভিনয় নয়। কারণ সত্যিকার প্রণয়িজন যে সে প্রণয়ী ও তাঁর নামাক্ষর অভিন্ন স্বরূপেই দেখে। অসম্ভবকে সম্ভব করেন একমাত্র যোগমায়া। তাই রাধাকৃষ্ণের লীলার অনুভূতি হয় একমাত্র লীলাশক্তি যোগমায়ার অনুগ্রহে। আমাদের বিষয় এবং ইন্দ্রিয় দুইই প্রকৃতি উপাদানে গড়া। এ জগতের খাদ্যকে ক্ষুধা ভোগ করে। ভোগ্যকে ভোক্তা ভোগ করে কিন্তু দুটিই প্রাকৃত। এ জগতের ভোগ্য রূপাদি পঞ্চক শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রাকৃত ইন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ গ্রহণ করে মনের কাছে পাঠায় —এই মনও প্রকৃতি উপাদানে গড়া—সে ঐ রূপাদি পঞ্চক রসিয়ে রসিয়ে ভোগ করে। কিন্তু ও জগতের রূপাদি পঞ্চক ভগবানের শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ চিৎ স্বরূপের বিলাস তার ভোক্তা তো প্রাকৃত ইন্দ্রিয় মন হতে পারে না। এখন এই ইন্দ্রিয় কে দেবে ? প্রাকৃত মায়া অর্থাৎ মহামায়া তো সে ইন্দ্রিয় দান করতে পারে না। এ ইন্দ্রিয় দেন যোগমায়া। এটি মহামায়ার হাতের বাইরে।

মা তো সন্তানের মনের খবর জানেন। তাই মায়ের কাছে সন্তানের শরণাগত হয়ে বলতে হবে প্রার্থনা জানাতে হবে—মাগো ! মহামায়ার দেওয়া এই প্রাকৃত খেলনা আমার আর ভাল লাগছে না।

মা, তুমি এই প্রাকৃত বিষয় বাসনা থেকে আমাকে মুক্ত করে তোমার অপ্রাকৃত রূপাদি পঞ্চকে আমার ইন্দ্রিয় বৃত্তি লুব্ধ করে রাখ। তখন মহামায়া সন্তানের মনের ভাব জেনে কৃপা পরবশ হয়ে যোগমায়ার কৃপার ইঙ্গিত পাইয়ে দেবেন। কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ পাইয়ে দেবেন। বৈষ্ণবতা পাইয়ে দেবেন। এ জগতে চোখ প্রাকৃত, শব্দও প্রাকৃত—তাই প্রাকৃত চোখ প্রাকৃত শব্দ গ্রহণ করতে পারে না—চোখ দিয়ে শোনা যায় না। সজাতীয় হয়েও চোখের শব্দ গ্রহণের সামর্থ্য নেই—আর ভগবান এবং আমাদের ইন্দ্রিয় প্রাকৃত এ তো সম্পূর্ণ বিজাতীয়—তাহলে আমাদের ইন্দ্রিয় কেমন করে ভগবানকে দেখবে? গোবিন্দের কাছে প্রাকৃতবস্তু বিড়ম্বনা মাত্র। আত্মাকে আত্মার খাদ্য দিতে হবে। মানুষ যেমন গরুর খাদ্য বিচুলি খেতে পারে না—আত্মাও তেমনি প্রাকৃত গন্ধ সহ্য করতে পারে না। মহামায়ার কারখানায় অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় হয় না। কিন্তু আমাদের তো প্রাকৃত জগতে থেকেই এই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় তৈরী করতে হবে। ছোট্ট শিশু—তার দৃষ্টিতে তো কোন দোষ নেই—নির্মল দৃষ্টি—সে চোখে সব জিনিষ দেখছে—বাবা, মা, আকাশ, ফুল ফল চাঁদ—কিন্তু গ্রন্থের অক্ষর দেখতে পায় না। কিন্তু যখন গুরুমশাই তার হাতে খড়ি দিয়ে অক্ষর পরিচয় করান তখন সে অক্ষর দেখতে পায়। তাহলে স্বীকার করতে হবে গুরুমশাই তার প্রাকৃত চোখের মধ্যে অক্ষর দেখবার মত আর দুটি চোখ তৈরী করে দিচ্ছেন। তাই যে চোখ দিয়ে সে অক্ষর দেখতে পেত না—এখন ঐ চোখ দিয়েই অক্ষর দেখতে পাচ্ছে। অথচ বাইরে তার চারটি চোখ তো দেখা যাচ্ছে না। দুটি চোখ যেমন ছিল তেমনই দুটি চোখ আছে। ঐ দুটি চোখের মধ্যেই আর দুটি চোখ তৈরী হয়ে গেছে। তেমনি আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় যাঁরা তৈরী করে দেবেন তাঁরা ও জগতের লোক। তাঁরা যোগমায়ার লোক—এরই নাম শ্রীগুরুকৃপা, মহৎকৃপা। যে চোখ তাঁরা তৈরী করে দেবেন তা কিন্তু আলাদা করে দেখা যায় না। সেটি

আমাদের প্রাকৃত চোখের সঙ্গে তাদাত্ম্যাপন্ন হয়ে গেছে। কারণ এ জগতেও দেখা যায় যে হাতে বাজনা বাজান যায়, চিত্র অঙ্কন করা যায় সেটি আলাদা হাত কিন্তু আলাদা করে তো দেখা যায় না। আমাদের এই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রীগুরুকৃপাদত্ত অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় যত বেশী পুষ্ট হবে ততই এই অবস্থা হবে—

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় যে তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি ॥

ভগবান গীতায় বললেন—

বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ। গীঃ ৭।১৯

শ্রীমদ্‌ভাগবতশাস্ত্রে যে নয়টি পদার্থ আছে—যারা আশ্রিত—আর আশ্রয় হলেন শ্রীগোবিন্দ নিজে। এই নয়টি পদার্থের মধ্যে ঊতি একটি—ঊতি বলতে ভগবানের জন্মাদি লীলাকে বুঝায়। ভগবানের প্রতিটি মূর্ত্তিই সর্ব্বব্যাপক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে একসঙ্গে এক জায়গায় দু চারজন ভগবান কেমন করে থাকবেন? তার উত্তরে ব্রহ্মা বললেন যোগমায়াং বিস্তারয়ন্। যোগমায়ার প্রভাবে তাঁরই ইচ্ছায় এ অসম্ভব সম্ভব হচ্ছে। ভগবৎস্বরূপ ও তাঁর লীলা সব সত্য। অবতারের মহিমা অচিন্ত্য।

বাক্‌পতি ব্রহ্মা এখানে বক্তা এবং শ্রীবালগোপাল শ্রোতা কাজেই যে স্তুতিবাক্য উচ্চারিত হচ্ছে সবই সত্য প্রামাণিক। বেদগর্ভ ব্রহ্মা। বেদধারণের গর্ব্ব ব্রহ্মার আছে কিন্তু সে জ্ঞানগর্ব্বে ভগবানকে স্তুতি করা সম্ভব হয়নি—ভগবানের কৃপাতেই ব্রহ্মার পক্ষে স্তুতি করা সম্ভব হয়েছে। ব্রহ্মা বেদবক্তা কিন্তু বেদজ্ঞ নন। জন্মান্ধ যে সে যেমন রূপের জগৎ দেখে না কিন্তু হঠাৎ যদি সে ভগবৎকরুণায় চক্ষুষ্মান হয় তাহলে যেমন রূপের জগৎ দেখতে পায় এও ঠিক তেমনি। ভগবানের তত্ত্বের উপলব্ধি হয় না—কিন্তু তাঁর কৃপা যদি হয় তাহলে তত্ত্বের উপলব্ধি হতে পারে। এ হল গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা। ভগবানের দান দিয়েই ভগবানের স্তুতি। যেমন বলা আছে—

অতিগূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
শ্রীচৈতন্য যারে জানায় সে জানিতে পারে॥

উপনিষদ্ বললেন—যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। তিনি যাকে বরণ করেন সেই তাঁকে পায়। এ বরণ হল কৃপার বরণ। অর্থাৎ তিনি যাকে কৃপা করেন সেই তাঁর তত্ত্ববোধ করতে পারে। আবার কৃপার এমনই স্বভাব কৃপা যার ওপর হয়েছে তাকে বুঝতে দেয় না যে তার ওপর কৃপা হয়েছে। কারণ কৃপা পেয়েছি জানলে অভাব বোধ থাকে না আর অভাব বোধ না জাগলে দৈন্য থাকে না। যেখানে দৈন্য রূপ গর্ত্ত নেই সেখানে কৃপাবারি সঞ্চিত হয় না। দৈন্য না থাকলে ভক্তি থাকে না। ব্রহ্মা ধ্রুব এঁরা হলেন দৃষ্টান্ত। শুধু এঁরা নন যে যা বলে বা করে সবই সেই ভগবানের দান। জীবের নিজস্ব কোন সামর্থ্যই নেই।

ব্রহ্মা বলছেন,—প্রভু, জগৎ অসৎ হয়েও কেন যে সৎ বলে প্রতিভাত হয় তোমার এ প্রশ্নের জবাব তোমার কৃপা হলে দিতে পারি।

তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥
১০।১৪।২২

কলুর বলদ যেমন নিজের বন্ধনে সন্তুষ্ট—তার বন্ধন বলে বুঝে না—বিষ্ঠার কৃমি যেমন বিষ্ঠাকেই প্রিয়স্থান বলে মনে করে তেমনি এই অসৎ জগতে বাস করে আমাদেরও অনুভব হল না যে এ জগৎ সৎ নয়। ব্রহ্মা বলছেন আজ তোমার কৃপাতেই বুঝতে পেরেছি যে এ জগৎ সৎ নয়। এ জগৎ সত্যস্বরূপ নয়—এটি অসত্য। এটি স্বপ্নের মত লুপ্তজ্ঞান। জগৎ বলতে জগতের জীবকেই ধরা হয়েছে। যেমন পুকুর কিনলে তার মাছও কেনা হয়ে যায়। জগতের জীবের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে। কারণ ভগবৎপাদপদ্মে উন্মুখতার নামই জ্ঞান। ভুল ভাঙার নামই জ্ঞান। আমাদের কৃষ্ণ

পাদপদ্ম ভুল হয়ে গেছে। এই ভুল আমাদের যতদিন না ভাঙবে ততদিন জ্ঞান ফিরে আসবার কোন পথ নেই। কৃষ্ণপাদপদ্ম ভুল হওয়াই হল জীবের প্রতি মায়া আক্রমণের দ্বার। তাই বলা আছে—

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।
তে কারণে মায়া পিশাচী তার গলায় বাঁধিল॥

কৃষ্ণপাদপদ্ম ভুল হওয়ার ফলেই মায়া আক্রমণ করেছে। তাই কৃষ্ণপাদপদ্মে উন্মুখতা না আসা পর্য্যন্ত মায়ার হাত হতে নিস্তারের কোন উপায় নেই। শ্রীতৃতীয় স্কন্ধে ব্রহ্মা একবার বলেছেন—

জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য সুচিরান্ননু দেহভাজাং ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যম্।
নান্যত্ত্বদস্তি ভগবন্নপি তন্ন শুদ্ধং মায়াগুণব্যতিকরাৎ যদুরুর্বিভাসি॥
ভাঃ ৩।৯।১

মানুষ যে ভগবানকে ভুলে গেছে এইটিই হল তার সবচেয়ে বড় অপরাধ। সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত রক্ষা করে ব্রহ্মাকে কথা বলতে হচ্ছে। সামনে বেদবিদ্ ভগবান শ্রীবালগোপাল শ্রোতা। তাঁর কাছে শাস্ত্রের অনুমোদিত নয় এমন কোন কথা গ্রাহ্য হবে না। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু এ জগতে শুধুই দুঃখ—চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ—এ কথা যে আছে সেটিও নিষিদ্ধ হয়ে গেল। কারণ দুঃখের পর সুখ আসে তারপর আবার দুঃখ তা নয়—এখানে দুঃখের পরে দুঃখ আবার দুঃখ তাই বললেন পুনর্দুঃখদুঃখম্। তাহলে দেখা গেল ব্রহ্মার বাক্য নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে মিলল না। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা এই কথা বলছেন—সুতরাং এইটিই ঠিক। কারণ সুখের মত মনে হয় বটে কিন্তু বস্তুত তা সুখ নয়। ব্রহ্মা তো নিজ হাতে এ জগৎ তৈরী করেছেন তাই জগতের উপাদান যে কি তা ব্রহ্মা যেমন জানেন এমন তো আর কেউ জানে না। তিনি বলছেন এ জগতের উপাদান কেবল দুঃখই এখানে সুখ বলে কিছু নেই। শ্রীএকাদশে উদ্ধবজীর কাছেও ভগবান বলেছেন—

অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈর্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্ ॥
ভাঃ ১১।১২।২৩

সুচিকিৎসক যেমন রোগীর খাতির রেখে চিকিৎসা করেন না তেমনি ভগবানও জীবের খাতির রেখে কথা বলেন না। ভগবান বলছেন,—উদ্ধব, এই সংসার বৃক্ষের (দেহ) দুটি ফল সুখ ও দুঃখ। ভগবান আমাদের গ্রামেচর শকুনি বলে তিরস্কার করেছেন—শকুনি মড়া খায় তারা আত্মা ভোগ করতে জানে না। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিও তেমনি আত্মা বাদ দিয়ে আত্মাতিরিক্ত বস্তু ভোগ করে। আত্মাকে ভোগ করতে জানে না। এরাই দুঃখ ফল ভোগ করে। আর সুখ ফলটি ভোগ করে যারা অরণ্যবাসী হংস—এরা মড়া খায় না—এরা পদ্মের মৃণাল খেয়ে জীবন ধরে। শ্রীল বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেছেন—ভক্ত হংস চক্রবাক্ যত তারা মৃণাল খেয়ে জীবন ধরে। অরণ্যবাসী মুনিগণ হলেন হংস অর্থাৎ তারা সারাসারবিবেক-চতুরা। হংস যেমন অসার অংশ জল ত্যাগ করে সার দুধটুকু গ্রহণ করে—ভক্ত হংসও তেমনি আত্মার পাতকস্বরূপ যে গৃহান্ধকূপ তাকে ত্যাগ করে হরিকে আশ্রয় করে। আত্মার যেমন নিত্য বিশেষণ সৎ গৃহেরও তেমনি নিত্যবিশেষণ কূপ। কৃষ্ণপাদপদ্মের মৃণাল খেয়ে বেঁচে থাকবে এই সারাসারবিবেকী ভক্ত হংস। এই সুখের সন্ধান পাওয়া যাবে যদি ঐ হংসের মত ভক্ত সঙ্গে মিত্রতা করতে পারা যায়। এ কথা শ্রুতিগণ স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—

দুরবগমাত্মতত্ত্বনিগমায় তবাত্ততনোশ্চরিতমহামৃতাব্ধি পরিবর্ত্ত পরিশ্রমণাঃ।
ন পরিলসন্তি কেচিদপবর্গমপীশ্বর তে চরণসরোজহংসকুলসঙ্গ-বিসৃষ্টগৃহাঃ॥ ভাঃ ১০।৮৭।২১

শ্রুতিগণ স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—প্রভু, তোমার তত্ত্ব জানা যায় না অথচ না জানলেও নয়। তাই জীবের প্রতি কৃপা করে তুমি

তোমার তনুকে এই জগতে আবির্ভূত করিয়েছ। তাই তোমার উপাসনা করে জীব উদ্ধার পায়। ভক্তজন তোমার লীলাসাগরে সাঁতার দেয়—সাঁতার যেমন দুইহাত দিয়ে জল কেটে যেতে হয় তেমনি ভক্ত দুইহাতে অর্থাৎ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করে তোমার লীলারস আস্বাদন করে—কারণ লীলারস আস্বাদনের মাধ্যম হল দুটি—হয় শ্রবণ না হয় কীর্ত্তন—

আমার নিতাই সোনার নাম মুখে বলা বা কানেতে শোনা। নিতাই নিতাই নিতাই নিতাই বলিলেই হয় বা শুনিলেই হয়।

এখন সাঁতার দিতে গেলে যেমন পরিশ্রম হয়—ভক্ত যে লীলা সাগরে শ্রবণ কীর্ত্তনের মাধ্যমে সাঁতার দেয়—তাদের কি পরিশ্রম হয়? শ্রুতিগণ বলছেন—না প্রভু, তাদের পরিশ্রম তো হয়ই না—বরং তারা আনন্দ করে করে। এখানে 'পরি' উপসর্গটি বর্জন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এই শ্রবণ কীর্ত্তন করে যে জক্তজন আনন্দ পায় শ্রুতি বলছেন—তারা কৌচিৎ অর্থাৎ সংখ্যায় তারা অন্ধ-বিরলপ্রচারা—সকলে এ আনন্দ পায় না। তারা এমনই আনন্দ পায় যে মুক্তিসুখও তারা বাঞ্ছা করে না। তোমার লীলামৃতমহাবারিধিতে যারা সাঁতার দেয় তারা হল হংস—তারা তো মুক্তিসুখ চায়ই না—তাদের যারা কুল অর্থাৎ বংশ শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরা ন তু পুত্র পরম্পরা কারণ এইসব হংসের সংসার হয় না। এই হংসকুলের যারা সঙ্গ করেছে তাদেরও মুক্তি বাঞ্ছা তুচ্ছ হয়ে যায়। হংস যে সুখ ভোগ করে এ আমরা বুঝতে পারি না। আমরা মনে করি সুখ দুঃখ দুটি ফল আমরা ভোগ করছি। আসলে কিন্তু এ দুটি ফল নয়—একটি ফলই আমরা দুটি করে ভোগ করি। এটি হল গরীবের ঘরে আলুর মত। তার যদি আলু ভাজা ও রসা খেতে সাধ হয় তাহলে একটি আলুরই আধখানা ভাজা ও আধখানা রসা করে তেমনি আমরাও দুঃখেরই একভাগকে সুখ বলে মনে করি। অর্থপ্রাপ্তিকে সুখ এবং অর্থনাশকে দুঃখ, পুত্রপ্রাপ্তিকে সুখ আর পুত্রনাশকে দুঃখ বলে মনে করি। আরোগ্যকে

সুখ আর ব্যাধিকে দুঃখ বলে মনে করি। আসলে কিন্তু সবটাই দুঃখ। কারণ অর্থপ্রাপ্তিই অর্থনাশের হেতু, পুত্রপ্রাপ্তিই পুত্র নাশের হেতু, স্বাস্থ্যই ব্যাধির হেতু। তাহলে বুঝা যায় দুঃখকেই আমরা সুখের গুঁড়ি মিশিয়ে সুখ বলে ভোগ করি। প্রকৃতপক্ষে কোনটাই সুখ নয় সবটাই দুঃখ। পুত্র পাওয়াতেই লেখাপড়া করা রইল যে পুত্রনাশ হবে। জগৎ মায়া হতেই তৈরী এবং মায়াতেই লয়। তবু এই অসৎ জগকে সৎ বলে মনে হয় কেন? ব্রহ্মা বলছেন—ত্বয়ি অধিষ্ঠানে জগৎ থাকে। তুমি আধার আর জগৎ হল আধেয়। তুমি সৎচিৎআনন্দ স্বরূপ। তোমার সৎস্বরূপ অধিষ্ঠানে জগৎ অধিষ্ঠিত বলেই জগৎকে সৎ দেখায়। এখানে আধারের গুণ আধেয়ে সংক্রামিত হয়েছে। তুমি সৎ চিৎ আনন্দ তাই জগৎকে সৎ চিৎ আনন্দ বলে মনে হয়।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ বলেছেন—এই জগৎ অসৎ হয়েও যে সৎ বলে দেখায় তার পক্ষে কোন হেতু? তস্মাৎ যেহেতু তোমার অবতা ও লীলা নিত্যা। মানুষের ক্রিয়ার নাম কাজ আর ভগবানের ক্রিয়ার নাম লীলা—কিন্তু দুটির মধ্যে উপাদানগত মহান্ ভেদ। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে ধাতুপাঠের মঙ্গলাচরণে শ্রীজীবপাদ বলেছেন—শ্রীহরির যা কিছু ক্রিয়া সবই লীলা। জগতের সকল ক্রিয়াই শ্রীহরির কাছ থেকে এসেছে। ভগবান গীতায় বললেন—মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। কিন্তু জগতের ক্রিয়া শ্রীহরির লীলা নয়—সেটি নয়—কিন্তু তার মত অর্থাৎ তদিব। ভগবানের শক্তি মায়া এটি পরিবেশন করেছে। মায়া তো গুণময়ী। ভগবানের শক্তি মাত্র জগতে আছে কিন্তু উপাদান তার সত্ত্ব রজঃ তমঃ। চেতন কর্ত্তা না থাকলে শুধু জড়াত্মিকা প্রকৃতি ক্রিয়া করতে পারে না। ভগবান বিশ্ব নির্মাণ করে তদনুপ্রবিষ্টঃ। বিশ্ব সৃষ্টি করে ভগবান নিজে সেখানে প্রবেশ করেন। শ্রীঅষ্টমে বলেছেন—

ত্বং মায়য়াঽত্মাশ্রয়য়া স্বয়েং নির্মায় বিশ্বং তদনুপ্রবিষ্টঃ।
পশ্যন্তি যুক্তা মনসা মণীষিণো গুণব্যবায়েঽপ্যগুণং বিপশ্চিতঃ॥
যথাগ্নিমেধস্যমৃতং চ গোষু ভুব্যন্নমম্বুদ্যমনে চ বৃত্তিম্।
যোগৈর্মনুষ্যা অধিযন্তি হি ত্বাং গুণেষু বুদ্ধ্যা কবয়ো বদন্তি॥

ভাঃ ৮।৬।১১-১২

ব্রহ্মা বলছেন,—কাঠ থেকে যেমন অগ্নি, দুধ থেকে যেমন ঘি, পৃথিবী থেকে শস্য, মাটি হতে জল, উদ্যমের থেকে কৃতি তেমনি সত্ত্ব রজঃ তমোময়ী এই পৃথিবী থেকে মনীষিরা তোমাকে লাভ করে। ভগবানের লীলার-উপাদান ভগবানই। অন্য কোন কিছু তাতে নেই। কারণ ভগবানের দ্বিতীয়বস্তু গ্রহণ হয় না। দ্বিতীয়বস্তুকে গ্রহণ করা স্পর্শ করা মায়িক জগতের স্বভাব। ভগবান দ্বিতীয় বস্তু স্পর্শ করেন না তাই তাঁর ধাম লীলা, পরিকর সবই তাঁর নিজের স্বরূপ। দ্বিতীয় বস্তুকে স্পর্শ না করে যেটি চিৎ জগতের গুণে দাঁড়িয়ে আছে সেই দ্বিতীয় বস্তুকে স্পর্শ করার ফলে এ জগতে সেটি দোষে পরিণত হয়েছে। ও জগতে সবই চেতন স্বরূপ। ভগবান নিজেই ধাম, লীলা, পরিকর তরু লতা, বন পর্ব্বত নদী শ্রীযমুনা গিরিরাজরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এই দ্বিতীয় বস্তুকে ছাড়তে পারলেই আত্মারামতা। বৈকুণ্ঠ সবই বৈকুণ্ঠনাথের। ওখানে আর তিনি ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু নেই। বৃন্দাবনের লীলার কৃষ্ণই সব করেছেন। কৃষ্ণই সকলরূপে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। অগ্নি দহন করছে না বলে যদি বলা যায় তার দাহিকা শক্তি দহন করেছে—কথা কিন্তু একই কারণ অগ্নি তার দহিকা শক্তিকে বাদ দিয়ে থাকতে পারে না। কৃষ্ণ তেমনি তাঁর আনন্দিনী শক্তিকে বাদ দিয়ে থাকতে পারেন না। কৃষ্ণ করেন নি—কিন্তু তাঁর আনন্দিনী শক্তি করেছে—কথা একই। অদ্বৈতবেদান্তী ভগবান শঙ্করাচার্য্য আত্মারামতার কথা বলেছেন কিন্তু আত্মারামতাকে এমন বহুমুখী করে প্রকাশ করতে পারেন নি। প্রকাশ করতে পারেন নি বললে ঠিক বলা হবে না প্রকাশ

করেন নি। এটিও ঈশ্বর ইচ্ছায়। অদ্বৈতবাদী আত্মাকে গুটিয়ে সঙ্কুচিত করে ভোগ করেছেন—সাত্বতধর্ম অর্থাৎ ভক্তিধর্মের মত এমন বিছিয়ে ভোগ করতে পারেন নি।

ও জগতের কর্ম আশ্রয় করলে এ জগতের জন্ম কর্ম বন্ধ হবে। ভগবান নিজেও বললেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥ গী ৪।৯

লীলা ও ক্রিয়ার মধ্যে আর একটি পার্থক্য আছে—লীলা হল শোভন ক্রিয়া আর ক্রিয়া হল অশোভন। মায়াস্পর্শশূন্য যে বস্তু সেই বস্তুই হল শোভন।

ভগবানের সম্পর্কে এবং ভক্ত সম্পর্কে অশোভন বস্তুত শোভন হয়। যে গৃহে শ্রবণ কীর্তন প্রভৃতি ভক্তি অঙ্গ যাজন হয় সে গৃহ কারাগৃহ নয় সে গৃহ বৈকুণ্ঠধাম। এই গৃহই ভগবদ্ধামকে পাইয়ে দেবে। এইরকম সব বস্তুই। বাক্য ভগবৎসম্পর্ক হলে সেই বাক্যই শোভন নতুবা অশোভন। মায়ার তিনগুণ থেকেই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রকাশ পায়। পূজার জন্য তো গঙ্গাজল দরকার হয়। কিন্তু সব জায়গায় তো আর গঙ্গাজল পাওয়া যায় না। তাই অন্য জলে গঙ্গার স্মরণ করে জল শুদ্ধ করে নিতে হয়। আর যেখানে গঙ্গাজলই পূজার একমাত্র উপকরণ তাদের আর শুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। তেমনি যাঁরা ভগবানে জাতরতি তাঁরা গঙ্গাজলের মত—তাঁদের আর আলাদা করে ইন্দ্রিয় শুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। ভগবৎ সম্পর্কে তাঁদের ইন্দ্রিয় শুদ্ধ হয়েই আছে। কিন্তু আমরা তো আর জাতরতি নই। আমার অশুদ্ধ ইন্দ্রিয় তাই ভগবৎ সম্পর্কে অথবা ভক্ত সম্পর্কে শুদ্ধ করে নিতে হবে। মহারাজ অম্বরীষ চরিত্রে শ্রীশুকদেব দেখিয়েছেন—তিনি সর্বেন্দ্রিয়কে ভগবৎ সম্পর্কে শুদ্ধ করেছেন। এখন কথা হল কি মহারাজ অম্বরীষ জাতরতি তাঁর ইন্দ্রিয় শুদ্ধই আছে। এটি আমাদের উপদেশদানের জন্য বলা হয়েছে। একে

তো আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি গুণময় বলে অশোভন হয়েই আছে আবার এর ওপর যদি রজঃ এবং তমঃ গুণের বৃদ্ধি করা যায় তাহলে তো কথাই নেই। হাত নিরন্তর বিষয় কাজ করে করে অপবিত্র হয়ে গেছে। তাই সাধুসেবা করলেই হাতের সার্থকতা। শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে—এখানে পদ বলতে ভক্তকে বুঝান হয়েছে। অর্থাৎ ভগবানের চরণে তো বটেই তাঁর ভক্তের চরণে মাথাটিকে নত করতে হবে। আমাদের কামনা ভগবানের দাস্যে নিযুক্ত করতে হবে। বাসনা অনেক দিন ধরে পূতিগন্ধময়স্থানে ছিল—তাই তাকে শুদ্ধ করতে হবে। কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত করতে পারলেই বাসনার শুদ্ধি হবে। আলঙ্কারিক মতে মৃত্যুকে বলা হয়েছে অশ্লীল। ক্রিয়ার মৃত্যু হয় বলে ক্রিয়া হল অশ্লীল। ভগবানের ক্রিয়ার মৃত্যু নেই। ভগবানের ক্রিয়া নিত্য—তাই শ্লীল অর্থাৎ শ্রীল। ব্রহ্মা বলছেন—হে বালগোপাল তোমার ঐচ্ছিক প্রকাশিকান্যা যোগমায়া শক্তির বিলাস তোমার লীলা ও অবতার। বলা আছে—

যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিশুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
অপ্রাকৃত রূপরতন ভক্তগণের গূঢ়ধন প্রকট কৈল নিত্য লীলা হইতে॥

ভগবানের ইচ্ছামাত্র কাজ হয়। মৎস্য কূর্মাদি অবতার তোমার ঐচ্ছিক শক্তির বিলাস। ভগবানের লীলা এবং অবতার—ভগবানের সম্পর্কিত যা কিছু তা বাদ দিয়ে আর যা কিছু সব মিথ্যা ও জড়। এই মায়ার জগৎকে বলা হয় প্রপঞ্চ—পঞ্চীকৃত বলে। কবিরাজী ওষুধ যেমন সব মিশিয়ে তৈরী হয় এ জগতেও তেমনি ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম—সব মিশিয়ে তৈরী তাই পঞ্চীকৃত।

এখন প্রশ্ন হতে পারে এ জগৎ অসৎ কেন? শাস্ত্র বললেন এ জগৎ সপ্নতুল্য। অত্যন্ত দুঃখের দ্বারা ইন্দ্রিয় যেখানে দুঃখে স্থিত আছে। জগতে জীবের ইন্দ্রিয় মাত্রই দুঃখে স্থিত তাই পুরুদুঃখ-দুঃখম্। প্রাকৃত শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—এতে বিন্দু বিন্দু ছিটেফোঁটা আছে তাই নিয়েই জীব ভুলে থাকে। কিন্তু রূপাদি

পঞ্চক যদি ভোগই করতে হয় তাহলে তাদের অনন্ত ভাণ্ডারে ইন্দ্রিয় পঞ্চককে ডুবিয়ে দিতে হবে যাতে করে ইন্দ্রিয় আর সেখান থেকে ফিরে আসতে না পারে। প্রাকৃত রূপাদি পঞ্চকে ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হতে পারে না। কারণ তার ক্ষুধা অনেক। সে লাখ লাখ যুগ অপ্রাকৃত রূপাদি পঞ্চক ভোগ করতে পারে। কিন্তু এ জগতে সে তো তা পায় না। তাই তার অতৃপ্তি তার দুঃখ। তাই সে দুঃখে স্থিত। ভিখারী যেমন এক দরজায় পেটভরে খেতে না পেয়ে দরজায় দরজায় ঘোরে। এখন এমন যদি কোন দয়ালু ব্যাক্তি থাকে তাকে এক জায়গাতেই পেট ভরিয়ে দিতে পারে তাহলে সে আর অন্য দরজায় যাবে না। তাই জীবের ইন্দ্রিয় বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ছুটছে কারণ গৌরগোবিন্দ ছাড়া এ জগতে এমন কেউ নেই যে জীবের এই অসীম ক্ষুধার পরিতৃপ্তি করাতে পারে। ভগবানের রূপাদি পঞ্চকে জীবের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়ে যায়।

ব্রহ্মার এই কথার উত্তরে যেন শ্রীবালগোপাল প্রশ্ন করছেন—জগৎ যদি অসৎ হয় তাহলে আমার মা যশোমতী আমার উদরে কেমন করে জগৎ দর্শন করলেন ? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন,—তোমার তনু হল নিত্যসুখবোধ সচ্চিদানন্দ—শ্রীনন্দকুমারের আধারে ঐচ্ছিকশক্তি যোগমায়ার বশে জগৎ উদ্ভুত হয়েছিল আবার সেই শক্তির দ্বারাই লয় পেয়েছে ; সদিবাবভাতি—ইব এখানে 'এব' অর্থে বলা হয়েছে। তোমা ছাড়া অন্যত্র যোগ থাকলে জগৎকে আর সৎ মনে হবে না। এব পদটি অন্য যোগ ব্যবচ্ছেদ বুঝায়। অর্থাৎ তুমি ছাড়া বাইরের জগৎ মিথ্যা। সচ্চিদানন্দ তোমাতে অসৎ রূপের উৎপত্তি হতে পারে না। বলিরাজার উপাখ্যানে বলা আছে জগৎ নশ্বর কিন্তু স্বপ্নবৎ মিথ্যা নয়। স্বপ্নলব্ধবস্তুর মত অলপকালবর্ত্তী।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ ব্রহ্মার এই বাক্যের ওপর আস্বাদন করছেন—ব্রহ্মা যে প্রকরণে কথা আরম্ভ করেছেন তার উপসংহার করছেন। জগতের অসারতা এবং ভগবত্তনুর সত্যতা। জগতের

প্রতি 'ইদম্' শব্দের দ্বারা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে দেখান হয়েছে—তোমার বপু অমায়িক—অর্থাৎ তোমার তনুতে মায়া স্পর্শ নেই। সেই বপুর তিনটি স্বরূপ অণু, মধ্যম এবং মহৎ। তার মধ্যে অণু ও মহৎ চোখে দেখা যায় না। মধ্যম পরিমাণ বপুই দৃষ্টিগোচর হয়। আকারবিশিষ্ট ভগবানকে অন্য আকার বিশিষ্টের মত দেখায় বটে তাই বলে অন্য আকারবানের মত মায়িক নয়। হে ভগবন্, জগতের দ্বারা তোমার দেহ পরিচ্ছিন্ন হলেও জগতের এক দেশে থেকেও সমগ্র জগৎকে ক্রোড়ীকৃত করতে পারে।

শ্রীশুকদেব বলেছেন—

ন চান্ত র্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥ ভাঃ ১০।৯।১৩

ভগবানের দেহ শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক। অসৎ বস্তু তাকেই বলা হবে যেটি সার্ব্বকালিকসত্তারহিত—তিন কালে অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানে যার সত্তা থাকে না। প্রমেয়রত্নাবলীতে নয়টি প্রমেয়ের মধ্যে একটি প্রমেয় বলা হয়েছে বিশ্বং সত্যম্। বিশ্ব সত্য অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের জগৎ থাকে—যেমন রাত্রিকালে বনে পাখিরা থাকে কিন্তু বুঝা যায় না তেমনি প্রকৃতি বনে মহাপ্রলয়ে জগৎ বনলীনবিহঙ্গবৎ লীন হয়ে থাকে। স্বপ্নাৎ বলতে স্বপ্নের মত মিথ্যা নয় কিন্তু স্বপ্নের মত অল্পকালবর্ত্তী।

জগতের আর একটি বিশেষণ দেওয়া হয়েছে লুপ্তধীষণম্—ধীষণা অর্থাৎ বুদ্ধি লুপ্ত হয়ে গেছে। এটি ঘটেছে অবিদ্যাপ্রভাবে। জীবের 'কে আমি' এই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে। জীব কৃষ্ণপাদপদ্ম ভুলেছে। অনাদিকালের কৃষ্ণপাদপদ্মে বহির্মুখ জীবের আত্মজ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপস্মৃতি আমি নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বরূপ এ বোধটি ছিল কিন্তু অনাদিকালের কৃষ্ণবিমুখতা অপরাধে মায়া জীবকে আক্রমণ করল এবং এই স্বরূপজ্ঞানকে ভুলিয়ে দিল। এখন জীবের

'কে আমি' এইটিই যদি মনে না থাকে তাহলে কৃষ্ণপাদপদ্ম যেটি অনাদি কাল থেকে হারিয়ে গেছে সেটির অন্বেষণ আর কে করবে ?

শ্রীজীবপাদ সন্দর্ভে বিচার করেছেন—জীবের দুটি বর্গ— নিত্যবন্ধ ও নিত্যমুক্ত। গরুড় নিত্যমুক্ত এবং নিত্যবন্ধ হল সারা ব্রহ্মাণ্ড। অনাদিকালের কৃষ্ণবিমুখতার অপরাধে মায়াপিশাচী জীবের গলায় বেঁধেছে। জীবের উন্মত্ত অবস্থায় যেমন অন্য কথা ভুললেও 'আমি মানুষ' এই জ্ঞানটি ভুল হয় না তেমনি জীবেরও কৃষ্ণপাদপদ্ম ভুল হলেও নিজের স্বরূপ জ্ঞানটি ভুল হয় নি। সে জানে সে নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বরূপ। তার ক্ষুধা পিপাসা, জন্ম মৃত্যু, রোগ শোক ভয় মোহ এসব কিছু নেই। কিন্তু কৃষ্ণ ভুলে যাওয়ার ফলে মায়া জীবকে শাসন করেছে—দণ্ড দিয়েছে। মায়া তো ভগবানের দাসী —তাই তার প্রভুকে ভুলে যাওয়ার অপরাধ সে সহ্য করতে পারে নি। মায়া জীবকে চরম শাসন করেছে। যে জীব কৃষ্ণ অন্বেষণ করবে সেই জীবাত্মাকে অর্থাৎ তার স্বরূপজ্ঞানকে ভুলিয়ে দিয়েছে। স্বরূপের বিস্মৃতি হলে তাকে যা বলাবে তাই বলবে তাকে যা করাবে তাই করবে। যে খুঁজবে তাকেও মায়া ভুলিয়েছে। ভগবৎ অনুসন্ধানই প্রকৃত জ্ঞান। তাহলে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণপাদপদ্ম ভোলা ও আত্মজ্ঞান ভোলা অর্থাৎ নিজেকে ভোলা এই দুটির মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ রয়েছে। কৃষ্ণপাদপদ্মবিস্মৃতি হল কারণ আর আত্মস্বরূপ বিস্মৃতি হল কার্য্য। নিমিত্তের অপায়ে নৈমিত্তিকের অপায় হয়। কারণ চলে গেলে কার্য্যও চলে যায়। তাই কারণকে আগে সারাতে হবে। কৃষ্ণপাদপদ্মের জ্ঞান আগে হতে হবে গোবিন্দকে মনে পড়লে নিজেকে মনে পড়বেই। কৃষ্ণপাদপদ্মজ্ঞান হলে আত্মজ্ঞান লাভ আপনিই হবে। তাই যোগীন্দ্র বিধান দিলেন—এই মায়ার হাত হতে নিষ্কৃতি পেতে গেলে আগে গোবিন্দ ভজতে হবে।

তন্ময়য়া বুধ আভজেত্তমীশম্ ।

যারা বুদ্ধিমান তারা মায়াতরণের জন্য সেই পরমেশ্বরের আরাধনা করবে।

ব্রহ্মা বলছেন,—সত্যস্বরূপ তোমাতে জগৎ অধিষ্ঠিত আছে বলে জগৎকেও সচ্চিদানন্দের মত দেখাচ্ছে। তোমার সব স্বরূপই মঙ্গল। সাধুদের অনুগ্রহ করবার জন্যই তোমার স্বরূপ তাই সবই মঙ্গলময়। এ জগৎ তোমাকে ছাড়া। তাই এ জগতের স্বরূপ অমঙ্গলই। মিথ্যাভূত জগতের আবার মঙ্গলামঙ্গলের বিচার কি? যেমন স্বর্গত ব্যক্তির দোষ বলা উচিত হয় না। তাতে চিত্তের পরনিন্দা বৃত্তিই পুষ্ট হয়, অন্য কিছু লাভ হয় না। ব্রহ্মা বলছেন—জগৎ অসৎ কিন্তু মিথ্যা বলে তো বোধ হয় না। স্বপ্নাভম্ শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন—ভাতি ইতি ভ ন ভাতি ইতি অভঃ স্বপ্নবৎ ন ভাতি অর্থাৎ সত্য বলেই মনে হয়—উপমা দিয়েছেন—মৃদ্‌গজ-ভানবৎ। মাটির হাতি ভেঙ্গে গেলে অজ্ঞ যে সে কাঁদে কিন্তু বিজ্ঞ তাকে কিছু মনেই করে না—তার পক্ষে কোন দুঃখের কারণই হয় না। কারণ সে জানে এ মাটির হাতি এ তো ভাঙ্গবেই। এ তো মিথ্যা—এতো থাকবে না। তাই বিজ্ঞের কাছে এ জগতের জিনিষ পাওয়া না পাওয়া দুইই সমান কোনটিতেই লাভ নেই কারণ দুইই তো মিথ্যা। কিন্তু বালক যে অজ্ঞ তার পাওয়াতেও লাভ আছে—না পাওয়াতেও তেমনি দুঃখ আছে। জগৎ বিনাশে তাই অজ্ঞের কাছে শোকের কারণ কিন্তু বিজ্ঞের কাছে নয়। কারণ বিজ্ঞ জানে জগৎ তো বিনাশী—তার বিনাশ তো হবেই। মাটির হাতির মত।

শ্রীজীবপাদ টীকায় স্বপ্নাভ পদের ব্যাখ্যা করেছেন জগৎ বস্তুত অনিত্য তুমি কিন্তু নিত্য। সেই নিত্য তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় জগৎকে অনিত্য বলে মনে হয়—ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে। বোধ অর্থাৎ জ্ঞান—তোমার সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ থাকায় নিত্য বলে মনে হয়। তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় চেতনবৎ বলে মনে হয় এবং তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে তাকে সুখময় বলে মনে হয়। জগতের আধার

ভগবান হলেও ভগবান জগতে প্রবিষ্ট হন না। কৃষ্ণপিতা বসুদেব স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—তুমি জগতে প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্ট। ভগবান্ জগতে প্রবিষ্ট না হলে জগৎ চলে না তাই প্রবিষ্ট বলতে হয় আবার বাইরে তাঁকে দেখছি বলে অপ্রবিষ্টও বলতে হয়। জগতের নিজের কোন গুণ নেই—কাজেই সে বাঁচতে পারে না। কিন্তু সেই জগৎই যদি তোমার সেবা করে তাহলে তার পরম মঙ্গল হতে পারে। অন্ধকার বিনাশের জন্য আলোই তার একমাত্র চিকিৎসা। আলোর অভাবেই তো যত বিপদ আসে। জীবাত্মা তো অল্প আলো তার ওপর আবার মায়ার তিনগুণ সত্ত্ব রজঃ তমঃ পর্দা। মায়ার কালো আবরণ এত গাঢ় যে জীবের অল্প আলোয় কোন কাজ হচ্ছে না। সে আলোতে নিজেকেই চেনা যায় না—সে ভগবানকে চিনবে কি করে? মায়ার অন্ধকারে জীব ছটফট করছে তাই সে অন্ধকার থেকে জীবকে মুক্ত করবার জন্য আলোর দরকার। জীবকে তাই কৃষ্ণপাদপদ্মসূর্য্যের আবির্ভাবের অপেক্ষা করতে হবে। এখন কথা হচ্ছে ভগবৎস্বরূপ মাত্রই তো আলো—তাহলে কোন স্বরূপকে আমরা মায়াবিনাশের জন্য আশ্রয় করব? সব ভগবৎস্বরূপ চিৎস্বরূপ হলেও যে স্বরূপে চিৎ উচ্ছলন সব চাইতে বেশী সেই স্বরূপেই কাজ হবে বেশী। রাজকীয় সম্পদ দ্বারা যেমন রাজার প্রয়োজন বেশী তেমনি যে ভগবান তাঁর নিজের প্রয়োজনে এসেছেন তাঁর স্বরূপে চিৎ উচ্ছলন বেশী এবং সেই স্বরূপেই বেশী কাজ হবে।

ভগবানের অন্যান্য অবতারের আবির্ভাবের অন্য কারণ আছে। কিন্তু রসনির্য্যাস আস্বাদনের জন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব। তাই তাঁতে চিৎ শক্তির উচ্ছলন বেশী। তাই এই স্বরূপে কাজও বেশী হবে। অধ্যাত্মদর্শনের আলোতেই একমাত্র এ জগতের মায়ার দুঃখের অন্ধকার দূর হতে পারে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই দুঃখ দূর করবার। আত্মদর্শনের আলোর অভাবেই জীবের যত দুঃখ। এ আলো অন্য কোন অবতার আনেন নি। স্বয়ং ভগবানে চিৎ উচ্ছলন সবচেয়ে

বেশী। তাই শ্রীশুকদেব শ্রীরাসলীলার শেষে বললেন—যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলাকথা শুনেই জীব তাঁর চরণে উন্মুখ হবে। পথে ঘুরে যেতে হলে অনেক দেরী লাগে আর তাতে পরিশ্রমও বেশী হয় কিন্তু নদীর জলে যখন বন্যা আসে তখন আর নদীর বাঁকে বাঁকে যেতে হয় না—তখন সোজা নৌকা চালিয়ে যাওয়া যায়। তাতে পথের দূরত্বও কমে যায়—পরিশ্রমও কম হয়। কৃষ্ণলীলা হল উচ্ছলিত চিৎ বন্যার জলের মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কৃষ্ণলীলা ছাড়া অন্য কোন অবতারের সম্বন্ধে যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ—এ কথা বলা হয় নি। আবার গৌরস্বরূপে এ উচ্ছলন সবচেয়ে বেশী। কারণ তাঁর আবির্ভাবের কারণই হল শ্রীরাধার প্রেম মাধুর্য্য আস্বাদন।

গোবিন্দস্বরূপে ভগবানের নিজেরও অভাব ছিল এবং সেই বাসনা পূরণের জন্যই তাঁকে গৌর হয়ে আসতে হয়েছে। গোবিন্দের অভাব চিৎ সার হ্লাদিনী শক্তি মেটাবেন। রাধারাণীর প্রণয় মহিমা আস্বাদন করতে রাধাভাবে বিভাবিত হয়ে কৃষ্ণকে আবির্ভূত হতে হল কারণ আশ্রয়তত্ত্ব না হলে আশ্রয়জাতীয় সুখ আস্বাদন করা সম্ভব হয় না। ভগবানের যতই আস্বাদন হচ্ছে ততই চিৎবৃত্তি উচ্ছলিত হচ্ছে। অন্তরে রস আস্বাদন হচ্ছে আর আনুসঙ্গে জীব উদ্ধার হচ্ছে। জীবের প্রতি করুণা হচ্ছে। নিজ আস্বাদনে তর না পেয়ে আস্বাদিত বস্তু উপছে পড়ছে যার ফলে জীবে প্রেমদান লীলা হয়ে যাচ্ছে। অধিক জ্ঞানটিরই উপদেশ করা হয়। হৃদয় সরোবর যখন অনুভূত লীলারসে পূর্ণ হয়ে যায় তখন অতিরিক্ত রস কণ্ঠপ্রণালী পথে বার হয় সংকীর্ত্তনরূপে। এর দ্বারাই পাষণ্ডেরও উন্মুখতা হয়। কারণ দানের দ্বারাই আস্বাদন হয়। যেমন গায়কের গান মনে মনে গাইলে আস্বাদন হয় না—কিন্তু পাঁচজনকে শুনিয়ে গলা ছেড়ে গান করলে তাঁর নিজেরও আস্বাদন হয়ে যায়। দান করতে গেলে আস্বাদন আপনিই হয়ে যায়। গৌরস্বরূপে

চিৎ শক্তি সবচেয়ে বেশী উচ্ছলিত—তাই এই স্বরূপে কাজ বেশী হবে ?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কৃষ্ণস্বরূপের সমাধিকতা কেন ? ভগবান বরাহ অবতারে তো পৃথিবী উদ্ধার করেছেন তবে তাঁর কাজ বড় হল না কেন ? কৃষ্ণ আত্মদর্শনের অভাবের আলো জেলেছেন—তাই তিনি সকলের বড়। এ আলো আর অন্য কোন ভগবান জ্বালেন নি। মানুষ যেমন নিজেকে মানুষ বলে জানলে গরুর গোয়ালে থাকবে না —গরুর খাদ্য খাবে না, তেমনি মানুষ (জীব) যদি নিজেকে নিত্য কৃষ্ণদাস বলে জানে তাহলে সে মায়ার গোয়াল ছাড়বে। ভগবান হলেন নিত্যসুখবারিধি—তাঁর লীলা হল কল্লোল। জগৎবাসী হল অসৎ তাই জগৎ অসৎ। ভগবানের মহিমা তাঁরা জানে না তাই তারা অন্তর্ধীষণ মায়াত উদ্যত অর্থাৎ মায়া থেকে তার জন্ম। স্বপ্নাভম্ অন্তর্ধীষণম্ পুরুদুঃখদুঃখম্—এসব হল এ জগতের পোষাক অর্থাৎ বিশেষণ। মায়ার সন্তান এর বেশী পোষাক পরতে পারে না। এ ছাড়া অন্য পোষাককে সে স্পর্শও করতে পারে না। তবু এ জগতের গুণ আছে। ব্রহ্মা বললেন—ত্বয়ি—এখানে সপ্তমী বিভক্তি দিয়েছেন —নিমিত্তাৎ কর্মসমবায়ে। যেমন হরিনামামৃত ব্যাকরণে বলা আছে সৌরভ্যে তুলসীং জিঘ্রতি। সৌরভের জন্য তুলসীর আঘ্রাণ তেমনি ত্বৎপ্রাপ্ত্যর্থম্ তোমাকে পাবার জন্য যদি জগতের যাবতীয় চেষ্টা হয় তাহলে জগৎ সৎ হবে। তৎসেবাং করোতি চেৎ তাহলে সদিবাবভাতি। অর্থাৎ উত্তমতাং প্রাপ্নোতি। অসৎ সৎ হবে, অচিৎ চিৎ হবে দুঃখ আনন্দ হবে। ইব এখানে 'এব' অর্থে বলা হয়েছে। ভগবৎ সম্বন্ধে ভক্তের প্রাকৃত তনু চিৎ হয়। মর্ত্তের কৃষ্ণভজন স্থান বৈকুণ্ঠের চেয়েও উত্তম। দেবাদিদেব শঙ্করকে দেবর্ষিপাদ নারদ প্রশ্ন করেছেন— কেন এটি হল ? বৈকুণ্ঠে তো সবই সচ্চিদানন্দময় তনু কিন্তু মর্ত্ত্যে পাঞ্চভৌতিক তনু হয়েও কৃষ্ণভক্তিসুধাপানের ফলে তনু প্রাকৃত মরণ ধর্ম ত্যাগ করে। সুধাপানে অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

কৃষ্ণভক্তিসুধাপানাৎ দেহদৈহিকবিস্মৃতেঃ।
তেষাং ভৌতিকদেহেঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা ॥

বৃহদ্ভাগবতামৃত

কৃষ্ণভক্তিসুধাপানে জীবের পাঞ্চভৌতিক ধর্ম ত্যাগ হয়। এ সুধাপান হল ভগবানের লীলাকথার শ্রবণ, কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন প্রভৃতি। দেহ যে পাঞ্চভৌতিকতা মরণধর্ম ত্যাগ করছে—সেটি বুঝা যাবে কেমন করে? ক্রিয়া যে হচ্ছে তার লক্ষণ কি? দেবতাদের চেহারা দেখলে যেমন তাদের অমৃতপায়ী বলে বুঝা যায়—শিব বললেন কৃষ্ণভক্তিসুধাপানে তৃপ্ত হয়ে দেহের পাঞ্চভৌতিকতা যারা ত্যাগ করছে তাদের দেহ দৈহিক ভুল হয়ে যাবে। ভক্তিসুধা মাদক দ্রব্য—দেহ দৈহিক সবকিছু ভুল করিয়ে দেয়। তখন তাদের এই পাঞ্চভৌতিক দেহই সচ্চিদানন্দময় হয়ে যায়। তাই শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বললেন—তোমার প্রাপ্তির জন্য যদি জগৎ প্রস্তুত হয় তাহলে অসৎ জগৎও সৎ হয়ে যায়। সেইজন্যই বলা হল সদিবাবভাতি।

ব্রহ্মার এই স্তুতিবাক্যের ওপরে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ আস্বাদন করেছেন। মায়া থেকে জগতের উৎপত্তি আবার মায়াতেই লয়। ভগবান গীতায় বললেন—

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ গীঃ ২।২৮

আমাদের সংসারের জীবের সমুদয় জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে কারণ তার দেহাভিনিবেশ মাত্র আছে—তাই জ্ঞান নেই। বেদব্যাসের প্রতি দেবর্ষিপাদ নারদের উক্তি আছে—

ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ পৃথগ্‌দৃশস্তৎকৃতরূপ নামভিঃ।
ন কুত্রচিৎ ক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতি র্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্‌ ॥

ভাঃ ১।৫।১৪

এ জগতে একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মের যশোগান ছাড়া অন্য কোন ধর্ম

হতে পারে না। ভগবানের স্মৃতি থেকে চ্যুত হওয়াই অশুচি। বলা আছে—

সা হানি স্তৎ মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ॥

কৃষ্ণপাদপদ্মের যশোগান করেন নি বলে বেদব্যাস আগে অপরাধী পরে সেই বাণী শুনে জীব অপরাধী হয়ে পড়েছে। ভগবানকে ভুললে তবে অন্য কথা বলবার ইচ্ছা হয়। জগতের নানারকম নামে রূপে চিত্তের বিভ্রম ঘটায় এ জগতের যেটিকে আমরা সুখের যত বেশী পরিমাণ বলে মনে করি পরিণামে সেটিও সেই পরিমাণে দুঃখ দেয়। যত পরিমাণে সুখ বলে মনে হয় নেশা কাটলে তত পরিমাণে দুঃখ বলে মনে হবে। বুদ্ধি তাই কখনও সুখী হয় না। সর্ব্বত্র দুঃখে স্থিত। ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি আমাদের সুখে অবস্থিত নয়। এটি বুঝা যাবে কেমন করে? কারণ সুখে অবস্থিত হলে ইন্দ্রিয় বা বুদ্ধি সেখান থেকে সরে আসতে পারত না। ইন্দ্রিয় আমাদের প্রাকৃত বিষয়ে দুঃস্থিত। যে নৌকা নোঙর করা হয়নি তা যেমন বাতাসে আহত হয়ে ইতস্তত চালিত হয়ে বিপথে গিয়ে পড়ে তেমনি আমাদের জীবনরূপ নৌকা যদি নোঙর করা না থাকে অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পিত না থাকে তাহলে বাসনাবায়ুতে তাড়িত হয়ে বিষয়তরঙ্গক্ষুব্ধ নদীতে জীবন কোথায় ভেসে যাবে তার ঠিক নেই। মায়া অসৎ নয় কারণ মহাপ্রলয়েও প্রকৃতি লয় পায় না। মায়া জাত বস্তু কিন্তু অসৎ। মায়া হল সৎ এবং অসৎ ভিন্ন একটি পৃথক্ বস্তু। অজ্ঞান অর্থাৎ মায়া অসৎ নয়। অস্তিত্ব তার আছে কিন্তু এ অস্তিত্বের দ্বারা আত্মানুভূতি হচ্ছে না। বৈষ্ণবদর্শন মতে মায়া মিথ্যা নয় কিন্তু মায়াজাত বস্তু অর্থাৎ মায়িক বস্তু মিথ্যা। যেমন দেখা যায় ইন্দ্রজাল মিথ্যা কিন্তু ইন্দ্রজাল যে তৈরী করছে সেই ঐন্দ্রজালিক কিন্তু সত্য। এই যে মায়িক মিথ্যা জগৎ এও সত্য হতে পারে—এমন জগৎও নিত্য হতে পারে ব্রহ্মা বলছেন—ত্বয়ি আধারে—তুমি তার আধার তাই

তোমার আধারে থাকায় এ জগৎও নিত্য হতে পারে। গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারে জগদধিষ্ঠিত। অংশ এবং অংশী অভিন্ন বলে কৃষ্ণেও জগতের অধিষ্ঠানত্ব সংক্রামিত হয়। এ সংক্রমণ হল আভাসে সংক্রমণ। জবাকুসুমের মত। জবার লাল রং স্বচ্ছ স্ফটিকে সংক্রামিত হলে যেমন স্বচ্ছ স্ফটিককে লাল দেখায় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ স্বচ্ছ স্ফটিকের সঙ্গে জবার কোন স্পর্শই হয় না—তবু স্ফটিককে লাল দেখায়। জলে যেমন অগ্নির সংক্রমণ হয় তাতে বস্তুস্পর্শ হয়। অগ্নি থেকে জল সরিয়ে নিলেও জল উষ্ণই থাকে। জবার লৌহিত্যের স্ফটিকে সংক্রমণ কিন্তু সেরকম নয়। জগৎ যদি ভগবৎসেবার জন্য হয় তাহলে জগৎ অসৎ হয়েও সৎ হতে পারে। ব্রহ্মা স্তুতিতে বলেছেন—

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন শে তো
বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্ মুহ্যতি।
সদ্বেষাদিব পুতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা যদ্ধামার্থসুহৃৎ-
প্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে॥ ভাঃ ১০।১৪।৩৫

ব্রহ্মা এই স্তুতিবাক্যে ব্রজবাসীর চরণ ছুঁয়েছেন। তাই ভগবানের কৃপা তাঁর ওপর এসেছে। ব্রজবাসী তারা জীবনের সবকিছু কৃষ্ণ চরণে অর্পণ করেছে এখন কৃষ্ণ তাদের কি দেবেন? শ্রীজীবপাদ নঃ চৈতঃ পদের টীকায় বলেছেন—ব্রজবাসীকে দেওয়ার ভগবানের আর কি আছে? নিজের স্বরূপ ছাড়া? সর্ব্বফলের জন্মদাতা তিনি যদি তার স্বরূপ দেন তাহলেও ঠিক দেওয়া হয় না। কারণ পুতনা যে হিংসা নিয়ে এসেছিল তাকেও তিনি স্বরূপ দিয়েছেন—তাকে একা নয় সকুলে অর্থাৎ সবংশে তাকে গতি দিয়েছেন। তাই সবংশে ব্রজবাসীকে স্বরূপ দিলেও ঠিক দেওয়া হয় না। ব্রজবাসী সব জিনিষ তোমার জন্য ধরে রেখেছে। কারণ যে যেমন কাজ করে তার পারিশ্রমিক তো তেমনি হবে। তাই অন্য দেহধারী জীব অপেক্ষা মানুষের পারিশ্রমিক বেশী। মানুষ ভিন্ন অন্য দেহধারীর পারিশ্রমিক

হয় আর্থিক কিন্তু মানুষের যোগ্য পারিশ্রমিক হল পরমার্থ। সেইজন্য সর্ব্বস্ব ভগবানে নিবেদন করে সংসার কর। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেছেন—

তোমায় লয়ে করুক সংসার
মায়াবন্ধন ঘুচুক সবার।

ভগবানও বলেছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যদ্ জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥ গীঃ ৯।২৭

সবই তোমার—আমার নিজস্ব বলতে কিছু নেই। ভগবানে নিবেদন না করে খেলে চুরি করা হয়। ভগবান বলেছেন—

তৈর্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ। গীঃ ৩।১২

ভাবসংশুদ্ধি করতে হবে। আমার কোনটিই নয়—এই ভাবটি মনের মধ্যে দৃঢ় করতে হবে। পুত্র চাই ভগবৎ সেবার জন্য তাই এ পুত্রকামনাও ভক্তি অঙ্গ। সংসার ত্যাগ করে কি হবে? মন তৈরী করে সংসার ত্যাগ করতে হবে। নিক্তির ওজনে মানুষের নিঃশ্বাস। মহাজন বলেছেন—মানুষের নিঃশ্বাসে বিশ্বাস নেই।

নিঃশ্বাসে ন হি বিশ্বাসঃ কদা রুদ্ধো ভবিষ্যতি।
আবাল্যাদেব জপ্তব্যং হরেনামৈব কেবলম্॥

শুধু মানুষ নয় যারা ইন্দ্রিয় পেয়েছে তারা হরিভজন না করে কি করে থাকতে পারে শ্রীশুকদেব তা চিন্তাই করতে পারেন না। তাই বললেন—

কো নু রাজন্নিন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজম্।
ন ভজেৎ সর্ব্বতোমৃত্যুরুপাস্যমমরোত্তমৈঃ। ভাঃ ১১।২।২

শুকদেবের ইন্দ্রিয় কৃষ্ণলোভী। এটি তাঁর সহজাত। কিন্তু অন্যের পক্ষে এটি দুর্লভ। সকলে কেন তাঁকে ভজবে? লোকে যে যাগযজ্ঞ করে সেটি স্বর্গে যাব বলে নয়, মৃত্যু এড়ানোর জন্য যাগ-যজ্ঞ করে। গরুড় মহাবৈষ্ণব তাই সৌভরিমুনির বাক্য লঙ্ঘন করেন

নি। কারণ বৈষ্ণব কখনও মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে না। মৃত্যু ব্রহ্মাকেও ছাড়ে না। ভগবান বললেন—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন। গীঃ ৮।১৬

কিন্তু গোবিন্দই একমাত্র যাঁকে মৃত্যু ভয় করে। দেবকী মা বলেছেন—কৃষ্ণপাদপদ্মরূপ ধন্বন্তরীর আবির্ভাবে মৃত্যুও ভয় পায়। ধন্বন্তরীকে মৃত্যু স্পর্শ করতে পারে না। জীবের সৌভাগ্যে কৃষ্ণ-পাদপদ্মের আবির্ভাব নয়। জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে ভগবান আবির্ভূত হন। তাঁকে যে জীব পায় এইটিই জীবের সৌভাগ্য। সম্বন্ধলক্ষণা ভক্তির আশ্রয় না পাওয়া পর্য্যন্ত জীব কিছুতেই স্থির হতে পারে না। পাওয়ার পরে তবে জীব সুস্থ হয়। কিন্তু কৃষ্ণ-পাদপদ্মের আবির্ভাবের এ প্রয়োজনটিও লঘু। আসল প্রয়োজন হল প্রেম। তবে লঘু প্রয়োজনটি আগে বুঝতে পারলে তবে প্রেম প্রয়োজন বুঝা যাবে। কারণ মৃত্যু নিবারণ করতে সবাই চায়। মৃত্যু নিবারণের জন্য কৃষ্ণভজন এ কথা যদি বলা যায় তাও ঠিক হবে না। কারণ কৃষ্ণপাদপদ্ম অসীম সুখধাম। তার আস্বাদ তো পাওয়া হয় নি। তাই জীবের প্রার্থনা হওয়া চাই জন্ম মৃত্যু আমার যেখানে হয় হোক্, কিন্তু তোমার ভক্তিরসের আস্বাদন যেন হয়। ভক্ত এইটিই প্রার্থনা করে। ব্রহ্মা নিজেও সেই জন্মই প্রার্থনা করেছেন। প্রহ্লাদজীর প্রার্থনাও তো তাই। ভক্তজনও প্রার্থনা জানিয়েছেন—গৌরপরিকরের প্রার্থনা—

তুমি আর নিত্যানন্দ বিহরিবে যথা।
এই করো যেন জন্মে জন্মে ভৃত্য হই তথা॥

বেতের ঘা একবার নিলে যদি দশটাকা পুরস্কার মেলে তাহলে যারা টাকার লোভী তারা সে বেতের ঘা সহ্য করতে পারে। তেমনি কৃষ্ণপাদপদ্মলোভী ব্যক্তিও জন্ম মৃত্যুর ক্লেশ সহ্য করতে পারে।

এখন কথা হচ্ছে মুকুন্দপাদপদ্ম যদি উত্তম বস্তু হয় তাহলে তার সেবা লোকে করতে পারে। কিন্তু সেটি কি উত্তম বস্তু? তাই

শ্রীশুকদেব বললেন—হ্যাঁ কৃষ্ণপাদপদ্ম উত্তম বস্তু। কারণ কৃষ্ণ উত্তম দেবতাদেরও উপাস্য। শিব বিরিঞ্চি (ব্রহ্মা) নিরন্তর কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজনা করেন। এমন ভজনা করেন যে ভজে ভজে কুল পান না। কারণ খাদ্য এবং খাদক দুইই যদি অফুরন্ত হয় তাহলে ভোজনের যেমন শেষ হয় না তেমনি ভোজনরূপ ভজনও অফুরন্ত। কারণ এখানে উপাস্য বস্তুরও শেষ নেই—তাই ভজনেরও শেষ নেই। ভগবানের পাদপদ্ম মাধুর্য্য আস্বাদন রূপ ভোজ্য যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে কৃষ্ণের অনন্ত নাম সার্থক হয় না।

তাই ব্রহ্মার এই স্তুতি বাক্যে শ্রীজীবপাদ আস্বাদন করেছেন জগৎবাসী যদি তোমার উচ্ছিষ্টভোজী হয়ে থাকতে পারে তাহলে এই জগৎই সুখের হবে সৎ হবে চিৎ হবে যদিও বস্তুত এ জগৎ দুঃখের অসতের এবং অজ্ঞানের।

জগতের সর্ব্বকালিন সত্তা বলে কিছু নেই। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে একান্ত সত্য বস্তু কি? ব্রহ্মা বলছেন, একান্ত সত্য বস্তু তুমি। তুমি আছ তাই জগৎ আছে। তুমিই সত্য। 'সত্যং পরং ধীমহি' —এই মন্ত্রে শ্রীশুকদেব শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে উপক্রম এবং উপসংহার করেছেন। মাঝে যা কিছু সব তারই অভ্যাস চলেছে। আর এই অভ্যাসের দ্বারাই মন্ত্র দৃঢ়তা লাভ করেছে। এই ধ্যানই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের সর্ব্বত্র। শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র শ্রবণ করিয়েছেন অর্থাৎ ধ্যান করিয়েছেন। ভগবানের রূপ, গুণ লীলা যে কোন রকমে ধ্যানে লাগাতে হবে। ভিড় ঠেলে যেমন মানুষকে গন্তব্যস্থানে পেঁছুতেই হয় এও তেমনি বিষয় ভিড় ঠেলে কৃষ্ণপাদপদ্মরূপ গন্তব্যস্থানে আমাদের পেঁছুতেই হবে। শ্রীশুকদেব মঙ্গলাচরণ করেছেন—সত্যই পরং ধীমহি—এস আমরা পূজা করি। পরে তাঁর ধ্যান আরম্ভ হল। ব্রহ্মা বলছেন, হে ভগবন্—তুমিই কেবল সত্য। অর্থাৎ তোমার যে সত্যতা তা কাউকে অপেক্ষা করে না। কিন্তু জগতের সত্যতা তোমাকে

অপেক্ষা করে। তোমাতে অধিষ্ঠিত বলে জগৎ সত্য। তুমি আছ তাই জগৎ আছে। নিতাইএর সত্তায় জগতের সত্তা। তুমি হলে সত্যস্য সত্যম্। হ্লাদিনীর সার যেমন প্রেম, দুধের সার যেমন ঘি, তেমনি সকলের সার হলে তুমি।

ব্রহ্মা এই মন্ত্রে ভগবানের গুণের নির্য্যাস বর্ণনা করছেন—

একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিত্যোঽক্ষরোঽজস্রসুখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোঽদ্বয়ো মুক্ত
উপাধিতোঽমৃতঃ॥ ভাঃ ১০।১৪।২৩

শাস্ত্রের সব বিশেষণ, ব্রহ্মা, পরমাত্মা, ভগবান—এই তত্ত্বের মত বিশেষণ হতে পারে সব বিশেষণগুলি কৃষ্ণস্বরূপে লাগিয়ে ব্রহ্মা স্তুতি করছেন। এখানে বাক্‌পতি ব্রহ্মা বক্তা আর শ্রোতা হলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীবালগোপাল। শ্রোতার যাতে সুখ হয় সেইরকম কথা ব্রহ্মা বলছেন। এ হল রাজভোগ। এ রাজভোগ আস্বাদন করবার অধিকার তো আমাদের থাকতে পারে না। কারণ অলপবেতনভোগী ভৃত্যের রাজভোগ গ্রহণে অধিকার কোথায়? তবে যদি রাজার ভৃত্য হয়ে বসতে পারা যায় এবং রাজা যদি তাকে নিজ ভৃত্য জেনে উচ্ছিষ্ট-দান করেন তবে সে ভৃত্যের পক্ষেও রাজভোগ গ্রহণে অধিকার হতে পারে। এখানেও তেমনি রাজভোগরূপ ব্রহ্মাস্তুতি আস্বাদনের যদি আমাদের লোভ থাকে তাহলে আচার্য্যগণ যাঁরা এই রাজভোগ পরি-পরিবেশন করেছেন তাদের দাস হয়ে বসতে হবে তাহলে আমরাও উচ্ছিষ্টভোজী হতে পারি। একস্তমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ—এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় আস্বাদন করেছেন ত্বম্ সত্যং—তুমিই সত্য, কেন? কারণ তুমি হলে আত্মা—দৃশ্যম্ অসত্যম্ দৃষ্টম্—যত কিছু দৃশ্য বস্তু দেখা গেছে সব অসত্য। কিন্তু আত্মা দৃশ্য নয়—তাই আত্মাই সত্য। যা কিছু বিকারী তা অসত্য। কিন্তু তোমাতে বিকার (জন্মাদি বিকার) নেই কাজেই তুমি সত্য। এখন তুমি যে সত্য তার কারণ কি? কারণ তুমি আদ্য অর্থাৎ কারণ।

তুমি আদ্য অর্থাৎ কারণ কেন ? কারণ তুমি পুরাণ। কারণ পুরাপি নব। পুরা হয়েও নব—অর্থাৎ কার্য্যাৎ পূর্ব্বমপি বর্ত্তমানঃ। কার্য্যের পূর্ব্বেও তুমি আছ। কারণ যে সে সর্ব্বদা পূর্ব্ববর্ত্তীই হয়। কাজেই সকল কার্য্যজাত পদার্থের আগেই তুমি বর্ত্তমান। তুমি পুরাণ অর্থাৎ কারণ কেন ? কারণ তুমি পুরুষ। চতুঃশ্লোকী ভাগবতে বৈকুণ্ঠনাথ বলেছেন—'অহমেবাসমেবাগ্রে'—অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির আগে আমিই ছিলাম আর কেউ ছিল না। এখানে ভগবান নিজেকে অহম্ পদের দ্বারা অভিহিত করেছেন—তাতেই বুঝা যাচ্ছে বক্তা এখানে মূর্ত্ত। অমূর্ত্ত যে সে কখনও বক্তা হতে পারে না। আর ভগবান অস্তি বলাতে যে 'অস্তি' পদের প্রয়োগ হয় সে অস্তি—জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপারিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতি এই ষড়ভাব-বিকারের অন্তর্গত নয়। কারণ জন্মের পরে যে অস্তিত্ব সেই অস্তি ভাববিকারের মধ্যে পড়ে—আর যে অস্তি জন্মের পরে নয় তাকে ভাববিকার বলা যাবে না। ভগবানের জন্ম নেই—তাঁর জন্ম বলতে আবির্ভাব প্রকাশকে বুঝায়—তাই ভগবানের যে অস্তিত্ব সেটি জন্মের পরের অস্তিত্ব নয়—তাই এই অস্তিকে ভাববিকার বলা যাবে না।

ব্রহ্মা বলছেন—তুমি বিকারবর্জিত। স্বামিপাদ আস্বাদন করছেন—তুমি বিকারবর্জিত কারণ তুমি নিত্য। নিত্য যা তার বিকার হয় না। এখানে চারটি ভাববিকার চারটি বিশেষণের দ্বারা নিবারণ করা হয়েছে। তোমার বৃদ্ধি বিকার নেই কারণ তুমি পূর্ণ। তোমার বিপারিণাম বিকার নেই কারণ তুমি অজস্রমুখ। তোমার অপক্ষয় বিকার নেই কারণ তুমি অক্ষর। তোমার বিনাশ নেই কারণ তুমি অমৃত। তুমি যে পূর্ণ তার হেতু হল তুমি অনন্ত এবং অদ্বয়। তুমি অমৃত হবে যদি চারটি ক্রিয়াফল তোমাতে নিবারিত হয়। প্রথম তোমার উৎপত্তিরূপ ক্রিয়াফল নেই কারণ তুমি যে আদ্য। দ্বিতীয় প্রাপ্তিরূপ দ্বিতীয় ক্রিয়াফল লাভ হয় দুই উপায়ে—(১) ক্রিয়ার দ্বারা এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা। তুমি আত্মা কাজেই ক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্তিরূপ

ক্রিয়াফল তোমাতে নেই। আত্মাকে প্রাপ্তির জন্য ক্রিয়াপ্রাপ্তির দরকার হয় না। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে ভজনকে ক্রিয়া বলা হয় কেন? তার উত্তরে বলা যায় ভজন ক্রিয়া নয়—ভজন ভগবৎ স্বরূপই। ভক্তিকে কর্ম বলা যায় না কারণ যে কর্ম বন্ধন ঘটায় তাকেই কর্ম বলা যায়—ভক্তিকর্মের দ্বারা বন্ধন তো হয়ই না বরং বন্ধন মুক্ত হয়। ভগবতস্বরূপিণী হলেন ভক্তিমহারাণী তাই ভক্তিক্রিয়াকে ক্রিয়া বলা যাবে না। সাক্ষাৎ চিদানন্দময়ী ভক্তি আর দ্বিতীয়রূপ যে প্রাপ্তি ক্রিয়াফল তাও তোমাতে নেই। জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্তি তোমাতে নেই কারণ তুমি স্বয়ং জ্যোতি। কারণ নিজের ডান হাত দিয়ে যদি নিজের অঙ্গ ধরা যায় তাহলে যেমন তাকে অন্য কেউ ধরেছে বলা যায় না—কারণ নিজেরই ডান হাত আবার নিজেরই অঙ্গ তেমনি ভজন বা ভক্তি দিয়ে যে ভগবানকে পাওয়া তাকেও তাঁকে ক্রিয়ার দ্বারা প্রাপ্তি বলা যাবে না কারণ ভক্তি তাঁরই স্বরূপ। ভক্তি ভগবানের থেকে ভিন্ন নন। ভক্তি দিয়ে ভগবানকে পাওয়া তার অর্থ হল তাঁকে দিয়েই তাঁকে পাওয়া। ভগবানের দক্ষিণ হাত হলেন ভক্তি। ভজন যত করা যাবে ততই তাঁর হাত নিকটবর্ত্তী হবে। সূর্য্যকে দেখতে হলে যেমন অন্য কোন আলোর সাহায্য লাগে না সূর্য্যের আলোতেই সূর্য্য দেখা যায় তেমনি ভগবানকে অন্য কোন জ্ঞান দিয়ে জানা যায় না। কারণ তিনি স্বয়ং জ্যোতি। যা দিয়ে ভগবানকে জানা যায় সেও ভগবানের থেকে ভিন্ন নয়—ভগবানের নিজেরই স্বরূপ হলেন ভক্তি। ভক্তি দিয়েই ভগবানকে জানা যায়। তৃতীয় ক্রিয়াফল অর্থাৎ বিকৃতি তাও তোমার নেই। তুষ বাদ দিয়ে যেমন চাল পেতে হয়, তেমনি তোমাকে পেতে গেলে কিছু বাদ দেবার প্রয়োজন নেই। তোমাতে খোসা ছাড়াবার কিছু নেই। কারণ তুমি অসঙ্গ। তুমি অসঙ্গ কেন? কারণ তুমি উপাধি হতে মুক্ত। আর সর্ব্বশেষ ক্রিয়াফল যে সংস্কার তাও তোমাতে নেই। সংস্কার দুইভাবে হতে পারে—(১) অতিশয় আধান এবং (২) মলাপকরণ—অর্থাৎ মল ত্যাজ্য বাদ দেওয়া। কিন্তু

এর কোনটিই তোমাতে সম্ভব নয়। অতিশয় আধান তোমাতে হতে পারে না কারণ তুমি পূর্ণ আর মলাপকরণও তোমাতে সম্ভব নয় কারণ তুমি হলে নিরঞ্জন।

ব্রহ্মা বলছেন ভগবানের সব অবতারই নিত্য। গোবৎসহরণ লীলায় তুমিই বালক বাছুররূপে দৃষ্ট হয়েছ। তোমার প্রতিটি বপুই সত্যস্বরূপ, চিৎস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ—এই শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলেছেন—তোমার এ মূর্ত্তি লীলার জগতের পক্ষে দৃষ্ট কিন্তু দেবতাদের দৃষ্টিগোচর হয় না—তারা শুধু কানে শোনে। উপনিষদ্ দৃশঃ—উপনিষদ্ যাদের চক্ষু—অর্থাৎ শ্রুতি যাদের চক্ষু তারা তোমার এ মহিমাকে স্পর্শও করতে পারে না। এ বিশেষণ অন্য কোন ভগবৎ স্বরূপে নেই। তুমি বহু হয়েও এক। অক্রূরদেব তোমাদের রথে বসিয়ে রেখে যখন যমুনায় নেমে স্নান করে—আহ্নিক করছেন তখন তোমাদের জলে দর্শন করেছেন। বিস্মিত হয়ে তখন অক্রূর স্তুতি করছেন—বহুমূর্ত্ত্যেহপি একমূর্ত্তি—তুমি বহুমূর্ত্তি হয়েও একমূর্ত্তি। বহু হয়েও যে তুমি একরূপ—তোমার এই একত্ব এটি তোমার অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা সম্ভব হয়েছে। তুমি সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদ শূন্য।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হতে পারে অন্য ভগবৎ স্বরূপের সঙ্গে স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণের সজাতীয় ভেদ তো থাকবেই—কিন্তু এ ভেদটি না থাকার হেতু কি? তার উত্তরে বলা হচ্ছে অন্য ভগবৎস্বরূপও তিনিই। তুমিই সীতাপতি। তবে শক্তি প্রকাশের তারতম্যে ভগবৎ-স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়। তা না হলে তুমিই সব। তাই তুমি এক। সকল ভগবৎ স্বরূপই তোমা থেকে আবির্ভূত তাই তুমি এক। যৎ দৃষ্টং তৎ ত্বমেব। লীলাবতার যা কিছু সেও তোমারই প্রকাশ। তোমারই স্বরূপ। তাই তো জয়দেব কবি দশাবতার স্তোত্রে বললেন—

কেশবধৃত মীন শরীর জয় জগদীশ হরে।
কেশবধৃত শূকররূপ জয় জগদীশ হরে।
কেশবধৃত বামনরূপ জয় জগদীশ হরে।
কেশবধৃত নরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে॥

ব্রহ্মা বলছেন—একস্ত্বমাত্মা—তুমি আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। অর্থাৎ তুমি শরীর নও। তখন শ্রীবালগোপাল প্রশ্ন করছেন,—পরমাত্মা তো নিরাকার তাহলে আমিও কি নিরাকার অর্থাৎ আমারও কি আকার নেই? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন,—না তুমি নিরাকার নও। তুমি নন্দকিশোর। শ্রীবালগোপাল জিজ্ঞাসা করছেন, তাহলে কি অন্য পুরুষের মত আমি অর্ব্বাচীন অর্থাৎ আধুনিক? ব্রহ্মা বলছেন, না, তুমি পুরাণ। তুমি পুরাতন অর্থাৎ—আধুনিক নও। যতদূর পুরাতন খবর পাওয়া যায় সেখানে দেখা যায় তুমিই আছ আর কেউ নেই। তুমি পুরাপি নব। তুমি পুরাতন হয়েও নূতন। সবাই তোমার এই স্বরূপটি পেতে চায়। অর্থাৎ প্রাচীন অর্থাৎ অভিজ্ঞ হয়েও নবীন থাকতে চায়—তাই বয়সের বার্দ্ধক্য জরাকে ঢাকবার জন্য তাদের এত বৃথা প্রয়াস। তাহলে দেখা যাচ্ছে সবাই নন্দকিশোরের স্বরূপকে পেতে চায়। কিন্তু প্রকৃত পথ কি তা জানে না। তাই নানা কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু পুরাণ হয়েও নূতন থাকবার একমাত্র উপায় হল নন্দকিশোরের ছায়ায় বসতে হবে। অর্থাৎ ভক্তিছায়ায় বসলে তাতেই পুরাপি নব হতে পারা যাবে। চন্দন তরুর কাছে যত যত তরু আছে বাতাস তাদের সুগন্ধি করে। এমনকি কাছাকাছি গাছের কাঠও চন্দন কাঠ বলে গণ্য হয়। বালগোপাল সুবিচারক। ভাল প্রশ্নকর্ত্তা। তাই প্রশ্ন করছেন—এখন তো আমার বয়স মোটে পাঁচবছর তুমি বললে আমি পুরাণ—পুরাণ যদি হই তাহলে নন্দপুত্র কেমন করে হলাম। আমার বয়স তো মোটে পাঁচ বছর তাহলে তো আমি অর্ব্বাচীন। তুমি স্তুতিতে আমাকে পুরাতন বলেছ বটে কিন্তু যথার্থ আমি পুরাতন নই। তার উত্তরে ব্রহ্মা

বলছেন—না, তুমি সত্য। নন্দপুত্ররূপে তুমি সত্য। তুমি ত্রিসত্য অর্থাৎ ত্রিষু অপি কালেষু সত্যম্ অর্থাৎ তিনকালে সত্য। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালে তুমি আছ তাই তুমি সত্য। কারণ সত্যের লক্ষণ হল ত্রিকালাবাধিত্বম্। তিনকালে যেটি অবাধিত তাকেই তো সত্য বলা হয়। অর্থাৎ তিনকালে তোমার ব্যভিচার নেই—তুমি অব্যভিচারী। ভগবান এবং ভগবানের লীলা এ দুটিই সত্য।

ভগবান বলছেন—ব্রহ্মন্ তোমার এ বাক্য যুক্তিপূর্ণ নয়। নন্দপুত্র আমি, আমি কেমন করে ত্রিকাল সত্য হতে পারি? ব্রহ্মা বলছেন, কেনই বা হবে না? নন্দ মহারাজ যশোদা মা তাঁরাও তো ত্রিকাল সত্য। লীলা এবং পরিকর সকলেই নিত্য। লীলা এবং পরিকরের নিত্যতা না থাকলে ভগবানের নিত্যতা থাকে না। লীলা এবং পরিকরসহ ভগবান নিত্য। এ জগতে চিন্ময় ধামের সঙ্গে তাঁদের আবির্ভাব হয় মাত্র। শ্রীদামবন্ধনলীলায় পূর্ব্ব অধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করেছেন—

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাস্তনং হরিঃ॥ ভাঃ ১০।৮।৪৬

নন্দ মহারাজ কি এমন পুণ্য করেছেন আর যশোদা মায়ের তো কথাই নেই তিনি কোন পুণ্যের বলে এত সৌভাগ্যবতী হলেন যাতে করে ভগবান হরিকে তিনি স্তন্যপান করালেন। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র এতক্ষণ শ্রবণ করবার পরে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন করবার অধিকার জন্মেছে। এর উত্তরে শ্রীশুকদেব ধরা দ্রোণ সংবাদ বলেছেন। এর পরেই শ্রীশুকদেব নিজের গরজে দামবন্ধন লীলা আরম্ভ করেছেন। এই লীলার প্রথম শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ বলেছেন—মহারাজের কোন প্রশ্ন না করা সত্ত্বেও শ্রীশুকদেব দামবন্ধন লীলা বলেছেন। এতে ঠারে ঠোরে শ্রীশুকদেব বললেন—ব্রহ্মার বরে নন্দ যশোদা হয় না মহারাজ—কারণ তাঁরা হলেন নিত্য পিতামাতা। নিত্য পিতামাতা

তৈরী হয় না। ধরা দ্রোণ যে নন্দ যশোদা হয়েছেন ব্রহ্মার বরে—তাঁরা তপস্যা করেছিলেন কিন্তু তাঁরা নিত্য পিতামাতা তো হতে পারেন নি—তাঁরা নিত্য পিতামাতা নন্দ মহারাজ যশোদা মায়ের আনুগত্যে শ্রীবালগোপালকে বাৎসল্যরসে আস্বাদন করেছেন। ভগবানের যে কোন পরিকর নিত্য—কারণ পরিকর নিত্য না হলে লীলার নিত্যতা থাকে না। নন্দমহারাজ যশোদা মা যদি সাধন করে হন তাহলে তো ভগবানকে অপেক্ষা করে থাকতে হয়—কে কবে সাধন করে সিদ্ধিলাভ করবে তারপর পিতামাতা হবে—তখন ভগবান তাদের নিয়ে বাৎসল্য রস আস্বাদন করবেন—তাহলে তো ভগবানের লীলার নিত্যতা থাকে না। অথচ শ্রুতি বাক্য আছে—একো দেবো নিত্য-লীলানুরক্তঃ। ভগবান নিত্য লীলাময়। তাই পরিকর নিত্য হওয়া চাই—তবে লীলার নিত্যতা বজায় থাকবে। শ্রীল ঠাকুরমশাই বলেছেন—গোবিন্দ শরীর সত্য তাহার সেবক নিত্য।

শ্রীশুকদেব বলেছেন—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যৎ তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥

ভাঃ ১০।৯।২০

শ্রীবালগোপালের প্রসাদ গোপী যশোদা যা পেয়েছেন—তা ব্রহ্মা পান নি, শিব পান নি এমনকি লক্ষ্মী ঠাকুরাণী যিনি ভগবানের অঙ্কশায়িনী বক্ষোবিলাসিনী তিনিও পান নি। তাহলে কথা হল কি গোপী যশোদা যে কৃপা পেয়েছেন সে কৃপা ব্রহ্মা না পেয়ে থাকেন তাহলে ঐ ব্রহ্মা বর দিয়ে যশোদা মাকে তৈরী করেন কি করে? এতেই বুদ্ধিমান মহারাজ পরীক্ষিৎ বুঝে নিলেন—ব্রহ্মার বরে নন্দমহারাজ তৈরী হয় না। এখানে কৃপা কথাটি বলায় একটু কানে বাজে ভক্তগণের। কারণ শ্রীবালগোপাল পুত্র—তিনি মা যশোদাকে কৃপা করবেন কি? মা ছেলেকে কৃপা করে সবাই জানে কিন্তু ছেলে তো মাকে কৃপা করে না—কথাটি বললে তো মানায় না। অথচ শুকদেব

বললেন প্রসাদ—গোপী যশোদাকে ভগবান যে প্রসাদ করেছেন—সে প্রসাদ ব্রহ্মাকে করেন নি শঙ্করকে করেন নি—এমনকি লক্ষ্মী ঠাকুরাণীকেও করেন নি। এখন প্রসাদ কৃপা অনুগ্রহ—সব একই অর্থ।

এখন এখানে কথা হচ্ছে—শ্রীশুকদেব যখন 'প্রসাদ' কথাটি উচ্চারণ করেছেন তখন অনেক চিন্তা করেছেন—দেখলেন যে 'প্রসাদ' 'কৃপা' ছাড়া অন্য কথা এখানে বসান চলে না। কারণ সিদ্ধান্ত বজায় রেখে তো কথা বলতে হবে। কৃপা বস্তু তো একমাত্র ভগবানের। ভগবান ছাড়া আর কেউ কৃপা করতে পারেন না। প্রকৃতি, কাল, কর্ম, জীব কেউ কৃপা করতে পারে না। কৃপা একমাত্র ভগবান করতে পারেন আর পারেন যারা ভগবানের নিজজন অর্থাৎ ভক্তগণ। তাই ভগবান যাকে যা করবেন—সবই কৃপা। কারণ বলা আছে—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচান সে তৈছে করে নৃত্য॥

ঈশ্বর কৃষ্ণ একমাত্র ভগবান—আর সব ভৃত্য। আর সকলের মধ্যে মা যশোদাকেও ধরতে হবে। সুতরাং কৃষ্ণ যার প্রতি যা করবেন সবই তাঁর কৃপা—মায়ের প্রতি যা করবেন—তাকেও কৃপাই বলতে হবে। কারণ এ ছাড়া তো আর দ্বিতীয় পদ নেই। এটি তত্ত্ব কথা বলবার জন্য বলা। কিন্তু লীলায় ভগবানের আচরণ ঠিক আছে। সেখানে মায়ের কাছে গোপাল এমন আচরণ করছেন—যাতে মাকে ভগবান কৃপা করছেন এটি আচরণে কখনও দেখা যায় নি। বরং বিপরীত। অনাদিরাদি শ্রীগোবিন্দ সর্ব্বকারণকারণম্—তিনি একটু ননী পাবার জন্য মায়ের আঁচল ধরে ধরে ঘুরছেন। মা একটু ননী না দিলে গোপালের ননী পাবার কোন উপায় নেই। তাহলে আচরণে দেখা যাচ্ছে মা অনুগ্রাহিকা আর গোপাল অনুগ্রাহ্য। অর্থাৎ মা অনুগ্রহ করছেন এবং গোপাল সেই অনুগ্রহ গ্রহণ করছেন। তবে কথা বলতে গেলে তত্ত্ব কথা সিদ্ধান্ত বজায় রেখে বলতে হবে—তাই শুকদেব 'প্রসাদ' কথাটি ব্যবহার করেছেন।

শ্রীভগবান অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। আনন্দচিদ্ঘনবিগ্রহ। শ্রুতি তাঁকে বললেন—রসো বৈ সঃ। আনন্দ হল চঞ্চল। আনন্দ জ্ঞানী নয় যোগী নয়। আনন্দ বলতে রসকে বুঝায়। রস চঞ্চল। নিত্য রসময় শ্রীবিগ্রহ আজ রসাস্বাদন করবেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিদ্। ভগবানই একমাত্র রসভোক্তা। কারণ তিনি বলেছেন—

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। গীঃ ৯।২৪

এখন ভগবান যদি নিজেই রস হন তাহলে তাঁর সে রস আস্বাদন করবে কে? তিনি ছাড়া আর তো কেউ রসিক নেই। তিনিই রস আবার তিনিই রসিক। রসাস্বাদনতৎপর তিনিই। শ্রুতি বললেন—'আনন্দং ব্রহ্মণো রূপম্।' রসের পাত্র নিত্য হওয়া চাই—তা না হলে রস বাঁচে না। রসের পাত্র নিত্য না হলে লীলা নিত্যা হয় না। লীলা নিত্যা হলে লীলার উপকরণও নিত্য হবে। এইজন্যই যেখানে লীলা হন অর্থাৎ লীলার ভূমি ধাম নিত্য। চতুঃশ্লোকী ভাগবতে ভগবান বললেন, ব্রহ্মন্—সৃষ্টির আগে আমিই ছিলাম—আর কেউ ছিল না।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎপরম্। ভাঃ ২।৯।৩২

অগ্রে বলতে সৃষ্টির আগে। এই আমিকেই ভগবান নানা বৈচিত্র্যে প্রকাশ করেছেন। ধাম, পরিকর, বিগ্রহ, নাম, লীলা, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, গিরিরাজ, শ্রীযমুনা—সবই তাঁরই প্রকাশ। তিনিই চেতনবান্ রস। রস যদি চেতন হয় তাহলে সে নিজেকে আস্বাদন না করে পারে না। মিছরির কুঁদো চেতন নয়—তাই সে নিজেকে আস্বাদন করতে জানে না—আস্বাদন করতে চায়ও না। কিন্তু ভগবান্ চিদ্ঘন। তাঁর রসাস্বাদনের স্পৃহা সর্ব্বদা। তিনি জ্ঞানময় এবং রসময়। তাঁর বাসনা আমিই আমাকে আস্বাদন করব। কারণ আমি ছাড়া আর তো কেউ নেই। এখন আস্বাদন শক্তি হল জিহ্বা। কিন্তু নিজের জিহ্বা দিয়ে যদি নিজের শ্রীঅঙ্গ আস্বাদন করতে থাকেন তাহলে সেটি শোভন হয় না—মানায় না। তাই ভগবান তাঁর

আস্বাদন শক্তিকে দাস, সখা, পিতামাতা কান্তাবর্গ এই চারভাগে ভাগ করলেন। এরা সকলেই ভগবানের নিজের স্বরূপ। ভগবান যেহেতু সত্যসংকল্প—তাই তিনি সংকল্প মাত্র সৃষ্টি করতে পারেন। নিজের শক্তিকে রূপ দিতে পারেন। এই চারটি রূপে তাঁরই আস্বাদন শক্তি কৃষ্ণ ভোগ করছেন—অর্থাৎ কৃষ্ণ নিজেই নিজেকে ভোগ করছেন। এ ভোগ কিন্তু চলে আসছে অনাদি কাল থেকে। তা না হলে লীলার নিত্যতা থাকে না। এঁরা সকলে হলেন রসের আশ্রয়-তত্ত্ব। আর কৃষ্ণ নিজে হলেন রসের বিষয়তত্ত্ব। বিষয় এবং আশ্রয় তত্ত্বত অভিন্ন বলেই আশ্রয়কে তত্ত্ব বলা হয়েছে। তত্ত্বতঃ আশ্রয় ও বিষয় দুইই এক। কেবল আস্বাদনের জন্য বিষয় এবং আশ্রয় এই দুটি ভিন্ন বলে ধরা হয়েছে। যেমন পুত্র পিতার স্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কিন্তু বাৎসল্য রস আস্বাদনের জন্য পিতা-পুত্রের মধ্যে ভিন্নতা স্বীকার করতে হয়েছে। পরমানন্দের প্রেমের স্রোত এতই বেশী যে রস এবং রসভোক্তা যে একই বস্তু তা বুঝা যাচ্ছে না। পিতা যে পুত্রকে সাজায় সে পুত্রকে সাজায় না নিজেকেই সাজায়। নিজে যদি নিজের অঙ্গ সাজায় তাহলে ভাল দেখায় না। তাই পুত্র যে তার অভিন্নস্বরূপ তাকে সাজিয়ে আনন্দ পায়। প্রেমের খরস্রোতে আত্মরক্ষা করা ভার। ভক্ত যে ভগবানের ধ্যানে ডুবে থাকে এবং ভগবান যে ভক্তের ধ্যানে ডুবে থাকে এ ধ্যানের তো বিরাম নেই। ভগবানের পরমকরুণাশক্তি নিত্যলীলায় বন্ধ্যা। নিত্যলীলায় করুণাশক্তি ফল প্রসব করবার সামর্থ্য নেই। কারণ করুণা হবে পতিতে। নিত্য লীলায় তো কেউ পতিত নেই। করুণাশক্তি তাই লীলাশক্তিকে অনুরোধ করল তখন লীলাশক্তি করুণাশক্তিকে সাজিয়ে অর্থাৎ বিষন্ন করে গোবিন্দের দৃষ্টিপথে রেখে এল। গোবিন্দ করুণাশক্তির বিষণ্ণ বদন দেখে তার উপর তাঁর নজর পড়ল। তখন করুণাশক্তিকে তিনি প্রশ্ন করলেন তুমি এত বিষন্না কেন? কি হয়েছে? তখন করুণাশক্তি জানাল

কাতরে আমি তো এখানে বন্ধ্যা কিন্তু ফল প্রসব করতে চাই। সেটি পতিতেই একমাত্র সম্ভব, তাই পতিতের জগতে চল। ভগবান তাঁর বাসনা পূরণ করলেন। নিত্য জগৎ থেকে ধাম পরিকর সঙ্গে পতিতের জগতে এলেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে প্রসঙ্গ আছে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দেবর্ষিপাদ নারদ বললেন—কৃষ্ণ অবতারে কত লোক মুক্তি পেল—রাম অবতারে তা হয়নি। করুণাশক্তির সেবায় শ্রীগোবিন্দ সবচেয়ে সুখী। করুণাশক্তি শ্রীগোবিন্দের সর্ব্বশক্তির পাটরাণী। করুণার কাজ গোবিন্দে নয়—করুণার কাজ পতিতে। ননীচুরির অপরাধে মা যখন গোপালকে অপরাধী বিবেচনা করে উদূখলে বেঁধেছেন তখন গোপাল মনে মনে ভাবছেন—যে অপরাধ করেছি মা তাতে আমার উপর রেগে গেছে তাই এখন যদি কোন ভাল কাজ করতে পারি তাহলে মা সুখী হবে সন্তুষ্ট হবে। এই ভাল কাজ করবার সংকল্পে যমলার্জ্জুন উদ্ধার হল। করুণাশক্তির সেবা তিনি গ্রহণ করলেন। সবাই গোবিন্দ কিন্তু সাজানোর পরিপাটি। মায়ের কাছে ভিখারীর মত গোপাল করুণা প্রার্থনা করেছেন। মা সুখী হবেন সুতরাং আমি সুখী হব এই তার মনের ভাব। করুণাশক্তি গোবিন্দের গলায় মালা পরাতে চায় কিন্তু সে সোজাসুজি গোবিন্দের গলায় মালা পরায় না। পতিতের গলায় গোবিন্দের প্রেমের মালা পরায়। আর তাতেই গোবিন্দের মালা পরা হয়ে যায়। এইটিই শ্রীগোবিন্দের শক্তির বিলাস। করুণাশক্তির এই যে কাজ এটি নিত্য জগতে নেই। তাই করুণাশক্তিকে কাজ দেবার জন্য ভগবানকে পতিতের জগতে নামতে হয়। এই ভাবেই নিত্য পিতা নন্দ মহারাজ নিত্য মাতা যশোমতীর সঙ্গে শ্রীভগবানের এ জগতে আবির্ভাব। তাই নন্দ যশোদা নিত্য এবং নন্দপুত্ররূপে তুমিও নিত্য। ব্রহ্মার বাক্যের এইটিই তাৎপর্য্য।

আত্মা অবিনাশী। জীব পরিবর্ত্তনশীল। মৃত্যু জীবের গন্তব্যস্থান। পরিবর্ত্তনই তার গমন। ভগবানের রাজ্য অমৃতের

রাজ্য। সেখানে মৃত্যু বলে কিছু নেই। অমৃতের বাজার। ব্রহ্মা বাক্য বলেছেন—দিনের সূর্য্যের মত ভগবান দীপ্তিমান। ভগবানের বন্ধনও নেই মোক্ষণও নেই। আত্মা নিত্যমুক্ত—তার বন্ধন হয় না। দেহের মৃত্যু হয়। আমরা দেহ নিয়ে চলি—তাই আমাদের জন্মমৃত্যুর পাকে পড়তে হয়। কিন্তু শুধু আত্মা নিয়ে যদি আমাদের কাজ হত তাহলে আমাদের জন্মমৃত্যুর হাতে পড়তে হত না। দেহপ্রাপ্তির নাম জন্ম এবং দেহের বিনাশের নাম মৃত্যু। ভগবানের ইচ্ছায় যাদের জন্ম হয় অর্থাৎ ভক্তজন্ম—ভক্তেরা এ মায়ার বাজারে বেড়াতে আসেন। জন্মমৃত্যুর বন্ধন তাদের সহ্য করতে হয় না। শ্রীল প্রেমানন্দ দাসজী বললেন—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ সদা যাঁর মুখে।
কোথা তার কর্ম্মবন্ধ প্রেমে মত্ত সদানন্দ
গতায়াত মাত্র নিজ সুখে॥

ভগবান নিজেও গীতাবাক্যে বলেছেন—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ গীঃ ৪।৯

অর্জ্জুন, আমার জন্ম কর্ম্ম যে যথার্থ জানে তার জন্ম এবং কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হয়ে যায়। মায়ার কারখানায় তৈরী এই কলকব্জা দিয়ে আমাদের এ দেহ তৈরী হয়েছে। কিন্তু শুধু কলকব্জা দিয়ে তো কাজ হবে না। তাতে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রেরণা চাই। তাই আমাদের দেহে অণু চৈতন্য বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবেশ করিয়ে তাকে ক্রিয়াশীল করা হয়েছে। ভগবৎ রাজ্যে কিন্তু হাত পা দেহ কলকব্জা বলতে যা কিছু কোনটিই মায়ার তৈরী নয় সবই আত্মা দিয়ে গড়া। যে রাষ্ট্র স্বয়ং সমর্থ যে যেমন অন্য রাজ্যের বস্তু গ্রহণ করে না তেমনি ভগবানের চিৎ রাজ অন্য রাজ্যের অর্থাৎ মায়ার রাজ্যের বস্তু গ্রহণ করে না। সেখানে মুখচরণকর সব আনন্দ দিয়ে গড়া।

এখন একটি প্রশ্ন হতে পারে বৈকুণ্ঠে তো সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ

সবই। তবে দাস প্রভু সম্বন্ধ কেমন করে সম্ভব হয়? এ প্রশ্নের সমাধান হবে যে স্বরূপে চিৎএর উচ্ছলন বেশী তিনি হবেন প্রভু এবং যে স্বরূপে চিৎএর উচ্ছলন কম তিনি হবেন দাস। যেমন মায়ের সব ছেলেকে সমানভাবে খাওয়ালে কারো দেহে উৎকর্ষ আবার কারো দেহে ন্যূনতা দেখা যায়। ব্রহ্মা বলছেন,—নন্দ যশোদা নিত্য পিতামাতা—তারা ত্রিকাল সত্য। অতএব তাঁর পুত্ররূপে তুমিও নিত্য সত্য।

এর পরে শ্রীবালগোপাল প্রশ্ন করছেন—আমি কি কাল ও কর্মের দ্বারা প্রকাশিত হই? ব্রহ্মা বলছেন,—না প্রভু, তুমি অন্য কোন বস্তুর দ্বারা প্রকাশ্য নও। তুমি স্বয়ংজ্যোতি। সূর্য্যকে যে দেখি সেও তোমারই আলোতে দেখি। মুণ্ডক উপনিষদ বললেন—

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্যৈব ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

ভগবানকে দেখবার জন্য অন্য কোন আলোর দরকার হয় না। তিনি স্বয়ংজ্যোতি আমাদের এই চোখ দিয়েও তাঁকে দেখা যায় না। ভগবানের কৃপাকিরণে চোখ তৈরী করে—সেই চোখ দিয়ে ভক্ত ভগবানকে দর্শন করে। ব্রহ্মা বলেছেন—

প্রেমাজনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন

অর্থাৎ ভক্তিচোখেই তাঁকে দেখা যায়। এ চোখ সাধন করে পাওয়া যায় না। চেষ্টা করে হয় না। আমাদের চেষ্টায় হয় না। কিন্তু তিনি যদি চেষ্টা করেন তবে হয়। তাঁর চেষ্টায় অর্থাৎ তাঁর কৃপায় সে চোখ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত আছে লীলায়—শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীবাসঅঙ্গনে মুসলমান দরজী প্রতিদিনই শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করে কিন্তু যেদিন মহাপ্রভু তাকে দর্শন করলেন—তার উপর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন সেইদিন সে 'দেখেছি' 'দেখেছি' বলে আর্ত্তিভরে কেঁদে উঠল। কৃষ্ণকৃপা হলে সে লোকধর্ম বেদধর্ম ছেড়ে কৃষ্ণ ভজে। তখন বুঝতে হবে ভক্ত যে শুধু ভগবানকে পাবার জন্য ব্যগ্র হয় তা নয়—ভগবানেরও তার প্রতি আকর্ষণ পড়েছে ভগবানও ভক্তের সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুল হয়েছেন।

শ্রীগোবিন্দজী উদ্ধবজীকে প্রশ্ন করেছেন—উদ্ধব, সাধক যদি আমাকে ভজে তাহলে আমি তাকে কৃপা করি—তাহলে তো উদ্ধব আমার কৃপা অহৈতুকী হল না—আমার কৃপা তো তাহলে সহৈতুকী হল। উদ্ধবজী বললেন—না, সখে সাধক যে ভজন করে সেটিও তোমার কৃপা। তোমার কৃপা ছাড়া ভজনও হয় না। কাজেই তোমার কৃপা মূলে অহৈতুকীই রইল। তোমার দিকে লোকে এই চোখে তাকাবে কেমন করে? প্রাকৃত জগতে সূর্য্যের দিকেই একক্ষণ তাকান যায় না। সে সূর্য্যের তেজ তোমার তেজ থেকে ধার করা।

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥

গীঃ ১৫।১২

কাজেই তোমার দিকে যে লোকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারে না—এটি খুব সত্য। যেমন এ জগতে সম্রাট যদি সুদরিদ্র প্রজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চান—তাহলে তিনি নিজে এসে বন্ধুত্ব করলে সেই দরিদ্র প্রজা তাঁর সঙ্গে মিশতে পারবে না—সংকোচ হবে। তাই সম্রাট আগে থেকে কিছু উপঢৌকন তাকে পাঠিয়ে দেন—তখন দরিদ্র প্রজার সঙ্গে সম্রাটের বন্ধুত্ব সম্ভব হয়—সহজ হয়। এখানেও তেমনি সম্রাটের সম্রাট কৃষ্ণ ভগবান দরিদ্রের কাছে পতিতের কাছে আগে তার কৃপা উপঢৌকন পাঠান পরে সেই সূত্রে তার সঙ্গে সম্বন্ধ করেন। আর তাছাড়া তাঁর নাম তো দীনবন্ধু, দীননাথ। তিনি দীনেরই বন্ধু—বড়লোকের সঙ্গে তার সম্বন্ধ হয় না। পাণ্ডবজননী বলেছেন—

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥ ভাঃ ১।৮।২৬

ভগবান রুক্মিণীদেবীকেও বলেছেন—

নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে॥

ভাঃ ১০।৬০।১৪

আমরা নিজেরা নিষ্কিঞ্চন এবং নিষ্কিঞ্চনেরই প্রিয়। নিষ্কিঞ্চন পদটি এখানে দুটি অর্থ বুঝাচ্ছে। (১) দরিদ্র (২) প্রাকৃত বস্তু যে গ্রহণ করে না। আর নিষ্কিঞ্চন পদের প্রকৃত অর্থ হল যারা ভগবানের প্রতি অনুরাগে প্রাকৃত বস্তু সব ত্যাগ করেছে। দীনজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার জন্য ভগবান লোলুপ। তাই পতিতের কাছে দীনজনের কাছে লৌকিকতা পাঠান ভগবান—এ লৌকিকতা হল শ্রীভগবানেরই অভিন্ন স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মদ্বারে ভজন উপঢৌকন পাঠান—এই ভজন দ্বারেই ভগবানের সঙ্গে সাধকের বন্ধুত্ব হয়। উদ্ধবজীর বাক্য—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্বন্নাচার্য্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং
ব্যনক্তি ॥ ভাঃ ১১।২৯।৬

এর পরে শ্রীবালগোপাল প্রশ্ন করছেন—আচ্ছা ব্রহ্মন্, আমি কি সূর্য্যাদির মত পরিচ্ছিন্ন? তার উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—না, তুমি পরিচ্ছিন্ন নও—তুমি অনন্ত। অর্থাৎ কাল এবং দেশের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নও। কাল ও দেশ তোমাকে বাঁধতে পারে না। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর প্রমেয় রত্নাবলীতে কারিকায় বলেছেন—তুমি যে কাল ও দেশের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নও তার প্রমাণ হল যুগপৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন কালে ভক্তরা তোমাকে ধ্যানে দর্শন করে। ধ্যানে সিদ্ধি লাভ করলে তুমি ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন কালে যুগপৎ তাদের দর্শন দান কর। তুমি যদি পরিচ্ছিন্ন হতে তাহলে যুগপৎ তোমার দর্শন সম্ভব হত না। তোমার ব্যাপকতা শুধু তোমার সত্তাতে নয় শ্রীমূর্ত্তিতেও তোমার ব্যাপকতা। এইটিই তোমার অচিন্ত্যশক্তির বিলাস। তুমি যে ত্রিসত্য ত্রিকালব্যাপী তার পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ চতুঃশ্লোকী ভাগবতে যে তুমি বললে—অহমেবাসমেবাগ্রে—তুমি সৃষ্টির আগে ছিলে অর্থাৎ অতীতে ছিলে—তুমি সৃষ্টির ভিতরে আছ—অর্থাৎ বর্ত্তমানে আছ—আবার সৃষ্টির

যখন মহাপ্রলয় হবে—তখনও তুমি থাকবে—অর্থাৎ ভবিষ্যতেও থাকবে। অতএব তুমি অতীত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতে তিনকালে থাক—তাই তুমি ত্রিসত্য। ভগবান সর্ব্বব্যাপক—গীতায় ভগবান বললেন—সর্ব্বত্র তাঁর হাত, মুখ, চোখ, চরণ, কাণ, মাথা পাতা আছে। এক কথায় তিনি সর্ব্বব্যাপক।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।

সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ গীঃ ১৩।১৩

কে কখন তাঁর নাম ধরে ডাকবে তাই তিনি সর্ব্বত্র তাঁর কাণ পেতে রেখেছেন। কারণ যে কেউ কৃষ্ণ নাম করুক তার কাছেই ভগবান ঋণী হয়ে পড়েন এবং সে ঋণ তাঁকে শোধ করতে হবে—এইজন্যই তিনি ব্যাকুল হয়ে থাকেন। কে কখন তাঁকে আদর করে কিছু খাওয়াবে তাই তিনি সর্ব্বত্র মুখ পেতে রাখেন। কে কখন তাঁর শ্রীচরণে তুলসী পুষ্প অর্পণ করবে—কে কখন তাঁর চরণে প্রণাম করবে—তাই চরণ পেতে রেখেছেন সর্ব্বত্র।

এখন ব্রহ্মার এ বাক্যে যেন শ্রীবালগোপাল প্রশ্ন করছেন—আচ্ছা ব্রহ্মন্, তুমি যে বিশেষণ আমার দিলে সে তো অন্য যে কোন অবতারেও হতে পারে—তাহলে তাদের মধ্যে আমি কোন্‌টি—অর্থাৎ কতম? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, তুমি তাদের মধ্যে আদ্য। তুমি প্রথম তুমি সর্ব্বকারণকারণম্ কারণ তুমি মূলীভূত অবতারী—সকল অবতারের অবতারী। আদিতে আছেন বলে তিনি আদ্য। তখন শ্রীবালগোপাল প্রশ্ন করলেন তাহলে ব্রহ্মন্ তোমার কথায় পাওয়া গেল—সৃষ্টির প্রথমে আমি তাহলে সৃষ্টির আগে তো আমি নেই—তাহলে আমি কেমন করে নিত্য হলাম?

ব্রহ্মা ভগবানকে যে স্তুতি প্রসঙ্গে চারটি বিশেষণ দিলেন—তুমি পূর্ণ, অজস্রসুখ, অক্ষর আর অমৃত, এর দ্বারা বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় এবং বিনাশ এই চারটিতে নিষেধ করলেন। কারণ তিনি পূর্ণ বলায়, তিনি অনন্ত এটি বুঝাল। অনন্ত যখন তখন দেশ এবং

কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হতে পারেন না বস্তুর দ্বারাও যে পরিচ্ছিন্ন নন—এটিও বুঝাল। আর তিনি যখন অজস্রসুখ তখন তার বিপরিণাম নেই বুঝতে হবে। কারণ বিপরিণাম থাকলে তার অজস্রসুখ হতে পারে না। অজস্রসুখ যখন তখন তার সুখের বিরতি নেই। তিনি অক্ষর যখন তখন তাঁর অপক্ষয় তো নেইই। ক্ষর অর্থাৎ ক্ষয়রহিত। আর তিনি অমৃত—অর্থাৎ মৃত্যু বিনাশ রহিত। তাঁর বিনাশ নেই। শ্রীবৈষ্ণবতোষণীকার বললেন—অজস্রসুখ তিনি অর্থাৎ নিত্যানন্দৈকরূপ—সর্ব্বদা আনন্দঘনস্বরূপ। কেবলানুভবানন্দস্বরূপ—তাঁর স্বরূপে দুঃখের লেশ নেই। নিরঞ্জন অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন। তিনি অদ্বয় অর্থাৎ দ্বিতীয় রহিত। তাঁর দ্বিতীয় কেউ নেই। শ্রুতি বলেছেন—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

তিনি মুক্ত উপাধিতঃ—অর্থাৎ কোন উপাধি (দ্বিতীয় বস্তু) তাকে স্পর্শ করে না। শ্রুতি বলেছেন সাক্ষাৎ প্রকৃতিপর—প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ার পরপারে তাঁর অবস্থান। মায়ার কোন জিনিষ তিনি স্পর্শ করেন না। অমৃত স্বরূপ তিনি—কারণ তাঁর কাছ থেকেই একমাত্র মৃত্যু ভয় পায়। শ্রুতি বললেন—গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি। মৃত্যু ভয় পায় এমন স্বরূপ গোবিন্দ ছাড়া আর দ্বিতীয় নেই। দেবকী মাও বলেছেন—

মর্ত্ত্যো মৃত্যুব্যালভীতঃ পলায়ন্, লোকান্ সর্ব্বান্ নির্ভয়ং নাধ্যগচ্ছৎ।
ভাঃ ১০।৩।২৭

মানুষ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে পুণ্য অর্জ্জন করে অন্য অন্য লোকে পালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ভয় নিবারণ তাদের হচ্ছে না—একমাত্র গোবিন্দ চরণাশ্রয় ছাড়া ভয় নিবারণের আর কোন পথ নেই।

ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালের স্তুতি প্রসঙ্গে বললেন, প্রভু, তুমিই একমাত্র অক্ষয়। ধূলিকণিকা থেকে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সব জড়বস্তু

এবং কীটাণু থেকে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বজীব কেউ সুস্থির নয়। সকলেরই যথাকালে উৎপত্তি এবং বিনাশ হয়ে থাকে—কিন্তু তোমার কোন বিনাশ নেই। সুতরাং তোমার উৎপত্তিও নেই।

কত চতুরানন মরি মরি যাওত তুয়া নাহি আদি অবসান।
তোঁহে জনমি পুন তোঁহে সমাওত সাগর লহরী সমানা॥
(বিদ্যাপতি)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বাক্যেও ভগবান নিজে তাঁর অক্ষর স্বরূপের পরিচয় দিলেন।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। গীঃ ১৫।১৮

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ—এই শ্রুতিবাক্যেও জানা যায় যে ভগবানই একমাত্র আনন্দস্বরূপ। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু তুমি ছাড়া আর যা কিছু সবই দুঃখপূর্ণ কেবল তুমিই অজস্রসুখ। প্রহ্লাদজী বলেছেন—

দুঃখৌষধং তদপি দুঃখমতদ্ধিয়াহং ভূমন্ ভ্রমামি বদ মে তব
দাস্যযোগম্। ভাঃ ৭।৯।১৭

কারণ সুখের লক্ষণ শ্রুতি করেছেন—ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি। ভূমাতেই সুখ অল্পে সুখ নেই। কাজেই এ জগতে তো কোনকিছু ভূমা নেই সবই অল্প তাই সুখ হবে কি করে? সুখের লক্ষণই তো মিলবে না। প্রভু তুমি ছাড়া আর সব অপূর্ণ। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অভাব আছে। এই অপূর্ণ জগতে তুমিই একমাত্র পূর্ণ। কারণ শ্রুতি বলেছেন—

ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে—এই বাক্যে দেখা গেল ভগবানের সমান বা তার থেকে অধিক কেউ নেই সুতরাং তুমি হলে অদ্বয়।

একস্ত্বমাত্মা এই শ্লোকে ব্রহ্মা এইভাবে শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রদর্শন করলেন। এর পরে ব্রহ্মা বলছেন—

এবম্বিধং ত্বাং সকলাত্মনামপি স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে।
গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষৎ সুচক্ষুষা যে তে তরন্তীব ভবানৃতাম্বুধিম্॥
ভাঃ ১০।১৪।২৪

ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবন্, যে অর্থাৎ ভাগাবান জন—এ ভাগ্যের পরিচয় কি—শ্রীগুরুকৃপায় যাদের প্রেমনেত্রের বিকাশ হয়েছে—সেই ভাগ্যবান গুরুই অর্ক অর্থাৎ সূর্য্যের মত তমো—মায়ার অন্ধকার নাশ করেন—শাস্ত্র অধ্যয়ন ছাড়াও শ্রীগুরুদেব কৃপা করলে সেই জ্ঞান দিতে পারেন—যে জ্ঞানে অজ্ঞান আঁধার দূর হবে। এ জ্ঞান কোন জ্ঞান ? এ জ্ঞান হল আত্মতত্ত্বজ্ঞান—ভগবজ্‌জ্ঞান এর নামই প্রেম—এই প্রেমের অঞ্জন যাঁর নয়নে লেগেছে শ্রীগুরুকৃপায় তার প্রাকৃত বিদ্যার অপেক্ষা থাকে না—এই দৃষ্টি যার আছে—তার চক্ষুকেই ব্রহ্মা বলছেন সুচক্ষু। অর্থাৎ এ জ্ঞান হল পরমার্থজ্ঞান। এই প্রেমভরা দৃষ্টি দিয়ে ভগবান যত যত অবতারেই প্রকাশিত হন—সকলকে যখন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ মনোনয়নাহ্লাদকরূপে দর্শন যে করতে পারবে তারই দর্শনের সার্থকতা। তা না হলে ভগবান জগতের জীবকে অনুগ্রহ করবার জন্য নানা মূর্ত্তিতে মৎস্য কূর্ম প্রভৃতি দেহে আবির্ভূত হয়ে নানাপ্রকার লীলা প্রকাশ করেন—কিন্তু আমরা অজ্ঞ জীব তাঁর স্বরূপ না বুঝে সেই লীলা এবং বিগ্রহ সম্বন্ধে নানারকম ভ্রান্ত ধারণা করে থাকি—কিন্তু তোমার প্রকৃত স্বরূপ অনুভব শুষ্ক তর্কের গোচর নয়। কারণ শ্রুতি বলেছেন—নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়া—তর্কের দ্বারা কখনও ভগবানের তত্ত্ববোধ হয় না। কিন্তু কঠোপনিষদ বললেন—

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।

তিনি যাকে বরণ করেন সেই তাকে পায়। এ বরণ কিসের বরণ ? এ হল কৃপার বরণ। ব্রহ্মাও তাই বললেন—শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতির ফলে তাঁর কৃপায় যারা সেই প্রেমনেত্র পায় সেই দৃষ্টিতে সুচক্ষু অর্থাৎ ভক্তিচক্ষুতে ভগবানের তত্ত্বের অনুভব হয়। অনাদি কাল থেকে জীব ভগবানের পাদপদ্মে বিমুখ হয়ে সংসার সুখে মজে আছে। শুদ্ধ চিৎ কণা আনন্দের কণা এই জীবাত্মার তো দেহধারণ ছিল না—সুতরাং দেহত্যাগও ছিল না। এই দেহধারণ এবং

দেহত্যাগ এর নামই তো সংসার। জীবাত্মার এই সংসার ছিল না—সুতরাং তার ক্ষুধা পিপাসা, জন্ম, মৃত্যু রোগ শোক ভয় মোহ কিছু ছিল না—কোন সংসার যাতনা ছিল না। আমরা যে দুঃখের আবর্ত্তে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি এর কারণ কি? এর কারণ হল ভগবানের পাদপদ্ম ভুলে যাওয়া—সেইটিই জীবের বড় অপরাধ—এই অপরাধের ফলেই মায়া পিশাচী জীবকে আক্রমণ করেছে—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ॥

আরও বলেছেন—

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।
তে কারণে মায়া পিশাচী তার গলায় বাঁধিল॥

প্রথমে যোগীন্দ্র শ্রীকবি ত্রেতাযুগে মহারাজ নিমির সভায় বসে বললেন—ঈশাদপেতস্য—ঈশ অর্থাৎ পরমেশ্বরকে ভুলে যাওয়ার ফলে তাঁর পাদপদ্ম থেকে সরে আসার ফলে জীবের প্রতি মায়ার আক্রমণ এবং তার এই সংসার যাতনা। এখন প্রশ্ন হতে পারে—মায়া ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি—তার এমন সাহস হল কি করে যে সে জীবকে আক্রমণ করে এই যন্ত্রণা দিল? তার সমাধান মহাজন করেছেন—অপরাধ করলেই দণ্ড পেতে হয়। জীবও অপরাধ করেছে। সে প্রভুকে ভুলে গেছে। ভগবানের নিত্য দাস জীব। দাস যদি প্রভুকে ভুলে যায় তাহলে এর থেকে বড় অপরাধ আর নেই। জীব সেই অপরাধে অপরাধী। মায়া সেই অপরাধের সুযোগ নিয়ে জীবকে আক্রমণ করল এবং শাস্তি দিল। তাহলেও মায়া তো শক্তি সুতরাং দাসী—দাসী হয়ে সে জীবকে দণ্ড দেয় কি করে—দাস দাসী তো নিজের স্বাতন্ত্র্যে কাজ করতে পারে না। না, নিজের স্বাতন্ত্র্যে মায়া জীবকে দণ্ড দেয় নি। ভগবানের আদেশেই দিয়েছে। ভগবান মায়াকে জীবকে দণ্ড দেবার আদেশ দিলেন? হ্যাঁ দিলেন—বড় আশা করে। জীব

দুঃখ পেলে হয়ত ভগবানকে মনে করবে। সুখের মধ্যে ভগবানকে মনে নাও পড়তে পারে কিন্তু দুঃখ পেলে ভগবানকে মনে করে না— এমন লোক কম আছে। তাই শ্রীতুলসীদাসজী বলেছেন—সুখমে পড়ুক বাজ, দুখমে বলিহারি যাই।

তাই ভগবান মায়াকে আদেশ দিলেন, মায়া, জীব তো আমাকে ভুলে বসে আছে—তাকে একটু আধটু শাস্তি দাও—যাতে তার আমার পাদপদ্ম মনে পড়ে। মায়া তো আগে থেকেই তৈরী—তবে দাসী বলে নিজের স্বাতন্ত্রে জীবকে শাস্তি দিতে পারছিল না—এখন যখন অনুমতি পেয়ে গেল—তখন তো আর কোন বাধা নেই। তবে একটু আধটু শাস্তি দেবার কথা ছিল কিন্তু মায়া—ক্রোধের বশে জীবকে দণ্ডের পরিমাণ বেশ বেশী করেই দিয়েছে—অর্থাৎ আদেশের অতিরিক্ত কাজ করেছে—এতে মায়ার উপর দোষারোপ হতে পারে—সেটি শ্রীজীব গোস্বামিপাদ মায়াকে রক্ষা করলেন—ক্রোধের বশে এরকম হয়। শ্রীজীবপাদ বললেন—জীবানামনাদি ভগবদ্ বৈমুখ্যমসহমানা —জীবের এই অনাদিকাল থেকে ভগবানের পাদপদ্মে বিমুখতা মায়া সহ্য করতে পারে নি—তাই ক্রোধের বশে দণ্ডের মাত্রা বেশী হয়ে গেছে। যোগীন্দ্র বললেন—মায়া জীবকে দুটি কড়া চাবুক দিয়েছে —(১) অস্মৃতি (২) বিপর্য্যয়। জীব গোবিন্দকে ভুলেছে কিন্তু নিজেকে ভোলে নি। জীবের মনে আছে সে নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বরূপ। সে নিত্য কৃষ্ণদাস—এটি ভুলে গেছে কিন্তু তার যে জন্ম মৃত্যু নেই সে যে নিত্যস্বরূপ এটি তার মনে আছে—আরও মনে আছে সে শুদ্ধ অর্থাৎ অপাপবিদ্ধ—মায়ার স্পর্শ তার নেই সে বুদ্ধ চেতন স্বরূপ তার অজ্ঞানতা নেই—আর সে মুক্ত অর্থাৎ উপাধি হতে মুক্ত। উপাধি বলতে দ্বিতীয় বস্তুকে বুঝায়। আত্মা থেকে অতিরিক্ত বস্তুর নাম দ্বিতীয় বস্তু। অর্থাৎ তার দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি কিছু নেই। এই যে জীব নিজেকে জানে সে নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ —এর নাম স্বরূপজ্ঞান, বা আত্মস্মৃতি। কিন্তু মায়া জীবকে আক্রমণ

করে প্রথম চাবুক দিল—তার স্বরূপজ্ঞান ভুলিয়ে দিল—জীব ভুলে গেল যে সে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ। মায়া বুদ্ধিমতী—মায়া জানে জীবের যদি স্বরূপস্মৃতি থাকে তাহলে সে আমার কবলিত হবে না। এর থেকে প্রমাণিত হল যে আত্মজ্ঞান মায়াকে ঠেকাতে পারল না। আত্মজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও জীব মায়াকবলিত হল। কারণ মায়া একমাত্র কৃষ্ণজ্ঞান ছাড়া—ভগবজ্‌জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন জ্ঞানের খাতির রাখে না। এর উপরে মায়া জীবকে আর একটি চাবুক দিয়েছে—যার নাম দিয়েছেন যোগীন্দ্র বিপর্য্যয়—অর্থাৎ মায়ার (ত্রিগুণাত্মিকা মায়া) তিনগুণ সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণ দিয়ে যে দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি তৈরী করে রেখেছে তা জীবকে গছিয়ে দিল—শুদ্ধ গছিয়ে দিল তাই নয়—দেহকে আমি বুদ্ধি করিয়ে দিল আর দৈহিক বস্তুতে আমার বুদ্ধি করিয়ে দিল। জীব দেহকে আমি বলে গ্রহণ করল সুতরাং দৈহিক বস্তুকে ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি, স্ত্রী পুত্র, আত্মীয়-স্বজন ঘরবাড়ী টাকা-কড়ি জমিজমা এসবকে আমার বলে গ্রহণ করল—এই আমি এবং আমার বোধ—এর নামই সংসার। মায়ার বাহাদুরি আছে। মায়ার তৈরী যা কিছু দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সবই তো জড় অর্থাৎ অচেতন। কিন্তু জীবাত্মা তো চেতন সে অচেতন দেহকে আমি বলে নিল—আমরা তো দেহকেই আমি বলে জানি। এটি মায়া ঘটিয়েছে। এই আমি আমার বোধ যার নেই সেই মুক্ত পুরুষ। মহাজন বললেন—

দেহস্মৃতি নাই যার সংসার কূপ কাঁহা তার।

দেহ দৈহিক বোধ—এর নামই সংসার। স্ত্রী পুত্র নিয়ে বসবাস এর নাম সংসার নয়। এখন এই সংসার থেকে নিষ্কৃতি পাবার কি উপায়? জীব কি এই যাতনা ভোগ করবে বরাবর? শাস্ত্র সিদ্ধান্ত করলেন—অচ্যুতের পাদপদ্ম উপাসনা না করা পর্য্যন্ত অর্থাৎ গোবিন্দ ভজন ছাড়া এ মায়াতরণের অন্য কোন পথ নেই। মায়াকে ভজনা করলেও মায়া ছাড়বে না—আত্মজ্ঞান অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞান জীবনিত্য

শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ এ বোধ ফিরে পেলেও মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি হবে না। কারণ জীবকে মায়া যখন আক্রমণ করেছে তখন তো জীবের আত্মজ্ঞান ছিল তাতে কিন্তু মায়ার আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। তাই অন্য কোন উপায়ে মায়া ছাড়বে না। একমাত্র গোবিন্দ পাদপদ্মে শরণাগতি ছাড়া মায়ার যন্ত্রণা অর্থাৎ সংসার থেকে নিষ্কৃতির অন্য কোন পথ নেই। কারণ নিদান ধরে তো চিকিৎসা করতে হবে। সুচিকিৎসক রোগের মূল ধরে চিকিৎসা করেন। শাস্ত্র তো চিকিৎসক—তাই মূল ধরে চিকিৎসার কথা বলেছেন। মায়ারোগের মূল কারণ হল ভগবানে বিমুখতা—সুতরাং ভগবানে উন্মুখতা হবে এর চিকিৎসা। ভগবানকে ভুলে যদি জীবের এত কষ্ট হয় তাহলে ভগবানকে মনে করলে আর কোন কষ্ট নেই। ভগবান গীতাবাক্যেও বললেন---

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীঃ ৭।১৪

অর্জুন, আমার পাদপদ্মে যে একান্তভাবে শরণাগতি নিতে পারে সেই মায়ার যন্ত্রণা হতে অনায়াসে নিষ্কৃতি পেতে পারে। এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা বললেন—তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। তাঁকে জানা ছাড়া অতিমৃত্যু অর্থাৎ জন্মমৃত্যুকে অতিক্রম করবার আর কোন পথ নেই। আলো জ্বালা ছাড়া যেমন অন্ধকার দূর করার অন্য কোন উপায় নেই। যোগীন্দ্রও বিধান দিলেন—

তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তম্ ভক্ত্যৈকয়েশং গুরু দেবতাত্মা।

ভাঃ ১১।২।৩৭

একাভক্তির দ্বারা অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তির দ্বারা ভগবানের আরাধনা করলে তবে মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি। এখন এই ভক্তির সন্ধান কোথায় পাবে? যোগীন্দ্র বললেন শ্রীগুরুদেবকে দেবতা অর্থাৎ ভগবৎবুদ্ধি এবং আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ প্রেষ্ঠ প্রিয়তম বুদ্ধি করতে পারলে তিনি কৃপা করে এই শুদ্ধা ভক্তি দিতে পারেন। ব্রহ্মা এখানে

ভগবানের স্তুতি প্রসঙ্গে সেই সিদ্ধান্তই করলেন—গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষদ্ সুচক্ষুষা—গুরুপাদপদ্মের দেওয়া প্রেমভরা নয়নে ভগবানের তত্ত্ব বোধ হবে। এ ছাড়া অন্য পথ নেই। কারণ গুরুস্বরূপের লক্ষণই তো তাই।

শ্রীভগবানই গুরুরূপে এ জগতে এসে জীবকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেন—যার ফলে জীবের ভগবানের প্রতি উন্মুখতা জাগে এবং তত্ত্ববোধ হয়। তা না হলে জীব তো ভগবানকে ভুলেই বসে আছে। তাই বলা আছে—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাই স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
কৃপায় করিল কৃষ্ণ বেদপুরাণ॥
শাস্ত্রগুরু আত্মারূপে আপনা জানান।
কৃষ্ণ মোর প্রভু এতো এই হয় জ্ঞান॥

সেইজন্য গুরুস্বরূপে প্রণাম মন্ত্রে বলা হয়েছে—

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

যিনি কৃপা করে সর্ব্বভাবে পরিপূর্ণ ও সর্ব্বব্যাপী পরমানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপ জানিয়ে দেন তিনিই গুরুপদবাচ্য—আমি তাঁর চরণে প্রণাম করি।

গুকারস্ত্বন্ধকারঃ স্যাৎ রুকারস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥ (তন্ত্রবচন)

'গু' শব্দের অর্থ হল অন্ধকার আর 'রু' শব্দের অর্থ হল তা নিবারণ করা। যিনি শাস্ত্র ও সাধনোপদেশ দ্বারা জীবের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করে ভগবানের স্বরূপ অনুভব করান তাঁকেই গুরু বলে অভিহিত করা হয়।

শ্রীগুরুকৃপাবলে শ্রীগুরুকৃপাশ্রিত ব্যক্তি এই মোহান্ধকার সংসার সাগর অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারে। তখন তার কাছে আর ভব (সংসার) সাগর থাকে না—সংসার তখন তার কাছে গোবৎসপদ হয়ে

যায়। সাগরে উত্তাল তরঙ্গ—তাই পার হওয়া কঠিন—তেমনি সংসার সাগরে বাসনা তরঙ্গ—তার একটা তরঙ্গ জীবনে পার হওয়া যায় না—এর ওপরে আবার কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য হাঙর মকর কুমীরের মত মুখ ব্যাদান করে আছে তাদের গ্রাসের মধ্যে আমরা পড়ে যাই। কিন্তু শ্রীগুরুকৃপায় ভজনের ফলে যখন সেই সাগর গোবৎসপদ হয়ে যায় তখন ভক্ত তা অনায়াসে পার হয়ে যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভেলা (পোত) অবলম্বনে ভক্ত সাগর পার হয়। কিন্তু সাগর যদি গোবৎসপদ হয়ে যায় তাহলে তো তা পার হতে আর ভেলার (পোতের) দরকার হয় না—তখন মহাজন বলছেন—ভক্তগণ তখন সেই ভেলাকে এ পারে রেখে তারা নিজেরা অনায়াসে সংসার পার হয়ে যান। ভেলাকে এ পারে রেখে যাওয়ার অর্থ বলেছেন—ঐ ভক্ত সাধু বৈষ্ণবগণ জগতে ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করে যান যাতে সেই শাস্ত্র অবলম্বন করে পরবর্ত্তীকালে যারা আসবে তারাও অনায়াসে সংসার সাগর পার হয়ে যেতে পারে।

শ্রীযোগীন্দ্রও (কবি) তাই বললেন—শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ভগবৎ-বুদ্ধি এবং প্রিয়তম বুদ্ধি করতে পারলে তাঁর কৃপায় শুদ্ধা ভক্তি (একাভক্তি) লাভ হলে এই একাভক্তি বলতে বুঝান হয়েছে যে ভক্তিতে ধর্ম অর্থ, কাম কোন বাসনা তো থাকবেই না এমনকি মুক্তি বাসনা পর্য্যন্ত থাকবে না—মুক্তিবাসনানির্মুক্তা যে ভক্তি তার নামই একাভক্তি এই একাভক্তি দিয়ে ভগবানের আরাধনা করলে তবে মায়ার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে।

এর পরে ব্রহ্মা বলছেন—

আত্মানমেবাত্মতয়াবিজানতাং তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা॥

ভাঃ ১০।১৪।২৫

ব্রহ্মা বলছেন,—প্রভু জীব এমনই মোহঘোরে আছে যে সে তোমাকে জানতে পারে না। একমাত্র তোমার জ্ঞান হলে এই

অজ্ঞানতা যায়। তা না হলে অন্য কোন উপায়ে এই অজ্ঞানতা দূর হয় না। আলো ছাড়া যেমন অন্ধকার অন্য কিছু দিয়ে দূর করা যায় না।

যতক্ষণ জীবের তোমার স্বরূপ জ্ঞান না হয় ততক্ষণ তার এই সংসার—প্রভু তোমার করুণার অন্ত নেই। জীবকে তোমার স্বরূপ তোমার তত্ত্ব জানাবার জন্য কতরূপে তুমি নিজেকে প্রকাশ করে রেখেছ এ জগতে। শাস্ত্ররূপে, গুরুরূপে, অন্তর্য্যামিরূপে তুমি নিজেকে প্রকাশ করে রেখেছ—যাতে জীব তোমার স্বরূপ, তোমার তত্ত্ব জানতে পারে। কিন্তু হায় জীবের এত দুর্ভাগ্য কিছুতেই তার বোধ হয় না। অজানা মোহের ফলেই শাস্ত্রভ্রমে অশাস্ত্রের কবলে পড়ে এবং গুরুভ্রমে মহাশত্রুর কুক্ষীগত হয়ে তোমার স্বরূপ জ্ঞান হতে বহুদূরে চলে যায়।

জীব এইভাবে নানা দুর্দৈবের ঝঞ্ঝাবাতে মোহগর্ত্তে পড়ে তোমার পাদপদ্ম ছেড়ে দূরে সরে যায়—প্রভু, তুমিই যে সকল আত্মার আত্মা, সকলের মূল ভগবান্ গীতাবাক্যে বললেন—

ঊর্দ্ধ্বমূলমধঃশাখম্‌শ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। গীঃ ১৫।১

আমি হলাম সকলের মূল—আর ব্রহ্মাদি দেবতা—সব শাখা-প্রশাখা তারা সব আমার নীচে। তাই মূলে জলসেক করলে সব শাখাপ্রশাখা প্রফুল্লিত হবে। গোবিন্দ ভজলে সব দেবতা সন্তুষ্ট। শ্রীশুকদেব বলেছেন—

যথাতরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।

ভাঃ ৪।৩১।১৪

কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব তোমার প্রকৃততত্ত্বের সন্ধান না পেয়ে নানাভাবে কুধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তোমার পাদপদ্ম থেকে দূরে সরে যায়। তখন তোমার সেবা ছেড়ে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন বিষয় বৈভব দেহগেহাদির সেবায় মত্ত হয়ে থাকে। আবার সর্ব্বজীবই ভগবান এই বুদ্ধিতে জীবসেবাই ভগবানের সেবা—সুতরাং আর আলাদা করে

ভগবানের সেবার দরকার নেই এই বুদ্ধি করেও তোমার সেবা থেকে দূরে সরে যায়। আবার কেউ বা বলে গুরুই ভগবান—কারণ শাস্ত্রে আছে—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুদেবই ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু তিনিই মহেশ্বর—তত্ত্বে অবশ্য তাই—কারণ ভগবান একক—তিনিই যখন রজঃ গুণকে অবলম্বন করে সৃষ্টি কাজ করেন তখন তিনি ব্রহ্মা, যখন তমঃগুণকে অবলম্বন করে সংহার কাজ করেন তখন তিনিই মহেশ্বর বা রুদ্র। আর ভগবান তো সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত আছেনই—তিনি সত্ত্বগুণে পালন কাজ করেন—তিনি বিষ্ণু। ব্রহ্মসূত্রে বলা হল 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—জন্ম অর্থাৎ সৃষ্টি এবং আদিপদের দ্বারা স্থিতি এবং লয়—যার থেকে তিনিই ব্রহ্ম। ভগবানই এ জগতে শ্রীগুরুরূপে আবির্ভূত হন।

শাস্ত্র প্রমাণ ভগবানের বাক্য—উদ্ধবজীর কাছে—আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ—আচার্য্য অর্থাৎ শ্রীগুরুস্বরূপকে আমি বলে জানবে উদ্ধব—গোবিন্দজী বললেন। মহাজন শ্রীসনাতন দাস শ্রীগুরুবন্দনায় বললেন—জীবের নিস্তার লাগি নন্দসুত হরি। ভুবনে প্রকাশ হন শ্রীগুরুরূপ ধরি। আবার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁর শ্রীশ্রীগুরুদেবাষ্টকে বললেন—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্ত

স্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।

শ্রীগুরুস্বরূপ সাক্ষাৎ হরি এ সকল শাস্ত্রেরই মত এবং মহাজনও এইভাবেই ভাবনা করেন।

শ্রীগুরুস্বরূপ তাহলে দেখা যাচ্ছে শ্রীগোবিন্দের অভিন্ন প্রকাশ। এ তত্ত্ব তো আছেই। কিন্তু আর একটি দিক্ আছে। শ্রীগুরুস্বরূপের উপাসনায় কিন্তু তাঁকে ভগবৎবোধে উপাসনা করা চলবে না। তাঁকে ভক্তভাবে আরাধনা করতে হবে। তাই উপাসনারদিক দেখিয়ে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বললেন—

কিন্তু প্রভোর্যপ্রিয় এব তস্য।

বন্দে গুরোশ্রীশচরণারবিন্দম্ ॥

তাঁকে প্রভুর প্রিয় অর্থাৎ ভক্ত হিসাবে আরাধনা করতে হবে। ভগবান শ্রীগোবিন্দই গুরুস্বরূপে আসেন। কিন্তু ভক্তভাব অঙ্গীকার করে আসেন। ভগবৎস্বরূপে এলে তিনি ভজন করতে পারেন না—আর ভজন নিজে না করলে অপরকে ভজন উপদেশ করতে পারেন না। কারণ নিজে ভজন না করলে ভজন উপদেশ করা যায় না। কারণ আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শেখান। আপনি না করিলে ধর্ম শেখান না যায়। ভগবান তো ভজন করতে পারেন না—কারণ ভজন করতে হলে তাঁর একজন ভজনীয় থাকতে হবে। কৃষ্ণের তো কেউ ভজনীয় নেই তিনিই সকলের ভজনীয়। তাই নন্দনন্দন শ্রীগুরুস্বরূপে আসেন ভক্তভাব অঙ্গীকার করে। সুতরাং শ্রীগুরুদেবের আরাধনার নিয়ম হল ভক্তভাবে।

তাই ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু তুমিই যে ভজনীয়—এটি অজ্ঞতায় জীব অনেকে বোঝে না—তারা গুরুভজনা করে মনে করে গুরুসেবাই ভগবৎসেবা—গুরুসেবা ছাড়া আর আলাদা করে ভগবৎসেবার দরকার নেই। কিন্তু এটি তাদের অজ্ঞতা। জগতে কত রকমের অজ্ঞতা আছে। আবার কেউ বা মনে করে 'অয়মাত্মাব্রহ্ম'—এই শাস্ত্রবাক্য থেকে মনে করে আত্মাই ভগবান্—এ ছাড়া আর পৃথক্ ভগবান নেই। সুতরাং আত্মজ্ঞানই ভগবজ্‌জ্ঞান। কিন্তু প্রকৃত অর্থ তা নয়। কারণ আত্মজ্ঞান বা স্বরূপস্মৃতি—আমি নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বরূপ এই আত্মজ্ঞান তো জীবের মায়া আক্রমণের আগেও ছিল—ঐ আত্মজ্ঞান থাকা অবস্থাতেই তো মায়া জীবকে আক্রমণ করেছে—করে তার আত্মজ্ঞান ভুলিয়ে দিল—এবং দেহ দৈহিক বস্তু দিয়ে তাতে 'আমি' এবং 'আমার' বুদ্ধি করিয়ে দিয়ে তাকে ভালকরে বাঁধল এর নামই তো সংসার। আত্মজ্ঞান যদি ভগবজ্‌জ্ঞান হত তাহলে ভগবানের জ্ঞানের কাছে কি মায়া স্পর্শ করতে পারে? কারণ

ভগবানের কাছে মায়া ঘেঁসে না। বলা আছে—তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্পর্ক। তাই আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে জানলে আত্মজ্ঞানে মায়া ছাড়বে না—ভগবানকে জানলে তবে মায়া ছাড়বে। কিন্তু অজ্ঞ জীব তা বোঝে না—তাই এইভাবে মোহে পড়ে জীব সকল আত্মার আত্মা যে তুমি সেটি বোঝে না—সর্ব্বসেব্য যে তুমি এটি না বুঝে সংসার সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খায়। তোমার স্বরূপ যারা বোঝে না প্রভু তাদেরই নানাবিধ সংসার দুঃখ ভোগ করতে হয়। কিন্তু যারা তোমার কৃপায় শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশে তোমার তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে তাদের আর কোন সংসার দুঃখ ভোগ করতে হয় না।

ব্রহ্মা একটি উপমা দিয়ে বলছেন—প্রভু, যেমন এ জগতে দেখা যায় যারা অন্ধকারে রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রান্ত ধারণা করে তারা রজ্জুতেই সর্পের ফণা, গর্জ্জন কত কিছুই অনুভব করে আবার তাতে ভয় পেয়ে পলায়—আবার পালাতে গিয়ে হয়ত পড়েও যায়—পড়ে গিয়ে হাত পাও হয়ত ভাঙ্গে—তাতে যন্ত্রণাও ভোগ করে। কিন্তু যদি রজ্জুকে সর্প বলে ধারণা না হয় তাহলে তাকে সর্পের ফণাও দেখতে হয় না—গর্জ্জনও শুনতে হয় না—তাই ভয়ে পালাতেও হয় না। দুঃখও ভোগ করতে হয় না।

সেইরকম যারা প্রভু তোমাকে সকল আত্মার আত্মা বলে না বুঝে কোনরকম ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে পড়ে তারাই এই মায়ার মোহে পড়ে আর তাদের কাছে মায়াও নানারকম সংসারের ছবি এঁকে নানাভাবে তাদের দুঃখ দেয়। এ সংসার যাতনা ভোগের মূলে তাই একটি মাত্র কারণ ভগবৎ বিস্মৃতি। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
সে কারণে মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

তোমায় ভুলে তোমার আরাধনা না করে যত কিছু প্রাকৃত পুণ্য করুক না কেন তাতে মায়ার দন্ডের হাত থেকে রেহাই পায় না। যাগ যজ্ঞ বার ব্রত তপস্যা যত পুণ্যকাজই করুক তাতে ঊর্দ্ধলোকে স্বর্গাদি লোকে গতি হতে পারে—কিন্তু তাতে জন্মমৃত্যু কবলিত অবস্থার হাত হতে নিষ্কৃতি পায় না। জন্ম মৃত্যু তার বাঁধা হয়ে রইল—এর নামই তো বন্ধন। এর নামই তো সংসার। ঊর্দ্ধলোকে গতি স্বর্গে যাক আর ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার আসনই পাক তাতে মায়া ছাড়ছে না—তাকে আবার পুণ্য শেষ হলেই মর্ত্তলোকে ফিরে আসতে হবে। ভগবানের বাক্য প্রমাণ—

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। গীঃ ৯।২১

আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন। গীঃ ৮।১৬

এতে বন্ধন এড়ান যাচ্ছে না—আর পাপের ফলে অধোগতি—সেটি যে বন্ধন তা বুঝা যায়—কিন্তু পুণ্যকাজ যে বন্ধন তা আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু পাপ পুণ্য দুই বন্ধন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ আমার শ্রীগুরুমহারাজ উপমা দিয়েছেন—স্বর্ণশৃঙ্খল আর লৌহশৃঙ্খল। সোনার শিকল আর লোহার শিকল যাই হোক—দুইই তো বন্ধন। শিকল সোনা দিয়ে গড়া হলেও সে বন্ধনের কাজই করছে। তাই বলা আছে—পাপ পুণ্য দুটিকেই ত্যাগ করতে হবে।

পাপপুণ্য দুই পরিহরি।

পাপ না করিও মন অধম সে পাপীজন
তারে মুই দূরে পরিহরি
পুণ্য যে সুখের ধাম তার না লইও নাম
পুণ্য মুক্তি দুই ত্যাগ করি।

তাহলে জীবের কর্ত্তব্য কি? শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশায় বললেন—

প্রেমভক্তি সুধানিধি তাহে ডুব নিরবধি
আর যত ক্ষারনিধি প্রায়।

ব্রহ্মা তাই কাতরে নিবেদন করছেন—প্রভু তোমার স্বরূপজ্ঞানে বঞ্চিত দুর্ভাগা জীব যদি কখনও তোমার শ্রীচরণাশ্রিত ভক্তচূড়ামণি-গণের সঙ্গলাভ করতে পারে তাহলে তাঁরা তোমার নাম রূপ গুণ লীলা কথা শ্রবণ কীর্তন করে তোমার চরণ ভজনা করে তোমার তত্ত্ব জানতে পারে তোমার কৃপায় তারা এই সংসার দুঃখ সাগর অনায়াসে পার হয়ে যায়।

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

এর পরে ব্রহ্মা স্তুতি প্রসঙ্গে আর একটি মন্ত্র বলছেন—

অজ্ঞানসংজ্ঞৌ ভববন্ধমোক্ষৌ দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।
অজস্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে বিচার্য্যমাণে তরণাবিবাহনী॥

ভাঃ ১০।১৪।২৬

এখানে ব্রহ্মা ভগবানের কৃপায় তাঁর তত্ত্ব অনুভব করে জীবের অজ্ঞানতার স্বরূপটি বলছেন। প্রভু, মানুষ এ জগতে সংসার বন্ধনের হাত হতে নিস্কৃতি পাবার জন্য মুক্তি প্রার্থনা করে। কিন্তু জীবের এই বন্ধন এবং মুক্তি দুটিই অজ্ঞানেরই রূপান্তর। বন্ধন এবং মুক্তি দুই অজ্ঞানতা। সূর্য্যে যেমন দিনও নেই রাত্রিও নেই সেইরকম দেহাতীত স্বপ্রকাশ শুদ্ধ জীবস্বরূপেও সংসারবন্ধন কিংবা সংসার মুক্তি—এই দুটির কোনটিই নেই।

অনাদিকালের মায়ামোহে পড়ে জীব তোমার প্রকৃতস্বরূপ জানে না প্রভু। সর্ব্বেশ্বররূপে তোমাকে জেনে যদি নিজেকে তোমার দাস বলে অনুভব করতে পারে তাহলেই কাজ হয়ে গেল। কিন্তু অজ্ঞতাবশত তা করে না। জীব নিজেকে তোমার দাস বলে মনে না করে স্বতন্ত্ররূপে নিজেকে ধারণা করে—তার ফলেই তাদের যত যন্ত্রণা। কারণ তুমি নিত্য স্বপ্রকাশ পরমানন্দ স্বরূপ। এ বোধ তাদের নেই তাই তারা ক্ষুদ্র আনন্দের লোভে দেহ দৈহিক বস্তুতে আসক্ত হয়ে নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে—ত্রিবিধ তাপ—সংসারের

—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক আধিভৌতিক—মায়ার লাথি খায় পড়ে পড়ে। যেমন এ জগতে যারা টাটকা মধুর আস্বাদ পায় নি—তারা চিটে গুড়ই খুব মিষ্টি মনে করে। যার গা কখনও পতিতপাবনী সুরধুনীর জলে ডোবে নি—সে খাতোদকে গা ডুবিয়েই আনন্দ পায়—তেমনি চিরসুন্দর অনন্তমাধুর্য্যমণ্ডিত শ্রীগোবিন্দের শ্রীমন্নিত্যানন্দের সন্ধান যারা পায় নি—সে অমৃতের কণা আস্বাদনের সৌভাগ্য যাদের হয় নি তারাই সংসারের এই ক্ষুদ্র আনন্দে লুব্ধ হয় এবং তার থেকে মুক্তি লাভের জন্য নানারকম চেষ্টা করে। প্রকৃতপক্ষে জীবের সংসার বন্ধন এবং তার থেকে মুক্তিলাভ দুইই অজ্ঞানেরই নামান্তর বা রূপান্তর। কারণ যে ব্যক্তি অজ্ঞানে মুগ্ধ তারই সংসার বন্ধন হয় এবং সেই তার থেকে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু প্রভু, তোমার করুণায় যে নিজেকে তোমার অধীন অর্থাৎ তোমার একান্ত দাস বলে বুঝতে পার—তুমি নিয়ামক এবং জীব নিয়ম্য, তুমি প্রভু জীব নিত্য দাস, তুমি যন্ত্রী,, জীব যন্ত্র, তুমি পরম স্বাধীন আর জীব তার অধীন বলে নিজেকে বুঝতে পারে ঠিক ঠিক তাহলে বুঝতে হবে তার আর অজ্ঞানতা নেই। তোমাকে সেব্য এবং নিজেকে সেবক বলে যদি জীব জানতে পারে তাহলে তার আর চিন্তা নেই—তখন তার স্বরূপের অজ্ঞানতার নাশ হয়ে গেছে তাই তার অজ্ঞানকৃত বন্ধনও নেই সুতরাং তার সে বন্ধন থেকে মুক্তিলাভেরও প্রয়োজন বোধ থাকে না—বন্ধনই যদি মূলে না থাকে—তাহলে তার মুক্তি লাভের কোন প্রশ্নই থাকে না। শ্রীল প্রেমানন্দ দাসজী বলেছেন—

দেহস্মৃতি নাই যার সংসার কূপ কাঁহা তার

যার দেহ দৈহিক বোধ নেই—তার আবার সংসার কি—সেই তো মুক্ত পুরুষ।

জগতেও দেখা যায় সূর্য্যের প্রকাশে এবং অপ্রকাশে দিন এবং রাত্রির ব্যবহার হয়ে থাকে। সূর্য্যের প্রকাশে দিন এবং সূর্য্যের অপ্রকাশে রাত্রি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সূর্য্যে দিনও নেই সুতরা রাত্রিও

নেই। সূর্য্যের স্বরূপ বিচার করলে তাতে দিন কিংবা রাত্রির অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয় না। তেমনি জীবও যদি তার দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির অতীত নির্মল নিরাবিল আনন্দস্বরূপ আত্মার বিচার করে দেখে তাহলে তারও অজ্ঞানকৃত সংসার বন্ধন এবং তার থেকে মুক্তি লাভ—এই দুটির একটিরও অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না।

এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতশাস্ত্রে একাদশ স্কন্ধে শ্রীভগবদুদ্ধব সংবাদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

বদ্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ
গুণস্য মায়ামূলত্বান্ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্ ॥
একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদির্বিদ্যয়া চ তথেতরঃ ॥ ভাঃ ১১।১১।১।৪

শ্রীভগবান উদ্ধবজীকে বলছেন—উদ্ধব, প্রকৃতপক্ষে জীবের সংসার বন্ধন বা মোক্ষ দুটির কোনটিই নেই। আমারই ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা শক্তি মায়া থেকেই জীবের এই বন্ধন মোক্ষ (মুক্তি) ঘটে থাকে। বন্ধন এবং মুক্তির মত ব্যবহার বলে মনে হয়। আমারই বিভিন্নাংশ জীবের অনাদিকালের অবিদ্যাবশে সংসারবন্ধন আর অবিদ্যার নিবৃত্তি হলে তার থেকে মুক্তিলাভ হয়ে থাকে। সুতরাং শুদ্ধ জীবের স্বরূপে বন্ধনও নেই সুতরাং মুক্তিও নেই। কেবলমাত্র মায়াবৃত্তি অবিদ্যা এবং বিদ্যাই জীবের বন্ধন এবং মুক্তির হেতু—এ বন্ধন এবং মুক্তি বলে মনে হয়।

শাস্ত্র একটি উপমা দিয়ে এটিকে বুঝিয়েছেন—বিস্মৃতকণ্ঠ-মণিবৎ। কেউ যদি তার কণ্ঠের হার হারিয়ে গেছে মনে করে নানা জায়গায় খুঁজছে এবং তার ফলে হারানোর ব্যথা অনুভব করছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে কারও কাছে শুনল—ওমা, তুমি হার খুঁজছ—হার তো তোমার কণ্ঠে। তখন সে তার নিজের কণ্ঠে হাত দিয়ে দেখে হ্যাঁ তাইত আমার হার তো আমার কণ্ঠেই আছে—তখন তাকে আর হার হারানোর ব্যথা ভোগ করতে হয় না—তাহলে তার হার

হারানোর দুঃখ যেমন নেই—সুতরাং হার পাওয়ার সুখও কিছু নেই। তাহলে হারানোর দুঃখ এবং প্রাপ্তির সুখ—দুটিই মিথ্যা—দুটিরই জন্ম অজ্ঞানতা থেকে। অজ্ঞানতা তো মিথ্যা—তাই এ জগতে সুখ দুঃখ দুটিই মিথ্যা—কারণ দুটিই অজ্ঞানতা প্রসূত। তাই ভক্ত প্রাকৃত সুখ দুঃখ দুটিকেই মিথ্যা বলে জানে বলে দুটিকেই সমান দৃষ্টিতে দেখে। প্রাকৃত সুখে এইজন্য উল্লসিত হয় না—প্রাকৃত দুঃখেও মুহ্যমান হয় না।

ভগবান ভক্তের লক্ষণে তাই বললেন—

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃস্থিতধী মুনিরুচ্যতে ॥ গীঃ ২।৫৬

আরও বলেছেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ ॥ গীঃ ২।৩৮

যাদুকর থলি থেকে টাকা বার করছে—তার একশত টাকা বা হাজার টাকা বুদ্ধিমানের কাছে দুইই সমান—কারণ সে জানে যাদুকরের টাকা সবই মিথ্যা—চোখের ভেলকি—কোনটিই সত্যি নয়।

তাই বহির্মুখ জীবের বহির্মুখতার জন্য অর্থাৎ অবিদ্যার ফলে ভগবজ্‌জ্ঞানের অভাবের ফলে ভগবানের স্বরূপানুভূতি না হওয়ার জন্য এই সংসারবন্ধন এবং সংসারমুক্তি বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে দুটিই অজ্ঞানতা থেকে বোধ হচ্ছে। তাই শুদ্ধ জীব যার স্বরূপানু-ভূতি হয়েছে—জীবের স্বরূপ হয় নিত্যকৃষ্ণদাস—জীব যখন নিজেকে কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রকৃতপক্ষে দাস বলে অনুভব করতে পারে তখন তার অবিদ্যা নাশ হয়ে গেছে—কাজেই অবিদ্যাপ্রসূত যে সংসারবন্ধন এবং সংসারমুক্তি তার কোনটিই নেই—কারণ অজ্ঞানতাই যদি না থাকে তাহলে তার থেকে জন্মাচ্ছে যে সংসারবন্ধন এবং সংসারমুক্তি—তা থাকবে কি করে? কারণ অজ্ঞানতা হল কারণ আর বন্ধন এবং মুক্তি হল কার্য্য। কারণের নাশে কার্য্যের নাশ—এইটিই তো নিয়ম।

শুদ্ধ ভক্ত যে মুক্তি চায় না—শুধু চায় না তা নয় দিতে গেলেও নেয় না। মুক্তিকে ঘৃণা বোধ করে—বলা আছে—

চতুর্ব্বিধা মুক্তি ভক্ত অঙ্গুলি না ছোঁয়।

শ্রীল সরস্বতীপাদ বললেন—

কৈবল্যং নরকায়তে

কৈবল্য সুখ অর্থাৎ মুক্তিসুখকে ভক্ত নরকের মত ঘৃণা করে। কপিল ভগবান মা দেবহুতির কাছে বলেছেন—ভক্তকে মুক্তি দিতে গেলেও সে নেয় না—দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি—বিনা মৎসেবনং জনাঃ। সে কেবল আমার পাদপদ্মে সেবাসুখ চায়। শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঋষি দুর্ব্বাসার কাছে বলেছেন—

মৎসেবয়া প্রতীতং চ সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥ ভাঃ ৯।৬৭

এর একমাত্র কারণ হল—যে জন্মমৃত্যুনিরোধরূপ যে মুক্তি তাতে শুদ্ধ ভক্তের কোন প্রয়োজন বোধ নেই। কারণ জন্ম এবং মৃত্যু—দেহধারণ এবং দেহত্যাগ দুইই তো অজ্ঞানতা থেকে জন্মাচ্ছে। ভক্তের তো অজ্ঞানতা নেই—সুতরাং দেহধারণের প্রয়োজন নেই তাই দেহত্যাগেরও প্রয়োজন নেই—কারণ বন্ধন তো তাদের নেই—সুতরাং মুক্তির প্রয়োজন থাকবে কি করে? এখন প্রশ্ন হতে পারে ভক্তেরও তো দেহধারণ দেহত্যাগ অর্থাৎ—জন্ম মৃত্যু আছে। ভক্ত জন্ম প্রার্থনা করে—আর জন্ম থাকলে তার মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভক্তের দেহধারণ দেহত্যাগ—অর্থাৎ জন্মমৃত্যু কর্মফলে হচ্ছে না। সেটি হয়—ভগবানের ইচ্ছায়। কর্মফলে গতাগতি যাদের তাদের জন্মমৃত্যু বন্ধন—সুতরাং তাদের এই বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়োজন আছে। কিন্তু ভক্তের দেহধারণ দেহত্যাগ তো ভগবানের ইচ্ছায়—ভগবানের ইচ্ছায় ভক্ত পরমানন্দে আসে আবার ভগবানেরই ইচ্ছায় ভক্ত দেহত্যাগ করে পরমানন্দে চলে যায়। দেখতে জন্মমৃত্যু একই রকম। কিন্তু ফলের দিক দিয়ে অনেক তফাৎ। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় একটি

সুন্দর উপমা দিয়েছেন—বিড়ালী যে দাঁত দিয়ে ইন্দুর ধরে তার দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়—আবার সেই দাঁত দিয়েই বাচ্চাদের ধরে—তাদের পরমানন্দ দেয়। কিন্তু বিড়ালীর যে দাঁত সে তো একই রকম। কিন্তু কাজের দিক দিয়ে তফাৎ আছে। এখানেও তেমনি জন্মমৃত্যু দুটো ধারাল দাঁত যাদের কর্মফলে গতাগতি তাদের কষ্ট দেয়—তাদের জন্মেও যাতনা মৃত্যুতেও যাতনা—কিন্তু ভক্তের দেহধারণ এবং দেহত্যাগ ভগবানের ইচ্ছায়—তাই তাঁর দেহ ধারণ অর্থাৎ জন্মেতেও যাতনা নেই আর দেহত্যাগে অর্থাৎ মৃত্যুতেও কোন কষ্ট নেই। কারণ ভক্তের দেহধারণ দেহত্যাগ জন্মমৃত্যু কোনটিই অজ্ঞান-প্রসূত নয়। তাই তাদের জন্মমৃত্যু বন্ধন নয় বলেই মুক্তিলাভের জন্য কোন প্রয়োজন বোধ নেই। তাই তারা মুক্তি চায় না। কোন ভক্তের প্রার্থনায় দেখা যায় না যে তারা বলছেন—প্রভু আমাকে মুক্তি দাও। তারা জন্মই প্রার্থনা করেন—বলেন—

আসিব যাইব চরণ সেবিব।
তুমি আর নিত্যানন্দ বিহরিবে যথা।
এই করো জন্মে জন্মে ভৃত্য হই তথা॥

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, গোবিন্দপ্রিয়সখা উদ্ধবজী, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, পাণ্ডব-গীতায় নকুলদেব, সনকাদি ঋষি সকলে জন্মই চেয়েছেন। কারণ তারা নিজেদের স্বরূপ অনুভব করেছেন—জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—এইটিই জীবের খাঁটি স্বরূপ—এই স্বরূপানুভূতিতে জন্ম চেয়েছেন—কারণ দেহধারণ করে না এলে তো ভজন হবে না। নরতনু ভজনের মূল। ভজনের জন্য দেহইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি দরকার। আর যতই ভজনে অগ্রগতি ততই আস্বাদন এবং যত আস্বাদন ততই আনন্দ। এই আনন্দ পাবার জন্য ভক্ত জন্ম চায়। এখন জন্ম হলে মৃত্যু তো হবেই। তাই ভক্তের দেহধারণ এবং দেহত্যাগ। এমনকি স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরও ভক্তকক্ষায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করলেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ॥
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাৎ ভক্তিরহৈতুকীং ত্বয়ি ॥

ধন জন কবিতা সুন্দরী কিছু চাই না—কিন্তু তোমার পাদপদ্মে (শিক্ষাষ্টকম্) আমার যেন জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি লাভ হয়। ভগবান আবার কার চরণে ভক্তি চাইবেন—এখানেও জন্ম প্রার্থনা করলেন। এটি ভক্তকক্ষায় দাঁড়িয়ে মহাপ্রভুর অশেষ বিশেষ আস্বাদন। অথবা শিক্ষাষ্টকমের বাণী তাই জগতের জীবকে শিক্ষা দিচ্ছেন—দেখ, তোমরা তো ভগবানের চরণে কি প্রার্থনা করতে হয় জান না—আমার প্রার্থনা শুনে শিখে নাও।

জন্মমৃত্যু নিরোধকেই সাধারণ দর্শনের মতে মুক্তি বলা আছে। দেহধারণ করে আসতে হবে না—সুতরাং দেহ ত্যাগ করে যেতে হবে না। এর থেকে আনন্দ আর নেই—তাই মুক্তিই প্রায় সকল দর্শনের মতে চরম কাম্য বস্তু হয়ে আছে একমাত্র ভক্তিদর্শন ছাড়া সকল দর্শনের মতে মুক্তির লক্ষণ এইটিই—কিন্তু এ মুক্তির লক্ষণে কিছু ত্রুটি আছে যেজন্য ভক্ত এই মুক্তিকে চায় না শুধু তা নয়—ঘৃণা করে। এখন প্রশ্ন হতে পারে—এ লক্ষণে কি ত্রুটি? দেহধারণ এবং দেহত্যাগ বন্ধ হলে মুক্তি হল বটে—সে মুক্তিধামে গেল কিন্তু এ মুক্তিতে জীবের স্বরূপানুভূতি হচ্ছে না—অর্থাৎ জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—এ স্বরূপবোধ হচ্ছে না। এখন নিজেকে যদি দাস বলে বোধই না হয় তাহলে সে প্রভুর পাদপদ্মে সেবাসুখ চাইবে কি করে? কারণ দাসই তো প্রভুর সেবা করে। এখন মুক্তি হল বটে—জন্মমৃত্যু বন্ধ হল কিন্তু ভগবানের পাদপদ্ম মাধুর্য্য তো আস্বাদন করতে পারছে না—কারণ নিজেকে দাস বলে অনুভব না হলে ভজন করতে পারে না—আর ভজন ছাড়া তো আস্বাদন হবে না। এটি হল জন্মমৃত্যু-নিরোধরূপ মুক্তিতে ত্রুটি। তাই ভক্ত মুক্তি চায় না।

তাহলে প্রশ্ন হবে ভক্ত কি মুক্তি পাবে না? তার উত্তরে বলা হয়েছে—ভক্ত তো মুক্তি অনায়াসে পাবে। তবে মুক্তি পাওয়ার দিকে

লক্ষ্য থাকবে না। শ্রীমদ্ভাগবতদর্শনও মুক্তির লক্ষণ করেছেন—এ মুক্তির লক্ষণ জন্মমৃত্যুনিরোধরূপ মুক্তি নয়—এ মুক্তি হল নিজের স্বরূপানুভূতি। জীব যখন ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে সে নিত্য কৃষ্ণদাস (কারণ জীবের স্বরূপ হয় নিত্যকৃষ্ণদাস) তখনই তার ঠিক ঠিক মুক্তিলাভ। এই মুক্তিলাভ হলে তবে জীব ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসুখ চাইবে এবং পরে—তাতে তার ভগবানের পাদপদ্ম মাধুর্য্য আস্বাদন হবে। শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে মুক্তির লক্ষণ বললেন—

মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।

মুক্তি হল অন্যরূপকে ত্যাগ করে জীবের নিজের স্বরূপে অবস্থিতি। ভক্ত এই মুক্তি পায় আর মায়ামুক্তি তো তার অনায়াসে হবে। কারণ যে ভগবানের পাদপদ্মে সেবা সুখ পেতে যাচ্ছে সে তো মায়ার সম্বন্ধ নিয়ে ভগবানের কাছে যেতে পারে না। কারণ শ্রীগোবিন্দের সঙ্গে মায়ার কোন সম্বন্ধই নেই। তুরীয় কৃষ্ণের নাহি মায়ার সম্বন্ধ। যেমন অন্ধকারের পুটলি সঙ্গে করে কেউ সূর্য্যের সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারে না তেমনি মায়ার অন্ধকার সঙ্গে নিয়ে কেউ ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসুখ পেতে পারে না। ভক্তের মায়ামুক্তি তো অনায়াসলভ্য। শাস্ত্র একটি উপমা দিয়েছেন—

নগরীং গচ্ছন্ গ্রামং পশ্যতীতি বৎ।

একজন মানুষ নগরে যাচ্ছে—নগর দেখাই তার প্রধান উদ্দেশ্য—কিন্তু নগরে যাওয়ার পথে—পথের দুপাশে যে গ্রাম তা যেমন অনায়াসে দেখা হয়েই যায়—কিন্তু গ্রাম দেখবার জন্য তার কোন চেষ্টা থাকে না—অথচ দেখা হয়ে যায় অনায়াসে—এখানেও তেমনি ভক্ত পেতে যাচ্ছে ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসুখ। সেইটিই তার উদ্দেশ্যে—কিন্তু ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসুখ পেতে যাবার পথে মুক্তি গড়াগড়ি যায়—মহাজন বললেন—

অষ্ট সিদ্ধি নব নিধি যে আছে—ভুক্তি মুক্তি পাড়ি রহিবে নাছে। তার নাছ দুয়ারে গড়াগড়ি যায়—অষ্টসিদ্ধি নবনিধি নানারকম ভোগ

সম্পদ তার নাছ দুয়ারে গড়াগড়ি যায়—আমায় গ্রহণ কর কর বলে—কিন্তু যে গৌর পদে মন দিয়েছে—সে ফিরেও তো চাইবে না রে। কিন্তু পথে যে মুক্তি পড়ে আছে সে মুক্তি পাওয়া তো তার অনায়াসে হয়েই যাবে। তবে মুক্তি পাওয়ার দিকে তার লক্ষ্য থাকবে না—মায়ামুক্তি লাভ করেই ভক্ত ভগবানের পাদপদ্মে সেবাসুখ পাবে। তাই মায়ামুক্তি তার অনায়াসে পাওয়া হয়ে যায়।

অনাদি বহির্মুখ জীবের অজ্ঞতা বশতঃ যে কতরকম ভ্রান্তি তা আর বলে শেষ করা যায় না। পরবর্ত্তীমন্ত্রে ব্রহ্মা বলছেন—

ত্বামাত্মানং পরং মত্বা পরমাত্মানমেব চ।
আত্মা পুনর্ব্বহির্মৃগ্য অহোঽজ্ঞজনতাজ্ঞতা ॥ ভাঃ ১০।১৪।২৭

ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালকে বলছেন—প্রভু, আত্মানং ত্বাং পরং মত্বা—এখানে পরং শব্দের অর্থ হল ভিন্ন অর্থাৎ আত্মা থেকে ভিন্ন বস্তু অর্থাৎ অনাত্মা দেহাদি বলে যারা তোমাকে মনে করে অর্থাৎ তোমার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে যারা মায়িক দেহ বলে মনে করে তুমি যে সকল আত্মার আত্মাস্বরূপ সেটি তারা অজ্ঞতায় কিছুতেই ধারণা করতে পারে না। ভগবান গীতাবাক্যে তাদের মূঢ় অর্থাৎ মূর্খ বলে তিরস্কার করেছেন—যারা তাঁর পরমভাব না জেনে তাঁর মানুষী তনু অর্থাৎ মানুষের মত আকারে ভগবানের বিগ্রহ দেখে তাকে মানুষ বুদ্ধি করে, ভগবান বললেন—অর্জ্জুন তারা আমাকে অবজ্ঞা করে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত মহেশ্বরম্ ॥ গীঃ ৯।১১

অর্জ্জুন, এই অবজ্ঞার ফলে সেইসব মানুষ অধঃপতিত হয়।

শ্রীগৌরসুন্দরও বলেছেন—

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥

পাপ যখন বিষ্ণু বৈষ্ণবে লাগে তাকে বলা হয় অপরাধ। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দঘন। দেখতে মানুষের মত হলেও মানুষের

দেহের উপাদান ভগবানের দেহে নেই। মানুষের দেহের উপাদান রক্ত মাংস মেদ মজ্জা অস্থি চর্ম—কিন্তু ভগবানের দেহের উপাদান তা নয়। ভগবানের দেহের উপাদান তিনটি সৎ চিৎ আনন্দ—শুধু সৎ চিৎ আনন্দ নয়, সৎ চিৎ আনন্দ ঘন। ব্রহ্মা ভগবানকে বলছেন, প্রভু অজ্ঞ জীব তোমার এই নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহকে প্রাকৃতদেহ মনে করে এবং তুমি ছাড়া তারা আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করে। এইজন্য তারা শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রকাশিত নরাকৃতি পরমব্রহ্মের ধারণা করতে পারে না। তারা অন্যবস্তু অর্থাৎ দেহ প্রভৃতিকেই আত্মা বলে মনে করে তখন হারাণ আত্মাকে তারা বাইরে খুঁজতে থাকে এইটিই বড় বিচিত্র। স্বামিপাদ টীকায় বললেন—ন হি গৃহে নষ্টং বনে মৃগ্যতে ইত্যর্থঃ। গৃহে হারান জিনিষ বনে খুঁজলে চলবে কেন ?

অখিল আত্মার আত্মা হলেন কৃষ্ণ। জীবাত্মা বা পরমাত্মার সত্তা বলতে যা কিছু তা কৃষ্ণের সত্তাতেই স্থিতি। ব্রহ্মা বলছেন—সেই তোমাকে যারা কেবল আত্মা বলে মনে করে প্রকৃতির গণ ছাড়া (প্রাধানিক গণ) আত্মার অনুশীলন করে—জ্ঞানবাদী ও যোগীরা বলেন—জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনেই রাসের উপস্থিতি। কৃষ্ণই সম্পূর্ণ—তাঁর একাংশ হল আত্মা তাই হে কৃষ্ণ তোমাকে যারা শুধু আত্মা বলে তারা তোমার একাংশ জেনেছে। এটি তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। কারণ তারা তোমাকে সম্পূর্ণ জানতে পারে নি। পরমাত্মা যে তুমি তোমাকে যারা শুধু আত্মা বলে তারা অজ্ঞ। পরমাত্মাও কৃষ্ণের ভিতরেই আছেন। কারণ জলাধিপতি বরুণদেব যখন কৃষ্ণকে স্তুতি করেন—তখন বলেছেন ওঁ নমো ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান বলেছেন—

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানত॥ গীঃ ২।৪৬

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে সব প্রয়োজন মেটে না কিন্তু মহান্ সাগরে

সব প্রয়োজন একসঙ্গে মিটে যায়। তেমনি আত্মা পরমাত্মা প্রভৃতি অংশে সম্পূর্ণ পাওয়া না গেলেও গৌর গোবিন্দ পূর্ণপূর্ণতমস্বরূপে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ভগবান সবই বর্ত্তমান। যেমন দশ সংখ্যার মধ্যে এক থেকে নয় সব সংখ্যাই আছে কিন্তু এক থেকে নয় সংখ্যার মধ্যে দশ পাওয়া যাবে না। আত্ম শব্দের অর্থ হল শুদ্ধ জীবস্বরূপ—'চ' অব্যয় পদে এখানে 'অপি' অর্থ ধরতে হবে। বিষ্ণুপুরাণে আত্মা শব্দে হরি বলা হয়েছে। আততাচ্চ মাতৃত্বাৎ (ধারণ এবং পোষণ) চ আত্মা। ভগবান বলেছেন—

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি

এর দ্বারা ধারণ বুঝাচ্ছে। আবার শ্রুতি বলেছেন—যেন জাতানি জীবন্তি এর দ্বারা পোষণ বুঝাচ্ছে। আবার আত্মা এবং অপুনঃ সন্ধি করে আত্মাপুনঃ করা হয়েছে—অর্থাৎ আত্মা অপুনর্বহির্মৃগ্যঃ অর্থাৎ আত্মা বহিঃ ন মৃগ্যতে। আত্মা শব্দের দ্বারা এখানে হরিকে বুঝাচ্ছে। আত্মাকে অর্থাৎ হরিকে বাইরে অর্থাৎ তাঁর ধাম বৃন্দাবনে খুঁজতে হবে না। আত্মা শুদ্ধ জীবস্বরূপ বলে দেহের মধ্যেই তিনি অনুসন্ধানের যোগ্য অর্থাৎ দেহের মধ্যে খুঁজলেই তাকে পাওয়া যাবে এইটি যাঁরা বলেন—তাঁরা জ্ঞানবাদী। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, এঁরা হলেন মূর্খ। এটি তাদের অজ্ঞতা। তাঁরা তোমার প্রকৃত তত্ত্ব বোঝেন না—তাই এ কথা বলেন। এর আগে ব্রহ্মা স্তুতি প্রসঙ্গে ভগবানের যে স্বরূপ বলে এসেছেন—'একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ—এতে জীব বিলক্ষণ ধর্ম কৃষ্ণে বিদ্যমান দেখান হয়েছে। অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপে যে ধর্ম—বা লক্ষণ—তা জীবে হতে পারে না। তাই কৃষ্ণ যে জীব নন—তা স্পষ্ট বলা হয়েছে। কিন্তু যারা কৃষ্ণকে শুদ্ধ জীবস্বরূপ বলেন বুঝতে হবে যে শাস্ত্রের এ সয তত্ত্ববাক্যে তাদের অনুসন্ধান নেই। ব্রহ্মা বলছেন,—প্রভু তারা তাই তোমাকে অজ্ঞতাবশতঃ জীবস্বরূপ বলে।

যদ্বা—কিংবা আর একপ্রকার অর্থ করা হচ্ছে—আত্মা অর্থাৎ

সর্ব্বেষাং মূলস্বরূপম্। আত্মা অর্থাৎ কৃষ্ণ যাঁর সত্তায় জগতের সকলের সত্তা। ভগবান গীতায় বলেছেন—

মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে। গীঃ ১০।৮

আমার থেকেই সকলের প্রকাশ। পরং অনাত্মা—পরকে অর্থাৎ অনাত্মাকে আত্মা বলে মনে করে। বহিঃ অর্থাৎ তোমার পাদপদ্ম হতে অন্যত্র তার অনুসন্বান করে তারা অজ্ঞ। যদ্বা—অথবা তোমাকে পরং মত্বা পরং অর্থাৎ কেবল তোমাকে কেবল আত্মা মনে করে অর্থাৎ তোমাকে শুদ্ধ জীবস্বরূপ অর্থাৎ জীবের শুদ্ধ স্বরূপ বলে মনে করে—তাদের মতে মায়া দেহ স্পর্শে জীবাত্মা ঘোলাটে হয় —সে আর শুদ্ধ থাকে না—তারপর সে যখন উৎকর্ষ লাভ করে তখন পর পর উন্নত হয় এবং পরমাত্মা অন্তর্য্যামিপদে ক্রমশঃ উন্নীত হয়। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু যারা তোমাকে এইরকম উন্নীত শুদ্ধ জীবস্বরূপ মনে করে—তথা তথা যদি বা মন্যতে তাহলেও তাদের তাতে অজ্ঞতাই প্রকাশ পাচ্ছে। ভগবান বিভূতিযোগ প্রসঙ্গে যে গীতায় বললেন—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ। গীঃ ১০।৪২

অর্জুন, আমার একপাদ বিভূতির দ্বারা এই অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধৃত হয়ে আছে—এ গীতাবাক্যেরও তাদের অনুসন্ধান নেই বুঝতে হবে। ভগবান গীতায় জীবাত্মা, পরমাত্মা ও পুরুষোত্তম এদের পরস্পর ভেদ দেখিয়েছেন।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ। গীঃ ১৫।১৭

এর দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ দেখান হয়েছে। ভগবান বললেন—এই জীবাত্মা এবং পরমাত্মা—এই উভয়েরই অতীত স্বরূপ হলাম আমি। আমার স্বরূপ এদের থেকে ভিন্ন।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ— গীঃ ১৫।১৮

আমি ক্ষর অর্থাৎ উত্তম পুরুষ নই। আমি পুরুষোত্তম—যশ্চ আত্মা। আত্মা শব্দের মুখ্যাবৃত্তির দ্বারা 'তৎ' কেই বুঝাবে। তাই ওঁ তৎ সৎ—এই মন্ত্র 'গঙ্গা' শব্দের মুখ্যাবৃত্তির দ্বারা যেমন ভগীরথ-

খাতাবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহকেই বুঝায় তেমনি 'আত্মা' শব্দের মুখ্যাবৃত্তি দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্মই বুঝায়। আগে যে বলা হয়েছিল—হরিকে দেহের ভিতরে অনুসন্ধান করলেই চলবে তাদের কথা বলছেন—তারা অজ্ঞতায় দেহে তোমাকে অনুসন্ধান করে। জীবের অজ্ঞতা যে কত রকম তা বলে শেষ করা যায় না। কেউ বা সর্ব্বজগতে তোমার চিৎসত্তার অনুসন্ধান করছে। এ সবই অজ্ঞতার পরিচয়। ব্রহ্মা বলছেন—কৃষ্ণপাদপদ্ম অন্তরে বা দেহে অনুসন্ধানের যোগ্য নয়। কিন্তু তাঁকে বাইরে অনুসন্ধান করতে হবে—বহির্মৃগ্য এব। এই বলে ব্রহ্মা তাঁর দুই তর্জ্জনী দিয়ে বাইরে কৃষ্ণপাদপদ্মযুগলকে দেখাচ্ছেন। আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা তো দেহেও আছে—কিন্তু আত্মা শব্দের মুখ্যাবৃত্তি লভ্য অর্থ তো জীবাত্মা নয়। 'আত্মা' শব্দের মুখ্যাবৃত্তি লভ্য অর্থ হল তৎ অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্ম। তাহলে দেখা যাচ্ছে শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মত কৃষ্ণকে দেহে বা অন্তরে খুঁজলে চলবে না। শ্রীধাম বৃন্দাবনে তাঁর অপ্রাকৃত স্বরূপকে খুঁজতে হবে। দেহে খুঁজলে হবে না। হৃদয়ে ধ্যান করলেও হবে না। এ সবই অজ্ঞনতার পরিচয়। কারণ কৃষ্ণ তো সর্ব্বোপরি প্রভু। আর জীব হল সেবক অর্থাৎ দাস। ভগবানের সঙ্গে কৃষ্ণের সঙ্গে জীবের নিত্য সম্বন্ধ দাস প্রভু। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। বলা আছে—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

প্রভুর নিত্যলীলার ধাম হল শ্রীবৃন্দাবন। প্রভুকে ডেকে ডেকে নিজের কাছে আনা চলবে না। তাতে সেবকের সেবকতা বা সাধকের সাধনতা থাকে না। জীবকে সাধকদেহে শ্রীধাম বৃন্দাবনে যেতে হবে। মহাজন বলেছেন—জীবকে দেহে যদি পারে আর তা না হলে মনে মনেও বৃন্দাবনে বাস করতে হবে। ব্রহ্মা বলছেন—দেহে অনুসন্ধান করলেই যদি হত তাহলে আমি ঘরে থেকেই কৃষ্ণ অন্বেষণ করতাম এবং তাতে সমাধানও হত। বৃন্দাবনে আসবার দরকার হত না।

ব্রহ্মা আক্ষেপ করছেন—আমার আচরণ দেখেও যদি আমার সৃষ্ট জীব না বুঝে তাহলে তাদের অজ্ঞতা ছাড়া আর কি বলব ? ঘরে হারিয়েছে ধন সেটি বনে গিয়ে খুঁজলে মিলবে কেন ? কৃষ্ণ তো বাইরে হারিয়েছে তাই তাঁকে অন্তরে খুঁজলে চলবে কেন ?

কিংবা আর একটি অর্থ করছেন। যারা সব ছেড়ে বৃন্দাবনে গিয়েছে এখন সব ছেড়ে বলতে কি বুঝাচ্ছে ? জীবতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব জেনেও তাকে ত্যাগ করে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণকেই স্তুতি করে—জীবতত্ত্ব বুঝাই তো কঠিন। জীব মানে 'আমি'—এই আমি কেমন—আমাকে বুঝে নিতে হবে। এ জগতে কত লোক কত বীরত্বেরই পরিচয় দিচ্ছে—কিন্তু কে এমন বীর আছে কে এমন ধীর আছে এস তো—অবিদ্যা অরণ্যে যে জীবাত্মা হারিয়ে গেছে তার অনুসন্ধান কে করতে পারে ? যদি এই জীবাত্মাকে অনুসন্ধান করে বার করতে পার তবে তো বুঝি তোমার গৌরব। এই যে কত কঠিন জীবাত্মাতত্ত্বের বোধ—এ করাও যার দ্বারা সম্ভব হয়েছে আবার এর ওপরে যে ঈশ্বর তত্ত্বের অনুভূতি সেও যে করেছে—এই আত্মবোধ এবং পরমাত্মা-বোধকে লাভ করার পরেও যে দুটিকেই ত্যাগ করেছে—ধর্ম কর্ম সব ত্যাগ করে একমাত্র কৃষ্ণেতেই আত্মসমর্পণ করেছে কারণ শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীমুখের উক্তি আছে—বিনা সর্ব্বত্যাগং ন ভবতি ভজনং হ্যসুপতেঃ—সর্ব্বস্ব ত্যাগ না করলে অসুপতি প্রাণপতি শ্রীগোবিন্দের পূজা হয় না। শ্রীকৃষ্ণের তো সঙ্কল্প আছে জীব উদ্ধার করবার জন্য। কিন্তু সেই ইচ্ছা তাঁকে করতে হবে। জগতেও দেখা যায় কাউকে দিয়ে যদি কোন কাজ করাতে হয় তাহলে মুরুব্বি ধরতে হয়। এখানেও তেমনি শ্রীকৃষ্ণকে নিজের কাছে আসবার ইচ্ছা করানোর জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণব মুরুব্বিকে ধরতে হবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের হাতে পায়ে ধরে কৃষ্ণের ইচ্ছা করাতে হবে নিজের কাছে আসবার জন্য।

কৃষ্ণ প্রেমমদিরা পান করে মত্ত হলে প্রাকৃত বাসনা বসন আপনিই

খসে যাবে এবং কখন যে খসে যাবে সে জানতেই পারবে না। ভগবানে রতি হলে অর্থাৎ ভক্ত আত্মারামতা তো ত্যাগ করেই এমনকি পরমাত্মরতিও ত্যাগ করে। আত্মারামতা বা পরমাত্মরতিও চিদানন্দ-রতি কারণ আত্মা এবং পরমাত্মা চিদানন্দেরই অংশ সন্দেহ নেই—কিন্তু এ সবই হল অস্ফুট কলিকা—কিন্তু এ সব ত্যাগ করে যে স্ফুট প্রসূন—সম্পূর্ণ বিকশিত কৃষ্ণপাদপদ্মকে গ্রহণ করে তারই বুদ্ধির বাহবা—তারই প্রশংসা।

এইভাবে ব্রহ্মা বলছেন—পরং অর্থাৎ কেবল তুমিই আছ আর কেউ নেই। এইরূপ অদ্বৈত উপাসনার দ্বারা যারা তোমাকে আত্মা অর্থাৎ শুদ্ধজীবস্বরূপের অতিরিক্ত অন্য কেউ নও এই বলে অনুভব করেছিল তারাই আবার পরে তোমাকে পরমাত্মা বলে অনুভব করেছে আবার তারও পরে এখন পুনরায় তোমাকে আত্মা অর্থাৎ সকলের মূল স্বরূপ বলে মনে করে তারা তোমাকে এখন বাইরে চোখে দেখবার জন্য খুঁজছে এইটিই অহো জ্ঞজনতাজ্ঞতা অর্থাৎ জ্ঞ অর্থাৎ বিজ্ঞজনের (জানাতি ইতি জ্ঞঃ) জনতা (জনসমূহের—জন+তা সমূহার্থে) জ্ঞতা জ্ঞানানুশীলন। বিজ্ঞজন যারা তারাই একমাত্র তোমাকে আত্মা অর্থাৎ সকলের মূল কারণ জেনে বাইরে চোখে তোমাকে দেখবার জন্য তোমার অনুসন্ধান করে। শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ দেবর্ষিপাদ নারদ প্রভৃতি আত্মারাম মুনিগণও তাই তোমার গুণে মুগ্ধ হয়ে তাদের আত্মারামতা ত্যাগ করে তোমারই গুণগানে মত্ত হয়েছেন।

ব্রহ্মা পরবর্ত্তী মন্ত্রে ভগবানের স্বরূপ নিরূপণ করে স্তুতি করেছেন—

অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব হ্যতৎ ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ॥

ভাঃ ১০।১৪।২৮

শ্রীভগবান সর্ব্বব্যাপক—তিনি বাইরেও আছেন আবার ভিতরেও আছেন। শ্রীবসুদেব কংসের কারাগারে কৃষ্ণস্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—তুমি

প্রবিষ্টোঽপি অপ্রবিষ্টোঽসি তুমি প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্টেরই মত। তুমি সকলের ভিতরে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করলেও আবার তোমাকে বাইরে দেখতে পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে—তুমি অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ প্রবেশ করনি। তাই তোমাকে প্রবিষ্টও বলা যায় আবার অপ্রবিষ্টও বলা যায়। ধ্রুবস্তুতিতেও বলা আছে ভগবান করুণা করে অসৎ গুণের ভিতরেও প্রবেশ করেছেন—

একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্গুণেষু নানেব দারুষু

বিভাবসুবদ্বিভাসি॥ ভাঃ ৪।৯।৭

প্রথম স্কন্ধে ব্যাস নারদ সংবাদে বলা আছে বেদব্যাসকে বিমনা দেখে দেবর্ষিপাদ নারদ যখন প্রশ্ন করলেন—তাঁর এ বিমনা অবস্থার কারণ কি—তখন ব্যাসদেবের মনের খেদ জানতে পেরে দেবর্ষিপাদ বললেন—জীবকে ধর্ম উপদেশ করবার জন্যই তোমার অবতার কিন্তু তুমি যেসব শাস্ত্র রচনা করে জীবকে উপদেশ দান করেছ তাতে তোমার কর্ত্তব্য ঠিকমত পালন হয় নি। বেদব্যাস তখন নিজের ত্রুটি জানতে চাইলেন। বেদব্যাসের ত্রুটি বলবার সামর্থ্য একমাত্র দেবর্ষি-পাদেরই আছে। সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে ভগবান অন্তশ্চর বায়ুরিবাত্মসাক্ষী—তিনি বায়ুর মত অন্তর বাহির ব্যেপে আছেন। সেই স্বরূপই ব্রহ্মা এই স্তুতিবাক্যে বলছেন।

ব্রহ্মা বালগোপালকে সম্বোধন করে বলছেন—হে অনন্ত, সাধুরা তোমাকেই অন্বেষণ করে। এখানে 'অনন্ত' শব্দের দ্বারা সর্ব্বব্যাপী অর্থ নেওয়া হয়েছে। এখন এই সর্ব্ব শব্দের দ্বারা যে কতটা বুঝায় সে ধারণা আমাদের নেই। কারণ সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধেই আমাদের ধারণা নেই। সমগ্র ভূর্লোক সম্বন্ধে তো কথাই নেই। এইরকম চৌদ্দভুবন নিয়ে একটি ব্রহ্মাণ্ড—এই রকম অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সব নিয়ে সর্ব্বশব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

শ্রীবৈষ্ণবতোষণীকার শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলছেন—সাধুগণ

কেমন করে তোমাকে অন্বেষণ করে ? সর্ব্বদোষহীন সর্ব্বগুণপূর্ণ স্বয়ং ভগবান তোমাকে পাবার জন্যই কেবল তোমাকে অন্বেষণ করে। তুমি ছাড়া আর যা কিছু আছে তাতে তারা আনন্দ পায় না—এটিই হল সাধুর লক্ষণ। তুমি ছাড়া অন্য বস্তুতে তাদের পরিতোষ না হওয়ায় তারা তুমি ছাড়া অন্য সব বস্তুকেই ত্যাগ করে। এইখানে জ্ঞানী ও ভক্তের সাধনের মধ্যে পার্থক্য আছে। জ্ঞানীরাও অতৎ বস্তু ত্যাগ করে—কিন্তু তাদের যে ত্যাগ তা অপরিতোষে নয় কিন্তু ভক্ত যে অতৎ বস্তু ত্যাগ করে তা অপরিতোষে। ক্ষুধাতুর ব্যক্তির যেমন বসনভূষণ কিছু ভাল লাগে না—সে তখন শুধু খাদ্য চায় তেমনি কৃষ্ণক্ষুধাতুরেরও বিষয় বসনভূষণ কিছু ভাল লাগে না— সে তখন শুধু কৃষ্ণ চায়—আকুল হয়ে বুকফাটা আর্ত্তিভরে কেবল বলে—

একবার দেখা দাও—হা গৌর প্রাণগৌর একবার দেখা দাও।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ রাধাকুণ্ডতীরে গড়ি যায়—হা রাধে তোমার অদর্শনে প্রাণে মরি—একবার দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ প্রাণেশ্বরি। মহারাজ যুধিষ্ঠির বলেছেন—ক্ষুধিতস্য যথেতরে। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য, ভ্রাতা, মাতা, পত্নী সবই কৃষ্ণ বাদ দিয়ে অপ্রিয়। শুধু কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলেই মহারাজ এসব গ্রহণ করেছেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র গৌরবিরহে কাতর হয়ে রাজ্য ত্যাগ এমনকি দেহত্যাগ করতে চেয়েছেন। সাধুদের এই অতৎ ত্যাগটি বড় মিষ্টি। কারো যদি ছেলে হারিয়ে যায় সে ছেলে খুঁজতে বেরিয়ে ছেলে ছাড়া আর যাকে পাবে তাকেই ত্যাগ করে। ছেলে পেলে শুধু তাকেই গ্রহণ করবে। আমাদেরও তেমনি কৃষ্ণ হারিয়ে গেছে। তাই কৃষ্ণকে খুঁজতে হবে সুতরাং কৃষ্ণ খুঁজতে বেরিয়ে কৃষ্ণ ছাড়া আর যা কিছু পাওয়া যাবে তাকেই ত্যাগ করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সাধুরা তোমাকে কোথায় খোঁজে ? ব্রহ্মা বললেন—অন্তর্ভবে—অর্থাৎ ব্যষ্টি সমষ্টি জগতের মধ্যে তোমাকে খোঁজে। ব্রহ্মা বলছেন—দুধ থেকে নবনীত কি করে তুলতে হয়

তার প্রক্রিয়া জানা চাই, ভূমি থেকে শস্য আহরণ কেমন করে করতে হয়—ভূমি খনন করে কি করে জল আহরণ করতে হয় তার প্রক্রিয়া জানা চাই। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিই এসব গ্রহণ করতে পারে। এই যে মন্থন খনন প্রক্রিয়া—এর নামই সাধন। ভবন্তমেব শ্রীকৃষ্ণমেব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকেই খোঁজে। এখানে সন্ত বলা হয়েছে—সন্ত বলতে সাধু বুঝায় বটে—কিন্তু এখানে সন্ত বলতে বুঝান হয়েছে বিবেকী—অর্থাৎ যাদের সৎ অসৎ বিবেক আছে—সৎ বস্তুই গ্রাহ্য আর অসৎ যা তা ত্যাজ্য এই বিচার যার আছে সে হল বিবেকী। তারাই খোঁজে এবং শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম পায়। এখন মনে হতে পারে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম পেতে হলে যে ব্রহ্মা বললেন—অতৎ ত্যজন্তঃ অতৎকে ত্যাগ করতে হবে—এই অতৎ ত্যাগের কি দরকার? এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটি পরিষ্কার হবে। রজ্জুতে সর্পদর্শন উঠেছে। অর্থাৎ রজ্জুকে আর রজ্জু দেখছি না সাপ দেখছি। কোন সাপ দেখছি অসন্তম্ অহিম্ অর্থাৎ যে অহি (সাপ) নেই—বস্তুতঃ সাপ নেই। কিন্তু সাপ না থাকলেও রজ্জুকেও তো পাচ্ছি না। কারণ ভ্রমে পড়েছি। এখন রজ্জু পেতে হলে মিথ্যা সাপ সরাতে হবে। বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেছেন—মার্গণে অতৎ ত্যজন আবশ্যক। অর্থাৎ কোন জিনিষ খুঁজবার সময় যে জিনিষটি খুঁজছি সেটি ছাড়া আর অন্য যে কোন জিনিষ সেটি তো বাদ দিতেই হবে তা না হলে আসল জিনিষ পাওয়া যাবে কি করে? অতৎ ত্যাগ না হলে বস্তু পাওয়া যায় না। কালীয়দমন লীলা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ উৎপাতে ব্রজবাসী প্রাণে প্রাণে বুঝেছে যে তাদের প্রাণের প্রাণ কৃষ্ণ বিপদে পড়েছে। কৃষ্ণতত্ত্বমূর্ত্তিমান শ্রীবলদেব স্বয়ং তাঁদের নানা যুক্তি দিয়ে বুঝালেন কৃষ্ণের কোন বিপদ হতে পারে না। কিন্তু ব্রজবাসীর তো বিশুদ্ধ প্রেম—তাই বলদেবের তত্ত্বকথা তাদের মনে স্পর্শই করে না। ব্রজবাসী এই প্রেমার বশেই ঐশ্বর্য্য তত্ত্ব দেখলে নিজ সমন্ধ না মানে। তারা তখন বলদেবের

তত্ত্বকথা না শুনে কৃষ্ণ খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু তাদের বিপদ হল—কেন কারণ কৃষ্ণ যে আজ সখা সঙ্গে কোন বনে গোচারণ রঙ্গে আছেন তা তো বলে যান নি। ঠিকানা তো দিয়ে যান নি। এখন তারা কৃষ্ণ খুঁজবে কোন পথে? কথা হল কৃষ্ণ ঠিকানা কাউকে দেয় না—তার স্বভাবই এইরকম। তবে তাকে খোঁজা যাবে কেমন করে? উৎকণ্ঠা হলে ঠিকানা জানা যায়। এই উৎকণ্ঠাই হল ঠিকানা। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলেছেন—কলিজীবের ভজন একদিনের, একদিনও যদি ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা যায়—তাহলে তাঁকে পাওয়া যাবে। সাধকের হৃদয়ের ব্যাকুলতাই সাধ্যবস্তুকে মিলিয়ে দেবে। এই উৎকণ্ঠা দেবী হলেন পরম আরাধ্যা। ভগবানের ঠিকানা থাকে। সাধকের যদি অন্বেষণের একান্ত দরকার থাকে—তাহলে তিনি তাকে এই উৎকণ্ঠা ঠিকানা পাঠিয়ে দেন। ব্রজবাসীরা ঠিক করলেন—কৃষ্ণ তো চরণ ফেলে ফেলে বনে গোচারণে গেছেন—তাঁর চরণচিহ্ন তো পথে পড়েছে। তাই অনুসরণ করে করে তাঁকে অন্বেষণ করতে হবে। পাদপদ্মচিহ্ন দেখবার সময় খুব সাবধানে দেখতে হবে। চোখ যেন আর কিছু না দেখে। কারণ কৃষ্ণ তো একা গোচারণে যান নি। তাঁর সঙ্গে বালক বাছুর আছে—তাদেরও পদচিহ্ন মাটিতে পড়েছে। কিন্তু যারা কৃষ্ণ অন্বেষণে বেরিয়েছে তাদের তো সেদিকে দৃষ্টি দিলে চলবে না। বালক বাছুরের পদচিহ্নকে ত্যাগ করতে হবে। কৃষ্ণ চরণচিহ্ন ছাড়া আর যত চিহ্ন সব ত্যাগ করতে হবে। এইটিই হল সাধকের অতৎ ত্যাগ। ভক্তিপথে যেমন অতৎ ত্যাগ আছে জ্ঞানীদের আত্মানুশীলনেও তেমনি অতৎ ত্যাগ আছে। সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় যে চব্বিশটি জিনিষ দেখান হয়েছে—পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, দশটি ইন্দ্রিয় (পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়) মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কার—এই সবশুদ্ধ চব্বিশ। সৃষ্টির মধ্যে এটি দেখাবার কি দরকার ছিল? এটি বলা হয়েছে শুধু এই অতৎ দেখাবার জন্য। শ্রুতিও ব্রহ্মকে নেতিমুখেই প্রতিপাদন করেছেন—অতৎ নিরসন

করেই উপনিষদ্ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করলেন ব্রহ্ম যে কি শ্রুতি তা স্পষ্টকরে বলতে পারেন নি। যা ব্রহ্ম নয় শ্রুতি তাই বলেছেন। বললেন ব্রহ্ম রূপ নন, রস নন, গন্ধ নন, স্পর্শ নন, শব্দ নন, দীর্ঘ নন, হ্রস্ব নন, স্থূল নন, ন্যূন নন—এর থেকেই বুঝা যায় শ্রুতি ব্রহ্মকে চেনেন—ব্রহ্মকে জানেন। যেমন রামকে না জানলে এ যে রাম নয় এ কথা বলা যায় না। শ্রুতি বললেন ব্রহ্ম অবাঙ্মনসোগোচর অর্থাৎ বাক্য মনের অতীত। আরও বললেন—'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। যেখানে গেলে ব্রহ্মকে না বুঝে বাক্য ও মন ফিরে আসে। এ জগতের সুখদুঃখের ব্যাপারেও তাই। সুখ ও দুঃখ—কোনটিই বলে বুঝান যায় না। মূকের আস্বাদনের মত। মূক (বোবা) যেমন রাজভোগ আস্বাদন করলেও মুখ ফুটে বলতে পারে না যে তার কেমন ভাল লাগছে—কারণ সে তো কথা বলতে পারে না—সুখ দুঃখের অনুভূতিও সেইরকম শুধু নিজের অনুভূতি বেদ্য। অপরের কাছে প্রকাশ করে বলার নয়। এখানে শ্রীশুকদেব গোস্বামি পাদ অহিরজ্জু উদাহরণটি বিবর্ত্তবাদের নিয়েছেন। কিন্তু এটি বিবর্ত্ত বাদের কথা নয়। কথা হচ্ছে অতৎ সর্প সরে না গেলে তৎ রজ্জু তো পাওয়া যাবে না। তেমনি কৃষ্ণ হলেন তৎ আর কৃষ্ণ ছাড়া আর যা কিছু সবই অতৎ। অতৎ বিষয় ত্যাগ না হলে তৎ কৃষ্ণ পাওয়া যাবে না। এখন আমাদের তো অতৎ ত্যাগ হচ্ছে না। কারণ প্রাকৃত যা কিছু বস্তু সবই অতৎ—কিন্তু আমরা তো তাকে 'তৎ' বলেই গ্রহণ করে বসে আছি। তাকে তো 'অতৎ' বলে বুঝতে পারছি না। সুতরাং ত্যাগের প্রয়োজন বুঝছি না। যদি আমরা সত্য সত্য কৃষ্ণ অন্বেষণ করতাম এবং বিষয়কে অতৎ বলে বোধ হত তাহলে কৃষ্ণেতর অর্থাৎ কৃষ্ণ বাদ দিয়ে আর যা কিছু সব 'অতৎ' বোধে ত্যাগ করতাম। বিষ্ঠা ত্যাগে যেমন মন খুসী হয়—ত্যাগে কোন আক্ষেপ তো থাকেই না বরং ত্যাগ করতে পারলেই তা স্বাস্থ্যের পরিচয়—শরীর সুস্থ হয়—তেমনি অতৎ বিষ্ঠা ত্যাগে মন খুসী হত। অতৎকে বিষ্ঠার মত

ত্যাগ করতাম। কিন্তু আমরা ত্যাগ তো করিই না বরং তাকে তৎ বলে আঁকড়ে ধরি। তাই সত্যি কথা বলতে হয় কৃষ্ণ খুঁজতে আমরা বেরুই নি। কৃষ্ণ অন্বেষণে প্রবৃত্তি আমাদের হয় নি। ব্রহ্ম পরমাত্মা, বা ভগবানের মৎস্য কূর্মাদি যে কোন বিগ্রহ সবই চিদানন্দময় তবু প্রেমিক ভক্ত এ সবে সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁর নরাকৃতি পরম ব্রহ্ম স্বরূপ অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচর—যে রূপের এককণ ডুবায় সব ত্রিভুবন—এইরূপেই অন্বেষণ করে এবং সেই আস্বাদনে ডুবে না যাওয়া পর্য্যন্ত তাদের অন্য কিছুতেই তৃপ্তি হয় না—এই অপরিতোষেই সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হয়। এই ব্যাকুলতাতেই সাধকের কাছে ভগবানের কৃপার ধারা নেমে আসে—তাই তাঁর অসীম মাধুর্য্য আস্বাদনে ভগবানের কৃপাই একমাত্র সম্বল--এ ছাড়া অন্য কিছুতেই এ আস্বাদন সম্ভব নয়। এইটি অনুভব করে ব্রহ্মা পরবর্ত্তী স্তুতিবাক্য বলছেন—

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥
ভাঃ ১০।১৪।২৯

এই মন্ত্রে শ্রীবালগোপালের সামনে ব্রহ্মা এই সিদ্ধান্ত করছেন--যে ভগবৎ কৃপা ছাড়া ভগবৎ তত্ত্বানুভূতির অন্য কোন উপায় নেই। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে এটি শুধু ব্রহ্মার সিদ্ধান্ত নয়—শ্রীবালগোপালের অনুমোদিত—কাজের অকাট্য। 'তৎ' বস্তুকে পেতে হলে 'অতৎ' বস্তু ত্যাগ করতে হবে বটে—কিন্তু এই ত্যাগের প্রবৃত্তি তো লোকে পায় না। কৃষ্ণপাদপদ্ম হল 'তৎ'—তাই একে অপেক্ষা করে ব্রহ্ম পরমাত্মাও বা ভগবানের অন্য মূর্ত্তি মৎস্য কূর্মাদিও শুদ্ধ প্রেমময় ভক্তের কাছে অতৎ এরই মত। তাই প্রেমিক ভক্ত চিরসুন্দর কৃষ্ণস্বরূপ ছাড়া আর সবই বাদ দেয়। কিছুতেই তাদের মন ভরে না। কিন্তু আমরা অন্য সব ত্যাগ করে শুদ্ধাভক্তি পথে হাঁটতে পারি না। তার কারণ হল আমরা একান্ত দুর্গত কলিহত

জীব পঙ্গুর মত। যেমন পথ সুন্দর হলেও চলবার সামর্থ যার নেই —যে পঙ্গু সে যেমন চলতে পারে না তেমনি ভক্তি পথ সুন্দর হলেও কলির জীব আমরা পঙ্গু—আমরা সে পথে চলতে পারি না।

ব্রহ্মা শ্রীবালগোপালকে বলছেন,—হে ভগবন্—তোমার কৃপাই তাকে চলবার শক্তি দেবে। কৃপাই সাধনের একমাত্র সম্বল। এই কৃপা ছাড়া সব সাধনই ব্যর্থ হয়ে যায়। উপনিষদ বললেন—

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। কঠ উঃ

যাঁকে তিনি বরণ করেন সেই তাঁকে পায়। এ বরণ কিসের বরণ? এ হল কৃপার বরণ। ভগবান জীবকে দিয়ে ভাল মন্দ দুইই করান। কিন্তু এর মধ্যে বিচার আছে। ভগবান নির্দোষ জীবই দোষী। কারণ ব্রহ্মসূত্র বললেন—

বৈষম্যনৈঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।

ভগবানে বিষম দৃষ্টি নেই—আর তিনি কাউকে ঘৃণা করেন না। ভগবান যে ইচ্ছা করেন তার প্রতি কারণ আছে। যেমন শ্রীমদ্ভবদ্গীতায় ভগবান ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন—

ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু— গীঃ ১৬।১৯

ভগবান যে তাদের আসুরী যোনিতে জন্মরূপ অশুভ দান করবেন তার প্রতি কারণ হল জীবের অজ্ঞতা। যারা ভগবানে অবজ্ঞা করবে তাদেরই তিনি আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করবেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে—ভগবানের ইচ্ছা কখনও নিরর্থক হতে পারে না। কিন্তু এর জন্য ভগবান দায়ী নন। জীবের অশুভ কাজে দায়ী হল পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্ম। আর শুভ কাজে হেতু হল পূর্ব্বসঞ্চিত মহৎকৃপা। জীবের চেষ্টা যদি সত্য সত্যই হয় তাহলে তাঁর কৃপা হাত উদ্ধারের জন্য আসবেই। কিন্তু জীবের চেষ্টা সত্য হওয়া দরকার। কূপের মধ্যে পড়ে গিয়ে কেউ যদি ছটফট করে তাহলে তাকে উদ্ধার করবার জন্য যেমন হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয় তেমনি ভগবানও বলেছেন—

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ গীঃ ১২।৭

যে সব সাধক অতৎত্যজন্ পন্হা অবলম্বন করেছেন—তারা জ্ঞান, যোগ, বৈরাগ্যাদিসাধনে কিছু অনাসক্তির ছায়া দেখে কিংবা কোন প্রকারে সিদ্ধিলাভের আভাস পেয়ে অভিমানে কেউ যদি ভগবানের চরণে শরণাগতি না নিয়ে নিজের আত্মশক্তিতে মায়ানিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করে তাহলে তাদের সেটি বিফল পরিশ্রম হয়—বস্তুত কিছু লাভ হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার দেবতাদের স্তুতিবাক্যের অনুবাদ করে বললেন—

জ্ঞানী জীবন্মুক্তিদশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

তারা মনে করেন যেন জ্ঞানসাধনে মুক্তি পাওয়া গেল, এটি মনে হলেও বস্তুত পাওয়া যায় না। গোস্বামিপাদ টীকায় বললেন—ভগবানের প্রসাদ অর্থাৎ কৃপা তার লেশ অর্থাৎ কণাও যদি লাভ হয় তাহলেও ভগবানের তত্ত্ববোধ হবে—কিন্তু যুগ যুগ ধরে অনুসন্ধান করলেও যদি কৃপা না হয় তাহলে তত্ত্ববোধ হবে না। ভগবানের একপাদ বিভূতির দ্বারা যেমন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ধৃত হয়ে আছে—একাংশেন স্থিতো জগৎ—তেমনি তাঁর কৃপা কণামাত্র লাভ হলেও তত্ত্ব জানা হয়ে যাবে। ব্রহ্মা বললেন—পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি—চরণের প্রসাদ বলা হল কেন? ভগবানের শরীরের অন্যত্র কৃপার উল্লেখ করা হল না কেন? তার কারণ হল কৃপা তো দৈন্যময়ী তাই চরণেই থাকেন। মহাজনগণ তাই ভগবৎচরণারবিন্দেরই স্তুতিগান গেয়েছেন। সনকাদি মুনিগণ পৃথুরাজকে উপদেশ দান করে বলেছেন—কর্ম বা জ্ঞানমার্গে ভবসাগর পার হওয়া যায় না। কুকুরের লেজ ধরে সাগরপারের চেষ্টা করলে যেমন তা ব্যর্থই হয় এও তেমনি এতে ডুবে মরতে হয়—পার হওয়া আর হয় না। পৃথুরাজা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে চান তার জন্য ব্রহ্মজ্ঞানীর কাছে উপদেশ গ্রহণই

শ্রেষ্ঠ। তা না হলে অন্য কারো কাছে উপদেশ গ্রহণ করে লাভ নেই। সনকাদি ঋষিগণ বলেছেন--

যৎ পাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্নরিক্তমতয়ো যতয়োঽপিরুদ্ধস্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্ ॥

আরও বললেন—

কৃচ্ছ্রো মহানিহ ভবার্ণবপ্লবেশং ষড়্বর্গনক্রমসুখেন তিতীর্ষন্তি।
তৎ ত্বং হরের্ভগবতো ভজনীয়মঙ্ঘ্রিং কৃত্বোড়ুপং

ব্যসনমুত্তরদুস্তরার্ণম্। ভাঃ ৪।২২।৩৯-৪০

অবিদ্যা জীবের কর্মের থলিকে আত্মার সঙ্গে মমতা সূত্রে গেঁথে দিয়েছে। সেই গ্রন্থি সাধুরা অর্থাৎ বৈষ্ণবভক্ত ভক্তির দ্বারা ছিন্ন করেন—এই ছেদন যেভাবে হয়—সেরকম ছেদন সর্ব্বস্বত্যাগী—(রিক্তমতি) সন্ন্যাসীরা অন্য সাধনের দ্বারা করতে পারেন না। রিক্তমতি বলতে এখানে ব্রহ্মজ্ঞানীকে বুঝাচ্ছে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবিষয়িনী মতি অর্থাৎ সে মতি অর্থাৎ বুদ্ধি রিক্তই। স্রোত শব্দের অর্থ এখানে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়কে নিরুদ্ধ করে তারা যে সাধন করেন সে সাধনের দ্বারাও এমন করে অবিদ্যা গ্রন্থি ছেদন হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানীর অবিদ্যাগ্রন্থিই উন্মুক্ত হয় না—তত্ত্বানুভূতি তো অনেক পরের কথা।

এখন এর মধ্যে একটি কথা আছে—তত্ত্বানুভূতি না হলে তো অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন হবে না—আবার অবিদ্যাগ্রন্থি ছেদন না হলেও তত্ত্বানুভূতি হবে না। এটি বীজাঙ্কুরবৎ—বীজ থেকে অংকুর গাছ) না অংকুর (গাছ) থেকে বীজ—এর যদি মীমাংসা করতে যাওয়া যায় তাহলে মীমাংসা হবে না—অনবস্থাপ্রসঙ্গ এসে যাবে।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা বললেন—

তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

তাঁকে জানতেই হবে। তাঁকে না জানলে অবিদ্যানাশের কোন উপায়ই নেই ; যেমন আলো জ্বালা ছাড়া অন্ধকারনাশের অন্য কোন পথ নেই। অবিদ্যা থাকতে তত্ত্বানুভূতি হতে পারে না।

যাঁহা কাম তাঁহা নাহি রাম

যেখানে কামনা অর্থাৎ অবিদ্যা সেখানে রাম অর্থাৎ ভগবান নেই।

তাহলে এখন ব্যবস্থা কি? মায়া (অবিদ্যা) হল অন্ধকার আর কৃষ্ণ হলেন সূর্য্য। আলো এলে অন্ধকার যায় কিন্তু অন্ধকার থাকলে সূর্য্য উঠবে না—এ কথা তো বলা যাবে না। তবে ক্রমিকতা আছে। ভক্তের যেমন যেমন তত্ত্বানুভূতি তেমনি তেমনি মায়ার অন্ধকার যাবে অর্থাৎ প্রাকৃত বস্তুতে অরুচি বোধ হবে।

শ্রীএকাদশে প্রথম যোগীন্দ্র শ্রীকবি মহারাজ নিমিকে বলেছেন—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োহনুঘাসম্॥
ভাঃ ১১।২।৪২

এখানে একই সঙ্গে তিনটি জিনিষ দেখা যাচ্ছে—ভক্তি, পরেশানুভব এবং বিরক্তি (সংসারে বৈরাগ্য)—এ তিনটি আগে তার ছিল না—আগে মানে ভজনের আগে। কিন্তু যখন শ্রীগুরুচরণাশ্রয় পেয়ে ভজন করতে আরম্ভ করল তাঁর করুণায় অর্থাৎ প্রপদ্যমান (ভজমান) হল তখন তার এই তিনটি হতে দেখা গেল। ভক্তি (ভগবানে ভালবাসা) পরেশানুভব (ঈশ্বর অনুভূতি) এবং বিরক্তি সংসারে অর্থাৎ বিষয়ে বীতস্পৃহভাব—এই তিনটি হল। এখন এই তিনটি হয় বটে কিন্তু তাড়াতাড়ি বুঝা যায় না। কারণ অনাদিকাল হতে আত্মা উপবাসী আছে। মানুষ দেহ ছাড়া আত্মা অন্য কোন দেহে (পশু পাখী, কৃমি কীট পতঙ্গ স্থাবর জঙ্গম গুল্ম লতা) খাদ্য পায় নি। যখন আত্মা মানুষ দেহ পেল তখনই তার খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা। আত্মার খাদ্য হল হরিগুণকীর্ত্তন। আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন—হরিগুণকীর্ত্তনং হি আত্মনো ঘাসঃ। কারণ আত্মা তো চিৎ তাই তার খাদ্যও চিৎ হতে হবে। কারণ সজাতীয় খাদ্য ছাড়া কেউ বিজাতীয় খাদ্য নেয় না। গরুর খাদ্য খোলবিচুলি মানুষে তো নেয় না। এ জগতে চিৎ খাদ্য তো অন্য কিছু নেই। ভগবানের

নাম রূপ গুণ লীলা অর্থাৎ ভগবানের কথাই একমাত্র চিৎ—তাই আত্মার খাদ্য একমাত্র হরিগুণগান। মনুষ্য দেহ দুর্লভ। নিমিরাজ বলেছেন—

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।

তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥ ভাঃ ১১।২।২৯

এই মনুষ্য দেহ দিয়ে মুক্তি সাধন করিয়ে নেওয়া যায় তাই এই দেহ দুর্লভ। অন্য কোন দেহ দিয়ে তা হয় না। যেমন নারীর ভেতরে মাতৃত্বশক্তি পূর্ণমাত্রায় থাকলেও পুরুষসংযোগের অভাবে যেমন নারী বন্ধ্যা থাকে তেমনি মুক্তি উপযোগিণী মনুষ্যদেহও শ্রীগুরুকৃপা সংযোগ ছাড়া ফলপ্রসূ হতে পারে না। বহুদিনের ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যখন ভোজনে বসে তখন একটি একটি গ্রাস গ্রহণ করে—যদিও প্রতি গ্রাসেই তার তুষ্টি পুষ্টি ক্ষুন্নিবৃত্তির কিছু খুচরো অংশ থাকে—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন—প্রতি গ্রাসের কিবা কথা প্রতিসিক্থমপি—অর্থাৎ প্রত্যেকটি অন্নের দানাতে তুষ্টি পুষ্টি ক্ষুন্নিবৃত্তির একটু অংশ থাকে কিন্তু যে ভোজন করছে সে তখনই তা উপলব্ধি করতে পারে না। কখন উপলব্ধি হবে—অন্তত আধাআধি ভোজন হলে। অর্ধেক ভোজন হলে একটু অনুভবের মধ্যে আসে। এ যেমন ভোজন বিষয়ে—ভজন বিষয়েও তাই। অন্ততঃ আধাআধি ভজন হলে একটু অনুভবের মধ্যে আসে—কি অনুভব হবে এখানেও তিনটি ভক্তি ঈশ্বরানুভূতি এবং বিষয়ে বৈরাগ্য। ভগবানের প্রতিটি নাম গ্রহণের মধ্যেই ভক্তি ঈশ্বরানুভূতি এবং বিরক্তির কিছু খুচরো অংশ আছে কিন্তু সাধকের সেটি অনুভবে জাগে না। তবে অনুভব হবে যদি অন্ততঃ আধাআধি ভজন হয়। সূর্য্যের আলোর যত প্রখরতা মায়ার অন্ধকার ততই দূর হয়। অন্ধকার সরিয়ে যেমন সূর্য্য আনা সম্ভব নয় কিন্তু সূর্য্য এলে অন্ধকার সরে যায়। তেমনি মায়া সরিয়ে কৃষ্ণ আনা সম্ভব নয়। কিন্তু মজা এমনই কৃষ্ণ এলেই মায়া সরে যাবে। সাধুগুরুবৈষ্ণবের পায়ে

ধরে কৃষ্ণসূর্য্যকে হৃদয়ে উদয় করাতে হবে—তখন দেখা যাবে মায়া আপনিই সরে গেছে। ভক্তি আগে এলে অবিদ্যা গ্রন্থি আপনিই খুলে যাবে।

শ্রীএকাদশে ভগবান উদ্ধবজীকে বলেছেন—

যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধূয় মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্॥

ভাঃ ১১।১৪।২৫

সোনা যেমন ধাতুজ ময়লা দূর করে নিজেকে অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে পাবার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করে তেমনি ভক্তিযোগও আত্মার কর্মবাসনা ত্যাগ করিয়ে স্বরূপকে পাইয়ে দেয়। সাধারণে আত্মহত্যার জন্য আগুনে প্রবেশ করে আর সোনা আত্মাকে পাবার জন্য আগুনে প্রবেশ করে। এখানে আমাদেরও তেমনি ধাতুজাত ময়লা অর্থাৎ খাদ দূর করতে হবে অর্থাৎ কর্মবাসনা হতে মুক্ত হতে হবে। স্বরূপকে ফিরে পেতে হবে। শুদ্ধা ভক্তিযোগ এই দুটিই করে।

ভক্তির দুই অবস্থা। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমশাই বললেন—

অপক্কে সাধন গতি পাকিলে সে প্রেমভক্তি
পক্কাপক্ক মাত্র সে বিচার।

জীবেরও দুটি কাজ। বাসনাকে ধৌত করতে হবে—আর স্বরূপকে পেতে হবে। জীবের স্বরূপ হল নিত্য কৃষ্ণ দাস। অগ্নির দ্বারা যেমন সোনার ধাতুজ মল নাশ হয় আবার স্বরূপও প্রাপ্তি হয় এখানে জীবের পক্ষে অগ্নি হল ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগও তেমনি বাসনা কর্ম মালিন্য দূর করে জীবের স্বরূপ প্রাপ্তি করায়। এইজন্যই নামের মহিমায় বলা আছে—নামে অভাব মেটায়, স্বভাব জাগায়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কর্মানুশয় না হয় ভক্তিযোগের দ্বারা ধৌত হল কিন্তু স্বরূপকে প্রাপ্তি হবে কেমন করে? ভগবান বলছেন—অথ মাং ভজতি। তখন সে আমার ভজনা করে। স্বরূপ অনুভূতি

হয়ে গেলে সেবক আর সেবা ছাড়বে না। পিত্তবিকার রোগগ্রস্ত রোগীর পক্ষে মিছরি প্রথমে থাকে ঔষধের মত তেতো। পরে ঔষধ সেবন করতে করতে যখন রোগ ভাল হয়ে যায় তখন ঐ মিছরিই হয় সুখাদ্য পথ্য। তেমনি অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের পক্ষে ভক্তি অঙ্গ যাজন প্রথমে থাকে সাধন পরে অবিদ্যা সরে গেলে স্বরূপ প্রাপ্তি হবার পর —সে পরম পথ্যের মত ভক্তি অঙ্গ যাজন করে—অত্যন্ত আস্বাদন করে। তখন সেই সাধনই সাধ্য হয়ে যায়। এইজন্যই অপক্কদশার ভক্তির নাম সাধন ভক্তি আর পক্কদশায় সেই ভক্তিই হয় সাধ্যা ভক্তি। শ্রীল ঠাকুরমশাই বললেন—

অপক্কে সাধন গতি পাকিলে সে প্রেমভক্তি

এই প্রেমভক্তিই সাধ্যা ভক্তি।

ব্রহ্মা সিদ্ধান্ত করলেন—এই ভগবৎ তত্ত্বের অনুভূতি ভগবানের কৃপা ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হয় না। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ টীকায় বলেছেন—ব্রহ্মা তাঁর স্তুতিবাক্যে শ্রুতির বাক্য স্বরণ করাচ্ছেন। স্তুতিতে শাস্ত্র সমাবেশ দেখাচ্ছেন—শ্রুতি বলেছেন—নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। এখানে ব্রহ্মার স্তুতিবাক্যে শ্রুতি প্রমাণ দেখান হয়েছে। জীব ভগবানের কাছে এগিয়ে যায় না। কাউকে নিমন্ত্রণ করে আনতে হলে যেমন পান সুপারি দিয়ে সমাদর করে আনবার ব্যবস্থা আছে তেমনি ভগবানও কৃপারূপ পান সুপারি দিয়ে জীবকে সম্মান করেন। কিন্তু ভগবানের এই যে জীবকে সম্মান দান—কেন করেন? কারণ ভগবানের প্রতিজ্ঞা আছে—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। গীঃ ৪।১১

যে তাঁকে ভজনা করে তাঁকে তিনি সম্মান করেন। জীব ভগবানের কি করেছে যে ভগবান তাকে সম্মান করেন? এতে ভগবানের নিজের গরজ আছে। তিনি নিজেই বলেছেন—মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা—আমার ভক্তের পূজা আমা হতে বড়। আরও

বলেছেন—আমার ভক্তের দেহ আমা হতে বড়। ভক্ত দেখলে ভগবানের বড় সুখ হয়। ভগবান নিজেই উদ্ধবজীর কাছে মুক্তকণ্ঠে ভক্ত প্রশংসা করেছেন।

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ।

ন চ সংকর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥ ভাঃ ১১।১৪।১৫

উদ্ধব, তুমি আমার যেমন প্রিয়—এরকম প্রিয় আমার কেউ নয়—ব্রহ্মা, শঙ্কর, সংকর্ষণ—এমনকি মহালক্ষ্মী আমার অঙ্কশায়িনী বক্ষবিলাসিনী তিনিও আমার তত প্রিয় নন—আর বেশী কি বলব উদ্ধব আমার নিজের যে আত্মা অর্থাৎ নিজের যে স্বরূপ তাও আমার কাছে তত প্রিয় নয়—তুমি আমার যেমন প্রিয়। এখানে ভগবান উদ্ধবজীকে ব্যক্তিগতভাবে প্রিয় বলছেন না—কিন্তু উদ্ধবজী সমগ্র ভক্ত সমাজের প্রতিনিধি হয়ে বসেছেন। ভগবানের বাক্যের তাৎপর্য্য হল—ভক্ত আমার যেমন প্রিয় এরকম প্রিয় জগতে আর কেউ নেই।

ঋষি দুর্ব্বাসার কাছেও বৈকুণ্ঠনাথ বললেন—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।

মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ ভাঃ ৯।৪।৬৮

সাধুর (ভক্তের) হৃদয় আমার হৃদয় আমার হৃদয় সাধুর হৃদয়। ভক্ত আমাকে ছাড়া জানে না—আমিও ভক্ত ছাড়া জানি না। কারণ ভক্ত আমার জন্য স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য সম্পদ্ সব ত্যাগ করতে পারে। শ্রীদামবন্ধনলীলাতে মা যশোমতী যখন গোপালকে বাৎসল্য প্রেম-রজ্জুতে বাঁধলেন—তখনও শ্রীশুকদেব মন্তব্য করেছেন—মহারাজ গোপী যশোদা ভগবানের যে প্রসাদ লাভ করেছেন সে প্রসাদ (কৃপা) ব্রহ্মা শঙ্কর এমনকি মহালক্ষ্মী—কেউ পান নি।

ভক্ত ভগবানের এত প্রিয় তাই ভগবান নিজের গরজে ভক্ত তৈরী করেন। সেইজন্য ভগবানের কৃপায় তৈরী ভক্ত যখন ভক্তি অঙ্গ যাজন করে তখন ভগবান নিজে কৃপারূপ পান সুপারি দিয়ে তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। শ্রুতি একটি সর্ব্বনাম পদ (অস্পষ্ট) দিয়েছেন

—যমেব। সর্ব্বনাম পদ বলায় কোন নির্দ্দিষ্ট নাম করে বলা হচ্ছে না—এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে কেউ এই ভক্ত হতে পারে। এর জন্য কোন ব্যক্তি বিশেষের বাছাবাছি নেই। এইটিই সাধকের পক্ষে পরম ভরসা। কারণ কোন নির্দ্দিষ্ট পদ থাকলে কেউ ভক্ত হবার আশা করতে পারত না। মহারাজ বলেছেন—

এ মন কি করে বরণকুল

যেই কুলে কেন জনম হউক না—কেবল ভকতি মূল।

এর থেকেই বুঝা যাচ্ছে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ—কোন জাতির বিচার নেই—এমন কি শুদ্ধ মানুষ নয় পশুদেহেও ভক্তি হতে পারে। দৃষ্টান্ত কপিপতি শ্রীহনুমানজী। ভক্তি বলে যে কেউ তাকে লাভ করতে পারে।

জাতিকুলাচারে কি করিবে তারে সে হরি যে ভজে তারই।

শ্রুতি 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ' এই মন্ত্রে শ্রুতি ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রতি সকল সাধনকেই জবাব দিয়েছেন।

শ্রীশুকদেব আরও বলেছেন—

যদা যমনুগৃহ্লাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।

স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥

ভাঃ ৪।২৯।৪৬

আত্মভাবিত ভগবান যখন যাকে অনুগ্রহ করেন—এখানে আত্মভাবিত বলতে ভগবান যে জীবের সম্বন্ধে ভাবনা করেন—কি ভাবনা? ভগবান যার সম্বন্ধে ভাবেন—এ তো পড়ে পড়ে মায়ার লাথি খাচ্ছে—এবারে এ আমার পাদপদ্ম ভজুক এই ভাবনা যার সম্বন্ধে যখন করেন—যখন যাকে—যদা যম্—দুটিই সর্ব্বনাম অর্থাৎ অনির্দ্দিষ্ট পদ—তখন সে লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম সব ত্যাগ করে কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বললেন—

তখন সে লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয়।

ব্রহ্মার এই স্তুতিবাক্যে শ্রুতিকে প্রমাণস্বরূপে নেওয়া হয়েছে।

ন চান্য বলতে ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবন্ তোমার পাদপদ্মকৃপালেশ যাকে অনুগ্রহ করে নি এমন জন। একোঽপি শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে—নির্জনে একা থাকলেও তত্ত্ব বোধ হবে না—যদি কৃপা না হয়। চিরং বিচিন্বন্—শাস্ত্রমার্গে বিচরণ করেও অর্থাৎ অতৎত্যজন্ মার্গে বিচরণ অর্থাৎ অন্বেষণ করেও তোমার তত্ত্ব বুঝতে পারে না—যদি কৃপা না হয়। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, তুমি আরাধ্য তুমি উপার্জ্জনীয়—তোমার চরণের কৃপালেশই তোমাকে উপার্জন করিয়ে দেবে। এ ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। যেমন জলপিপাসায় যদি কাতর হই তাহলে ঘরে যদি আমার জল না থাকে তাহলে যার ঘরে জল সঞ্চিত আছে তার কাছেই জল চাইব। তেমনি ভগবানের কৃপা-বারি যে সাধু গুরু বৈষ্ণব তাঁদের হৃদয় ঘরে সঞ্চিত করে রেখেছেন কৃপাপিপাসু হলে আমরাও তাঁদের কাছেই প্রাণভরে সে কৃপাবারি ভিক্ষা চাইব।

ব্রহ্মার এই সিদ্ধান্ত যে ভগবানের কৃপা ছাড়া তাঁর তত্ত্ববোধ কখনও সম্ভব হয় না—এইটিই ভগবান তাঁর লীলাতে রূপায়িত করেছেন। কারণ এটি শুধু ব্রহ্মার সিদ্ধান্ত নয়, ভগবানের অনুমোদিত। ব্রজ-লীলা এবং নদীয়ালীলা এই দুই লীলাতেই এই সিদ্ধান্ত বজায় আছে। কারণ ব্রজলীলা এবং নদীয়ালীলা দুটি লীলা নয়—একই—মহাজন বলেছেন—উপরে ভাসে ব্রজলীলা ডুবিলে নদীয়া লীলা। যে ডুবে যায় সে নদীয়া লীলা পায়। তাই নিয়ম যা তা দুই জায়গায় সমান। ব্রজলীলায় দেখা গেছে বাক্‌পতি ব্রহ্মা বেদবক্তা ব্রহ্মা, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা সনকাদিঋষির পিতা ব্রহ্মা তাঁর তপস্যায়, পাণ্ডিত্যে সাধনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বুঝতে পারেন নি। ব্রহ্মারও তত্ত্ববোধ হয় নি। ভগবান তত্ত্ববোধ করাবার জন্য ব্রহ্মাকে চোখের সামনে দেখালেন—অঘাসুরের আত্মা কৃষ্ণচরণে লীন হয়ে গেল। ব্রহ্মা এটি নিজের চোখে দেখলেন—এতেও তাঁর কৃষ্ণকে ভগবান বলে মনে করার কথা। কারণ আত্মা তো ভগবানের চরণে ছাড়া আর কারও চরণে লীন হবে না। ব্রহ্মা দেখেও বুঝতে পারছেন না। সন্দেহ করলেন

—কৃষ্ণ খাঁটি ভগবান কি না। কারণ দেখে তো মনে হচ্ছে না। দেখতে একটি গোপবালক বলেই মনে হচ্ছে। পেটকাপড়ে বাঁশীটি গোঁজা, বগলের নীচে গরু তাড়াবার পাচনী, বামহাতের করতলে দইমাখা অন্নের গ্রাস—আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে পিলু ফল—বালক বাছুর নিয়ে গোচারণ করছেন—আবার সখাদের সঙ্গে হেসে হেসে পরিহাস করতে করতে ভোজন করছেন—তিনি আবার ভগবান হবেন কি করে? অথচ ঐ গোপবালকের চরণেই তো অঘাসুরের আত্মা লীন হল। তাহলে পরীক্ষা করতে হবে। যে পরীক্ষা করতে গিয়ে ব্রহ্মমোহনলীলা—তাতে ব্রহ্মা নাজেহাল হয়েছেন। তাহলে বুঝা যাচ্ছে তপস্যায় সাধনে, জ্ঞানে ভগবানের তত্ত্ব অনুভব হয় না—এ একমাত্র কৃপালভ্য বস্তু। ঐ ব্রহ্মার উপরে যখন ভগবানের কৃপা হল —তখন ব্রহ্মা কৃষ্ণের স্বরূপ উপলব্ধি করলেন—ভগবান কৃপা করে তাঁর অনন্তকোটি বাসুদেব মূর্ত্তি ব্রহ্মার চোখের সামনে প্রকাশ করেছেন—ব্রহ্মার চোখ ঝলসে গেছে—মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন—মূর্চ্ছা যখন ভাঙল দেখলেন সেই অনন্তকোটি বাসুদেব মূর্ত্তির একটিও নেই সেই আগে যাকে দেখেছিলেন—সেই কৃষ্ণ গোপবালক দাঁড়িয়ে আছেন। ব্রহ্মার তখন সকল গর্ব্ব অভিমান চূর্ণ হয়ে গেছে—চিত্ত দীনাতিদীন হয়ে গেছে এবং সেই দীন চিত্ত গলে গিয়ে আটটি নয়নের অশ্রুধারায় নেমে এসেছে যা দিয়ে ব্রহ্মা শ্রীবাল গোপালের চরণকমল ধুইয়ে দিয়েছেন—চারটি মাথা দিয়ে বারে বারে প্রণাম করেছেন। পরে অন্তর নিঙ্‌ড়ানো অনুভূতি দিয়ে শ্রীবালগোপালের চরণে বেদসার স্তুতি করেছেন—ব্রহ্মার প্রতিটি স্তুতিবাক্য তো তত্ত্বে ভরা। কারণ ব্রহ্মস্তুতি একখানি স্বয়ং সম্পূর্ণ শাস্ত্র—যাতে বৈষ্ণব দর্শনের সব সিদ্ধান্ত বলা আছে—এত তত্ত্বকথা ঐ ব্রহ্মা জানলেন কি করে—এ শুধু ভগবানের কৃপার ফল। তাই কৃপা ছাড়া ভগবানের তত্ত্ববোধ করার অন্য কোন পথ নেই। সূর্য্যের আলোতে যেমন সূর্য্য দেখা যায় অন্য আলোতে দেখা যায় না—তেমনি ভগবানের

কৃপা আলোকেই ভগবানের তত্ত্ব বুঝা যায়, অন্য কিছুতে বুঝা যায় না।

এর পরে তো ব্রহ্মা তাঁর ব্রহ্মসংহিতায় কৃষ্ণতত্ত্ব পরিপাটি করে বলেছেন যার প্রথম মন্ত্র—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ

অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অঃ

এ তো কৃষ্ণতত্ত্বের চরম পরম প্রকাশ। পরেও স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো দ্রুমাঃ

ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং কথা গানং নাট্যং গমনমপি

বংশী প্রিয়সখী চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ।

যে কৃষ্ণকে ব্রহ্মা গোপবালক বলেছিলেন—সেই কৃষ্ণকেই বলছেন—পরমপুরুষ—তাহলে কৃপা পাবার আগে এক অবস্থা—আবার কৃপা পাবার পরে আর এক অবস্থা দৃষ্টির কত তারতম্য। এই দৃষ্টি কৃপা ছাড়া হয় না। তাই ব্রহ্মা সেই দৃষ্টিকে বললেন—প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচন—(ব্রহ্মসংহিতা)। শ্রীমদ্ভাগবতে স্তুতি প্রসঙ্গে সেই চোখকে বললেন—গুর্ব্বর্কলব্ধোপনিষদ্সুচক্ষুষা—সুচক্ষু অর্থাৎ ভক্তি চক্ষু। প্রেমের অঞ্জন মাখান চোখ—এ চোখ ছাড়া তত্ত্ব দর্শন হয় না। আমরা শ্রীগুরুমহারাজ শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখে কীর্ত্তন প্রসঙ্গেও সিদ্ধান্ত শুনবার সৌভাগ্য লাভ করেছি—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।

কোনও কোনও ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥

মহাজনের এই পদের ওপর অক্ষর দিয়েছেন শ্রীল বাবাজী মহারাজ—

ত্রিকাল সত্য গৌর লীলা

আজও হতে সেই লীলা—ভাগ্যবান জনে দেখিছে—

এ ভাগ্যবানের লক্ষণ কি? শ্রীগুরুকৃপায় যাদের প্রেমনেত্রের বিকাশ হয়েছে সেই ভাগ্যবান জনে দেখিছে।

কৃষ্ণলীলায় দেবরাজ ইন্দ্রও কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝতে পারেন নি। কারণ তাঁর দেবরাজ বলে বড় অভিমান। কারণ অভিমান তত্ত্ববোধে বাধা দেয়। যেখানে যত বেশী অভিমান তত্ত্ববোধ তার কাছ থেকে তত দূরে। তাই অভিমানভরে ইন্দ্র অজস্র কৃষ্ণনিন্দা করেছেন—অবশ্য সে নিন্দা কৃষ্ণস্বরূপে লাগে নি। সব নিন্দাবাক্যই কৃষ্ণের স্তুতি হয়েছে। কারণ নিন্দা একটি দোষ। ভগবানের স্বরূপে কোন দোষ স্পর্শ করে না। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর পীঠক ভাষ্যে আঠার রকম দোষের কথা উল্লেখ করেছেন—এই আঠার রকমের দোষের কোনটিই ভগবানের স্বরূপকে স্পর্শ করে না—যেমন সূর্য্যকে অন্ধকার স্পর্শ করে না। পরে যখন ইন্দ্র ভগবানের কৃপা পেলেন—তখন কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝতে পেরে তাঁর চরণকমলে স্তুতি করেছেন। তাই ব্রজলীলায় দৃষ্টান্ত রয়েছে। নদীয়া লীলাতে তো দৃষ্টান্ত আছেই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করে নীলাচলে গেছেন একা একা গেছেন জগন্নাথদর্শন করতে—জগন্নাথ দর্শনে ভাবে বিহ্বল হয়ে প্রেমাবেশে শ্রীমন্দিরে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন—শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার যুগপৎ প্রকাশিত। শ্রীগোস্বামিপাদ বলেছেন—

বৈবর্ণ্য স্তব্ধতা আর গদগদ বাক্যোচ্চার
কম্প অশ্রু পুলক সঘর্ম।
এই সপ্ত সাত্ত্বিকভাব আর দুই অনুভাব
হাস্য নৃত্য সব প্রেমধর্ম॥
নবরত্ন অলঙ্কার অঙ্গে শোভে চমৎকার
হেরি জগন্নাথ প্রমুদিত।
সে রস যে নিরখিল সেই সে রসে মাতিল
মোর মন করে উন্মাদিত॥

শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দর মূর্চ্ছিত অবস্থায় আছেন—এমন সময় রাজপণ্ডিত শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্দিরে এসে তাঁকে দেখে বিস্মিত হয়েছেন—কে এই নবীন সন্ন্যাসী যাঁর স্বরূপে অষ্টসাত্ত্বিক

বিকার যুগপৎ প্রকাশিত—অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের কথা সার্ব্বভৌমের জানা আছে—কারণ পণ্ডিত লোক শাস্ত্র জানেন। কিন্তু অবাক হয়েছেন—কেন—কারণ এই আটটি ভাববিকার কোনও মানুষের দেহে তো হতে দেখা যায় না। এ সন্ন্যাসী কে? নিয়ে গেলেন তাঁকে নিজের আলয়ে—শুশ্রূষা করে যখন তাঁর বাইরের আবেশ ফিরে এল তখন পরিচয় নিয়ে জানতে পারলেন তিনি নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দৌহিত্র। তখন সার্ব্বভৌম বললেন—ও তুমি নিমাই তাহলে তো আমার স্নেহের পাত্র। কারণ তোমার মাতামহের সঙ্গে আমার বড় সখ্যতা সেই স্নেহসূত্রে আমি তো তোমার হিতৈষী। তবে তুমি অল্প বয়সে সন্ন্যাস নিয়েছ এখন এই সন্ন্যাস ধর্ম্ম পালন করবে কি করে—রক্ষা করবেই বা কি করে? কারণ সন্ন্যাসীর পক্ষে বেদান্ত শ্রবণ কর্ত্তব্য। আমি তো এই নীলাচলে বেদান্ত অধ্যাপনা করি। তাই তোমার হিত কামনা করে আমি তোমাকে বেদান্ত শোনাব। মহাপ্রভুর তো কোন প্রতিবাদ নেই—শুনতে বলেছেন—বললেন হ্যাঁ শুনব ভট্টাচার্য্য। সার্ব্বভৌম গৌরসুন্দরকে বেদান্ত শোনাচ্ছেন—মহাপ্রভুও শুনছেন সাতদিন হয়ে গেছে—কিন্তু গৌর হ্যাঁও বলেন না—নাও বলেন না—বুঝতে পারছি কি পারছি না—কিছুই বলেন না। সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করেন—নিমাই। তুমি তো কিছু বল না—বুঝতে পারছ কি পারছ না—কিছু তো বলবে। গৌরসুন্দর বলেন—ভট্টাচার্য্য, তুমি যখন বেদান্ত সূত্র অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র উচ্চারণ কর তখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি—কোন অসুবিধা হয় না—নির্ম্মল ভাস্করের মত বুঝতে পারি কিন্তু যখন তুমি তাকে অদ্বৈত পক্ষে জীব ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদন কর—নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞানে জীব সাধন করে করে সাধনের চরম দশায় সিদ্ধিকালে ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়—এই জীবব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদন কর—তখন আমি বুঝে উঠতে পারি না—ঐ নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান রূপ ভাষ্যমেঘ নির্ম্মল ভস্করকে ঢেকে দেয়—আমার বুদ্ধি গুলিয়ে যায় ভট্টাচার্য্য।

আমি বুঝে উঠতে পারি না—অণু চৈতন্য জীব সে বিভু চৈতন্য ব্রহ্ম হবে কি করে ? অণু কখনও বৃহৎ হতে পারে ? এটি আমার বুদ্ধি নিতে পারে না। বেদান্তীরা তাঁদের এই জীবব্রহ্মের অভিন্নতা মতবাদে দৃষ্টান্ত দেন—একঘটি জল সাগরে ঢেলে দিলে ঘটির জল সাগরে মিশে গেল—তখন ঘটির জল দাবী করতে পারে আমি সাগর হয়ে গেলাম। আরও দৃষ্টান্ত দেন—গৃহাকাশ মহাকাশে মিশে গিয়ে গৃহাকাশ বলতে পারে আমি মহাকাশ হয়ে গেলাম। এই দৃষ্টান্তে অদ্বৈত বেদান্তী জীবব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদন করেন। তাঁরা বলেন জীব অনুচৈতন্য বটে কিন্তু সে সাধন করে করে যখন সাধনের চরম দশায় অর্থাৎ সিদ্ধিকালে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবে তখন সে নিজেই ব্রহ্ম হয়ে যাবে—এইটিই জ্ঞানবাদীর মত—এর নামই নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান। কিন্তু আচার্য্য শংকর যিনি অদ্বৈত বেদান্তীর গুরু তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছে বেদান্ত ভাষ্যে আচার্য্য শংকর বললেন—জীব যতই ব্রহ্ম হোক কিন্তু ব্রহ্ম যে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্তা—জীব ব্রহ্ম হয়েও জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কাজ করতে পারবে না—শংকর বলেছেন—জগদ্ব্যাপারবর্জম্।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাই ভট্টাচার্য্যকে বলছেন—ভট্টাচার্য্য তোমার এ মত তো আমার বুদ্ধি নিতে পারছে না। কারণ ঘটির জল তো পরিমিত একসের না হয় দুসের না হয় পাঁচ সের—সে তো মহাসাগর ব্যেপে মিশতে পারছে না—তাহলে ঘটির জল কি করে বলতে পারে আমি মহাসাগর হয়ে গেলাম। ঘটির জল সাগরের একাংশে মিশতে পারে কিন্তু সে তো মহাসাগর হতে পারে না। গৃহাকাশও তেমনি পরিমিত সে মহাকাশে মিশতে পারে একাংশে কিন্তু মহাকাশ তো সর্ব্বব্যাপক (অবশ্য প্রাকৃত) গৃহাকাশ তো মহাকাশের সবটা ব্যেপে মিশতে পারছে না—তবে কি করে সে দাবী করতে পারে যে আমি মহাকাশ হয়ে গেলাম ? এইরকম যখন অবস্থা তখন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য্য এসে উপস্থিত—তিনি

এসে বলছেন ভট্টাচার্য্য, তুমি কাকে বেদান্ত শোনাচ্ছ ? ভট্টাচার্য্য বলছেন—কেন নিমাই, সে আমার স্নেহের পাত্র, অলপবয়সে সন্ন্যাস নিয়েছে—আমি তার হিতৈষী। তাই তার হিত কামনা করে তাকে বেদান্ত শোনাচ্ছি—কারণ সন্ন্যাসীর পক্ষে বেদান্ত শ্রবণ অবশ্য কর্ত্তব্য। গোপীনাথ বললেন—ভট্টাচার্য্য, তুমি ভুল করছ। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ আবির্ভূত হয়েছেন—অর্থাৎ বেদান্ত মূর্ত্তিমান—তুমি আবার তাঁকে বেদান্ত শোনাবে কি ? ভট্টাচার্য্য তো তা মানতে পারছেন না। বলছেন—গোপীনাথ তুমি নিমাইকে স্বয়ং ভগবান বলতে চাইছ ? তাঁকে ভক্ত বল, কোনও মহাপুরুষ বল, এমনকি ভগবানের কোন অংশ অবতার কলা অবতারও বলতে পার—স্বয়ং ভগবান বলছ কি করে ? বেদান্ত মূর্ত্তিমান বলতে তো স্বয়ং ভগবানকেই বুঝায়। ভগবান গীতায় পুরুষোত্তমযোগ প্রসঙ্গে শ্রীপঞ্চদশ অধ্যায়ে বলেছেন—

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।

গীঃ ১৫।১৫

গোপীনাথ বললেন, ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে আমি স্বয়ং ভগবান কেন বলছি জান, মহাপ্রভুর কৃপা আমার ওপর হয়েছে তাই বলছি কারণ কৃপা ছাড়া ভগবানের তত্ত্বযোধ কারও হয় না। তুমি স্বীকার করতে পারছ না ভট্টাচার্য্য যে মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান। কারণ তোমার ওপরে এখনও মহাপ্রভুর কৃপা হয় নি। যখন তোমার ওপর কৃপা হবে তখন তুমিও স্বীকার করবে মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান।

মহাপ্রভুর কৃপা যবে তোমা প্রতি হবে।
এ সব সিদ্ধান্ত তখন তুমিও করিবে॥

হলও তাই। শ্রীগৌরসুন্দর যখন সার্ব্বভৌমকে কৃপা করলেন—তখন ভট্টাচার্য্য তো স্বীকার করেছেন—তাঁরই তো মন্ত্র—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
আমাদের এই জপ এই তপ এই লব নাম॥

আরও বললেন—

বৈরাগ্যবিদ্যা নিজ ভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃপুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

পরে বললেন—

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

তাই কৃপা না হলে যে ভগবানের তত্ত্ববোধ হয় না—এইটিই স্থির সিদ্ধান্ত।

গৌরলীলায় আর একটি দৃষ্টান্ত কাশীতীর্থে শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বেদান্তকেশরী। তিনিও মহাপ্রভুর কৃপা পাবার আগে গৌর সুন্দরের সম্বন্ধে কত বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

নামে মাত্র সন্ন্যাসী মহা ইন্দ্রজালী।
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাব কালি॥
বেদান্ত শ্রবণ কর না যাইও তার পাশ।
উচ্ছৃঙখল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীধাম বৃন্দাবন যাবার পথে কাশীতীর্থে যান সেখানে মণিকর্ণিকা ঘাটে স্নান করলেন—তপনমিশ্র তাঁকে নিজের আলয়ে নিয়ে গিয়ে পারিপাটি করে সেবা করেছেন—পুত্র বালক রঘুনাথকে (পরে ছয় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীজী) দিয়ে মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করিয়েছেন। এমন সময় মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদের কাছে গিয়ে মহাপ্রভুর কথা বললেন। সরস্বতীপাদ তখন কাশীতীর্থে বেদান্ত অধ্যাপনা করেন—তাঁর খুব নাম ডাক—অনেক শিষ্য তাঁর। মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণের কাছে গৌরসুন্দরের খবর পেয়ে প্রকাশানন্দ সরস্বতী একটু অবজ্ঞাভরেই বললেন—'জানি জানি—বাংলাদেশের ভাবুক সন্ন্যাসী

চৈতন্য চৈতনা—হাসে কাঁদে নাচে গায়—ও আবার সন্ন্যাসী নাকি ? ও যাদুবিদ্যা দেখায় লোক ঠকায়। কেশবভারতী শিষ্য লোক প্রতারক। এ কাশীতীর্থ এখানে জ্ঞানবাদীর জায়গা এখানে ওসব বুজরুকি চলবে না—তাই ভাল বলছি—এখানে থেকে বেদান্ত শ্রবণ কর—ওসব লোকের কাছে যেও না—ও উচ্ছৃংখল—ওসব লোকের সঙ্গ করলে ইহলোক পরলোক দুইই নষ্ট হবে।

সরস্বতীপাদের মহাপ্রভু সম্বন্ধে এই বাক্য অবশ্য নিন্দার মতই শোনাচ্ছে। কিন্তু নিন্দা হবে না। তার দুটি কারণ। একটি তত্ত্বের দিক আর একটি হল লীলার দিক। তত্ত্বে ভগবানের স্বরূপকে কোন নিন্দা বাক্য স্পর্শ করে না। নিন্দা একটি দোষ। আঠার রকম দোষের কথা শ্রীবলদেব তাঁর পীঠক ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন—এই আঠার রকম দোষের কোনটিই ভগবানের স্বরূপে স্পর্শ করে না—যেমন অন্ধকার সূর্য্যকে স্পর্শ করে না। আর একটি হল লীলার দিক। এ দিক দিয়েও মহাপ্রভুতে নিন্দা হতে পারে না। কারণ যিনি এই বাক্য উচ্চারণ করছেন—শ্রীল সরস্বতীপাদ তিনি হলেন ব্রজলীলায় অষ্টসখীর একজন শ্রীতুঙ্গবিদ্যা সখী—কারণ ব্রজপরিকরই তো গৌরপরিকর হয়ে এসেছেন। এরাই তারা তারাই এরা। এই সেই সেই এই।

নন্দনন্দন শচীনন্দন
নবদ্বীপ বৃন্দাবন
পারিষদ সব গোপীগণ

সুতরাং তুঙ্গবিদ্যা সখী কখনও গৌর নিন্দা করতে পারেন না। তবে বাক্যটি নিন্দার মত শোনাচ্ছে। এটি ব্যাজস্তুতি—অর্থাৎ নিন্দা ছলে স্তুতি। শুনতে নিন্দার মত প্রকৃতপক্ষে কিন্তু স্তুতি। মহাজন স্তুতি পক্ষে ব্যাখ্যা করেছেন। গৌরসুন্দর তো নামে মাত্র সন্ন্যাসী বটেই—তাঁর সন্ন্যাস হবে কি করে ? সন্ন্যাস বলতে সম্যক্ ন্যাস অর্থাৎ ত্যাগ বুঝায়—কি ত্যাগ ? ত্যাগের মধ্যে গৌরব হল কামিনী এবং

কাঞ্চন। গৌরস্বরূপ তো কামিনী দিয়ে গড়া—রাধাকৃষ্ণ—মিলিত মূরতি। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি পাদ বললেন—

তাই রাধাভাব কান্তি ধরি রাধাপ্রেম গুরু করি
নদীয়াতে করল উদয়।

কাজেই মহাপ্রভুর স্বরূপে সন্ন্যাস হয় না। বলা আছে—

গোপীনাং কুচকুঙ্কুমেন নিচিতং বাসঃ কিমস্যারুণং
নিন্দৎ কাঞ্চন কান্তি রাস রসিকাশ্লেষেণ গৌরং বপুঃ।
তাসাং গাঢ়করাভিবন্ধন বশাৎ রোমদ্গমো দৃশ্যত
আশ্চর্য্যং সখি পশ্য লম্পটগুরোঃ সন্নাসিবেশাঙ্কিতো॥

তাই সরস্বতীপাদ ঠিকই বলেছেন—নামে মাত্র সন্ন্যাসী। মহা-ইন্দ্রজালী বলেছেন গৌরকে। গৌর তো মহা ইন্দ্রজালী বটেই। এমন ইন্দ্রজাল তো জগতে আর কেউ দেখাতে পারে নি। জগতে ঐন্দ্রজালিক নানা ইন্দ্রজাল দেখায়। শুকনো আমের আঁটি মাটিতে পুঁতে দেয় কাঠি ঠেকিয়ে—তার থেকে গাছ করে ফল ফলায়—লোককে ডেকে খাইয়ে দেয়। কিন্তু আমার গৌর যে ইন্দ্রজাল দেখিয়েছেন বনের পশু বাঘকে কৃষ্ণ বলে নাচিয়েছেন—এমন ইন্দ্রজাল আর কেউ দেখতে পারেন নি। কোথায় বনের পশু বাঘের জন্ম—আর কোথায় কৃষ্ণ বলে নাচা অর্থাৎ প্রেমিক ভক্তের জন্ম—এই দুই জন্মের মধ্যে কত ব্যবধান। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ব্যবধান মুহূর্ত্তে সরিয়ে দিলেন। কারণ গৌর হলেন ভাবনিধি। তিনি অভাবের সঙ্গ করেন না। শ্রীল বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করেছেন—

ভাবনিধি গৌরাঙ্গ আমার অভাবের সঙ্গ করে না।

ওমা ওর কি গরজ বালাই ভাবের অভাব দেখতে পারে না, স্বভাব জাগায়ে করে সঙ্গ।

বনের পশু বাঘের স্বরূপে যে অভাব—জীব নিত্য কৃষ্ণদাস—এই স্বভাবটি ফুটছে—এই স্বরূপের অভাব বাঘের দেহে। গৌর হলেন

স্বরূপ জাগান স্বরূপে—তাই গোর যখন বাঘের সামনে দাঁড়িয়েছেন—তখন তার এই অভাব দূর করে স্বভাব (জীব নিত্য কৃষ্ণদাস) জাগিয়ে দিলেন—জীব যেহেতু নিত্য কৃষ্ণদাস—তাই তার স্বভাব হল কৃষ্ণ বলে নাচা। এই স্বরূপ মহাপ্রভুর কৃপায় পশুযোনি বাঘ অনায়াসে পেয়ে গেল। এ যাদুবিদ্যা এক গৌরই দেখিয়েছেন আর কেউ দেখাতে পারে নি। তাই সরস্বতীপাদ বললেন—

নামে মাত্র সন্ন্যাসী মহা ইন্দ্রজালী

এটি তো মহাপ্রভুর পরম চরম স্তুতি। আর যে বললেন—কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালি—এ বাক্যটিকে কাকু অর্থাৎ স্বরভঙ্গী করে উচ্চারণ করতে হবে একটি প্রশ্নসূচক চিহ্ন দিয়ে।

কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাব কালি ?

কাশীতীর্থে তাঁর ভাবকালি বিকোবে না—তা তখনও হয়—নিশ্চয়ই বিকোবে তাই এটিও স্তুতি। কাশীতীর্থেই তো মহাপ্রভু ভাবকালি বিকালেন।

সরস্বতী আরও বলেছেন—

বেদান্ত শ্রবণ কর—না যাইও তার পাশ।
উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ॥

এখানে যতি চিহ্ন একটু পরিবর্ত্তন করতে হবে। বেদান্ত শ্রবণ কর না এখানে পূর্ণচ্ছেদ দিতে হবে—এর পরে যাইও তার পাশ—অর্থাৎ বেদান্ত মূর্ত্তিমান স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর আবির্ভূত হয়েছেন—তাঁর কাছে যাও আবার বেদান্ত শোনার কি দরকার ? কাজেই এও স্তুতি হল। আর যে বললেন মহাপ্রভু উচ্ছৃঙ্খল—তার সঙ্গ কর না—ওসব লোকের সঙ্গ করলে ইহলোক পরলোক দুইই নষ্ট হবে। এ তো স্তুতি বাক্য বটেই। গৌরসুন্দরকে উচ্ছৃঙ্খল বললেন। গৌর তো উচ্ছৃঙ্খল বটেই। কারণ উচ্ছৃঙ্খল বলা হয় যে শাস্ত্রের বিধি নিষেধ মানে না—মহাপ্রভু তো স্বয়ং ভগবান তিনি আবার শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানবেন কেন ? শাস্ত্রের বিধিনিষেধ

(নিগড়) এ তো জীবের জন্য—এ তো ভগবানের জন্য নয়। আর এক অর্থেও গৌরকে উচ্ছৃঙ্খল বলা হয়েছে—যিনি মায়ার শৃঙ্খল মোচন করেন উদ্‌গত করেন মায়ার শৃঙ্খল—তাই তিনি উচ্ছৃঙ্খল। কলিজীবের মায়ার বন্ধন মোচন করে তাকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধলেন।

যার গলায় ছিল মায়ার ফাঁস।
সে বলে আমি রাধাদাসী॥

সরস্বতীপাদ ইহলোক পরলোক দুইলোক নাশ হওয়ার কথা বলেছেন। দুই লোক নাশেরই তো দরকার। কারণ ইহলোক শুধু ত্যাজ্য তা নয় পরলোকও ত্যাজ্য। কারণ দুইই বন্ধন। মহাজন বলেছেন—স্বর্ণশৃঙ্খল আর লৌহশৃঙ্খল। দুইই যেমন বন্ধন এখানেও তেমনি মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে যেখানেই গতাগতি হোক্, দুইই বন্ধন—সুতরাং দুই দণ্ড তাই দুটিই ত্যাজ্য। শ্রীল ঠাকুর মশাই বললেন—ইহলোক পরলোক দুই পরিহরি। সুতরাং এটিও স্তুতি।

এইভাবে সরস্বতীপাদের প্রতিটি বাক্যই মহাপ্রভুর পক্ষে স্তুতি হয়েছে।

কাশীপুরে ভাবকালি বিকোবে না শুনে মহাপ্রভু বললেন—

ভাবকালি বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে।
গ্রাহক নাই না বিকায় লইয়া যাব ঘরে॥
তবে ভারী বোঝা আনিয়াছি কেমনে লইয়া যাব ?
অলপস্বলপ মূল্য পাইলে হেথায়ই বিকাইব॥

গৌর বললেন—সরস্বতী কি বলেছে ? এখানে ভাবকালি বিকোবে না ? কিন্তু কাশীতীর্থেই তো আমি ভাবকালি বিকোতে এসেছিলাম—তবে যদি গ্রাহক না পাই তাহলে যেখান থেকে এনেছি আবার সেখানে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। উপায় কি ? তবে বোঝা তো ভারী—রাধারাণীর প্রেম ভাণ্ডার এনেছিলাম কারণ বলা আছে—

রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
নিত্য আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥

এই গুরুভার আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাব? তাই কেউ যদি অল্পমূল্য দেয়—তাহলেও তাকে দিয়ে যাব—বোঝা তো আর বয়ে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না। প্রাকৃত জগতের একটি দৃষ্টান্ত দিলে বুঝা যাবে। পসারি অনেক দূর গ্রাম থেকে জিনিষপত্র মাথায় বয়ে নিয়ে হাটে আসে—হাট হয়ত সেই গ্রাম থেকে অনেক দূরে। সারাদিন হাটে জিনিষ বিক্রী করল—সন্ধ্যাকালে যখন হাট ভেঙ্গে গেল—তখন দেখা গেল—তার কিছু জিনিষ থেকে গেছে। তখন পসারি ভাবে এই জিনিষ আবার বয়ে বয়ে অতদূর গ্রামের পথে নিয়ে যেতে হবে—বয়ে নিয়ে যাওয়ার কষ্ট তো আছে। তাই যদি কেউ অল্পদাম দেয় তাহলেও দিয়ে যাব—লাভ না হয় কিছু কম হবে—কিন্তু কষ্ট করে আর বইতে তো হবে না। তেমনি মহাপ্রভু বলছেন—এখানে যদি কেউ অল্পমূল্য দেয় তাহলেও তাকে সেই গুরুবস্তু রাধারাণীর প্রেম দিয়ে যাব—আবার বয়ে বয়ে তো নিয়ে যেতে হবে না।

সরস্বতীপাদ তো অল্পমূল্যই দিয়েছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুরো নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তো উচ্চারণ করেন নি—বলেছেন 'চৈতন্য' 'চৈতন্য' তাহলে অল্পমূল্যই তো দেওয়া হল। তাতেও গৌরসুন্দর সরস্বতীপাদকে তো কৃপা করে গেলেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে গৌর যে সরস্বতীপাদকে কৃপা করেছেন—তার প্রমাণ কি? কারণ ঐ সরস্বতীপাদই তো গৌরকৃপা পাবার পরে বলেছেন—

অপ্যগণ্যং মহাপুণ্যমনন্যশরণং হরে-।
রনুপাসিতচৈতন্যমধন্যং মন্যতে মতিম্॥

যদি কেউ মহামহা অগণিত পুণ্য করে আর অনন্যচিত্তে কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি নেয়—কিন্তু সে যদি আমার গৌরচরণ না ভজে তাহলে আমার মতে তার বুদ্ধি (মতি) ধন্য হল না। এর থেকে কৃপা আর কি হতে পারে?

সরস্বতীপাদের এই মন্তব্যে মহাপ্রভুর কৃপা তাঁর ওপরে এর কি প্রমাণ পাওয়া গেল ?

সরস্বতীপাদ বললেন—কেউ যদি অগণিত মহামহাপুণ্য করে—যত পুণ্যই করুক তার ফল তো বিনাশী কারণ সব পুণ্যই তো প্রাকৃত। তাহলে সে ফল পেয়েই বা লাভ কি? তাতে তো বুদ্ধি (মতি) ধন্য হচ্চে না। এটি সরস্বতীপাদ ঠিকই বলেছেন। কিন্তু যে অনন্যাচিত্তে কৃষ্ণ পাদপদ্মে শরণাগতি নিয়েছে সে যদি গৌরচরণ না ভজে তাহলে তার বুদ্ধি ধন্য হল না—এটি সরস্বতীপাদ কি করে বলেন ? এটি বলেছেন মহাজন ফলের দিক্ প্রাপ্তির দিক্ বিচার করে। কারণ মানুষ সব সময় কাজ করে ফলের দিক্ বিচার করে। প্রাপ্তি কি হবে সে দিকে লক্ষ্য করে মানুষ কাজ করে। পরিশ্রম সেই একই করব—অথচ পাওনা কম নেব কেন ? কৃষ্ণভজনে পরিশ্রম আছে—কারণ বিনা পরিশ্রমে ভজন হয় না। আর গৌর ভজনেও পরিশ্রম কিছু আছে বৈ কি ? তবে পাওনা দেখতে হবে। কৃষ্ণভজনে প্রাপ্তি খুব বেশী হলে মুক্তি। আর গৌরভজনে গৌর ভক্ত মুক্তি তো অনায়াসে পাবেই উপরন্তু বেশী পাবে রাধারাণীর প্রেম। যে প্রেম সম্পদ কৃষ্ণ ভজলে মিলবে না। কারণ শ্রীশুকদেব বললেন—

মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।

এরই অনুবাদ করে শোনালেন—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ—

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া॥

কৃষ্ণ প্রেমভক্তি দেন না—এইটিই বলা আছে। কারণ প্রেমভক্তি তো তাঁকে বাঁধবার রজ্জু—কেউ নিজের বন্ধন রজ্জু যেমন ইচ্ছা করে কারও হাতে দিয়ে বলে না—আমাকে এই দিয়ে বাঁধ—কৃষ্ণও তেমনি প্রেমরজ্জু কারও হাতে তুলে দেন না। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ বললেন—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ—

এ প্রেম কোনকালে কেউ পায় নি—চিরকালের অনর্পিত—কোটিকল্প সাধনেও যা মেলে না। ব্রহ্মাদিরও সুদুর্লভ। সেই প্রেম শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণায়—তাঁর অভিন্ন তনু নিতাইচাঁদের করুণায় কলিজীব অনায়াসে পাবে।

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥

গৌরভজনে এত পাওনা—তাই সরস্বতীপাদ ঠিকই বলেছেন—যে আমার গৌর ভজে না—কৃষ্ণ ভজলেও আমার মতে তার বুদ্ধি ধন্য হল না। এটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়।

তাই ব্রহ্মা স্তুতি প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত করলেন—প্রভু, তোমার কৃপা লেশ হলে তখুনি তোমার সকল তত্ত্ব বোধ হয়ে যায় যা কোটিকল্প সাধনেও হয় না।

বাক্‌পতি ব্রহ্মার পরবর্ত্তী স্তুতিবাক্য—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥
১০।১৪।৩০

ব্রহ্মা বলছেন, হে নাথ, তুমি আমার প্রভু—তুমি নাথ, অর্থাৎ তুমি সব কামনা বাসনা পূরণ করে দিতে পার। তুমি সর্ব্বকামপূরক। গোপরামারাও গোবিন্দের শ্রীচরণের বিশেষণ দিয়েছেন—প্রণতকামদম্—যারা তোমার চরণে কৃষ্ণায় নমঃ বলে প্রণাম করে তাদের সকল বাসনা কামনার বস্তু তুমি দিতে পার। তবে জীব (মানুষ) তো নিজের অজ্ঞতা বশে কত কি চাইবে—ভগবান সে সব দেবেন কেন? প্রহ্লাদজী বলেছেন—প্রভু তুমি জীবের এ কাম্যবস্তু না দিলেও পার। কারণ তুমি তো জান জীব না জেনে এ প্রাকৃতবস্তু চাইছে—আর এ কাম্য বস্তু পেয়ে ভোগ করলে পথ ঘুরে আসতে হবে—তাতে তোমার কাছে পৌঁছুতে দেরী তো হবেই উপরন্তু পরিশ্রম

হবে—সময়ও যাবে—কাজেই তুমি না দিলেও পার—তবু দাও—কেন? কারণ তুমি জান জীবকে এই কামনার বস্তু তুমি যদি না দাও তাহলে তাকে দেবার আর কেউ নেই—তাই করুণা করে দাও। দিয়ে দেখ যে এই কাম্যবস্তু—পুত্র, অর্থ, স্বর্গ, যশ, আরোগ্য আয়ু পেয়ে সে তৃপ্ত হচ্ছে কিনা—কারণ এতে তো শুধু অতৃপ্তি—এ সব ভোগে তো তৃপ্তি নেই শুধু জ্বালা—তারপর ভোগ করে করে যখন তৃপ্তি পাবে না—তখন যদি সাধু গুরু বৈষ্ণবের করুণা হয়—তাহলে গোবিন্দপাদপদ্ম ভজবে। কারণ হরিভজন ছাড়া সুখ কিছুতে নেই।

ব্রহ্মা তাই প্রার্থনা করছেন, প্রভু আমি তোমার কৃপায় এই ব্রহ্মার পদমর্য্যাদায় আছি বটে, কিন্তু আমার যদি অন্য কোন পশু পাখীর জন্ম হয় কৃমিকীটের জন্ম হয়—তাতেও আমার কোন দুঃখ হবে না—সে জন্মও আমি বহু সৌভাগ্যের বলেই মনে করব—তবে একটা সর্ত্ত ঐ নিকৃষ্ট হীন জন্মে থেকেও যদি তোমার সেবক মধ্যে গণ্য হতে পারি—তাহলে আমার ভূরিভাগ্য অর্থাৎ প্রচুর সৌভাগ্য বলেই মনে করব। কারণ ভগবানের পাদপদ্মের সেবাসুখই তো জীবের প্রকৃত প্রাপ্তি। জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণদাস। দাস প্রভুর সেবা করবে তবে তো জীবের সার্থকতা—স্বরূপ প্রাপ্তি। সেবাসুখ যদি না পায় তাহলে ব্রহ্মার জন্ম পেয়েই বা কি লাভ—কোনও লাভ নেই। আর—কৃমিকীট পশু পাখীর জন্ম পেয়ে যদি ভগবানের পাদপদ্মের সেবাসুখ পায় তাহলেও তার প্রচুর ভাগ্য। তাই নকুলদেব পাণ্ডব গীতায় প্রার্থনা করেছেন—

যদি গমনমধস্তাৎ কর্ম্মপাশানুবদ্ধঃ
যদি চ কুলবিহীনে জায়তে পক্ষীকীটে।
কৃমিশতমপি গত্বা জায়তে চান্তরাত্মা
ভবতু মম হৃদিস্থে কেশবে ভক্তিরেকা॥

কর্ম্মবশে যদি আমার অধঃলোকে গতি হয়—শতশতবার যদি কৃমিকীট পক্ষীজন্ম লাভ করি—তাতেও ক্ষতি নেই—শুধু তোমার

চরণে এইটিই প্রার্থনা—ঐ হীন জন্মেও যেন তোমার চরণে হে কেশব আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে। পদকর্ত্তা বিদ্যাপতিও বলেছেন—

কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীটপতঙ্গে।
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতিরহু তুয়া পরসঙ্গে॥

করম বশে যে কোন জন্ম হোক্ মানুষ পশু পাখী কৃমিকীট তাতে কিছু ক্ষতি নেই কিন্তু মনটি যেন সর্ব্বদা তোমার চরণে থাকে।

বৈকুণ্ঠনাথ যখন সনকাদি ঋষিকে বললেন—তোমরা আমার জয় বিজয় দ্বারীকে অভিশাপ দিয়েছ—তাতে অপরাধ করেছ। অপরাধী ব্যক্তির দণ্ড পাওয়া উচিত—তা না হলে অন্যলোকে অপরাধ করতে সাহস করবে। আমি তোমাদের দণ্ড দেব। তখন ঋষিরা বললেন—দাও প্রভু তোমার দেওয়া দণ্ড আমরা মাথা পেতে নেব। ভগবান বললেন—যদি বলি তোমাদের অনন্তকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে—পারবে তোমরা সহ্য করতে—কারণ তোমাদের তো দণ্ড পাওয়া অভ্যাস নেই। তখন ঋষিরা বললেন—পারব প্রভু। অনন্তকাল নরকে থাকি আর যেখানেই থাকি সেখানে থেকেও আমাদের চিত্তরূপ অলি (ভ্রমর) যেন তোমার পাদপঙ্কজে মধুপান করে অর্থাৎ আমাদের মন যেন তোমার পাদপদ্ম স্মরণ করে। আর আমাদের—বাক্যরূপ তুলসী যেন তোমার চরণের শোভা হয়ে থাকে—অর্থাৎ আমাদের বাক্য যেন তোমার গুণগান করে। আর আমাদের কাণের ছিদ্র যেন তোমার গুণগাথায় পরিপূরিত হয়—আমাদের কাণ যেন তোমার কথা নিরন্তর শোনে। এর তাৎপর্য্য হল—নববিধা ভক্তি অঙ্গ যাজনের যে প্রধান তিনটি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ তাই ঋষিরা চাইলেন। মনের কাজ স্মরণ, জিহ্বার কাজ কীর্ত্তন আর কাণের কাজ শ্রবণ। তিনটি ভক্তি-অঙ্গ যাজন—শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ চাইলেন—এই ভজনের নামই তো ভক্তি। কারণ ভক্তি এবং ভজন ভিন্ন নয়। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি

বললেন—ভক্তিরস্য (গোপালস্য) ভজনম্। আর ভক্তি মানেই সেবা। বলা আছে ভক্তির্ভগবতেঃ সেবা। ভগবানের সেবার নামই ভক্তি। উদ্ধবজীও বলেছেন—

কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য।

অনন্ত অর্থাৎ ভগবানের কথারসে যদি চিত্ত না মজে তাহলে ব্রহ্মার জন্ম পেয়েও তো লাভ হচ্ছে না—আর ভগবানের কথারসে যদি চিত্ত মজে তাহলে ব্রহ্মার জন্ম পাওয়ারও কোন দরকার নেই। পশু পক্ষী কৃমি কীট জন্ম পেলেও তাতেও লাভ আছে। তাই ব্রহ্মা এখানে প্রার্থনা করছেন প্রভু তুমি যদি কৃপা করে আমাকে এমন একটি জন্ম পাইয়ে দাও—তা সে পশু পাখী কৃমি কীট তির্য্যক প্রাণী অতি হীন জন্মও যদি হয়—কিন্তু সেই হীন জন্ম তোমার সেবকমধ্যে গণ্য করে যদি আমায় নাও যাতে তোমার সেবকদের মধ্যে একজন হয়ে তোমার এবং তোমার ভক্তদের সেবাসুখ পেতে পারি তাহলে আমার জীবনে ভূরিভাগ্য অর্থাৎ প্রচুর সৌভাগ্য বলে মনে করব। এখানে এই প্রার্থনায় ব্রহ্মা আর একটি সিদ্ধান্ত করলেন—ভক্তসেবা ভগবানের সেবা থেকে কিছু কম নয়। বরং ভক্তসেবার ফল বেশী। উদ্ধবজীর কাছে গোবিন্দ বলেছেন মদ্ভক্তপূজাভ্যাধিকা। আমার ভক্তের পূজা আমা হতে বড়। আরও বলেছেন আমার ভক্তের দেহ আমা হতে বড়। মহারাজ অম্বরীষ হরিমন্দির নিজহাতে মার্জন করেন। সেখানে হরিমন্দির বলতে শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবান যেখানে বিরাজ করছেন তাকে তো হরিমন্দির বলা হবেই—আর ভক্তকেও হরিমন্দির বলা আছে। কারণ ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম। মহারাজ অম্বরীষ তাই ভগবানের সেবা এবং ভক্তসেবা একসঙ্গে করেন।

শিবপার্ব্বতী সংবাদে—পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করেছেন, হে দেবাদিদেব—জগতে কার আরাধনা সকলের বড়। শঙ্কর বললেন—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরাধনং পরম্।

যত দেব দেবী আছেন—সকলের আরাধনার মধ্যে বিষ্ণু অর্থাৎ

কৃষ্ণ আরাধনা সকলের উপরে। এতে পার্ব্বতীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল বটে কিন্তু শিবের বলবার অভিপ্রায় শেষ হয় নি। তাই ভিন্ন প্রক্রমে আবার বাক্য আরম্ভ করেছেন—

তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্।

কৃষ্ণ আরাধনার উপরেও বড় আরাধনা আছে দেবী। সেটি হল তাঁর ভক্তের আরাধনা। শ্রীচৈন্যভাগবত বলেছেন—ভগবানের আরাধনায় ফললাভ হবে কি না—সে বিষয়ে সন্দেহ আছে—কিন্তু ভক্ত আরাধনায় ফললাভ নিশ্চিত। শ্রীযোগীন্দ্রও তাই প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্তের লক্ষণে বললেন—যারা ভগবানের শ্রীবিগ্রহ শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করে কিন্তু ভগবানের ভক্তকে সাধুসন্তকে আদর করে না—তাদের বলা হয় কনিষ্ঠ ভক্ত বা প্রাকৃত ভক্ত। অর্থাৎ নিম্নস্তরের ভক্ত।

ব্রহ্মার এ বাক্যে তার প্রাণের দীনতা ফুটেছে। এই দৈন্যে কৃষ্ণ বশ। তাই ব্রহ্মা ভগবানের কৃপা পেয়ে গেছেন। ব্রহ্মার এমনই দীনতা যাতে বললেন—প্রভু, এ জন্মে যদি না হয় না হল—কিন্তু পরজন্মেও যদি তোমার এই কৃপা পাই—তাহলেও আমার প্রচুর সৌভাগ্য বলে মনে করব।

ব্রহ্মার নিজের দীনতায় অপরের সৌভাগ্য অনুভব করছেন। তাই বললেন—

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা যৎ তৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ।
ভাঃ ১০।১৪।৩১

এখানে ব্রহ্মা ভগবানকে সম্বোধন করছেন—হে বিভো। অর্থাৎ তোমার স্বরূপে তুমি ঐশ্বর্য্য ও মহিমায় পরিপূর্ণ—তোমার মহিমা বা ঐশ্বর্য্য—কোনটিরই কখনও অপূর্ণতা নেই। শ্রীজীবপাদ এখানে টীকায় বলেছেন—ব্রহ্মা এখানে ব্রজবাসীদের মহিমা দেখাচ্ছেন। একাংশের দ্বারা সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে। সমগ্র ব্রজবাসীর মহিমাই এর দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। ভগবানকে তুষ্ট করবার জন্য

সৃষ্টির আদি থেকে যত যত যাগযজ্ঞ আছে সবাই চেষ্টা করছে। ভগবান শ্রীমুখে বলেছেন—তিনি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা—"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" গীতা। ভগবান যজ্ঞেশ্বর তিনি অচ্যুত। অনাদি কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত সকল যজ্ঞই তাঁকে তৃপ্ত করতে চেষ্টা করছে কিন্তু পারে নি। যাগযজ্ঞ যে শুধু আমাদের এই পৃথিবীতে হয় তা নয়—চৌদ্দ ভুবনের সর্ব্বত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। তার মধ্যে আবার সব চেয়ে বেশী সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান হয় ব্রহ্মলোকে। সেখানে শাস্ত্র ঋষি, তীর্থ সব মূর্ত্তিমান হয়ে আছেন। সহস্রশীর্ষা পুরুষ সেখানে নিজহাতে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। ভগবানের প্রথম প্রকার অঙ্গীকার হল দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্যে যে ফল নৈবেদ্য নিবেদন করা হয় তিনি দৃষ্টিপাতের দ্বারা তা গ্রহণ করেন। এর নাম দৃষ্টিভোগ। কিন্তু তার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি তা নিবেদন করল ভগবানের ভোজন না হলেও তাকে ফল কিন্তু তিনি দেবেনই। এতে ভগবানের খাওয়া কিন্তু হল না। কিন্তু শাস্ত্র গোপনে আর একটি সংবাদ দিলেন যে ভগবান প্রেমিকভক্তের কাছে খান। গীতাবাক্যেও ভগবান বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ গীঃ ৯।২৬

পাতা, ফুল, ফল জল ভক্ত যখন ভক্তিমাখিয়ে আমাকে দেয় অর্জ্জুন—আমি তা খাই—এখানে দৃষ্টি দিই—এ কথা বলেন নি—বলেছেন খাই।

ভগবান পূর্ণকাম হলেও প্রেমিক ভক্তের কাছে তাঁর ক্ষুধা আছে। প্রেমিক ভক্তের প্রেমই পূর্ণকাম ভগবানের ক্ষুধাকে জাগিয়ে দেয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে ভগবানের আবার ক্ষুধা জাগে কি করে? ক্ষুধা জাগে তো অভাব থেকে। ভগবানের স্বরূপে তো কোন অভাব নেই। তিনি তো পূর্ণকাম। তাঁর স্বরূপে তো সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়েই আছে। ব্রহ্মা শিব সম্পদ্ লাভের জন্য যে লক্ষ্মীঠাকুরাণীর আরাধনা করেন

সেই লক্ষ্মীঠাকুরাণীও সম্ভ্রমের সঙ্গে মুকুন্দচরণ সেবা করেন। ভগবানের চরণের বিশেষণ দেওয়া আছে কোটিলক্ষ্মীসেবিত পাদপদ্ম। লক্ষ্মী আর কাউকে না পেয়ে মুকুন্দকে বরণ করেছেন। তাহলে এই মুকুন্দের চরণপদ্মের সম্পদ না জানি কত। প্রহ্লাদজী বলেছেন—ভগবান অবিদ্বানের পূজা গ্রহণ করেন না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অবিদ্বান বলতে কাকে বুঝাবে ? যে লেখাপড়া জানে না —তাকেই কি অবিদ্বান বলা হবে ? না, তা বলা হবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানকে ভজনা করেও বিষয় চায় তাকে বলা হবে অবিদ্বান। প্রাকৃত সম্পদ আমরা চাই কারণ প্রকৃত সম্পদ যে কি তা আমরা জানি না। প্রকৃত সম্পদ কি তা যদি আমরা জানতাম তাহলে প্রাকৃত সম্পদ চাইতাম না। যেমন যে ব্যক্তি হীরক দান করতে পারে তার কাছে যেমন কেউ বিচুলি চায় না তেমনি ভগবান যিনি আমাদের জন্মমৃত্যুর ক্লেশ নিবারণ করতে পারেন তাঁর কাছে আমাদের এই প্রাকৃত সম্পদ দেহের খাদ্য প্রার্থনাও অতি মূর্খতারই পরিচয়। সম্পদ চিনেছিলেন বাবা তারকেশ্বরের প্রেরিত ব্রাহ্মণ—তাই তিনি শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের কাছে পরশমণি পেয়েও তা যমুনার জলে ফেলে দিতে পেরেছিলেন। তাহলে মনে হবে অবিদ্বান যে ভগবানকে ভজে তাদের কি ভগবান ফল দেন না ? ভগবান তাদেরও ফল দেন। ভগবানের কাছে আঁচল পাতলে তিনি আঁচল ভরিয়েই ভিক্ষা দেন। এমন করে দেন যে তখন তাকে আর অন্যের কাছে আঁচল পাততে হয় না। কারণ ভগবান না দিলে যারা লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা চায় তাদের তো আর কেউ দেবার নেই। তাই ভগবান তাদের ফল দেন।

শ্রীগোবিন্দ গীতাবাক্যে অর্জ্জুনদেবকে বললেন—অর্জ্জুন, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী জ্ঞানী—এই চার প্রকার ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে—এরা সকলেই সুকৃতিমান। কারণ তারা অন্য দেবতার আরাধনা না করে কেবল আমাকেই ভজে তাই তারা সুকৃতিমান। এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল জ্ঞানীভক্ত কারণ আর্ত্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী এই

তিনজন বেশীক্ষণ আমার কাছে থাকে না। কামনা পূরণ পর্য্যন্ত থাকে। কিন্তু জ্ঞানীভক্ত বারবার আমাকে ভজনা করে। কারণ তার তো কোন কামনা নেই। এ জ্ঞানীভক্ত বলতে শুদ্ধ ভক্তকে বুঝান হয়েছে। সে ভগবানের কাছে কিছু চায় না। ভগবান সকলকেই উদার বলেছেন—কিন্তু এই জ্ঞানী ভক্ত অর্থাৎ শুদ্ধভক্তকে বললেন এই ভক্ত আমার বড় প্রিয়। উদার বললেন কেন? উদার বলতে বুঝায় দাতা এবং মহান্। তারা অন্য দেবতার আরাধনা না করে সকলের মূল কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজে তাই তারা মহান্। আর কৃষ্ণকে সুখ দান করে বলে তাদের দাতা বলা হল। ভক্তকে কিছু দিতে পারলে ভগবানের সুখ হয়। এখন ভক্ত তো ভগবানের কাছে কিছু চায় না—তাহলে ভগবান ভক্তকে দেবেন কি করে? তাহলে তো ভক্তকে ভগবানের কিছু দেওয়া হয় না। আর দিতে না পারলে তিনি সুখই বা পাবেন কি করে? এইজন্যই ভক্ত ভগবানের কাছে সেবাসুখ ভক্তি প্রার্থনা করে—তাতে ভগবানকে দানের সুযোগ দেন আর এইভাবে ভক্ত ভগবানের সুখ বিধান করে। ভগবান বললেন জ্ঞানীভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ভগবান বললেন—এই জ্ঞানীভক্ত আমার নিজের আত্মা-স্বরূপ। এই শুদ্ধভক্ত জানে ভগবান কল্পতরু—তাই তাঁর কাছে অন্য কোন জিনিষ চেয়ে লাভ নেই। তার প্রার্থনা তাই প্রভু তুমি আমার হয়ে থাক। ধ্রুব ভগবানকে স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন—হে ভগবন্, যারা তোমার উপাসনা করে দেহের ভোগ্যবস্তু অর্থাৎ মড়ার ভোগ্য (আত্মা ব্যতিরিক্ত দেহই হল মড়া) বস্তু প্রার্থনা করে আমার মনে হয় তোমার মায়া তাদের বুদ্ধিকে চুরি করে নিয়েছে। কারণ আত্মার খাদ্য পৃথক আর দেহের খাদ্য পৃথক্। আত্মাশূন্য দেহের ভোগ্যই হল মড়ার ভোগ্য। সিংহাসন পাওয়ার আশায় ধ্রুব তপস্যা আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু যখন তাঁর ভগবানের দর্শন লাভ হল তখন তিনি আর সিংহাসন চাইতে পারেন নি। ধ্রুব তখন বলেছেন,—হে ভগবন, আমি জানতাম যে আমার এই স্থূল দেহই শুদ্ধ আছে।

কিন্তু যে রূপের এক কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন—নরনারী করে আকর্ষণ —এই মুনীন্দ্রগুহ্য যে রূপ তোমার আছে তা তো আমার জানা ছিল না। তাই তোমার এইরূপের যখন দর্শন পেয়েছি তখন প্রাকৃত সিংহাসন পাওয়ার লোভ আমার আর নেই। কাঁচ খুঁজতে খুঁজতে কারও যদি দিব্যরত্ন লাভ হয় তাহলে তার কি আর কাঁচে আদর থাকে?

শ্রীজীবপাদ বললেন—এর থেকে তাহলে ধ্বনি উঠছে বিদ্বানের পূজা ভগবান গ্রহণ করেন। কিন্তু অবিদ্বানের পূজা যে ভগবান গ্রহণ করেন না তা নয় গ্রহণ করেন করুণা করে। প্রহ্লাদজী বলেছেন—করুণো বৃণীতে। অবিদ্বান্ ভগবানকে সুখী করবার জন্য পূজো করে না। কিন্তু নিজেরা সুখী হবে বলে পূজা করে। ভগবান কিন্তু তাদের পূজাও করুণা করে গ্রহণ করেন। কারণ ভাবেন যে আমি তাদের পূজা গ্রহণ না করলে এদের তো লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তি হবে না। তাই করুণা করে গ্রহণ করেন। তাঁর মনের এইভাব আমাকে পূজা করে তারা লাভ পূজা প্রাপ্ত হোক। পিতা যেমন সন্তানের অন্যায় জেনেও করুণা করে ক্ষমা করেন ভগবানও তেমনি করুণা করে অবিদ্বানের পূজা গ্রহণ করেন। কিন্তু ভগবান প্রেমিক ভক্তের পূজায় আনন্দ পান। প্রেমিক ভক্ত ভগবানকে দিতে চায়—তাঁর কাছ থেকে কিছু নিতে চায় না। যজ্ঞের দ্রব্য গ্রহণ কালে ভগবান শুধু দৃষ্টি দেন—কারণ তাঁর দৃষ্টি (যজ্ঞেশ্বরের দৃষ্টি) ছাড়া যজ্ঞ তো সম্পূর্ণ হবে না। কিন্তু ভগবানেরও ক্ষুধা আছে। তিনিও খান। সুদামাজীর কাছে ভগবান বলেছেন অভক্তের উপচার বহু হলেও ন মে তোষায় কল্পতে—আমি সন্তুষ্ট হই না—কিন্তু ভক্তের উপচার অল্প হলেও তা আমাকে আনন্দ দেয়। এইটিই আমার স্বভাব। তাই দুর্য্যোধনের নিমন্ত্রণের রাজ উপচার ফেলে বিদুরপত্নীর কলার খোসা বাৎসল্যপ্রেমমাখা ভগবান খেয়েছেন। গোবিন্দের অংশ জীব তাই এই স্বভাব জীবেরও আছে। সেও যেখানে আদর পায় না—সেখানে মহার্ঘ্য উপচার হলেও গ্রহণ করতে

চায় না। কিন্তু আদরের ক্ষুদ্র উপচার গ্রহণেও তার প্রীতি দেখা যায়। গোবিন্দের অল্পেতেই তুষ্টি। বলেছেন—

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

একপত্র তুলসী আর এক গণ্ডূষ গঙ্গাজল কেউ যদি কৃষ্ণায় নমঃ মাধবায় নমঃ মুকুন্দায় নমঃ বলে আমার চরণে অর্পণ করে তাহলে তার কাছে আমি ঋণ স্বীকার করি—এবং সেই ঋণ শোধের জন্য নিজকে তার কাছে বিকিয়ে দিই। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

আত্মা বেচি করে কৃষ্ণ ঋণের শোধন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রেমিকভক্তের কাছে ভগবানের ক্ষুধা জাগে। যার ফলে আদর করে ভোজন করেন। দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখের যেমন কোন স্বাতন্ত্র্য নেই মুখ যেমন যেমন করে প্রতিবিম্বও সেইরকম করে। এখানেও তেমনি ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে কে যে বিম্ব আর কে যে প্রতিবিম্ব তা বুঝা যায় না। ভক্তের যেমন যেমন ইচ্ছা ভগবান তেমনি ভাবে চলেন আবার ভগবানের যেমন ইচ্ছা ভক্ত তেমনি ভাবে চলে। ব্রহ্মস্তুতির দ্বিতীয় মন্ত্রেও ব্রহ্মা বলেছেন—প্রভু, তুমি স্বেচ্ছাময়—সেখানে স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করেছেন—স্বীয়ানাং ভক্তানাং যথা যথা ইচ্ছা তথা তথা ভবতঃ। প্রেমিকভক্তের প্রেম সকলের চেয়ে বলবান বস্তু—তাই তার কাছে ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। সর্ব্বব্যাপক গোবিন্দকে মা যশোমতীর প্রেমরজ্জু বেঁধে দিল। শ্রীশুকদেব বললেন—গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা। শ্রীজীবপাদ বলেছেন—প্রেম ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিকেও দুর্ব্বল করে। ভক্তের প্রেমে পূর্ণকাম ভগবানেরও অভাব বোধ জাগে। যার ফলে তার ক্ষুধা হয়। জগতে যত যত উপাসক আছে তার মধ্যে প্রেমজাত ভক্ত শ্রেষ্ঠ। আবার তাদের মধ্যে নিত্য পার্ষদ শ্রেষ্ঠ। নিত্য পার্ষদের মধ্যে আবার ব্রজবাসী শ্রেষ্ঠ। কারণ

বৈকুণ্ঠাদির নিত্য পার্ষদদের ভগবানকে দেওয়ার অপেক্ষা আছে। তারা দিলে ভগবান খান। কিন্তু ব্রজবাসীর ঘরে ভগবানের দেওয়ার অপেক্ষা নেই। লোভে পড়ে তাদের ঘর থেকে চুরি করে খান। তাই ব্রহ্মা বলছেন—ব্রজবাসী অতিধন্য। যাদের বস্তু ভগবান গ্রহণ করেন তারা ধন্য কিন্তু যাদের বস্তু ভগবান লোভে পড়ে খান তারা অতি ধন্য। এ সৌভাগ্য একমাত্র ব্রজবাসী ছাড়া আর কেউ লাভ করতে পারে নি।

স্তনদুগ্ধকে ব্রহ্মা এখানে বলেছেন—অমৃত। পূর্ব্ববর্ত্তী মন্ত্রে ব্রহ্মা বলেছেন—আমি অতি নিকৃষ্ট—তাই প্রার্থনা তোমার ভক্তের মধ্যে একজন হয়ে যেন তোমার পাদপদ্মের সেবা করতে পারি কিংবা তোমার ভক্তজনের যেন সেবা করতে পারি। এখানে ব্রহ্মার বাক্যে তাঁর দৈন্য প্রকাশ পেয়েছে। দৈন্য আসনেই ভক্তিমহারাণীর অধিষ্ঠান। যেখানে দৈন্য নেই সেখানে ভক্তি মহারাণীরও স্থান নেই। ব্রহ্মার মত ব্যক্তিও এই দৈন্য প্রকাশ করেছেন তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী—যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়—তাহার স্বরূপ বলি শুন রামরায়—এর পরেই বললেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

ব্রজবাসীভক্তের মধ্যে আবার রসের বিচার আছে। মধুর রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—যে জন্য তাকে বলা হয়েছে রসবিশেষ। সেই মধুররসের পরিকর ব্রজে রাধারাণী এবং ব্রজরামাগণ তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রহ্মা তো ভগবানের পুত্র সেইজন্য তিনি মধুররসের পরিকরের কথা উল্লেখ করতে পারেন নি। মধুররসের নীচেই যে বাৎসল্যরস তারই শ্রেষ্ঠত্ব দেখালেন। আর তা ছাড়া ব্রহ্মা তো শ্রীবালগোপালের স্তুতি করছেন তাঁর কাছে মধুররসের কথা তো বলা যায় না। আর বললেও ভগবানের বাল্যলীলার হানি হয়। বসুদেব দেবকী এবং নন্দ যশোদা দুজনেই ভগবানের মাতাপিতা হলেও বসুদেব দেবকীর শুদ্ধ

বাৎসল্য নয়—এটি খাঁটি নয়—জলমেশান অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত। তাঁরা ভাবেন ভগবান আমাদের পুত্র হয়েছেন। সান্দীপনি মুনির ঘর থেকে ফিরে এসে যখন কৃষ্ণ বলরাম বসুদেব দেবকীকে প্রণাম করতে যাবেন তখন তারা সরে গিয়ে বললেন—বাবা, তোমরা আমাদের শুধু পুত্র নও—তোমরা জগদীশ্বর। তাই তোমরা আমাদের প্রণাম কর না। এই ঐশ্বর্য্যবোধে বাৎসল্য রস মলিন হয়ে গেল। কিন্তু নন্দ যশোদার বাৎসল্য খাঁটি—এতে ঐশ্বর্য্যের গন্ধ মাত্র নেই। তাঁদের ভাব কৃষ্ণ আমাদের পুত্র—এর ওপরে ভগবত্তার বোধ মনের মধ্যে জাগছেই না। বিশুদ্ধ বাৎসল্যের চাপে ভগবত্তার বোধ তলিয়ে গেছে।

ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, বাৎসল্য প্রেম প্রার্থনা করবার যোগ্যতাও আমার নেই। আমরা কেবল তাঁদের স্তুতি করব। বাক্যের প্রথমেই ব্রহ্মা বলেছেন—অহো! কেন বললেন? শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন অহো এখানে আশ্চর্য্যজনক—অর্থাৎ বাক্য ও মনের অগোচর চমৎকারী। হে ভগবন্, তুমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ—ব্রজরমণীর দেহরস স্তন্যামৃত পান করেছ। তাও আবার অনুরোধ পড়ে নয়—মুদা অর্থাৎ আনন্দে পান করেছ। একটু আধটু পান করেছ তা নয় অতীব পান করেছ। পুনঃ পুনঃ পানে প্রতিক্ষণে ক্ষণে তোমার আনন্দের বৃদ্ধি হয়েছে। বাছুর হয়ে গাভীর দুগ্ধ পান করেছ—গাভীর বাঁটে মুখ দিয়েছ। কারণ এত লোভ যে দোহন করতে যেটুকু সময় লাগবে সেই কালের ব্যবধানও তোমার কাছে অসহ্য হয়েছে। ব্রহ্মা ভগবানকে বিভো বলে সম্বোধন করেছেন। অর্থাৎ হে ভগবন্ তোমার এতই লোভ যে লোভে পড়ে বহু স্বরূপ লাভ করেছ যাতে একজনের স্তনদুগ্ধপানও যেন বাদ না যায়। তুমি তো আনন্দঘন বিগ্রহ—আনন্দই তো তোমার স্বরূপ। কিন্তু সেই তোমাকেও তারা আনন্দ দিয়েছে। কাজেই তারা যে সচ্চিদানন্দময় তাতে তো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। তাদের দেহ যদি সচ্চিদানন্দময় না হত তাহলে

তাদের দেহরস পানে তোমার আনন্দ হত না। কারণ যে কোন জিনিষে তো তোমার আনন্দ হয় না। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন—ব্রহ্মা বলছেন—আমরা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি কিন্তু তাতে তৃপ্তি নেই—যাগযজ্ঞ তোমাকেও তৃপ্ত করতে পারে না। ব্রজবাসীরা অতি ধন্য। কিন্তু প্রভু একটা কথা তোমাকে বলতে চাই আমি যদি তোমার বালক বাছুর চুরি না করতাম তাহলে তো তোমার এই লোভ পূর্ত্তি হত না। অতএব প্রার্থনা তোমার করুণা যেন আমার ওপরেও কিছু হয়।

ব্রজবাসীর সৌভাগ্যের মহিমা বর্ণনা করে ব্রহ্মা বলছেন—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ ভাঃ ১০।১৪।৩২

শ্রীশুকদেব গোস্বামিচরণ ব্রহ্মার এই স্তুতিবাক্যে ব্রজবাসীর মহিমা বর্ণন করছেন। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, নন্দগোপব্রজৌকসাম্ অহোভাগ্যম্। নন্দমহারাজের ব্রজভূমিতে যারা বাস করেন তাদেরই অহোভাগ্য। সেখানে নন্দ মহারাজ সেখানকার ব্রজবাসীর এবং সমগ্র গোপজাতির ভাগ্যের সীমা নেই। ব্রহ্মা এখানে বললেন—নন্দগোপের ব্রজভূমিতে যাঁরাই বাস করেন তাদেরই অহোভাগ্য। এখানে ব্রজবাসী বলতে মানুষ ব্রাহ্মণ কোন জাতি বর্ণ, আশ্রম, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাস—কোনও আশ্রম বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র কোন বর্ণ সম্বন্ধে উল্লেখ নেই। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বললেন—ব্রজরমণীগণ এবং গোরমণীগণ যে শুধু ভগবানকে স্তন্যদান করবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তা নয় তারা মা যশোদার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মা যশোদার ভাগ্য বর্ণনা করতে গিয়ে শ্রীশুকদেব বলেছেন—পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ। ভগবান হরি যাঁর স্তন্য পান করেছেন। মা যশোদার এ কোন ভাগ্যের কথা শুকদেব বলছেন? আমরা যে প্রশ্ন করি প্রশ্ন করতে হয় বলে করি কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ যে প্রশ্ন করেছেন এ হল হরি চিনে প্রশ্ন করা।

তিনি হরিকে চিনে প্রশ্ন করেছেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে এ কেমন ভাগ্য—যার ফলে হরি তাঁর স্তন্যপান করেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ আরও প্রশ্ন করেছেন—নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্। মহোদয় অর্থাৎ মহান্ উদয়—উদয় বলতে তো বৃদ্ধি বুঝায়—এ কিসের বৃদ্ধি? মঙ্গলের কিম্ শব্দের দ্বারা অনির্ব্বচনীয় কিছু বুঝাচ্ছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ তো শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি শাস্ত্র অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে এমন কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের বিধান সেখানে দেওয়া হয় নি যার ফলে স্বয়ং ভগবান তাঁর স্তন্যপান করতে পারেন। কিংবা শাস্ত্রে থাকলেও মহারাজের জানা নেই। তাই তাঁর প্রশ্নের স্বরে অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়। নন্দগোপব্রজৌকসাম্ ব্রহ্মার এই বাক্য উচ্চারণের ফলে আমাদের স্বতঃই মনে হতে পারে তিনি নন্দমহারাজের ভাগ্য আগে বর্ণনা করেছেন—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়। যশোদা মায়ের ভাগ্যের কথাও বলা হয়েছে। তাঁরা অজ্ঞাত কোন পুণ্য করেছেন। অজ্ঞাত কোন কিছুর অনুমান করতে গেলে কোন লক্ষণের দ্বারা জানতে হয়। যেমন ধূম দেখে অগ্নির অনুমান করা হয়। পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ। এখানে যে তাঁদের অজ্ঞাত পুণ্য অনুমান করা হচ্ছে তার লক্ষণ কি? পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ—এইটিই লক্ষণ। এ লক্ষণটি মাত্র মা যশোমতীতেই প্রযোজ্য। তাই শাস্ত্র এটি বিশ্লেষণ করতে পারেন না। শাস্ত্রের এটি অজ্ঞাত। কারণ নিত্য পার্ষদের অনুষ্ঠান শাস্ত্র বলেন না। এখন মা যশোদার এই সৌভাগ্য সকল ব্রজরমণী ও গোরমণী পেয়েছেন ব্রহ্মমোহনলীলা প্রসাদে। তাই ব্রহ্মা বলছেন—ব্রজবাসীদের অহোভাগ্য। এই অহোভাগ্য শব্দটি এখানে দুবার বলা হয়েছে—এটি কি বীপ্সায় দ্বিরুক্তি? না। এই দ্বিরুক্তিটি হয়েছে পরমহর্ষে অথবা ব্রজবাসীর অতিশয় ভাগ্য বুঝাবার জন্য। ব্রহ্মা বলছেন—নন্দগোপের ব্রজভূমিতে যারা বসতি করে তাদের সকলেরই অহোভাগ্য। এখানে শুধু নন্দ বললেই তো হত—আবার 'গোপ' শব্দটি বেশী বসান হল কেন?

কারণ ব্রহ্মা তো বাক্‌পতি তিনি তো বেশী কথা বলবেন না। কারণ পরিমিত এবং সার কথা বলাই বাগ্মিতার লক্ষণ। তাই এখানে 'গোপ' শব্দের অর্থ করলেন—নন্দশ্চ গোপশ্চ অন্যে চ ব্রজৌকসঃ। অন্য ব্রজবাসী বলতে পশুপক্ষী কৃমি কীট সকলে। মহাজনের দৃষ্টিতে তরুলতা কৃমি কীট সকলেই ব্রজবাসী। বৃন্দাবনভূমি চিন্তামণিময় ভূমি এই বোধ হলে তবে এই সব ব্রজবাসীর প্রতি দৃষ্টি পড়ে। ব্রজভূমির প্রতিটি প্রাণীর উপরেই রাধারাণী এবং শ্রীগোবিন্দের সখ্য প্রীতি। ব্রহ্মা ব্রজভূমিতে তৃণজন্ম প্রার্থনাও অযোগ্য বিবেচনা করেছেন। কারণ ব্রহ্মা যখন তৃণজন্ম প্রার্থনা করেছেন—তখন শ্রীবালগোপালের বদন পানে চেয়ে দেখলেন তাঁর মুখখানি অপ্রসন্ন। তাতে ব্রহ্মা বুঝতে পারলেন—আমার এ প্রার্থনায় প্রভু সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তখন ভগবানেরই কৃপায় ব্রহ্মার অনুভব হয়েছে যে ব্রজের একটি রজঃকণা কোটি কোটি চিন্তামণিকেও তুচ্ছ করে। ব্রজের একটি তৃণকণা কোটি কোটি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করতে পারে। তখন প্রার্থনা ফিরিয়ে নিয়ে কাঠের পাটা বা পাথরখণ্ডের জন্ম চেয়েছেন। কিন্তু সে জন্মও ব্রহ্মা পান নি। শুধু প্রার্থনা করেছেন।

কত কত সিদ্ধ মহাপুরুষ সিদ্ধ মহাত্মা স্বরূপেও যুগল চরণরজঃ না পেয়ে ব্রজভূমিতে তৃণজন্ম নিয়ে বসে আছেন নিত্য যুগলচরণ পাবার আশায়। শ্রীল শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ আকুল আর্ত্তি নিয়ে গেয়েছেন—

ব্রজের একটি রজঃকণা কোটি কোটি চিন্তামণিকেও তুচ্ছ করে।
সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা যেথায় গুল্ম হতে বাঞ্ছা করে।

ব্রহ্মার বাক্যে 'অহো' পদটি এখানে অনির্ব্বচনীয় অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ ব্রজবাসীর যে ভাগ্য তা অব্যক্ত। ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। শ্রীবালগোপাল যেন প্রশ্ন করছেন, ব্রহ্মন্‌ তুমি তো বেদজ্ঞ ব্যক্তি তুমি কতজনকে ভাগ্য দান কর—ভাগ্যের খবর তো

তুমি জান। তুমি বলছ ব্রজবাসীর অহোভাগ্য। এ ভাগ্যের লক্ষণ কি? কোন ভাগ্যকে তুমি অহোভাগ্য বলছ? ব্রহ্মা তার উত্তরে বলছেন—পরমানন্দ সনাতন পূর্ণ ব্রহ্ম যাঁদের মিত্র তাঁদের ভাগ্যকেই আমি অহোভাগ্য বলছি। এখানে ব্রহ্মা কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করলেন না—কিন্তু বিশেষণগুলি বললেন এমন করে যার ফলে কৃষ্ণকেই বুঝান হয়েছে। এ বিশেষণ কৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোথাও যাবে না। পরমানন্দ বলতে পরমানন্দময় এ অর্থ করলেন না। কারণ তা বললে কৃষ্ণের স্বরূপ বুঝাত বটে কিন্তু তাতে তাঁর বৈশিষ্ট্য কিছু প্রকাশ পেত না। তাই অর্থ করলেন—পরমঃ আনন্দঃ যস্মাৎ। যিনি আনন্দের খনি—সাগরই যেমন জলের একমাত্র উৎস আনন্দের উৎসও একমাত্র তিনি। জগতের যত খণ্ড খণ্ড আনন্দ সব তাঁরই প্রকাশ। সুখময় কৃষ্ণ করেন সুখ আস্বাদন। ব্রহ্মা বলেছেন সংসারবন্ধন তাকে ততক্ষণই বাঁধতে পারে যতক্ষণ সে কৃষ্ণের নিজের জন না হয়। কৃষ্ণের নিজজন হওয়া মাত্রই অনাদিকালের মায়াবন্ধন মুহূর্তে ছেদন হয়ে যায় যেমন অমৃতসাগরে অবগাহন করলেই অনাদিকালের ত্রিতাপ জ্বালা মুহূর্তে দূর হয়ে যায়।

নরনারায়ণ ঋষিকে স্তুতি প্রসঙ্গে মদন বলেছেন—তোমাকে যারা পেয়েছে তারা পরম আত্মারামতাকে লাভ করেছে তাই তারা প্রাকৃত সম্পদকে স্পর্শ করে না। তারা তোমাকে প্রণাম করে—এর তাৎপর্য্য হচ্ছে তুমি এত বড় আত্মারাম যে তোমাকে প্রণাম করে করে তারা আত্মারাম হয়েছে। জল যেখানে যতই থাক সব জল যেমন সাগরেরই —তেমনি যত খণ্ডানন্দ আছে সব তোমারই অংশ। প্রাকৃত আনন্দ তাই প্রকৃত আনন্দ নয়। আনন্দের ছায়া মাত্র—তাই তাতে ভোগ নেই, সুখ নেই আছে শুধু জ্বালা। তোমাকে তারা প্রণাম করে কেন? প্রণাম বলতে শরণাগতিকেই বুঝায়। বাইরের জলকে বাড়ীতে আনতে গেলে যেমন নালিকা সংযোগে আনতে হয় তেমনি ভগবানের বা সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপাবারি দ্বারা অভিষিক্ত হতে হলে শরণাগতি-

রূপ সংযোগের প্রয়োজন—এই শরণাগতি নালিকাপথেই সেই আনন্দের খনি থেকে আনন্দধারা আমাদের কাছে আসবে এবং সেই আনন্দের ধারায় আমরা স্নাত হতে পারব। শাস্ত্র যে বলেছেন কৃষ্ণের যতেক গুণ ভকতে সঞ্চরে—এটি কেমন করে হবে? শরণাগতি নালিকা পথেই ভগবানের গুণ ভক্তে সঞ্চারিত হয়। ভগবান নিজেও বলেছেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গীঃ ৭।১৪

তাঁর উপর সম্পূর্ণ শরণাগতি হলেই তখন মায়া তাকে ত্যাগ করবে। এখানে ব্রহ্মা যে বললেন ভগবান পরমানন্দস্বরূপ—তাতে শোক দুঃখ সুখাল্পতা নিরস্ত হল। তাঁর থেকে প্রবাহিত হচ্ছে নিরন্তর যে আনন্দের ঝরণা তাতে স্নাত হলে তার কাছে আর শোক দুঃখ বা সুখের অল্পতা ঘেঁসতে পারবে না। এই আনন্দের ঝরণার স্রোতে ব্রজবাসী নিত্য স্নাত হয়। ভগবানকে বলা হয়েছে পূর্ণ—কৃষ্ণের মিত্র কেমন? তিনি পূর্ণ। এর দ্বারা প্রত্যুপকারাদিত্ব নিরস্ত হল। অর্থাৎ কৃষ্ণ যে কিছু প্রত্যুপকারের আশায় ব্রজবাসীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন তা নয়। কারণ তিনি পূর্ণ তাই তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ। ব্রহ্ম বলতে ব্যাপক বুঝায়। যিনি নিজে বড় এবং অপরকে বড় করেন। তাই তাঁকে ব্যাপক বলা হয়। এর দ্বারা কুত্রাচিৎ অলভ্যত্বাৎ নিরস্তম্। অর্থাৎ তিনি যদি সর্ব্বত্র ব্যাপক হন তাহলে এমন কোন জায়গা পাওয়া যাবে না যেখানে তাঁকে পাওয়া যাবে না।

রাসস্থলীতে যখন কৃষ্ণহারা হয়ে রাধারাণী এবং অন্যান্য ব্রজরামা কৃষ্ণ অন্বেষণ করছিলেন তখন তাঁরা পৃথিবীকে বলেছিলেন—পৃথিবী তুমি বহু তপস্যা করেছ তাই তোমার গোবিন্দবিরহ নেই। কারণ গোবিন্দ যেখানেই চরণ স্পর্শ করুন সেটি তোমা ছাড়া নয়। পৃথিবীর আবার তপস্যা কি? ভগবান বরাহ অবতারে যখন পৃথিবীকে উদ্ধার করলেন তখন পৃথিবী তাঁর বাহুপীড়ন সহ্য

করেছিলেন—এইটিই তাঁর তপস্যা। কৃষ্ণমিত্রকে ব্রহ্ম বলাতে এইটিই বুঝা গেল যে ব্রজবাসীর কাছে কৃষ্ণ কখনও হারিয়ে যান না। এখন এমন যদি কখনও দেখা যায় ব্রজবাসী কৃষ্ণ অন্বেষণ করছে তাহলে বুঝতে হবে এটি লীলা। বায়ুকে যেমন কখনও অন্বেষণ করতে হয় না—সেই রকম ব্রজবাসীরও কখনও কৃষ্ণকে অন্বেষণ করতে হয় না। ব্রজবাসীর এই মিত্র হলেন সনাতন অর্থাৎ নিত্য। অর্থাৎ এর দ্বারা ব্রজবাসীর কাছে যে কৃষ্ণ কখনও অপ্রাপ্য হন না সেটি বুঝা গেল। তাই গোস্বামিপাদ বললেন কদাচিৎ অপ্রাপ্যত্বং নিরস্তম্। যদ্বা—অথবা বলা হয়েছে পূর্ণং ব্রহ্ম ত্বং যেষাং মিত্রম্। দেবর্ষিপাদ নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন—মহারাজ পরম ব্রহ্ম আপনাদের ঘরে বাঁধা আছেন তাই মুনিঋষিরা খুঁজে খুঁজে আপনাদের ঘরে আসেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজা বলে মুনিনা আসেন তা নয়। ভগবান নরাকৃতিতেই আপনাদের ঘরে আছেন। পূর্ণ ব্রহ্ম বলতে কৃষ্ণকেই বুঝায়। কারণ পরিপূর্ণ ব্রহ্ম কৃষ্ণেতেই পর্য্যবসিত। এখানে পূর্ণ ব্রহ্ম বলতে বেদান্তের ব্রহ্ম নয়। শ্রীজীবপাদ বলেছেন —মুক্ত প্রগ্রহবৃত্ত্যা—ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিলে সে যতদূর যেতে পারে ততদূরকে বলা হয় মুক্তপ্রগ্রহবৃত্তি। তেমনি পূর্ণ পদকে যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে যতদূর পর্য্যন্ত পূর্ণ পদ গেলে—তার যাওয়ার নিবৃত্তি—সেই পর্য্যন্ত হল পূর্ণ পদের চরম অবস্থা। দেখা গেছে পূর্ণ পদ কৃষ্ণস্বরূপে গিয়ে থেমেছে এর ওপরে তার আর জায়গা নেই। তাই পূর্ণ ব্রহ্ম বলতে কৃষ্ণ স্বরূপেকেই বুঝতে হবে। পূর্ণ হল প্রগ্রহ আর ব্রহ্ম হলেন ভূমি। গোবিন্দেই পূর্ণের বিশ্রাম। কৃষ্ণ হলেন ব্রজবাসীর সনাতন মিত্র অর্থাৎ অনাদিকালের মিত্র। দুচারদিনের জন্য কোন কারণকে অপেক্ষা করে এ মিত্রতা নয়। এ হল চিরকালের মিত্রতা। এ বন্ধুত্ব কোন বিপদ থেকে ত্রাণ পাওয়ার জন্য নয় এ বন্ধুত্ব হল শুধু পরমানন্দ লাভের জন্য। কৃষ্ণ যে তাদের বন্ধু—তিনি যে ব্রজবাসীর কেবল বিপদ দূর করেন তা নয়

ব্রজবাসীকে পরমানন্দও দান করেন। অথবা আনন্দময় কৃষ্ণ ব্রজবাসীর কেবল মিত্রই—ন তু ঈশ্বরাদিকম্। ব্রজবাসী তাকে ঈশ্বর বলে মনে করেন না কারণ তাহলে প্রেম বিশেষের হানি হয়। যদ্বা পূর্ণং ব্রহ্ম অপি ত্বং যন্মিত্রম্। যে ব্রজবাসিনঃ মিত্রাণি যস্য ত্বম্—যে ব্রজবাসীরা তোমার মিত্র হয়েছে সেই তুমি ব্রজবাসীদের বন্ধু করতে বাধ্য হয়েছ তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্রজবাসীদের প্রেমের জোর বেশী। কারণ ভগবান তাদের মিত্র করতে বাধ্য হয়েছেন। যে ব্রজবাসিনঃ শুধু বললেন—রাধারাণী প্রভৃতি ব্রজরামার কথা বললেন না কারণ সেটি পরম গোপ্যঃ। যন্মিত্রম ব্রহ্মের বিশেষণ তাই ক্লীবলিঙ্গ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীজীবপাদ বলেছেন—ব্রজরমণী এবং গোপরমণীদের অহোভাগ্য। ব্রহ্মা বললেন ভগবান যখন তাদের স্তন্যপান করলেন তখন ধন্যতা। তাই বলে এটি বুঝাবে না যে এই ভাগ্য তাদের কদাচিৎ—কখনও কখনও এই ধন্যতা—তা নয়। এ ধন্যতা তাদের নিত্য। ব্রহ্মা বলছেন,—হে বালগোপাল তোমার মহিমা যে কেবল আমাদের বিস্ময়ের কারণ তা নয়—তোমার আরও মহিমা আছে—সমস্ত যজ্ঞ যার তৃপ্তি বিধান করতে পারেন নি সেই তুমি যাদের স্তন্যপান করলে —এইটিই বিস্ময়ের কারণ—এ ছাড়া আরও মহিমা আছে। যাদের স্তন্য ভগবান পান করেন নি তাদেরও মহিমা আছে। ভাগ্য অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় তৎপ্রসাদ। প্রাকৃত সম্পদের ভাগ্যকে সাধুগণ গণনা করেন না। যা ত্যাগ করতে শাস্ত্র উপদেশ দিয়েছেন তা যদি পাওয়া যায় তাকে ভাগ্য বলা যায় না। প্রাকৃত সম্পদ্ যা কিছু তাই ত্যাজ্য। তাই প্রাকৃত সম্পদ্ পেলে তাকে ভাগ্য বলা যায় না। কৃষ্ণ অনুগ্রহকেই একমাত্র ভাগ্য বলা যায়। কৃষ্ণ অনুগ্রহ যেখানে আছে সেই ভাগ্যবান। শ্রীল বাবাজী মহারাজ ভাগ্যের লক্ষণ করেছেন—ভাগ্যবান্ জনে দেখিছে—শ্রীগুরুকৃপায় যাদের প্রেমনেত্রের বিকাশ হয়েছে সেই ভাগ্যবান জনে দেখিছে। ফেলে দেওয়া থু থু যেমন

কেউ কুড়িয়ে খায় না—তেমনি সাধুগণ ত্যাজ্য বিষয়সম্পদকে গ্রহণ করেন না। কৃষ্ণ অনুগ্রহের চিহ্ন শাস্ত্র বললেন—

কৃষ্ণকৃপার হয় এক স্বাভাবিক ধর্ম।
রাজ্য ছাড়ি করায় তারে ভিক্ষুকের কর্ম॥

তাই সাধুভক্ত শত দারিদ্র্যক্লিষ্ট হলেও ভগবান তাকে সুখসম্পদ দান করেন না (ইচ্ছা করলে দিতে পারেন) তার ভক্তিকে রক্ষা করবার জন্য। কৃপণের ধনের মত সে ভক্তিরত্নকে অতি সযতনে রক্ষা করে। কৃপণের অবস্থার মত ভগবান তাঁর নিজ অনুগ্রহ রত্ন যেখানে রাখেন তার চারিদিকে দারিদ্র্যের বেড়া দিয়ে তাকে রক্ষা করেন।

ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, ব্রজবাসীকে তুমি যে করুণা করেছ তা হল অনির্ব্বচনীয় প্রসাদ। অর্থার্থী ভগবানকে ভজে অর্থপ্রাপ্তির আশায়। সাধক প্রথমে ফলশ্রুতি চায় প্রাকৃত সম্পদ, তারপর চায় মুক্তি। এর পরে নিত্যপার্ষদ গতি। এর পরের অবস্থা হল কৃষ্ণকে যারা বশীভূত করেছে। এরও পরের স্তরের সাধকের কথা আর শাস্ত্র বলেন নি। যারা কৃষ্ণকে বশীভূত করে তার তাড়ন ভর্ৎসন করে—তারা গালাগালি করে। শ্রীশুকদেব বলেছেন—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যৎ তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥
ভাঃ ১০।৯।২০

প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ গোপী যশোদা লাভ করেছিলেন—এখানে প্রসাদ শব্দের পরিবর্ত্তে 'যৎ' শব্দটি বসে নি। তাহলে যঃ পুংলিঙ্গ শব্দ হত। এখানে যৎ ক্লীবলিঙ্গ হয়েছে। অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় কিছু বুঝাচ্ছে। গোস্বামিপাদ টীকায় বললেন—মা যশোদা কৃষ্ণের প্রসাদ অর্থাৎ অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন—এটি বলতে শঙ্কা লাগে। কারণ ছেলে মাকে অনুগ্রহ করে না। বরং মা ছেলেকে অনুগ্রহ করেন—এইটিই স্বাভাবিক। কিন্তু সিদ্ধান্ত বজায় রেখে তো কথা বলতে হবে। শাস্ত্রে আছে—

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥

কৃষ্ণ একক ঈশ্বর—আর সকলেই তাঁর ভৃত্য। তাই সকলের ওপরেই তাঁর কর্তৃত্ব। সকলকেই তিনি কৃপা করেন। কাজেই তারা কৃষ্ণের কাছে যে অনুগ্রহ পাচ্ছে তা বুঝা যায়। কিন্তু মা যশোদাকে কৃষ্ণ যে অনুগ্রহ করেছেন সেখানে অনুগ্রহ দানের এমনই ভঙ্গী যে যশোদা অনুগ্রহপ্রার্থিনী বলে মনেই হয় না—বরং মনে হয় যে কৃষ্ণই অনুগ্রহপ্রার্থী। মায়ের হাতে লাঠি দেখে গোপাল ভয় পেয়ে বলছে—মা তোমার হাতের লাঠি ফেলে দাও মা—আমার বড় ভয় করছে। আমি এমন অপরাধ আর কখনও করব না। কৃষ্ণই এখানে অনুগ্রহ-ভিখারী। কিন্তু মায়ের হৃদয়ভরা যে বাৎসল্য তা কৃষ্ণেরই কৃপার দান। কিন্তু প্রকাশের ভঙ্গী—এমনই যে জগৎকে যেন জানতেই দিচ্ছেন না যে এটি তাঁর অনুগ্রহ। তাই শ্রীশুকদেব 'যৎ' 'তৎ' শব্দ বসিয়ে অনুগ্রহের অনির্ব্বচনীয়তাকে প্রকাশ করেছেন।

ব্রহ্মা প্রথমেই বললেন—অহোভাগ্য অহোভাগ্য—এ অহোভাগ্য যাদের তারা কারা? তার উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—নন্দগোপব্রজৌকসাম্—নন্দব্রজে যে সব ব্রজবাসী—তারা। 'অহো' পদটি আশ্চর্য্যবোধক। আশ্চর্য্য কেন আর এখানে ভাগ্যই বা কি? কারণ পরমানন্দ বস্তু যাদের মিত্র হয়েছে এর চেয়ে বড় সম্পদ আর হয় না। পরমানন্দ যাদের সঙ্গে প্রীতি করেন বন্ধুত্ব করেন।

আমাদের পক্ষে বিষয়ানুরাগ দুস্ত্যজ—বিষয়ানুরাগ আমরা ত্যাগ করতে পারি না—আর ব্রজরাজ্যে কৃষ্ণানুরাগ দুস্ত্যজ—ব্রজবাসী তারা কৃষ্ণানুরাগ ত্যাগ করতে পারে না। এই যে ত্যাগ করতে পারে না—এটি শুধু ব্রজবাসীর নয়—এ কৃষ্ণেরও। ব্রজবাসী যেমন কৃষ্ণ ছেড়ে থাকতে পারে না—কৃষ্ণও তেমনি ব্রজবাসী ছেড়ে থাকতে পারেন না। তাই উভয়ে উভয়ের দুস্ত্যজ। কৃষ্ণ ব্রজবাসীর স্বজন অর্থাৎ নিজজন। শ্রীশুকদেবও বলেছেন—গোপানাং স্বজনঃ।

জগতে দেখা যায় আনন্দ যেখানে আছে সেখানেই মানুষের বা জীবের প্রীতি হয়। আনন্দ কর্ত্তা হয় না—জীবই কর্ত্তা হয়। আনন্দ কউকে খুঁজতে যায় না—জীবই আনন্দকে খোঁজে। কিন্তু এখানে আনন্দ নিজে কর্ত্তা—পরিপূর্ণতম আনন্দ এখানে নিজে খুঁজে খুঁজে ব্রজবাসীর সঙ্গে মিত্রতা করেছেন। আনন্দময় ভগবানের এইটিই বৈশিষ্ট্য। আর এইজন্যই ব্রজবাসীর অহোভাগ্য—ব্রহ্মার এইটিই বক্তব্য। এ ভাগ্য একমাত্র ব্রজবাসী ছাড়া আর কারও হয় নি।

ব্রহ্মা ব্রজবাসীর সৌভাগ্য এইভাবে বর্ণনা করে তাঁদের করুণায় যে নিজেদের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে—তার উল্লেখ করছেন—

এষান্তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাবদাস্তামেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ শর্ব্বাদয়োহঙ্ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং তে॥

ভাঃ ১০।১৪।৩৩

ব্রহ্মা বলছেন—হে অচ্যুত তোমার একান্ত প্রিয় ব্রজবাসীজনের যে মহিমা তা আমি আর কত বর্ণনা করব—সে মহিমা স্পর্শ করবার অধিকার তো আমার নেই। কারণ তারা তোমার সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তি সর্ব্বদা দর্শন করে, স্পর্শ করে আবার প্রেমভরে তোমার নানাপ্রকার সেবা করে সুতরাং তাদের ভাগ্যের কি সীমা আছে? কাজেই তাদের মহিমা বর্ণন আমার মত ক্ষুদ্রবুদ্ধির পক্ষে দুঃসাধ্য। তবে তোমার কৃপায় এবং তোমার প্রিয় ব্রজবাসীজনের কৃপায় আমরা একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যে সৌভাগ্য লাভ করেছি তা তোমার একান্ত অনুগ্রহে একটু উল্লেখ করি। প্রাকৃত সম্পদ নিজে নিজে পাওয়া যায় কিন্তু অপ্রাকৃত সম্পদ কেউ দিলে পাওয়া যায়। আমরা যে একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই সৌভাগ্য লাভ করেছি—এটি তোমার প্রিয় ব্রজবাসীজন কৃপা করে আমাদের দিয়েছেন—তাই পেয়েছি। ব্রজবাসী আমাদের এ ভাগ্য দিয়েছেন। তাই ব্রজবাসীজনের ভাগ্য কে বলতে পারে? অর্থাৎ কেউ পারে না।

জীবমাত্রেই চক্ষুঃ কর্ণ, জিহ্বা ত্বক্‌, নাসিকা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়

বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কার এই চারটি অন্তরিন্দ্রিয় আছে—সবশুদ্ধ এই চৌদ্দটি ইন্দ্রিয়। জীব এই চৌদ্দ রকম ইন্দ্রিয় দিয়ে চৌদ্দ রকম বিষয় গ্রহণ করে থাকে। তার মধ্যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক দিয়ে রূপ, শব্দ গন্ধ রস ও স্পর্শ বিষয়কে গ্রহণ করে। আর চারটি অন্তরিন্দ্রিয় দিয়ে সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব এবং স্মরণ (মতান্তরে অভিমান, অধ্যবসায় সঙ্কল্প এবং নিশ্চয়) এই চারটি বিষয় গ্রহণ করে। কিন্তু জীবের এই যে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় সবই জড় সুতরাং তারা নিজেরা কোন বিষয় গ্রহণ করতে পারে না। এইজন্য ভগবান করুণা করে এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় দিয়ে চতুর্দ্দশ বিষয় গ্রহণের জন্য চতুর্দ্দশ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নিযুক্ত করে রেখেছেন। এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের চতুর্দ্দশ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই চতুর্দ্দশ বিষয় গ্রহণ করে দেহাভিমানী জীবকে তা আস্বাদন করান। জীব তার অজ্ঞতায় মনে করে আমিই বুঝি এই বিষয় গ্রহণ করে আস্বাদন করছি। এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কর্ণের দেবতা হলেন দিক্ অর্থাৎ আকাশ, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার প্রচেতা (বরুণ) নাসিকার অশ্বিনী, বাক্যের বহ্নি, হস্তের ইন্দ্র, পাদের বিষ্ণু, পায়ুর মিত্র, উপস্থের প্রজাপতি, মনের চন্দ্র, বুদ্ধির ব্রহ্মা, অহংকারের রুদ্র, এবং চিত্তের বাসুদেব অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

যদিও চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে—এখানে ব্রহ্মা তো একাদশ ইন্দ্রিয়ের উল্লেখ করেছেন—কারণ চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পায়ু এবং উপস্থ এই দুই ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎভাবে কৃষ্ণসেবায় সম্বন্ধ নেই বলে—আর তাদের যে ক্রিয়া তাও শ্লীলতা সম্পন্ন নয় তাই ব্রহ্মা তাদের এদের কথা কিছু বললেন না। আর চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাসুদেব সাক্ষাৎ কৃষ্ণেরই চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত বলে তাঁর নাম নিজেদের নামের মধ্যে করলেন না। এইজন্যই ব্রহ্মা চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কথা না বলে এই তিনজন বাদ দিয়ে একাদশ ইন্দ্রিয়ের

অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম উল্লেখ করেছেন। আমরা একাদশ ইন্দ্রিয়ের একাদশজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই কথা বললেন। 'একাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।' এখানে ব্রহ্মা বলেছেন—শর্ব্বাদয়ঃ—অর্থাৎ রুদ্র প্রভৃতি বলে উল্লেখ করলেন—রুদ্র প্রভৃতি—একাদশ ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—ব্রহ্মাও তো একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—তিনি নিজের নাম করলেন না কেন? ব্রহ্মা নিজে বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—কিন্তু নিজের নাম উল্লেখ করলেন না সংকুচিত হয়ে। কারণ ভগবানের বালকবাছুর হরণ করায় নিজেকে অপরাধী বলে বিবেচনা করেছেন—তাই ভেবেছেন—এঁদের মধ্যে অপরাধী আমার নাম যদি উল্লেখ করি তাহলে হয়ত ভগবান রুষ্ট হতে পারেন—রুদ্র (শর্ব্ব) ভক্ত তাই ভক্ত সম্বন্ধ নিয়ে যদি বলি তাহলে ভগবান সন্তুষ্ট হবেন—তাই বললেন শর্ব্বাদয় ব্রহ্মা বলছেন, প্রভু শুধু আমি একা নই—এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী একাদশ দেবতাই ভাগ্যবান হয়েছে। আমরা ইন্দ্রিয়রূপ পানপাত্রের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণপদ্মের মধুপান করব। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণকে পদ্মের সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে। সাদৃশ্য কোমলতা, রক্তিমাভা ও সৌগন্ধ্য। তবু প্রাকৃত পদ্মের সঙ্গে উপমা হয় না। ভগবানের চরণ হল অপ্রাকৃত। কৃষ্ণচরণ এত কোমল যে গোপরামারা তাদের কঠির বক্ষে রাখতে ভয় পান শঙ্কিত হন। কৃষ্ণচরণের সৌগন্ধ্য আত্মানন্দে বিভোর মুনিগণের নাসিকাকেও মাতিয়ে তোলে। আত্মারামাকেও আকর্ষণ করে নিজপাদপদ্ম সেবায় লুব্ধ করে।

আচ্ছা, পদ্ম বিকশিত হলে তো ভ্রমর আসে। কৃষ্ণচরণও যেখানে উদিত হয় সেখানে ভক্ত ভ্রমর আসে। এ চরণমাধুর্য্য এমনই যে বৈকুণ্ঠের অধিশ্বরী মহালক্ষ্মীও এতে লুব্ধ হন। লক্ষ্মীদেবীর বিলাসস্থান নারায়ণের বক্ষস্থল। কিন্তু কৃষ্ণচরণ সরোজে তাঁর এতই লোভ যে সেটিও ত্যাগ করে—লক্ষ্মীঠাকুরাণী এমনকি রমণীসুলভ শালীনতাও ত্যাগ করে চরণপংকজে সমাগত পুরুষভক্ত ভ্রমরের মাঝে

এসে উপস্থিত হয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কৃষ্ণচরণের অর্থাৎ পাদপদ্মের মধু বলতে কাকে বুঝাবে ? দাস অভিমান, অধ্যবসায় সঙ্কল্প, শব্দ স্পর্শ রূপ, রস গন্ধ (শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের) কীর্ত্তন, পাদসংবাহন, চরণসমীপে গমন এইগুলিই হল মধু। অর্থাৎ আনন্দদায়ী। এই মধুই অমৃত। পদ্মের মধু শব্দমাত্র উচ্চারণ করলে তো মিষ্টি লাগে না—জিহ্বায় না লাগান পর্য্যন্ত তার মাধুর্য্য বুঝা যায় না। কিন্তু কৃষ্ণপাদপদ্মের মধু নাম উচ্চারণ মাত্রে মধু সঙ্কল্পমাত্রে মধুরতা বোধ। অমৃত বলতে অত্যন্ত স্বাদু বুঝায়—অর্থাৎ সব ফেলে যা খাওয়া যায়। গোপরামারা বলেছেন—কৃষ্ণ, তোমার অধরামৃত ইতররাগবিস্মারণং নৃণাম্। কৃষ্ণপাদপদ্মের মধু আর সব আসক্তি ভুলিয়ে দেয়। তাহলেই বুঝা যাচ্ছে তার সব ফেলে কৃষ্ণচরণ আশ্রয় করা চলে। এর উদাহরণ হয়ে আছেন রাজর্ষি ভরত। তিনি সব ফেলে কৃষ্ণপাদপদ্ম মধুপান করেছেন। এমনকি মুক্তপুরুষও এই অচিন্তিত মধুপান করতে চান অবশ্য যদি তাঁদের উপর ভগবানের কৃপা হয়। আত্মারাম শ্রীশুকদেবের নাগাল না পেয়ে আচার্য্য বেদব্যাস 'বর্হাপীড়ং নটবরবপু'—এই মন্ত্ররূপ কৃষ্ণকথাকে পাঠালেন। কৃষ্ণরূপমাধুর্য্য কথাই তাঁকে ব্রহ্মানন্দ থেকে টেনে আনল—কৃষ্ণকথা এতই বলবতী যে ব্রহ্মানন্দ আত্মানন্দ থেকেও শুকদেবকে আকর্ষণ করে এনেছে। তাই শুকদেবের পরিচয় দিয়ে শ্রীসূতমুনি বলেছেন—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥ ভাঃ ২।১।৯

কৃষ্ণপাদপদ্মকে ব্রহ্মা বললেন আসব—অর্থাৎ মাদক। কৃষ্ণপাদপদ্মমধুপান মত্ততা আনে। তাই প্রেমিকভক্তকে যোগীন্দ্র বলেছেন—উন্মত্তবৎ। অর্থাৎ উন্মাদের মত। সে যখন লোকব্যবহারকে অপেক্ষা না করে হাঁসে কাঁদে নাচে গায় তখন আর উন্মাদের মত বললেন কেন ? উন্মাদই বললেন। না প্রেমিক ভক্ত উন্মাদ নয়—উন্মাদের মত। কারণ

প্রকৃত যে উন্মাদ তার সঙ্গে প্রেমিক ভক্তের পার্থক্য আছে। যে উন্মাদ —তার মস্তিষ্ক বিকৃত। সে অবস্তুকে বস্তুজ্ঞান করে—অর্থাৎ ত্যাজ্যকে গ্রাহ্য বুদ্ধি করে। সুস্থ মস্তিষ্ক যা ফেলে দেয় উন্মাদ তাকে পরম আদরে গ্রহণ করে। কিন্তু প্রেমিক ভক্তের মস্তিষ্ক বিকৃত নয়—সে ত্যাজ্যকে গ্রাহ্য বুদ্ধি করে না—অবস্তুকে বস্তুজ্ঞান করে না —বস্তুকেই বস্তুজ্ঞান করে গ্রাহ্যকেই গ্রাহ্য বুদ্ধি করে। বস্তু বলতে বুঝায় ভগবান এবং বাস্তব বলতে ভগবানের সম্পর্কিত যা কিছু বুঝায়। বরং আমরা যাকে গ্রাহ্য বুদ্ধি করি—লাভ পুজা প্রতিষ্ঠা, ধন সম্পদ তাকেও প্রেমিক ভক্ত থু থু করে ফেলে দেয়—কারণ এসবে ভগবানকে মেলে না।

যার গুণে ঝুরি ঝুরি রূপ সনাতন।
অতুল ঐশ্বর্য্য ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন॥
আবার যার গুণে ঝুরি ঝুরি রঘুনাথ দাস।
ইন্দ্রসম রাজ্য ছাড়ি রাধাকুণ্ডে বাস॥

তাহলে কথা হতে পারে প্রেমিক ভক্ত যদি বস্তুকেই বস্তুজ্ঞান করে আর অবস্তুকে অবস্তুজ্ঞান করে—ত্যাজ্যকে ত্যাজ্য বুদ্ধি করে আর গ্রাহ্যকে গ্রাহ্য বুদ্ধি করে—তাহলে তাদের আবার উন্মাদবৎ বলা হচ্ছে কেন? তাদের প্রকৃতিস্থই বলা হোক। প্রেমিক ভক্তকে উন্মাদবৎ বলা হচ্ছে তার কারণ হল—যে এই জগতের ব্যবহারের সঙ্গে তারা তাল রাখতে পারে না। জগতের স্তুতি নিন্দা মান অপমান তাদের স্পর্শই করে না। তারা এ সবেতে উদাসীন। তাই যদি কারও কৃষ্ণপাদপদ্মমধু পান করার পরেও উন্মত্ততা না আসে তাহলে বুঝতে হবে পান করা হয় নি। বিষ খেলে যেমন জ্বালা আছে তেমনি পান করলেও মত্ততা আছে। এইজন্যই ভক্ত ধ্রুব ভক্তিসুধা পানের প্রার্থনা করেছেন।

সংসার হল সাগর, বাসনা হল জল আর কামক্রোধাদি হল হাঙর কুমীর তার মধ্যে ভক্তবাৎসল্য করুণা—প্রভৃতি ভগবৎ কথা ভগবানের

কাছে পাওয়া যাবে না। কারণ ভক্তই তার ভাণ্ডারী। মধু পেতে হলে যেমন মধুকরের কাছে যেতে হবে—পদ্মের কাছে মধু মিলবে না। এখানেও হরিকথারূপ মধু পেতে হলে ভক্ত মধুকরের কাছে যেতে হবে—ভগবানের কাছে তাঁর কথা মিলবে না। এ সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা উন্মত্ত ব্যক্তি সব ভুলে যায় তেমনি গৌরগোবিন্দ বলে পাগল হতে না পারা পর্য্যন্ত যত দুঃখ—পাগল হতে পারলে আর কোন দুঃখ নেই। এ জগতের নেশা করে মানুষ দুঃখ ভুলবার জন্য। কিন্তু সে নেশা তো বেশীক্ষণ থাকে না। প্রাকৃত নেশা তো কেটে যায়—কিন্তু হরিকথায় যদি নেশা হয়—তাহলে সে নেশা তো কাটে না—বরং উত্তরোত্তর বাড়ে। জগতের সব দুঃখ কষ্ট আশা আকাঙ্ক্ষা এমনকি জাগতিক সুখ পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দেয়। সব ধর্ম ত্যাগ করে কৃষ্ণভজন—এটি ঠিক ত্যাগের পথ নয়। কারণ সব ধর্ম ত্যাগ করে তারপর শুদ্ধ হয়ে কৃষ্ণ ভজব এ হয়ে ওঠে না। সব ধর্ম ত্যাগ হয় না। ধর্ম থাক আর অধর্মই থাক সব নিয়েই কৃষ্ণভজন আরম্ভ করতে হবে। তখন আস্তে আস্তে সব ধর্ম ত্যাগ আপনিই হয়ে যাবে। জোর করে ত্যাগ করতে হবে না। অসুখ করলে কুপথ্য ত্যাগের ব্যবস্থা কবিরাজমশাই দেন কিন্তু এমন কবিরাজ কজন আছেন যার ওষুধ খেলে কুপথ্য নিজে চেষ্টা করে ত্যাগ করতে হবে না আপনিই ত্যাগ হয়ে যাবে। তাই ধর্মাত্মা হয়ে কৃষ্ণভজন করতে পারা যাবে না। কৃষ্ণভজন করতে করতেই ধর্মাত্মা হবে। শ্রীভগবান বললেন—

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ গীঃ ৯।৩১

যা দোষগুণ আছে থাক তাই নিয়েই কৃষ্ণভজন আরম্ভ করতে হবে। করতে করতেই দোষ সব চলে যাবে। গৌরগোবিন্দ নাম উচ্চারণই সব ঠিক করে দেবে। কারণ নাম এবং স্বরূপ তো অভিন্ন। স্বরূপ যেমন সব বিষয় থেকে নিজস্বরূপে টেনে নেয়—নামও তেমনি।

সব বিষয় থেকে মনকে তুলে নিয়ে নিজের আনন্দে ডুবিয়ে দেয়। নাম করবার পক্ষে যে যে বাধা থাকে নাম এতই বলবান যে সে ক্রমে ক্রমে সব বাধা সরিয়ে দেয়। নামের মহিমা সে উপলব্ধি করতে পারে যে স্থিরচিত্তে নাম করে। স্থির হয়ে নাম করতে করতে আস্বাদ কিছু পাওয়া যায়ই। নাম কিছুদিন করার পর মনে হয় যেন কই নাম তো কিছু দিল না। নাম দিয়েছে। এতদিন যে নাম করিয়ে নিয়েছে এইটিই তো নামের দেওয়া। তা না হলে আমাদের প্রাকৃত জিহ্বা তো অপ্রাকৃত নাম উচ্চারণ করবার সামর্থ্যও রাখে না। বিগ্রহ অপ্রাকৃত—বিগ্রহের সঙ্গে নাম অভিন্ন—তাই নামও অপ্রাকৃত—তাই সেই অপ্রাকৃত নাম আমাদের প্রাকৃত জিহ্বা উচ্চারণ করবে কি করে? জিহ্বা যে নাম উচ্চারণ করছে এইটিই নামের করুণা—এইটিই নামের দেওয়া। আর তা ছাড়া নাম আনন্দও দিয়েছে—কারণ নাম করতে করতে এমন হয় যে তখন নাম না করে থাকা যায় না। প্রতিটি অন্নের দানা যেমন দেহের পুষ্টি, মনের তুষ্টি এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির কারণ তেমনি প্রতিটি নাম উচ্চারণ আত্মার তুষ্টি পুষ্টি এবং প্রাকৃত ক্ষুধা (কামনা) নিবৃত্তি করে। তাই ব্রহ্মা বলছেন, হে বালগোপাল, তোমার পাদপদ্ম-মধু আস্বাদন প্রাকৃত আসক্তি সব ভুলিয়ে দেয়। জীবের একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে আমরা তোমার পাদপদ্মমধু অমৃত আসব পান করব। আত্মাই ভাবনায় বিষয় ভোগ করে—বিষয়ের ভোক্তা আসলে হল মন—এই মনকে আত্মা খুব ভালবাসে—তাই মনের ভোগ আত্মা নিজের ভোগ বলেই মনে করে। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তো ভোক্তা নন। তবে ব্রহ্মা এ কথা বললেন কেন? আমরা অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে ভোগ করি। জীবের বুদ্ধি (মন, বুদ্ধি চিত্ত অহংকার) ইন্দ্রিয়ের দেবতা হলেন ব্রহ্মা। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ভোগ এখানে উপচারে বলা হয়েছে। কারণ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা যদি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত না হন তাহলে ভগবানের রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ এই অপ্রাকৃত বিষয় পঞ্চকের গ্রহণ হয় না। তাই

দেবতাদের এই ভোগ উপচারে। উপচারে তাদেরই ভোক্তৃত্ব। বস্তুত কিন্তু ব্রজবাসীর ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মাদি নন। কারণ ব্রজবাসীর ইন্দ্রিয় তো অপ্রাকৃত। ব্রহ্মাদি যে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তারা তো সকলে প্রাকৃত। তাই তারা ব্রজবাসীর অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দেবতা হবেন কি করে ? তবে যে ব্রহ্মা বললেন—আমরা অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে তোমার (কৃষ্ণের) পাদপদ্মমাধুর্য্য আস্বাদন করি এটি সাধারণের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতার সাদৃশ্যে বলা হয়েছে। অনেক সময় দেখা যায় মিথ্যাপবাদের দ্বারাও বস্তুসিদ্ধি হয়ে থাকে। যেমন রাধারাণীর কৃষ্ণকলঙ্ক মিথ্যা ভাবে প্রচারিত হওয়াতেও রাধারাণীর আনন্দ হচ্ছে যে আমি কৃষ্ণদাসী—এতে তাঁর কৃষ্ণদাসী অভিমান সিদ্ধি হয়েছে—এটি প্রেমের বিলক্ষণ সিদ্ধি। তাই প্রাকৃত দেবতা হয়েও ব্রজবাসীর ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা এই মিথ্যাপবাদের দ্বারা আমরা যে কৃষ্ণ পাদপদ্মমধুপান করব এই অভিমান সিদ্ধি হচ্ছে। আর এইটি মনে করে—ব্রহ্মা আনন্দ পাচ্ছেন।

শ্রীজীবপাদ আবার বলেছেন—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা ব্রজবাসীর চরণসুধা পান করছি। কারণ ব্রজবাসীর চরণসুধা কৃষ্ণচরণসুধার চেয়ে উৎকৃষ্ট। রঘুপতি উপাধ্যায় তাই শ্রুতি স্মৃতি মহাভারত সকলকে ছেড়ে দিয়ে নন্দমহারাজকে বন্দনা করেছেন—অহমিহ নন্দং বন্দে। নন্দমহারাজের এত মহিমা কেন—পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্র যাঁর অলিন্দে বাস করে। ব্রজবাসীর প্রেমে কৃষ্ণ একান্ত বশীভূত—তাই তাঁদের ভজনা করতে হবে—তাঁদের করুণা লাভ হলে কৃষ্ণ করুণা অতি সহজে মিলবে। যেমন নিতাই করুণা পেলে গৌরকৃপা অনায়াসে পাওয়া যায়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাই বললেন—

হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাই পায়।

ব্রজলীলাতেই তাই—রাধে রাধে বলতে হবে। রাধারাণীর কৃপা হলে কৃষ্ণকৃপা অনায়াসে পাওয়া যাবে।

ব্রজবাসীর ভাগ্যমহিমা বর্ণনা করবার পর ব্রহ্মা নিজের ভাগ্যের কথা বলবেন। ভাগ্যের লোভে তাদের মধ্যে প্রবেশের ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু ব্রহ্মা ভাবছেন এতে তো আমার অধিকার নেই। ব্রজবাসীর মধ্যে যাতে কোন একজন হতে পারেন—এ প্রার্থনা ব্রহ্মা আগেই শ্রীবালগোপালের চরণে জানিয়েছেন—বলেছেন—

যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্।

ব্রজবাসীর মধ্যে কেউ হতে পারলেই পরম সিদ্ধি হল। কাজেই এটি পরম লোভের বস্তু। কিন্তু কেমন করে সেটি পাওয়া সম্ভব হবে? তাই ব্রজবাসীর পাদরজঃ প্রার্থনা করছেন। ব্রজবাসীর পাদরজঃস্পর্শে অধিকার সিদ্ধি হতে পারে। নতুবা ব্রজবাসীর একজন হওয়া বড় দুর্লভ।

শ্রীদামবন্ধন লীলায় শ্রীশুকদেব সিদ্ধান্ত করেছেন—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ভাঃ ১০।৯।২১

ব্রজবাসীর আনুগত্য ছাড়া ব্রজের কৃষ্ণ পাওয়ার কোন উপায় নেই। একমাত্র ভক্তিমার্গেই তিনি সুলভ—তা ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ।

তাই ব্রহ্মা কাতরে প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং যদ্গোকুলেঽপি
কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ
শ্রুতিমৃগ্যমেব॥ ভাঃ ১০।১৪।৩৪

বাক্‌পতি ব্রহ্মা এই মন্ত্রে নিজের দৈন্য চরমভাবে প্রকাশ করে কাতরে প্রার্থনা করছেন—প্রভু, তোমার এই ব্রজভূমিতে যদি যে কোন একটি জন্ম আমাকে পাইয়ে দাও কৃপা করে তাহলেও আমার ভাগ্যকে আমি প্রচুর ভাগ্য বলে মনে করব। এখানে কতম জন্ম বলেছেন—যে কোন একটি জন্ম—স্বামিপাদ অর্থ করলেন—যস্য কস্য। অর্থাৎ একটি নিকৃষ্ট জন্ম—যেমন তৃণ, গুল্ম জন্ম। খড়কুটো—নিকৃষ্ট

তো বটেই—তাকে তো কেউ গণনা করে না। এখানে বুঝা যাচ্ছে কৃষ্ণকৃপায় ব্রহ্মার বস্তুর বোধ হয়েছে তাই ব্রহ্মা মূল্য দিয়েছেন। আর বস্তুর মহিমাবোধের নামই বস্তু প্রাপ্তি। কৃষ্ণ যেন বলতে চাইছেন, ব্রহ্মন্ এ তোমার কেমন কথা। ব্রজে একটি তৃণ গুল্ম জন্ম পেলে তোমার ভাগ্যকে প্রচুর ভাগ্য বলে মনে করবে—কেন তোমার ভাগ্যের কি সীমা আছে? এক এক করে বলি। কৃষ্ণ অবশ্য কথা বলে বলেন নি—যেন মৌন দৃষ্টিতে বলতে চাইছেন—ব্রহ্মন্ প্রথমতঃ তুমি আমার নাভিকমলে জন্মেছ—আমার পুত্র বলে শিষ্য বলে তোমার পরিচয়—এ তোমার এক বড় সৌভাগ্য। তার উপর তুমি চার মুখে চারখানি বেদ বলেছ—এ ভাগ্যও তোমার কম নয়। তুমি এক ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, তুমি লোকপিতামহ। তুমি দেবর্ষিপাদ নারদের পিতা সনকাদিঋষির পিতা—এত সৌভাগ্য থাকতে ব্রজে একটি তৃণ গুল্ম জন্ম পেলে তোমার প্রচুর ভাগ্য লাভ হবে বললে এ তোমার কোন বিচার? তোমার ভাগ্যের কি তুলনা আছে? ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু যত ভাগ্যের অধিকারীই আমি হয়ে থাকি—কিন্তু তোমার কৃপায় যদি তোমার ব্রজভূমিতে যে কোন একটি জন্ম অর্থাৎ তৃণ গুল্ম—একটি নিকৃষ্ট জন্ম পেতে পারি তাহলে তার কাছে আমার কোন ভাগ্যকেই গণনা করি না। ভগবান অবশ্য ব্রহ্মার এ প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হন নি। বরং মৌনদৃষ্টিতে যেন বলছেন—ব্রহ্মন্ তোমার স্পর্দ্ধা তো বড় কম নয়। তুমি ব্রহ্মভূমিতে এই তৃণ গুল্ম জন্ম প্রার্থনা করছ কি করে? কারণ তুমি কি দেখনি যে ব্রজের একটি তৃণকণা কত শক্তি ধরে। তারা তোমার মত কোটি কোটি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করতে পারে। তোমার প্রার্থনা ফিরিয়ে নাও। তুমি তো বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাইছ। তুমি যেমন সেই অধিকার অনুযায়ী প্রার্থনা কর। তখন ব্রহ্মার ওপরে ভগবানের অলক্ষ্যে কৃপা হয়ে গেছে—তাই দৃষ্টি খুলে গেছে। তাই সেই দৃষ্টি দিয়ে ব্রহ্মা দেখছেন—হ্যাঁ তাইত—ব্রজের একটি তৃণকণা তো আমার মত কোটি কোটি ব্রহ্মাকে

সৃষ্টি করতে পারে—তখন লজ্জা পেয়ে প্রার্থনা ফিরিয়ে নিচ্ছেন—বলছেন প্রভু তৃণগুল্ম জন্ম নয়—আর তোমার ব্রজভূমিতেও নয়—কিন্তু ব্রজভূমির প্রান্তভাগে যেখানে অন্ত্যজ শ্রেণী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ নাম করে করে বলেছেন—হাড়ি ডোম চণ্ডাল—এইসব নীচ জাতি বাস করে তাদের ঘরের সামনে একখানি কাঠের পাটা বা পাথর খণ্ড করে যদি আমার জন্ম দাও তাহলেও আমার ভাগ্যকে আমি প্রচুরভাগ্য বলে মনে করব। ভগবান যেন বলতে চাইছেন, ব্রহ্মন্—তোমার লজ্জা করছে না? তুমি একজন উঁচুদরের লোক—তোমার এই হীন জন্ম চাইতে লজ্জা করছে না? আর এতে তোমার কি লাভ হবে? ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, লাভ কি হবে জান? হতে পারে তারা হীন জাতি কিন্তু তারা ব্রজবাসীতো বটে—তাদের ঘরের সামনে যদি তোমার কৃপায় একখানি কাঠের পাটা বা পাথর খণ্ড হয়ে পড়ে থাকতে পারি—তাহলে তারা যখন সারাদিনের কাজের পরে ঘরে ফিরবে তখন আমার মাথায় চরণ রেখে তারা ঘরে যাবে—তখন তাদের অর্থাৎ ব্রজবাসীর চরণধূলি মাথায় পেয়ে ধন্য হব—এইটিই আমার লাভ। ব্রজবাসীর চরণরজঃ পাওয়া এইটিই চরম লাভ। এই ব্রজবাসীর মহিমা ব্রহ্মা ঠিক ঠিক ভাবে অনুভব করেছেন—তাই বলতে পেরেছেন—ব্রজবাসীর নিখিল প্রাণ হলেন গোবিন্দ। ব্রজবাসী অন্নজল গ্রহণ করে বটে—কিন্তু অন্নজল তাদের প্রাণ রক্ষা করে না। মুকুন্দই তাদের প্রাণ। তাহলে এখানে প্রশ্ন হতে পারে—কৃষ্ণবিরহে ব্রজবাসী কেমন করে বেঁচে থাকলেন?

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন—

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম শুদ্ধ জাম্বুনদ হেম
এই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ কদাপি না হয় বিয়োগ
বিয়োগ হইলে কেহ না জিয়য়॥

ব্রজবাসীর কৃষ্ণপ্রেমে তাই বিরহ হতে পারে না। ব্রজবাসীর অন্তর্দশায় অনবরত কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয়। কৃষ্ণ সত্যিই তাদের কাছে আসেন। ব্রজবাসীর কাছে কৃষ্ণ প্রেম নিয়ে আসেন তাঁদের বাঁচানোর জন্য। শ্রী বলদেব বলেছেন—কৃষ্ণ এলে ব্রজবাসীকে না দেখে দুঃখ পাবে তাই কৃষ্ণবিরহেও ব্রজবাসী বেঁচে থাকে। ব্রজবাসীর বাঁচবার কারণ আর অন্য কিছু নয় তাদের নিখিল জীবিতই হলেন মুকুন্দ। অদ্যাপি অর্থাৎ অত্র অবতীর্ণেঽপি সাক্ষাৎভাবে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন কিন্তু আজও শ্রুতিগণ তাঁকে অন্বেষণ করছে। অর্থাৎ শ্রুতি (বেদাদি শাস্ত্র) তাঁকে পায়নি পেলে তো আর অন্বেষণ কাজ হয় না। শ্রুতি সাধনকে বলেছে সাধ্যবস্তু বলতে পারে নি। তাই সাধ্যকে পেতে পারে নি। সাধন বলেছে—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম—শ্রুতি যদি সাধ্য-বস্তু পেয়ে যেত তাহলে আর সাধনকে বলত না। কারণ সাধ্যকে পাওয়ার পরও যদি সাধন বলা হয় তাহলে সিদ্ধ সাধন দোষ হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে শ্রুতি ভগবানকে পায় না কেন? শ্রুতি ব্রজভাব গ্রহণ করতে পারে না—কারণ শ্রুতি বিধ্যাত্মক শাস্ত্র। বিধিবিধানে চলে। কাজেই সে নিজে বিধিবিধানকে লঙ্ঘন করবে কি করে? বিধিত্যাগে প্রেম হয় আর সেই প্রেমে ব্রজে যাওয়া যায়। শ্রুতি মাননীয়—তাই সে গোপীচরণরজঃ নিতে পারে না। ব্রহ্মার বেদজ্ঞা যতদিন ছিল ততদিন কৃষ্ণ অনুভূতি হয় নি। কিন্তু আজ তার বেদজ্ঞা চলে গেছে—কৃষ্ণকরুণা তাঁর উপর পড়েছে—তাই ব্রহ্মা ব্রজবাসীর চরণরজঃ চাইছেন। চরণরজের ভাবনাতেও কৃষ্ণ পাওয়া যায়। ব্রজবাসীর চরণরজের মহিমা বুঝে উদ্ধবজীও প্রার্থনা জানিয়েছেন—

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি
গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথং চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং
শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ ১০।৪৭।৬১

ব্রহ্মার চেয়ে উদ্ধবজী আরও অগ্রসর হয়েছেন—তিনি লোভে ব্রজরমণীদের চরণরজ প্রার্থনা করেছেন। প্রার্থনাই করেছেন—কিন্তু পাওয়ার কোন ঠিকানা নেই। বেদবিধির পারে মুকুন্দ দাঁড়িয়ে আছেন। এই বেদবিধিকে লঙ্ঘন করতে মুকুন্দমহিষীরা পারেন নি। তাই মুকুন্দকেও বশীভূত করতে পারেন নি। বশীভূত করতে পারার নামই পাওয়া। পাওয়া নিয়ে কথা—সে ধর্ম লঙ্ঘন করেই হোক্ আর ধর্মলঙ্ঘন না করেই হোক। ব্রজরামাদের কৃষ্ণপিপাসা এতই তীব্র যে সে বিধি লঙ্ঘন করে কৃষ্ণ পেয়েছে। বেদলঙ্ঘনের পথেই কৃষ্ণ দাঁড়িয়েছেন। কাজেই বেদবিধি লঙ্ঘন না করলে তো তাঁকে পাওয়ার কোন উপায় নেই। সান্নিপাতিক রোগী যেমন তীব্র পিপাসায় বৈদ্যের বিধি লঙ্ঘন করে—এই বেদবিধি তো লঙ্ঘন করা যায় না তাই গোপরামাদের প্রেমের এত উৎকর্ষ। ব্রহ্মা ব্রজবাসীর চরণরজঃ চাইছেন—কারণ ভগবানের সেবার চেয়ে ভক্তসেবা বড় এবং তাতে ফল বেশী। তাই দেবাদিদেব শঙ্কর সঙ্কর্ষণ পূজা করেন। ইষ্টদেবকে কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়—অনন্ত (সর্পকে) শিব তাই অঙ্গের ভূষণ করে রেখেছেন। মহাদেব সর্পবিভূষণ। গৌর গোবিন্দ হলেন ইষ্ট। শ্রীগুরুদেবের বাণী আছে—আমি ঠাকুর ভজি না মানুষ ভজি। দ্বাদশ মহাপুরুষ তাই তাঁর নিত্য স্মরণীয়।

এখানে ব্রহ্মার বাক্যে দেখা যাচ্ছে যে তিনি জন্ম প্রার্থনা করেছেন। তাতে বুঝা যাচ্ছে তিনি জন্মমৃত্যু নিরোধরূপ মুক্তি ত্যাগ করেছেন। কারণ মুক্তি হল ভক্তির বাধক। ধর্ম, অর্থ কাম মোক্ষ এরা হল অজ্ঞানতম।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলেছেন—

অজ্ঞানতমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হন অন্তর্ধান॥

ধর্ম অর্থ কামবাঞ্ছাকে অজ্ঞানতম বলা হল কেন? কারণ ধর্ম অর্থ কামনা—যে কোনটির সাধনাই আমরা করি না কেন সবই অজ্ঞানের চিহ্ন। অজ্ঞানতম কারণ কি চাইছি আমরা জানি না। যা আমাদের প্রয়োজন তা যদি চাইতে জানতাম বা পেতাম তাহলে আমাদের দুঃখ দূর হত, কান্নাও বন্ধ হত। কিন্তু ধর্ম, অর্থ, কাম যে কোনটিই আমাদের প্রার্থনা হচ্ছে বা আমরা পাচ্ছি কিন্তু তাতে আজ পর্য্যন্ত তো আমাদের কান্না বন্ধ হল না। দুঃখ তো দূর হল না। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যেমন কাপড় জামা পেলেও তার কান্না থামে না তেমনি আমাদের পক্ষে যে কোন প্রার্থনাই অজ্ঞানতমের লক্ষণ—আমাদের ক্ষুধা তো হৃদয়ের তাই ধর্ম অর্থ কামনার জিনিষ পেলেও ক্ষুধা মেটে না—বিরোধিবস্তু চাওয়ার নামই অজ্ঞানতম। কারণ অজ্ঞানতা বলা হয়—যা কৃষ্ণভক্তির বাধক তার নামই অজ্ঞানতা—তা সে শুভই হোক আর অশুভই হোক।

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম রে।
সেই হয় জীবের এক অজ্ঞানতম ধর্ম রে॥

ধর্ম অর্থ কাম বাঞ্ছাকে বলা হয়েছে কৈতব—অর্থাৎ কপটতা। কপটতার লক্ষণ করেছেন শ্রীল বাবাজী মহারাজ। কৃষ্ণ ভজে চতুর্বর্গ বাসনা—এর নাম কপটতা। ভজছি গোবিন্দ পাদপদ্ম—চাইছি ধর্ম অর্থ কাম—এর নাম কপটতা। কৃষ্ণ ভজে যেই ধর্ম অর্থ কাম প্রার্থনা হল—তখনই মন হল কৃষ্ণপাদপদ্ম থেকে সরে এল তাই একে কপটতা বলা হয়েছে। কারণ মনে মুখে কাজে মিল না হলেই তাকেই লোকে কপট বলে। এই অজ্ঞানতার ঘন অবস্থা হল মুক্তি বাঞ্ছা। তাই মোক্ষবাঞ্ছাকে বলা হয়েছে কৈতব প্রধান। কারণ ধর্ম, অর্থ কামনার বস্তু ভোগ করেও মানুষ যখন তৃপ্ত হতে পারে না—তখন যদি তার ওপর সাধু গুরু বৈষ্ণবের কৃপা হয় তাহলে সে হয়ত শুদ্ধা ভক্তি পথে আসতেও পারে। কিন্তু মুক্তি বাসনা যার মনে তার হৃদয়ে কখনও ভক্তি মহারাণীর স্থান হবে না। বলা আছে—

যে হৃদয়ে ভুক্তি মুক্তি বাসনা ধৃষ্টা চণ্ডালিনী থাকে শুদ্ধা সাধ্বী ব্রাহ্মণী ভক্তিদেবী সে হৃদয়ে কখনও যান না। তাই মুক্তি বাসনা হল কপটতার চরম। জীবের স্বরূপকে জানবার পথ চিরতরে বন্ধ করে দেয়। কারণ জীবের স্বরূপ হল নিত্য কৃষ্ণদাস। জন্মমৃত্যু নিরোধরূপ মুক্তি বাসনা বা এই মুক্তি পেলে জীবের এই স্বরূপানুভূতি হয় না—আর জীবের স্বরূপানুভূতিই যদি না হয় তাহলে ভগবৎ পাদপদ্ম সেবা পাবার আশাও নির্মূল হয়ে যায়। কারণ জীবের স্বতঃসিদ্ধ কামনা কৃষ্ণপ্রেম। এই কৃষ্ণক্ষুধা গোবিন্দ ক্ষুধার ঠিকানা আজ পর্য্যন্ত আমাদের জানা হল না। আমরা কাপড় গয়না চাই। আমাদের ক্ষুধা এক আর চাইছি আর এক—তাই একে কপটতা বলা হয়েছে। আত্মারামগণও কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজেন—অবশ্য সকল আত্মারাম নন। যে আত্মারামের ওপর ভগবানের করুণা হয় তিনি গোবিন্দ পাদপদ্ম ভজেন। যেমন ধনী ব্যক্তির কোন দরিদ্রের ওপর করুণা হয়। মুক্ত পুরুষকেও ভগবান ভক্তদ্বারে কৃপা করেন। তাই বলা হয়েছে—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।

মুক্তপুরুষ—অর্থাৎ যাদের দেহধারণ এবং দেহত্যাগ বন্ধ হয়ে গেছে তারাও ভগবানের কৃপা হলে আবার দেহ ধারণ করে ভগবানের আরাধনা করে। ধর্ম অর্থ কামকে তবু সরান যায় কিন্তু মুক্তি পাথরের মত বসে থাকে—তাকে কিছুতেই সরান যায় না। মুক্তিতে জন্মমরণের দুঃখের নিবৃত্তি হয়ে যায় চিরতরে তাই আত্মসৌন্দর্য্যে সে বিভোর হয়ে থাকে বলে অধিক সুন্দরের দিকে তার দৃষ্টি যায় না।

জীবাত্মা সর্ব্বথা অস্বতন্ত্র। এই অস্বাতন্ত্র্য দুই প্রকার। (১) মায়িক (২) প্রেমিক। অণু চৈতন্য জীব কখনও স্বাধীন হতে পারে না। জীব শ্রীহরির দাস—পদ্মপুরাণ বললেন—দাসভূতো হরেরেব নান্যস্যৈব কদাচন। জীব নিত্যকৃষ্ণদাস—এইটিই জীবের স্বরূপ। এটি হল প্রেমোত্থ অধীনতা। তাই মহাজন বলেছেন—

অল্পকরি না মানিও দাস হেন নাম। অল্পভাগ্যে দাস নাহি করেন ভগবান। জীবের এ অস্বতন্ত্রতা পরম আনন্দের। শিববিরিঞ্চিও এই দাসত্ব প্রার্থনা করেন। এ দাসত্ব তাঁদেরও সাধ্য। এ অধীনতা হল প্রেমের অধীনতা। সুখের অধীনতা। আর এক রকমের অধীনতা আছে সেটি হল মায়ার অধীনতা। দাস হওয়াই হল জীবের স্বাধীন স্বরূপ। কৃষ্ণদাসত্ব যখন জীব পায় তখন সে নিজের ঘরে যায়। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে স্বামীর ঘরে অধীনতা থাকলেও যেমন সেইটিই নিজের ঘর হয়—তখন মায়ের বাপের ঘর যেমন আর ভাল লাগে না। জীবেরও তেমনি গুরুকরণের পর দীক্ষার পর (দীক্ষাই মাথার সিঁদুর) স্বামীর ঘর কৃষ্ণের ঘরই তার তখন একমাত্র নিজস্ব। মহামায়ার মায়ের সংসার তখন তার আর ভাল লাগে না। কৃষ্ণপাদ-পদ্মে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিই একমাত্র স্বাধীন। গোমুখীর মুখ হতে গঙ্গাধারার মত মহাজনের মুখে হতে হরিকথা জীবকে কৃষ্ণ উন্মুখী করে। কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্তকে রত করতে পারলে তার আর ভয় শোক মোহ থাকে না। কৃষ্ণকরুণা জীবের ওপর নিরন্তর বর্ষিত হচ্ছে কিন্তু আমাদের অসৎ অবগ্রহ অর্থাৎ অহং মম—অহংকার এবং মমকার —আমি আমার এই অভিমানই স্বতঃস্ফূর্ত্ত কৃষ্ণকরুণাকে রুদ্ধ করে দেয়।

শ্রীগোবিন্দের মহিমা বুঝলে তবে ব্রজবাসীর মহিমা বুঝতে পারা যাবে। গোবিন্দের যে এত মহিমা তার লক্ষণ কি? এর উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—অদ্যাপি যৎ পদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব। আজও যাঁর চরণরজঃ শ্রুতিগণ খুঁজছেন—অর্থাৎ এখনও গোবিন্দ চরণরজের নাগাল পান নি।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন—ঐশ্বর্য্যের যন্ত্রণা ভোগ হলে মানুষ মুক্তি চায়। মীরাবাঈজী কুলে তিলাঞ্জলি দিয়ে গিরিধারীর ভজনা করেছিলেন। কারণ কুলের গৌরব ভক্তির বাধক। ইহলোকের ঐশ্বর্য্য তো বটেই এমন কি মুক্তি পর্য্যন্ত ভক্তির বাধক।

কারণ ঐশ্বর্য্যভোগে দীননাথের স্মরণ হয় না। যদিও ভগবান বিভূতিযোগ প্রসঙ্গে গীতাবাক্যে বললেন—জগতে সর্ব্বত্রই আমার বিভূতি। তবু সত্য কথা বলতে কি ঐশ্বর্য্যের মাঝে তাঁকে মনে পড়ে না। লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় ধনলাভ হয় এ কথাটি সত্য নয়। আমরা ধনলাভের আশায় যে লক্ষ্মীদেবীর উপাসনা করি তিনি বৈকুণ্ঠমহিষী লক্ষ্মীঠাকুরাণীর ছায়া প্রাকৃত লক্ষ্মী। তাই লক্ষ্মীর খাঁটি কৃপা পেলে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি পাওয়া যায়। এমন যে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির মূর্ত্তি লক্ষ্মী তিনিও ক্ষীরোদসাগর থেকে উঠে মুকুন্দকেই বরণ করেছিলেন। তিনি বৈরাগ্যবতী তাই প্রাকৃতবস্তুকে ত্যাগ করেছেন। ভগবানের কাছ থেকে যখন ভক্তের কাছে আসে তার নাম কৃপা আর যখন সেটি ভক্তের কাছ থেকে ভগবানের কাছে ফিরে যায় তার নাম ভক্তি। নিজের ঝুলি যদি প্রাকৃত সম্পদে পূর্ণ না হয়ে থাকে—ঝুলি যদি খালি থাকে—তাহলে তাঁর কৃপাকে ধরতে পারা যায়। ঐশ্বর্য্যের ছত্র ধরলে কৃপাবারি গড়িয়ে পড়ে যায়—তাকে ধরা যায় না।

শ্রীজীবপাদ বলেছেন—মুক্ত ও মায়াবদ্ধ জীবের মধ্যে কোন ভেদ নেই। কারণ অনাদিকৃষ্ণবিমুখতারূপ ব্যাধি—এ দুজনেরই সমান। কৃষ্ণবৈমুখ্যাবিশেষাৎ। রোগ দুজনেরই সমান আছে। মূল রোগ হল কৃষ্ণবিস্মৃতি। ভগবৎবিস্মৃতিই হল রোগ। আত্মজ্ঞান না থাকাটা রোগ নয়। এটি হল রোগের লক্ষণ। আত্মবিস্মৃতি হল উপসর্গ। অনাদিকৃষ্ণবিমুখতাই হল মূল রোগ। এই রোগই জীবের স্বরূপ ভুলিয়েছে। অসতে সৎ বুদ্ধি করিয়েছে। ত্যাজ্যকে গ্রাহ্য বুদ্ধি করিয়েছে। বৈষ্ণবগণের কাছে মুক্তি এতই তুচ্ছ যে তারা বিচারে মুক্তিকে কত হীনপদে নামিয়েছে। মুক্তিও ব্যাধি। শ্রী একাদশে ভগবান শ্রীগোবিন্দজী উদ্ধবজীকে বলেছেন—অগ্নি যেমন স্বর্ণের মালিন্য দূর করে—আবার তার শুদ্ধ স্বরূপকে প্রকাশ করায়—তেমনি কর্মানুশয়—অর্থাৎ কর্মবশে প্রাকৃত বাসনা হল জীবের মালিন্য

—যার ফলে জীবের এই বিবর্ণতা হয়েছে। কৃষ্ণপাদপদ্মে দাসত্বই হল জীবের স্বরূপ। জীবাত্মা মায়ার কামিণীকাঞ্চন ঘাঁটে তাই তার মালিন্যে বিবর্ণ হয়েছে। ভক্তিযোগরূপ অগ্নির দ্বারা কর্মানুশয়রূপ মালিন্য ধুয়ে স্বরূপ প্রাপ্তি হবে। মুক্তি জীবের কাম্য হওয়া উচিত নয়। ভগবান বলেছেন—মদ্ভক্তিযোগেন স ভজতে অথ মাম্ এবং আমাকে ভজতে ভজতেই জীবের স্বরূপ প্রাপ্তি হবে। তাই মহাজন বলেছেন—তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান। কারণ মুক্তি পেয়ে গেলে জীবের স্বরূপ প্রাপ্তির আর কোন পথই রইল না।

এখন ব্রহ্মার ইচ্ছা কেমন করে চরণরজঃ পাব? মুক্তি চরণরজঃ পেতে দেয় না—এ বোধটি কৃষ্ণকৃপায় ব্রহ্মার হয়েছে। ব্রহ্মা বলছেন—সেই ভাগ্য আমার হোক। কিন্তু ব্রহ্মা এও জানেন যে আমি প্রার্থনা করলে শুধু হবে না। কিন্তু শ্রীভগবানের করুণা যদি হয় তবেই হবে। নতুবা হবার কোন আশা নেই।

শ্রীবালগোপাল যেন জিজ্ঞাসু নেত্রে প্রশ্ন করছেন—হ্যাঁগো ব্রহ্মন্, তুমি যেটি চাইছ সেটি কি? ব্রহ্মা বলছেন—ইহ অটব্যাং যৎ কিমপি জন্ম। এই ভূ বৃন্দাবনে কোমল তৃণদূর্ব্বা হবার অভিলাষ আমার ছিল কারণ সখাসঙ্গে গোচারণ রঙ্গে তোমার পদরজঃ আমি তাহলে পেতে পারতাম্। এতে কিন্তু শ্রীবালগোপালের মুখে কোন প্রসন্নতা দেখা গেল না। তিনি যেন বলছেন—ব্রহ্মন্ বৃন্দাবনে তৃণগুল্মে জন্ম বড় দুর্লভ জন্ম। এতে লোভ কর না। এ জন্ম পাওয়া অত সস্তা নয়। তার চেয়ে নিজের যোগ্য কিছু প্রার্থনা কর। যা তোমাকে মানাবে। কারণ বৃন্দাবনের একটি তৃণকণা কোটি কোটি ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করতে পারে। তখন ব্রহ্মা প্রার্থনা করেছেন—তোমার গোকুলভূমিতে নয়—ব্রজভূমির প্রান্তভাগে যস্য কস্যাপি অর্থাৎ তোমার হাড়ি, ডোম চণ্ডাল প্রভৃতি নীচজাতির পদরজঃ পেতে পারি—এমন একটি পাষাণ খণ্ড বা কাঠের পাটাতন আমাকে করে দাও—তারা নীচজাতি হলেও তারা তো ব্রজবাসী। এ কথা শুনে যেন শ্রীবালগোপাল বলছেন—

আচ্ছা ব্রহ্মন্, ব্রজবাসীর এত মহিমা কেন ? কি কারণ ? আর তুমি ব্রহ্মা হয়ে যে ব্রজবাসীর চরণরজঃ প্রার্থনা করছ তাতে তোমার লজ্জাই বা করছে না কেন ? লজ্জা না হওয়ার কি কারণ ? ব্রজবাসীর মাহাত্ম্যের উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন ব্রজবাসী যে তোমাকেই নিখিল প্রাণ করেছে—তারা গোবিন্দকে প্রাণ করেছে। ভগবান মুকুন্দকে প্রাণ করেছে। ভগবান বলতে ঐশ্বর্য্যবান—ভগং শ্রীকাম মাহাত্ম্যে সৌন্দর্য্য সুস্বরত্ব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট আর মুকুন্দ—মুখে যার কুন্দ ফুলের মত হাসি। ব্রজবাসী কৃষ্ণের রূপে গুণে মুগ্ধ হয়েছে—এমনই মুগ্ধতা যে গোবিন্দের একটি কথার বিনিময়ে তারা কোটিবার জীবন দিতে পারে আর কৃষ্ণ ছাড়া তারা প্রাণে বাঁচে না। ব্রজবাসীর অসাধারণ প্রেমের জন্যই তাদের সর্ব্বোৎকর্ষের হেতু।

তাই বলা আছে—চণ্ডালও যদি হরিভক্তি পরায়ণ হয় তাহলে সে দ্বাদশ গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। প্রহ্লাদ এ বাক্য ব্রহ্মাণ্ডের সভায় বলেছেন—তাই এটিকে প্রামান্য হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে। ব্রজবাসী গোবিন্দের কাছে নিজেদের প্রাণদান করেছে—অর্থাৎ যাবৎ আয়ু তাবৎ তোমার কাছে বিক্রীত হলাম। হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেন ? ভক্ত চণ্ডাল একুশ পুরুষকে উদ্ধার করে পবিত্র করে কিন্তু সদাচারী ব্রাহ্মণ নিজেকেও পবিত্র করতে পারে না। ব্রাহ্মণের উৎকর্ষ ব্যবহারিক জগতে দেখা যায় কিন্তু বিষ্ণুদাস অর্থাৎ বৈষ্ণব পরমার্থে সকলের ওপরে। আর এই বৈষ্ণবের চরম হলেন ব্রজবাসী। তারা প্রেমগুণে সর্ব্বোৎকর্ষকে লাভ করেছে। তাই ব্রজবাসীর চরণরজঃ প্রার্থনীয়। আর চাইতে লজ্জাই বা হবে কেন ? সে ব্রজবাসীর চরণরজঃ শ্রুতিগণ আজও খুঁজছে—অর্থাৎ পায় নি—কারণ পেলে তো আর খুঁজতে হয় না। ব্রহ্মা কি শ্রুতির চেয়েও বড় ? ব্রহ্মার জ্ঞানদাতা বেদ যা চাইতে পারে ব্রহ্মা যদি তাই চান তাহলে ব্রহ্মার তো লজ্জা পাওয়ার কোন কারণ নেই। ব্রহ্মা এর আগে বিধিমার্গে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন—'তদস্তু মে নাথ স

ভূরিভাগঃ।’ কিন্তু এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং কৃষ্ণকৃপায় এখন রাগানুগাভক্তিতে এই প্রার্থনা করলেন—

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাম্……।

ব্রজবাসীর মহিমা অনুভব করে ব্রহ্মা পরবর্ত্তী মন্ত্র বলছেন—

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেবরাতেতি ন—
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎ প্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎ কৃতে॥ ৩৫

পূর্ব্বের শ্লোকে ব্রজবাসীর মহিমা বর্ণন করে ব্রহ্মা বলেছেন—ব্রজবাসীর কৃতার্থতাই যথেষ্ট নয়। স্বামিপাদ বললেন—যেষাং ভক্ত্যা ভবানপি ঋণী ইব আস্তে। যাদের ভক্তিতে ভগবান নিজে ঋণী হয়ে আছেন। এখন কথা হচ্ছে ঋণী এ জগতে কে হয়? যার সম্পদ নেই সেই তো ঋণী হয়। কিন্তু শ্রীবালগোপাল যিনি সকল সম্পদের ভাণ্ডারী তিনি ঋণ স্বীকার করেছেন। কৃষ্ণচরণকমলে ভক্ত-ভ্রমর নিয়ত লুব্ধ কাজেই মধুর ভাণ্ডার শ্রীকৃষ্ণ চরণে মধুর অভাব নেই—অথচ সেই কৃষ্ণ ব্রজবাসীর প্রেমের কাছে ঋণী—তাঁকে গোপীসমাজে দাঁড়িয়ে অকপটে স্বীকারোক্তি করতে হল—পারলাম না। ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাম্। তোমাদের প্রেমের ঋণ শোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। রাধা আদি ব্রজরামার কাছে শ্রীগোপীজনবল্লভ নিজমুখেই ঋণ স্বীকার করলেন। কিন্তু সমগ্র ব্রজবাসীর কাছেই যে ভগবান ঋণী এটি ব্রহ্মা তাঁকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিচ্ছেন। বালগোপালকে এইভাবে ঋণী বলায় শ্রীবালগোপাল রেগে গেছেন—তাঁর যেন এই ভাব—কেন আমি ঋণী হতে যাব কেন? আমি কি তাদের দিতে পারি না? দিতে পারলে তো আর ঋণ থাকে না। ব্রহ্মা তার উত্তরে বলছেন—ভগবন্ তুমি তো তোমার স্বরূপ আগে থেকেই ব্রজবাসীদের দিয়ে রেখেছ—তারা তো তোমাকে পেয়েই বসে আছে—আর নূতন করে বেশী তাদের কি

দেবে ? কারণ তোমার স্বরূপ ছাড়া অন্য কোন উৎকৃষ্ট ফল বা প্রাপ্তি তো আর নেই। এই চিন্তার অন্ত না পেয়ে (অযৎ অগচ্ছন্) মুহ্যতি। তোমার ঋণের কথা চিন্তা করে আমাদের মোহ হচ্ছে। তখন বালগোপাল যেন বলতে চাইছেন—কেন, আমাকে দিয়ে তোমরা মোহমুক্ত হও। আমিও আমাকে দিয়ে অঋণী হব। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, তা যদি বল তাহলে সেটিও যোগ্য পুরস্কার হবে না। পুতনার পরিচয় শ্রীশুকদেব দিয়েছেন—সে লোকবালঘ্নী, রাক্ষসী রুধিরাশনা তামস যোনি, ছোট ছেলে দেখলে খেয়ে ফেলে আর রক্ত হল তার খাদ্য। সে মাতৃবেশে এসে তোমাকে স্তন্য পান করিয়ে তোমাকে পেয়ে গেল। পুতনা এখানে সৎ বেশ গ্রহণ করেছে—সৎ বেশ সতাং ভক্তানাং বেশ—ভক্ত যে বেশ গ্রহণ করবে সেটি কৃষ্ণের আনুকূল্যময় বেশ হওয়া চাই। পুতনা তাই মা হয়ে গিয়েছিল। মায়ের বেশ পুতনা গ্রহণ করেছিল বটে কিন্তু সেই বেশটি প্রকৃত মায়ের বেশ নয় —তাই ব্রহ্মা পদে বললেন—সদ্বেশাদিব—পুতনা বৈষ্ণবী সেজেছিল —বেশের অনুকরণ করেছে মাত্র। তাই যে পুতনা এত কপটতা করেছে তাকেও তুমি একা নয় সবংশে উদ্ধার করেছ বকাসুর অঘাসুর সকলেই তোমাকে লাভ করেছে। তাই একা কোন ব্রজবাসীকে তো নয়ই সবংশে ব্রজবাসীকে যদি তুমি নিজস্বরূপ দান কর তাহলেও তোমার দান ঠিক হল বলা যায় না। ব্রজবাসী তো তোমাকে ছাড়া জানে না—তাদের গৃহ, অর্থ, সুহৃৎ, প্রিয় আত্মা, তনয় আশয় সবই তো তোমার জন্য। তারা গৃহ, পুত্র, অর্থ সবই তোমার সুখের নৈবেদ্য করে সাজিয়ে রাখে তোমার ভোগে লাগবে বলে।

শ্রীতোষণীকার বললেন—ব্রহ্মা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মোহ কেন? ভগবান যে ব্রজবাসীকে কি দেবেন এটি নিশ্চয় করতে না পেরে তাদের মোহ। নিশ্চয়াশক্তেঃ। যদ্বা অথবা ব্রহ্মা ভাবছেন—ব্রজবাসীর কাছে ভগবান ঋণী তাই ভগবান তাদের কাছে বশীভূত। ব্রজবাসী মহাজন আর ভগবান হলেন খাতক। তাই

তিনি আমাদের ছেড়ে ব্রজবাসীর কাছেই থাকবেন—এইটিই তো স্বাভাবিক—তাই তাঁদের মোহ।

শ্রীজীবপাদ বলেছেন—ভগবান ভাবছেন ব্রহ্মার মত নগণ্যকে যদি ব্রজবাসীর চরণরজঃ দিই তাহলে ব্রজবাসীকে কি দেব? এইটি শ্রীবালগোপালের প্রথম প্রশ্ন। এর পরে দ্বিতীয় প্রশ্ন হয়েছে—হে ব্রহ্মান্ তুমি যখন আমাকে প্রথম স্তুতি করতে আরম্ভ কর তখন তো বলেছিলে তোমাকে পাবার জন্য স্তুতি করছি তবে এখন আবার ব্রজবাসীর চরণরজঃ চাইছ কেন? তাহলে তোমার নিষ্ঠা কোথায় থাকল?

ব্রহ্মা 'অহোতিধন্যা'—এই শ্লোকে ব্রজবাসীর মহিমা প্রকাশ করেছেন এখন আবার বললেন এষাং ঘোষনিবাসিনাম্—। ব্রহ্মা বলছেন, হে প্রভু, তোমার ওপরে তো কোন বস্তু নেই আর ব্রজভূমির ওপরে তো কোন স্থান নেই। আর তোমার স্বরূপ ছাড়া অন্য কোন ফল নেই। মানুষ সাধন করে উচ্চধাম পাওয়ার জন্য বা উত্তম ফল পাওয়ার জনা। ব্রজবাসীকে তুমি কি দেবে এটি আমরা জানতে না পেরে মোহগ্রস্ত হয়েছি। কারণ ব্রজবাসী যা করেছে তার বিনিময়ে তুমি যদি তোমাকে তাদের দাও তাহলেও ঠিক হবে না। এখানে সদ্বেশ বলতে বুঝাচ্ছে সৎভাব অর্থাৎ কৃষ্ণের অনুকূলভাব যুক্ত—সৎভাবযুক্ত। পুতনা হিংসাদম্ভে মাতৃবেশ ধারণ করেছিল। এখানে ভাব নয় বেশ মাত্র গ্রহণ করে ভগবান তাকে মাতৃগতি দান করেছিলেন—শুধু পুতনার গতি দান নয়—পুতনার প্রাক্তন—অর্থাৎ পূর্ব্বের এবং পরের সব বংশের উদ্ধার করেছেন।

ব্রজবাসী চেষ্টা করে তোমাকে কিছু দেয় না—স্বাভাবিকভাবে তারা গোবিন্দকে সব কিছু অর্পণ করে। ব্রজবাসীর যা কিছু সবই তোমার। কিন্তু তোমার তো অনেক প্রিয় জন আছে—তাই ব্রজবাসীর কাছে তোমার ঋণ শোধ হবে না। তাহলে এই কথাই দাঁড়ায় ব্রজবাসী তোমাকে সব দিতে পারে কিন্তু তুমি তাদের সব দিতে পার না।

এর থেকে বুঝা যাচ্ছে ব্রজবাসী পূর্ণ আর তুমি হলে অপূর্ণ। ব্রহ্মা কিন্তু এই কথাই বলতে চান কিন্তু তাতে শ্রুতিবাক্যে দোষ পড়বে। কারণ শ্রুতি তো ভগবানকে পূর্ণ বলেছেন। ব্রহ্মা বলছেন—ব্রজবাসীর কাছে তুমি পরাধীন। ব্রহ্মার প্রতিজ্ঞা ছিল ভগবানকে পাব—কিন্তু ভগবান অধীন। ব্রহ্মা বলছেন ব্রজবাসীর অনুমতি ছাড়া হে ভগবন্ তুমি তোমাকেও দিতে পার না—তাই ব্রজবাসীর চরণরজঃ প্রার্থনা করলাম। তাহলে ফলশ্রুতি এই দাঁড়ায় ব্রজবাসী ও কৃষ্ণ অব্যাভিচারী। উভয়ের উভয়কে ছেড়ে থাকবার উপায় নেই। ব্রজবাসী তোমাকে অনবরত দিয়েই যাচ্ছে—তাই ভগবানের তাদের কাছে ঋণের মাত্রাও বেড়েই চলেছে। আর ঋণ শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রজবাসীকে ছেড়ে যাওয়ারও উপায় নাই। সুতরাং ব্রজবাসীও কৃষ্ণের ছাড়াছাড়ি হচ্ছে না। এ জগতের মহাজন যা দিতে পারে না ব্রজবাসী মহাজন তাই দিয়েছে। এ ব্রজবাসী মহাজন দিতে পারব না—এ কথা কখনও বলবে না। তাই তাদের ঋণ শোধের কোন ব্যবস্থাই নেই। ব্রজবাসী যখন সব দিয়েছে তখন তোমাকেও সব দিতে হবে। আর তুমি যদি সব দাও তাহলেও তো একজন ব্রজবাসীর ঋণ শোধ হবে। অন্যসব ব্রজবাসী তো মহাজন থেকেই গেল। তাই দেখা যাচ্ছে যে ব্রজবাসীকে ছাড়বার কৃষ্ণের কিছুতেই কোন উপায় নেই। ঋণ তো থেকেই গেল। কৃষ্ণ মহাজনের কাছে আগাম নিয়ে রেখেছেন তাই তাদের ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার কোন উপায় নেই। এর দ্বারা পূর্ব্বপক্ষের ভঙ্গীতে সিদ্ধান্ত সূচিত হয়েছে। রজবাসীকে কৃষ্ণ আগে থেকেই দিয়ে রেখেছেন। যে প্রেম দিয়ে কৃষ্ণকে বশীভূত করা যায় সেই অগাধ অফুরন্ত প্রেম ব্রজবাসীকে ভগবান দিয়ে রেখেছেন। সুতরাং ভগবান যে ব্রজবাসীর কাছে ঠিক ঋণী এ কথা বলা হল না—বলা হল ঋণী ইব।

শ্রীজীবপাদ অন্য এক টীকায় বলেছেন—ভগবান বলেছেন—আমি ব্রজবাসীকে আমাকে (নিজেকে) দেব—তাহলে তো আমি ঋণী

এ কথা বলা যাবে না। ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, তুমি যদি তোমাকে (নিজেকেও) দাও তাহলেও তোমার অবিদগ্ধতাই প্রকাশ পাবে। অর্থাৎ তোমার কোন বিচার নেই এই কথাই লোকে বলবে। পূতনাকে যা দিয়েছ তাই দেবে ব্রজবাসীকে? এ তোমার কেমন বিচার? সদ্বেশ সতী মাতা মায়ের মত বেশ ন তু মাতা। কৃষ্ণ পূতনার হৃদয় খুঁজে দেখলেন—কিন্তু সেখানে তাঁর অনুকূল কোন ভাবই খুঁজে পেলেন না। তখন বাইরের বেশের দিকে তাকালেন। দেখলেন সেখানে মাতৃবেশের আভাস আছে—সেইটিকে নিয়ে পূতনাকে মাতৃগতি দান করলেন। কারণ পূতনা এসেছে নন্দালয়ে—তাই তাকে তো শুধু হাতে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। কারণ গৃহস্থের ঘর থেকে অতিথি যদি শুধু মুখে ফিরে যায় তাহলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। কৃষ্ণ দেবার জন্য এতই ব্যস্ত যে যখন বাইরে পান না তখন ভিতর দেখেন আবার যখন ভিতরে পান না তখন বাইরে দেখেন। ব্রজবাসীর পক্ষে ভগবান যৎ দেয়ম্ তৎ দত্তম্ যা দেওয়া উচিত তা দিয়েছেন। আত্মবশীকারিণী ভক্তি ব্রজবাসীকে দিয়েছেন। যা দিয়ে কৃষ্ণকে তাঁরা বেঁধে রেখেছেন। ত্বৎকৃতে তোমার কর্মে—বাগ্দেবী এই বাক্য দিয়ে ব্রহ্মার বাক্যে সিদ্ধান্ত করেছেন। ব্রজবাসী কৃষ্ণকরুণায় প্রেমের অধিকারী আগেই হয়েছে। পূতনাকে ভগবান দিয়েছেন মাতৃগতি আর ব্রজবাসীকে দিয়েছেন প্রেমরত্ন—তাই তাঁর দানে বিচার নেই তা বলা যাবে না—দানে অপাণ্ডিত্য প্রকাশ পায় নি।

শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ বলছেন—ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবন্, আমি লোভে পড়ে চেয়েছি। আমি পাব কি পাব না তুমি তো কিছু বলছ না। তা উত্তর না দাও তাতে ক্ষতি নেই আমার কিন্তু ভাবনা হচ্ছে—তুমি ব্রজবাসীকে কি দেবে? বালগোপাল যেন বলছেন—ব্রহ্মন্, তুমিই বল না ব্রজবাসীকে কি দেওয়া যায়? ব্রহ্মা বলছেন,—হে ভগবন্ আমরা তো ঘুরে অনেক দেখেছি কিন্তু পাই নি। তাই তো

আমাদের মোহ হয়েছে। অনাদিকালের ফলস্বরূপ যে তুমি, সেই তুমি তাদের পুত্র হয়ে আছ—এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ফল তো আর নেই। বালগোপাল যেন বলতে চাইছেন,—ব্রহ্মন্ তুমি হচ্ছ অনভিজ্ঞ। ব্রজবাসীর আমার প্রতি অনুরাগবতী অদ্ভুত ভক্তি ভবিষ্যতে হবে জেনে আমি পুত্ররূপে আগে থেকেই আমাকে দিয়ে রেখেছি। এ জগতে দেখা যায় যারা ভাল লোক সজ্জন তারা কৃতজ্ঞ হয়। যে উপকার করে তার উপকার করে। কিন্তু আমি শুধু কৃতজ্ঞ নই, আমি করিষ্যমাণজ্ঞ —অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে আমার প্রতি ভক্তিবিধান করবে তার উপকার আমি আগে থেকেই করে রাখি। অতএব আমারই জয় হয়েছে ময়া এব জিতম্। ব্রহ্মা বলছেন, হে বালগোপাল তোমার এ কথা সত্য বটে কিন্তু ন্যায়েন ত্বং পরাজিতঃ। পুতনা যা পেল ব্রজবাসীও কি তাই পাবে? এখানে এ বাক্যটি কাকু অর্থে নিতে হবে। অর্থাৎ না তা পাবে না—ব্রজবাসী অনেক বেশী পেয়েছে। যদি এখানে বাক্যটি কাকু অর্থে না নিয়ে সোজাসুজি নেওয়া যায় অর্থাৎ ব্রহ্মা বলতে চাইছেন—পুতনা যা পেয়েছে ব্রজবাসীও যদি তাই পায়—তাহলে তোমার দান কি ঠিক হল? দানে তোমার অনৌচিত্য দোষ তো থেকেই গেল। একমাত্র একটি উপায়ে তোমার অঋণী হওয়ার পন্থা আছে। সেটি হল ব্রজবাসীর কাছে তুমি ঋণী আছ এটি যদি স্বীকার কর তাহলে তুমি অঋণী হবে। এ ছাড়া তোমার অঋণী হওয়ার আর কোন উপায় নেই।

বাক্‌পতি ব্রহ্মা এই মন্ত্রে স্তুতিপ্রসঙ্গে সকল মানুষের মধ্যে দুটি স্তর দেখিয়ে বলছেন—

> তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
> তাবন্মোহোঽঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ॥ ৩৬

ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, এ জগতে মানুষের মধ্যে দুটি ভাগ—একদল তোমার চরণে উন্মুখ আর একদল তোমার চরণে বিমুখ। যারা তোমার চরণে বিমুখ অর্থাৎ তোমাতে অরুচি—তোমাকে ভজে না—

তাদের কথা আগে বলি—তাদের যে রাগ সেটি চোরের কাজ করে। এখন প্রশ্ন হবে এই রাগ কাকে বলে? রাগ বলতে আসক্তি বুঝায়। আমরা ভাষা ব্যবহারে অনেক সময় রাগ বলতে ক্রোধকে বুঝাই কিন্তু রাগ পদের অর্থ তা নয়। রজ্ ধাতু ঘঞ্ প্রত্যয় করে পদ হয়েছে রাগ—সুতরাং রাগ মানে আসক্তি। শব্দ স্পর্শ রূপ, রস গন্ধ এই পঞ্চবিষয়ের প্রতি যে আসক্তি তার নাম রাগ। কারণ বিষয় পাঁচটি আবার ঐ বিষয়কে যে গ্রহণ করে জ্ঞানেন্দ্রিয় তাও পাঁচটি—চক্ষু কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা ত্বক্—এই ইন্দ্রিয় বিষয় দেখলেই ছুটে যায়—গ্রহণের জন্য লোলুপ হয়। বিষয়কে ইন্দ্রিয় ভোগ করতে পারে না—মনের কাছে পাঠায়—মন তাকে রসিয়ে রসিয়ে ভোগ করে—মনই ভোক্তা। বিষয়-মনের দ্বারা ভুক্ত হয়ে সংস্কাররূপে সূক্ষ্মরূপে থেকে যায়—আবার যখন বিষয় দেখে তখন ঐ সংস্কার আবার জেগে ওঠে এবং বিষয় গ্রহণের জন্য ইন্দ্রিয় লোলুপ হয়। বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ আবার ইন্দ্রিয়ের প্রতি বিষয়ের আকর্ষণ—এ দুর্বার। এতে নিবারণ করা যায় না। এর নামই রাগ অর্থাৎ আসক্তি। ব্রহ্মা এই 'রাগ' কথাটি উচ্চারণ করে তারপরে একটি 'আদি' পদ বসিয়েছেন। এই আদি পদের দ্বারা বলতে চেয়েছেন হর্ষ শোক, বিষাদ। বিষয়ের প্রতি যখনই আসক্তি হবে তখনই এই রাগের মুখ নিরীক্ষক হর্ষ, শোক বিষাদ হবে। বিষয় পেলে হর্ষ অর্থাৎ আনন্দ আর না পেলে বিষাদ অর্থাৎ দুঃখ—আর যে বিষয় পাওয়া গেছে তার যদি বিনাশ হয় তাহলে শোক্। কারণ প্রাপ্তবস্তুর বিনাশের নামই শোক। মূলে যার বিষয়ের প্রতি আসক্তি নেই তার এই হর্ষ শোক বিষাদ—এই তিনের কোনটিই হয় না। তাই ভগবান ভক্তের লক্ষণে গীতাবাক্যে বললেন—অর্জ্জুন ভক্ত দুঃখে উদ্বিগ্ন অবসন্ন হয় না—আবার সুখেও উল্লসিত হয় না। কারণ মূলে তাদের বিষয়ের প্রতি আসক্তিই নেই। অবশ্য এ সুখ দুঃখ দুটিই প্রাকৃতসম্বন্ধী কিন্তু এই সুখ দুঃখ যদি ভগবৎ সম্বন্ধী হয় তাহলে ভক্তের সুখও হয় দুঃখও হয়। প্রাকৃত

সুখ হোক আর দুঃখ হোক দুটিই মিথ্যা। কারণ মিথ্যার লক্ষণ হল যা চিরদিন থাকে না—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিনকালে যেটি বাধিত হয় তার নাম মিথ্যা। বিশ্বকবি তাই বলেছেন—

বলো মিথ্যা আপনার সুখ
মিথ্যা আপনার দুঃখ।

ভক্ত তাই কোনটিতেই অভিভূত হয় না।

ব্রহ্মা বলছেন, হে কৃষ্ণ যারা তোমার জন নয় কিংবা যতক্ষণ তারা তোমার চরণে উন্মুখ না হয় ততক্ষণ তাদের রাগ প্রভৃতি স্তেন অর্থাৎ চোরের কাজ করে। তাদের গৃহ কারাগৃহের মত হয় আর মোহ (অবিবেকিতা) অঙ্ঘ্রিনিগড়ের (পায়ের বেড়ির) কাজ করে। বিষয় গ্রহণ করলে ক্ষতি নেই—তাতে রাগ অর্থাৎ আসক্তি যদি না থাকে তাহলে তা গ্রহণ করলেও তাতে হর্ষ, শোক বা বিষাদ কিছু হয় না। যেমন দুঃখ গ্রহণ করা হয় বটে কিন্তু তাতে প্রীতি হয় না—দুঃখ চলে গেলে শোক তো হয়ই না। তেমনি ভক্তের সম্পদ্ গ্রহণেও প্রীতি হয় না। কারণ তারা এ জগৎকে বিষ্ণু মায়া বলে জানে। ঐন্দ্রজালিকের টাকা আম সবই যেমন অসার—তার ভেতর সার বলে কিছু নেই। তেমনি ভক্ত জানে এ জগতে সার বলে কিছু নেই। ঐন্দ্রজালিকের অন্তরঙ্গ জন যেমন তার ফাঁকি বোঝে জানে তেমনি বিষ্ণুভক্তও বিষ্ণুর মায়া জানে। বেদান্তদর্শন বলেছেন—মৃদ্‌গজভানবৎ। বালক অজ্ঞতায় মাটির হাতীকে সত্যিকারের হাতী বলেই মনে করে এবং সেটি পাবার জন্য বায়না ধরে—কারণ তাতে প্রীতি আছে কিন্তু বিজ্ঞ পিতা জানে যে এটি মাটির হাতী—এ দিয়ে হাতীর কাজ কিছু করা যাবে না। এখানে ভগবৎপাদপদ্ম—সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিই বিজ্ঞ আর সেই সম্পর্কহীন ব্যক্তিই অজ্ঞ। মনের মধ্যে আনন্দ বা দুঃখ যেটিই হোক না কেন দুটিই বিকার। এইজন্যই জাতাশৌচ এবং মৃতাশৌচ—দুটিকেই অশৌচ বলা হয়েছে। মানুষের প্রতি সাধারণ ভাবে বিধান দেওয়া আছে—এইটিই স্বাভাবিক ধর্ম—স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ

—বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। বিষ্ণু (কৃষ্ণ) পাদপদ্ম সর্ব্বদা স্মরণ করতে হবে—এইটিই বিধি আর সে পাদপদ্ম কখনও বিস্মৃত হওয়া চলবে না—এইটিই নিষেধ। বেদবাক্যে এই একটাই বিধি এবং একটাই নিষেধ এ ছাড়া আর যত বিধি নিষেধ আছে সব এর অনুগত। চিত্তে দুঃখ হর্ষ যে কোন বিকারই হোক না কেন তা বিষ্ণুস্মরণকে ভুলিয়ে দেয়—এই বিস্মৃতিরই অর্থ হল অশুচি। কারণ ভগবৎ স্মরণ থাকলেই শুচি। মায়া পিশাচীর আক্রমণে এই স্মরণ ভুল হয়। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণের ক্ষত্রিয় সত্ত্ব ও রজঃ গুণের বৈশ্য রজঃ ও তমোগুণের এবং শূদ্র হল শুদ্ধ তমোগুণের। এই হিসাবে ব্রাহ্মণাদির অশৌচ পালনের ব্যবস্থা। দশদিন, পনেরদিন একমাস প্রভৃতি। কারণ চিত্তবিকারকে সংযত করবার জন্য যার যত অল্পসংখ্যক দিন প্রয়োজন তার অশৌচ পালনের জন্য তত অল্পসংখ্যক দিন ধার্য্য করেছেন শাস্ত্র।

পেঁপে গাছের যেমন তক্তা হয় না, ডাঁটাচচ্চড়ির মধ্যে যেমন সার কিছু পাওয়া যায় না, ভস্মে ঘৃতাহুতি যেমন সার্থক হয় না তেমনি এ সংসারের সবটাই অসার। প্রহ্লাদজী বিষ্ণুপুরাণে দৈত্যবালকদের কাছে বলেছেন—

অসারসংসারবিবর্ত্তনেষু মা যাত তোষং প্রসভং ব্রবীমি।

এই অসার সংসারে যেন কখনও আনন্দ পেও না ভাই—এটি তোমাদের জোর করে বলছি। এ সংসার বিবর্ত্তন—রজ্জুতে সর্প-বুদ্ধির মত। অহমিকায় দান করলে পুণ্যের ভাগে কিছু পড়বে না। অহঙ্কারশূন্য হয়ে পুণ্য অর্জ্জন করতে হবে। এ সংসারে যদি আটকে থাকা যায় তাহলে ও জগতে যাওয়া যাবে না। প্রহ্লাদ দৈত্য বালকদের বলেছেন—তোমরা এ জগতে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি লাভ করতে চেষ্টা কর। মায়া এ জগতে বিচিত্র সম্ভার দিয়ে দোকান সাজিয়ে বসেছে। মাটির বাসনের দোকানে যেমন হাঁড়ি সরা, কলসী থালা—সব সাজান থাকে কিন্তু সকলের উপাদান যেমন মাটি শুধু রঙের কাজ

তেমনি জগতের সব কিছুই এমন কি ব্রহ্মপদ ইন্দ্রপদ পর্য্যন্ত সবই ত্যাজ্য—এই বুদ্ধি করতে হবে। সব বস্তু ত্রিগুণময় শুধু ভাবলে হবে না। ত্রিগুণময় অতএব ত্যাজ্য কোনটিই গ্রহণীয় নয় এই বুদ্ধিতে সমদৃষ্টি বলা হয়েছে। দৈত্যবালকগণ যেন বলছেন, ভাই, সব ত্যাজ্য কোনটিই গ্রহণীয় নয়—এটি তো মন বুঝতে চায় না তখন প্রহ্লাদ বলছেন এটি বুঝবার জন্য একটি মন্ত্র আছে। সেটি হল আরাধন-মচ্যুতস্য—অচ্যুত অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের আরাধনা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি গোবিন্দের আরাধনা করে তারই এই ত্যাজ্য অংশে সমবুদ্ধি হবে। অচ্যুতের আরাধনা না করা পর্য্যন্ত জগতের বস্তু ত্যাজ্য বলে বোধ হয় না। ভগবান তাই গীতায়—অর্জ্জুনদেবকে বললেন—নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন। তিনগুণের অতীত হয়ে নিজেকে ভাবতে হবে। গুণময় সকল পদার্থকেই ত্যাগ করতে হবে। জগতে বিপদ্ই শুধু ত্যাজ্য নয় সুখও ত্যাজ্য। বিষয়ের প্রতি আসক্তি থাকলেই তা পেলে হর্ষ, না পেলেই ক্রোধ—আবার পাওয়া জিনিষ যদি বিনাশ পায় তাহলে শোক। আসক্তির উপরই হর্ষ, শোক বিষাদ।

আমাদের যে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ—এই পঞ্চবিষয়ের ওপর আসক্তি তার স্বাভাবিক আশ্রয় হল শ্রীগোবিন্দের রূপাদিপঞ্চক। আমাদের আসক্তি নিত্য আশ্রয়প্রার্থী হয়ে ঘুরছে। যেমন একজন লেখাপড়া জানা লোক অভাবের তাড়নায় হীনকর্ম্মে প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হলেও সে যেমন সেখানে সুখী হয় না বরং দ্বেষবশতঃ তার সম্পত্তি হরণ করায়—কিন্তু উপযুক্ত অর্থাৎ মনোমত তার লেখাপড়ার কাজ পেলে খুসী হয়ে সে-ই যেমন আবার অপরের ধনভাণ্ডার লুঠ করে এনে সম্পত্তি প্রভুর ঘরে পেঁছে দেয় তেমনি আমাদের রূপাদি পঞ্চকের রাগকে আমরা প্রাকৃত রূপাদি পঞ্চকের গ্রহণে নিযুক্ত করেছি কারণ গোবিন্দরূপাদি পঞ্চকের সন্ধান আমরা জানি না—কিন্তু প্রাকৃত রূপাদি বিষয় বড় দরিদ্র—তাদের ভাণ্ডার বড় অল্প। তাই তারা আমাদের রাগকে চিরদিনের মত আশ্রয় দিতে পারছে না কারণ দরিদ্র

কখনও আশ্রয়দাতা হতে পারে না। তাই প্রাকৃত রূপাদির কাছ থেকে রাগ কেবল ফিরে ফিরে আসছে। আশ্রয় পাচ্ছে না। রাগকে আমরা তার যোগ্য কাজ দিতে পারি নি। শ্রীগোবিন্দের রূপাদি পঞ্চকই হল এই রাগের খোরাক। আমরা তাদের এই প্রাকৃত রূপাদি পঞ্চকে নিযুক্ত করলাম। তাই সে দ্বেষ করে আমাদের ভজন সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেল। রাগ স্তেন অর্থাৎ চোরের কাজ করল দ্বেষের ফলে। কিন্তু এই রাগকে যদি আমরা উপযুক্ত কাজ দিতে পারি—শ্রীগোবিন্দের রূপাদি পঞ্চকে তাকে নিযুক্ত করতে পারি—তার প্রবৃত্তি ঘটাতে পারি তাহলে এই রাগাদি (হর্ষ, শোক, বিষাদ বিদ্বেষ প্রভৃতি) চোরই বন্ধুর কাজ করবে। যে পাকা চোর সে চোরের ঘরে চুরি করে। তখন এই আসক্তি চোরও পাকা চোরের কাজ করবে। চৌরজারশিখামণি গোবিন্দের ঘর থেকে ভক্তিসম্পদ প্রেমরত্ন এনে দেবে। গোবিন্দরূপাদি পঞ্চকের সঙ্গে আসক্তির সম্পর্ক হলেই রাগের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হল। এটি শ্রীজীবপাদ বলেছেন। প্রসঙ্গত বলা যায় রামানুজ স্বামীর এক শিষ্যের রূপের প্রতি অত্যন্ত আসক্তিতে তার স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত আসক্তি ছিল। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশে যখন সে শ্রীবিঠল নাথের দর্শন পেল তখন সেই গোবিন্দরূপে পাগল হয়ে তার প্রাকৃত রূপাসক্তি চিরতরে বিলীন হয়ে গেল। তখন রূপরাগের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হল। প্রহ্লাদজী বললেন—

যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েষ্বনপায়িণী

বিষয়ে অবিবেকীদের যে প্রীতি তা অনপায়িনী অর্থাৎ তা কিছুতেই যাবার নয়। শুভ, অশুভ, সৎ অসৎ ভাল মন্দ বিচার যার নেই তাকেই বলা হয় অবিবেকী। অন্যান্য সাধন কামাদি রিপুর বিনাশ করে জয় করে। কিন্তু ভক্তিরাজ্যে কোন কিছুরই বিনাশ নেই। শত্রুকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত করিয়ে জয় করলে তাতেই জয়ের গৌরব। বাঁচিয়ে রেখে জয় করতে হবে। ভক্তিরাজ্যে অধীন করে জয় করে। এই জয়েরই গৌরব। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমশাই বললেন—

কৃষ্ণসেবা কামার্পণে ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে
লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা।
মোহ ইষ্টলাভ বিনে মদ কৃষ্ণ গুণ গানে
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥

কামনাকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করতে পারলে কামনার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হল। ক্রোধকে ভক্তবিদ্বেষীতে নিযুক্ত করলে ক্রোধের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হল আর লোভকে সাধু সঙ্গ হরিকথায় নিযুক্ত করলে তার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হল। এইরকম ইষ্টলাভ ছাড়া অন্যত্র মোহ হবে না—তবে মোহের কৃষ্ণপ্রাপ্তি —আর কৃষ্ণগুণগানে মত্ত হলে মদ অর্থাৎ গর্ব্বের কৃষ্ণপ্রাপ্তি—ভক্ত তাই গরব করে বলে—সকল গর্ব্ব দূর করি দিব তোমারই গর্ব্ব ছাড়িব না। গরবিনীর দাসী মোরা এই গরবে সদাই ফিরি। আমি নিত্যকৃষ্ণ-দাস আমি নিত্যরাধাদাসী এই আমাদের সাধনের ধন—এই আমাদের ভাবনার ধন। এর পরে মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরের উৎকর্ষ যে সহ্য করতে পারে না তাকে বলা হয়—মৎসর। মৎসরের ভাবের নাম মাৎসর্য্য। একজন কৃষ্ণসেবা করছে খুব পরিপাটি করে—ভজন করে একনিষ্ঠ হয়ে—তার প্রতি যদি কেউ মাৎসর্য্য করে আমি ওর থেকে বেশী সেবা করব ভজন করব—তাহলে তো সেটি অত্যন্ত প্রশংসার—তখন ঐ মাৎসর্য্যের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়ে গেল।

ভগবান গীতাবাক্যে নরকে যাবার রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নানানমাত্মনঃ।
কামক্রোধস্তথালোভ স্তস্মাদেতং ত্রয়ং ত্যজেৎ॥ গীঃ ১৬।২১

এটি ভগবানের নিজের কথা—কিন্তু ভক্তিমহারাণীর এমনই স্বাধীনতা যে তিনি ভগবানের কথাও শোনেন না। বরং ভগবানকেই কথা শোনান। সব কামনা কৃষ্ণসেবায় দিতে হবে। লোভ সাধুসঙ্গে হরিকথায়। এ লোভ সম্বন্ধে মহাজন বলেছেন—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতামতি ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমেব মূল্যমেকলং জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে॥

এ লোভের ঠিকানা বলা হয়েছে কুতোঽপি অর্থাৎ কোনও ঠিকানা নেই। কোটিজন্মের সুকৃতির বিনিময়েও এ লোভ মেলে না। ক্ষুধা যেমন শুধু খাদ্য চায় বস্তু বিচার করে না—বস্তু বিচার করে মন। তেমনি আমাদের কাম ক্রোধ লোভ এরাও বিষয় গ্রহণ চায় কিন্তু বিষয়ের বিচার করে না। তাই প্রাকৃত রূপরস প্রভৃতি তাকে না দিয়ে গোবিন্দ বিষয় (রূপ রস প্রভৃতি) যদি তাকে দেওয়া যায় তাহলে তাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মশাই তাই বলেছেন—

গোবিন্দ বিষয় রস সঙ্গ কর তার দাস।

যে কোন বস্তুই যদি ভগবানে নিবেদিত হয় তাহলে তার দাম অনেক বেড়ে যায়। অনিবেদিত বস্তুর গ্রহণের ফলে তা কেবলমাত্র বিষ্ঠাতে পরিণত হয়। আর ভগবানে নিবেদন করলেই তার নাম হয় মহাপ্রসাদ।

কৃষ্ণে নিবেদিত বস্তু মহাপ্রসাদ নাম।

কৃষ্ণাশ্রয়ীর গৃহ হয় ভজনস্থলী। ভক্ত সবকিছুই কৃষ্ণকে সমর্পণ করে। ভক্তের কৃষ্ণকে সমর্পণ করবার মন্ত্র হল—মাং মদীয়মহং দদে। আমি এবং আমার বলতে যা কিছু সব তোমার। ভক্তের ঘর হয় ভজনস্থলী বৈকুণ্ঠ ধাম। মোহ তখন চরণে বেড়ির কাজ করে না—মোহ তখন প্রেমময় হয়। অবিবেক হয় কিন্তু সেটি প্রেমমূর্চ্ছার জন্য। লোহা তখন সোনা হয়ে যায় আত্মবিস্মৃতি হয় ভগবৎ প্রেমে।

ব্রজবাসীর মহিমার প্রশংসাপন্ন ব্রহ্মা বলছেন—তারা সব কৃষ্ণকে সমর্পণ করেছে। এখন তাই শুনে শ্রীবালগোপাল যেন বলতে চাইছেন—ব্রজবাসীর যদি এই মহিমা হয় তাহলে ব্রহ্মাও তাই করুন না কেন ? ব্রহ্মা বলছেন—তা হতে পারে না। কারণ আমি চেষ্টা করলেই আমার সর্ব্বস্ব কৃষ্ণে সমর্পণ করতে পারি না। ব্রজবাসী হল ভক্তশ্রেষ্ঠ। আমরা সেই ব্রজবাসীর চরণরেণু পাবার অভিলাষী। ব্রজবাসীকে তোমার দেবার কিছু নেই ভেবে আমরা মুহ্যমান হয়েছিলাম—তুমি তাদের কাছে ঋণী হয়ে পড়েছ এই ভাবনাও

আমাদের প্রবল ছিল। বালগোপাল যেন প্রশ্ন করছেন, ব্রজবাসী যদি জানে যে আমি তাদের ভজনের প্রতিদান দিতে পারব না—ঋণ শোধ করতে পারব না তাহলে তারা আমাকে ভজে কেন? তার জন্য তো তাহলে ব্রজবাসীই দোষী। তার উত্তরে ব্রহ্মা ভগবানকে সম্বোধন করে বলছেন,—হে কৃষ্ণ, অর্থাৎ সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, তোমার সাক্ষাৎ সেবা না পাওয়া পর্য্যন্ত তাদের গৃহ কারাগৃহ হয়। ভক্ত নিরন্তর কৃষ্ণস্মৃতিতে ডুবে থাকে। আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকে। কিন্তু দেহধর্ম পালনের জন্য যে স্বাভাবিক বিষয়রাগ যেমন ভোজনের ইচ্ছা প্রভৃতি সেগুলি তাদেয় দুঃখের কারণ হয়—কারণ তাতে কৃষ্ণস্মৃতির ব্যাঘাত হবে। তাই নিঃসঙ্গ হয়ে ছুটে একা বনে চলে যায়। ঘরে এখনও আছে বলে সেটিকে দুঃখ বলে মনে করে। মোহ বলতে এখানে ক্বচিৎ নিদ্রাজনিত মোহ—নিদ্রায় স্মরণের ব্যাঘাত হয় বলে অনুতপ্ত হয়।

শ্রীজীবপাদ ব্যাখ্যা করেছেন—তাবৎ রাগাদয়ঃ—অর্থাৎ ভক্তের যে তোমার প্রতি অভিলাষ বা তোমার প্রতি প্রীতি তাতে তাদের গৃহ হয় তোমার লীলাস্থান আর মোহ বলতে প্রেমমূর্চ্ছা—কৃষ্ণকে প্রীতি করলেই ক্রন্দন তার চিরসঙ্গী। শ্রীমতী রাধারাণীর নয়নের ধারার বিরাম নেই। শ্রীগৌরসুন্দরের নয়নের ধারায় ধরা ভেসে যায়। শ্রীজীবপাদ বলছেন—তোমার প্রতি আসক্তি তোমার লীলাস্থান দর্শন তোমার প্রতি প্রেমজনিত মূর্চ্ছা ভক্তের পরমদুঃখের কারণ হয়। কারণ লীলাস্থানের দর্শন হচ্ছে অথচ সাক্ষাৎ দর্শন হচ্ছে না—তাতে তার দুঃখ আরও বাড়ে। কটকে গড়গড়িয়া ঘাটে মহাপ্রভু যেখানে নদীপার হয়েছিলেন মহারাজ প্রতাপরুদ্র সে স্থান দর্শন করে গৌরবিরহে আকুল হয়ে প্রার্থনা করেছিলেন—আমার দেহ মন যেন এইখানেই পতন হয়। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বুকফাটা আর্ত্তিতে কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেছেন—

তখন না হইল জন্ম এবে ভেল ভববন্ধ
সে না শেল রহি গেল চিতে।

তাই ভক্ত যতদিন সাক্ষাৎ সেবা না পায় ততদিন তার এ দুঃখ আর মেটে না। ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবন্—তুমি ব্রজবাসীর ঋণ শোধ করতে পারবে না জেনেও যে ব্রজবাসী তোমাকে ভজে—না ভজে পারে না—এটি তাদের দোষ নয়। তোমার পূজার মোহ আছে—তোমার পূজা যে করে সে না করে পারে না। তাই দোষ যদি কিছু থাকে তাহলে তোমার মোহনতাই দোষ। শ্রীজীবপাদ আর একটি টীকায় বলেছেন—বিষয়রাগ চোরের কাজ করে জ্ঞানে মোষকত্বাৎ। কারণ বিষয় রাগ যত বাড়ে আত্মজ্ঞান ভগবজ্জ্ঞান তত চুরি হয়ে যায়। কারাগৃহ থেকে যেমন বন্দী বেরুতে পারে না তেমনি বিষয়াসক্ত ব্যক্তির গৃহ বলতে প্রারব্ধ-ক্ষয় ব্যতীত বহির্গন্তুং ন শক্নোতি। বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মোহ বলা হয়েছে অবিবেক শৃঙ্খল। হাতে পায়ের শিকল যেমন নিজে খোলা যায় না—তেমনি এই মোহও (অবিবেক শৃঙ্খলও) নিজে কাটতে পারে না—একমাত্র ভগবানের কৃপা ছাড়া এটি সম্ভব হয় না। তাই ভগবান গীতাবাক্যে বললেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। গীঃ ৭।১৪

প্রহ্লাদজীও বলেছেন—গৃহব্রত অর্থাৎ গৃহসর্ব্বস্ব বিষয়ী ব্যক্তি কখনও নিজে নিজে কৃষ্ণে মতি দিতে পারে না। আর তারা যদি কাউকে কৃষ্ণে মতি দিতে উপদেশ করে তাতেও কোন কাজ হয় না। কৃষ্ণে মতি দেবার তাদের অবসর হয় না। গোষ্ঠী করে যে কৃষ্ণে মতি দেবার পরামর্শ করবে এমন অবসরও তাদের নেই। যতদিন তারা তোমার নিজজন না হয় ততদিন তাদের এ দুঃখ মেটে না।

গিরিধর তাঁর বালপ্রবোধিনী টীকায় বলেছেন—ব্রজবাসী হল গৃহস্থ আর বিষয়রাগ হল চোর। চোর যেমন গৃহস্থের সম্পদ অপহরণ করে তাকে বেঁধে কারাগারে নিক্ষেপ করে এখানেও তেমনি বিষয়রাগ ব্রজবাসী গৃহস্থের বিবেক ধৈর্য্য ধন অপহরণ করে মোহনিগড়ে বেঁধে কারাগৃহরূপ গৃহে নিরুদ্ধ করে। ভগবান বলছেন সেই গৃহস্থ ব্রজবাসীকে গৃহ থেকে মুক্ত করে আমাকে (নিজেকে) তাদের পাইয়ে

দিই তাহলে তাদের পাওনা অপর্য্যাপ্ত হবে কেন? কারণ বিগতরাগ সন্ন্যাসীরাও তো আমাকেই চায়—আমার ওপরে কোন ফল তারা কামনা করে না। হে কৃষ্ণ সদানন্দরূপ—যাবৎ তে ত্বদীয়া ন ভবন্তি অর্থাৎ তদেকশরণতয়া তোমাকেই একমাত্র শরণ নেওয়ার ফলে ত্বয়া অঙ্গীকৃতা ন ভবন্তি সব ছেড়ে হে গোবিন্দ—আমি নিরাশ্রয়—আমাকে তুমি রক্ষা কর—'নিরাশ্রয়ং মাম্ জগদীশ রক্ষ'—এই বলে যতক্ষণ তারা তোমার নিজজন না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাগদ্বেষ চোরের কাজ করে—গৃহ হয় কারাগৃহ—অর্থাৎ বন্ধনের কারণ, আর মোহ হয় পায়ের শৃঙখল। চোর যেমন রাজার অনুগতজনের সেবা করে কিন্তু রাজ অনুগত যারা নয় তাদের উপর উপদ্রব করে তেমনি ভগবদ্বিমুখ-জনের পক্ষে রাগাদি চোরের কাজ করে কিন্তু ঐ রাগাদি ভগবানের অনুগত জনের উপকার করে। তখন তারাই ভজন সামগ্রী হয়। কাম ক্রোধ লোভ—এরা দোষ কিন্তু এরাই তখন গুণে পরিণত হয়। তাই যত কামনা বাসনা হৃদয়ে আছে সব কৃষ্ণসেবায় লাগাতে হবে। দ্বেষ বা ক্রোধ হবে ভজনবিরোধিজনের ওপরে। যারা সংসারে বাঁধতে চেয়েছিল তারাই তখন তার মুক্তির সহায় হবে। সন্ন্যাসী বিষয়প্রীতি ত্যাগ করেছে কিন্তু গৃহস্থ ভক্ত বিষয়প্রীতি ত্যাগ তো করেইছে উপরন্তু সেই বিষয়প্রীতি তোমাতে লাগিয়েছে—এইটিই তাদের ভজনের অধিক বৈশিষ্ট্য তাই ব্রহ্মা বলছেন—সন্ন্যাসীদের তুমি যে তোমার নিজস্বরূপ দান করেছ সেই স্বরূপ যদি গৃহস্থ ভক্ত ব্রজবাসীকেও দাও তাহলেও ঠিক দান হল না।

ব্রহ্মা এইভাবে জগতে মানুষের মধ্যে স্তরবিভাগ করে দেখালেন—যারা ভগবদ্ভজনে উন্মুখ—তাদের অবস্থা আর যারা বিমুখ তাদের অবস্থা। এর পরে ব্রহ্মা ভগবানের এ জগতে আবির্ভাবের কারণ উল্লেখ করে ভগবানকে স্তুতি করছেন। কারণ ভগবান এ জগতে প্রকটলীলায় না এলে তো মানুষের পক্ষে তার পাদপদ্ম-ভজন কিছুতেই সম্ভব হবে না।

ব্রহ্মা বলছেন—প্রভু, তুমি এই ধরাধামে আবির্ভূত হও কেন ? আমার মনে হয়—

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥ ৩৭

জ্ঞানী জ্ঞানে ভগবানকে জানে আর ভক্ত ভক্তিতে ভগবানকে জানে। ভক্ত দুইপ্রকার—জ্ঞানীভক্ত এবং শুদ্ধভক্ত। শুদ্ধভক্ত আবার দুরকম। সবিষয় এবং নির্ব্বিষয়। সবিষয় হলেন ধ্রুব, প্রহলাদ মহারাজ, অম্বরীষ আর নির্ব্বিষয় হলেন রাজর্ষি ভরত। ভগবান ভক্তকে বিষয় দেন কেন ? ভক্তের বাসনা পূরণের জন্য। যেমন ধ্রুব। কিন্তু, প্রহলাদের তো কোন বাসনা ছিল না। তাঁকে রাজ্য দিলেন কেন ? ভগবান যখন ভক্তকে রাজ্য দেন তখন তাঁর ইচ্ছা থাকে রাজা কৃষ্ণভক্ত হলে সমস্ত প্রজাকে কৃষ্ণভক্ত করবে। রাজ্যে আর কেউ কৃষ্ণ-বিমুখ থাকবে না। তাই তিনি ভক্তকে রাজ্য দেন। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণভক্ত—তাঁরা রাজত্ব করায় কৃষ্ণবিমুখ কৌরবদেরও কৃষ্ণের হাতে বিনাশ পাওয়ায় সদ্গতি হল। বিষয় ত্যাগ করে ভগবদ্ভজন অপেক্ষা বিষয়েয় মধ্যে থেকে অনাসক্ত হয়ে ভগবদ্ভজন কঠিন। জ্ঞানী বিষয় ত্যাগ করে বিষয় ত্যাজ্য বলে আর ভক্ত ভগবানের প্রতি অনুরাগে ছোটে—বিষয় ত্যাজ্য কি অত্যাজ্য তা বোঝে না। তাদের কৃষ্ণ অনুরাগের ফলে ত্যাজ্য বিষয় আপনা থেকেই ত্যাগ হয়ে যায়। তখন গৃহ আর তাদের বন্ধনস্থল থাকে না—সেইটিই ভজনস্থলী হয়ে পড়ে। সংসার তাকেই বলা হবে যা ভগবৎস্মরণ ভুলিয়ে দেয়।

পূর্ব্বশ্লোকে ব্রহ্মা গৃহস্থ ব্রজবাসীর মহিমা বর্ণন করছেন। গৃহস্থ অর্থাৎ সংসারী। সংসারী ব্রজবাসীর এত মহিমা ব্রহ্মা বললেন কেন ? ব্রজবাসীর তো কৃষ্ণকে নিয়েই সংসার—এতে তো কৃষ্ণস্মরণ ভুল হচ্ছে না। সংসার যদি কৃষ্ণস্বরণের অনুকূল হয় তাহলে সে সংসারে দোষ হবে না। যেমন সাপের বিষদাঁত যদি ভাঙ্গা হয়ে যায় তাহলে সে সাপ আর কামড়াতে পারে না। মৃত্যু হল অত্যন্ত ভগবৎ বিস্মৃতি।

শ্রীল সরস্বতীপাদ বলেছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণাকটাক্ষরূপ বৈভব যিনি লাভ করেছেন তিনি হলেন সাপুড়ে। সাপুড়ে সাপ খেলায়—সাপে কিন্তু তাকে দংশন করে না—তেমনি গৌর করুণা যারা পেয়েছে তাদের কাছেও ইন্দ্রিয়রূপী দুর্দান্ত সাপ পরাজিত হয়েছে। শিব যেমন সাপকে আশ্রয় দিয়েছেন। সাপ তাঁকে কিছু বলে না। শিব ছাড়া আর কেউ সাপকে সহ্য করতে পারবে না। সাপ দেখে মৃত্যুভীত যারা তারা সকলেই ভয় পেয়ে পালাবে। সাপ আর কোথাও নিশ্চিন্তে আশ্রয় পাবে না। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী শিব তাকে পরম নির্ভয়ে আশ্রয় দিয়েছেন। ইন্দ্রিয় সর্পের বিষদাঁত হল বিষয়াসক্তি। 'আমি সুখী'—এইটিই হল আসক্তির গোড়া। কিন্তু শুদ্ধভক্তের 'আমি সুখী' এই বোধ হয় না—'তুমি সুখী হও' এই বোধ হয়। শুদ্ধভক্তের এই বিষদাঁত তোলা হয়ে গেছে তাই তাকে ইন্দ্রিয় সাপ দংশন করে না। সমগ্র শাস্ত্র মন্হন করে ঠাকুরমশাই (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর) বললেন—

গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে
(ঠাকুর) নরোত্তম মাগেন তার সঙ্গ।

তাই ভগবদনুরাগই দরকার—বিষয় ত্যাগ আপনিই হয়ে যাবে। ব্রহ্মা বলছেন, হে বালগোপাল—ব্রজবাসী তো তোমাকে নিয়ে সংসার করে তাই তাদের আবার সংসার কি ? শ্রীশুকদেব বললেন পুতনা রাক্ষসীদেহ কৃষ্ণঅঙ্গস্পর্শে অগুরুসৌরভে সুরভিত হল।

'প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি'—শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ বলছেন—পূর্বের কয়েকটি মন্ত্রেই ব্রহ্মা ব্রজবাসীর মহিমা বর্ণন করেছেন তাতে বুঝা যাচ্ছে ব্রজবাসীর বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মা অনুভব করেছেন। এ বৈশিষ্ট্য কি বৈশিষ্ট্য ? শ্রীজীবপাদ বলছেন—শ্রুতি যে কৃষ্ণকে খুঁজছে—আজও পায় নি সেই কৃষ্ণকে ব্রজবাসী পুরুষার্থ বলে মেনেছে—তাতে তারা ঠকে নি। ব্রজবাসীর জীবন হলেন কৃষ্ণ। ব্রহ্মা কৃষ্ণকে স্তুতি করতে গিয়ে প্রথমেই যে বাক্য উচ্চারণ করেছেন—'নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে' সেটি উল্লেখ করে শ্রীবালগোপাল যেন বলতে চাইছেন,

ব্রহ্মন্ তুমি আমার যেরূপ বর্ণনা করলে এবং লীলায় আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে যাতে করে অনেকে সন্দেহ করে যে আমার দেহ মায়িক —তাই তারা বলে আমার লীলা ঠিক ভগবানের লীলা নয়—এটিকে তারা অন্যভাবে আশঙ্কা করে—এ সম্বন্ধে তোমার কি মত ব্রহ্মন্ ? এর উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—

'প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি'—এখানে 'অপি' পদের তাৎপর্য্য হল—প্রপঞ্চ দেবতাই এই ভূতলে আসেন না—আর নিষ্প্রপঞ্চ তুমি কেন এখানে আসবে ? তুমি তো মায়ার অতীত স্বরূপ—অপ্রপঞ্চ রসভূপ। কারণ তোমার তো এ জগতে আসার কোন প্রয়োজন নেই। ভূতলে শুধু তুমি যে অবতীর্ণ হও তাই নয়—তুমি এ জগতে এসে মায়ামুগ্ধ জীবের কাজের মত অনুকরণ কর (বিড়ম্বয়সি)—ব্রহ্মা বলছেন—এর একমাত্র কারণ আমার মনে হয়—প্রপন্নজনতার ঘন আনন্দকে বিস্তার করবার জন্য। নিত্য তুমি এ জগতে লীলা প্রকাশ করেও নিষ্প্রপঞ্চই আছ। কারণ এ জগতের মায়া তো তোমাকে স্পর্শ করতে পারে না। তোমার ধামকেও স্পর্শ করতে পারে না। প্রপন্নজন বলতে বুঝায় যারা তোমার চরণে একান্ত শরণাগতি নিয়ে পড়ে আছে —অর্থাৎ ভক্তজন। ভক্তজনকে আনন্দ দেবার জন্যই তোমার এই মায়ার জগতে আবির্ভাব এবং লীলা প্রকাশ—এইটিই ব্রহ্মার মন্তব্য। ভগবান এ জগতে আবির্ভূত হলেও মায়া তাঁকে বা তাঁর সম্পর্কিত কোনও কিছুকে স্পর্শ করে না। তাঁর ধাম লীলা পরিকর বিগ্রহ নাম সব মায়ার ঊর্দ্ধ্বে। শিশুকে যেমন শৃঙ্গাররস স্পর্শ করে না—তেমনি ভগবান আর মায়া কেউ কাউকে ছোঁয় না। প্রাকৃত জগতেও দেখা যায় একজনের কাজ আর একজন করে না। কাণ এবং চোখ কাছাকাছিই থাকে—কিন্তু কাণের কাজ চোখ করে না—চোখের কাজ কাণ করে না। এক জায়গায় থাকলেও ছোঁয়া যায় না। অপ্রপঞ্চ অপ্রপঞ্চই ছোঁয়—অপ্রপঞ্চ প্রপঞ্চকে ছোঁয় না। অপ্রপঞ্চ অপ্রঞ্চই দেখে প্রপঞ্চ দেখতে পায় না—তাই মহাজন বললেন—

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥

শ্রীগুরুকৃপায় প্রেমাঞ্জনাচ্ছুরিত ভক্তিচক্ষু পেলে তাতে অপ্রপঞ্চ দর্শন হয়—নতুবা হয় না। ব্রহ্মা বলছেন—প্রপঞ্চ (মায়া) তোমার লীলাকে স্পর্শ করতে পারে না। তুমি মাঝে মাঝে ভূতলে অবতীর্ণ হও এবং প্রপঞ্চের অনুকরণ কর কিন্তু প্রাকৃত লোকের চেয়ে তোমার লীলায় অনেক বেশী উৎকর্ষ প্রকাশ পায়। কিন্তু যারা অজ্ঞ মূর্খ তারা বোঝে না—তারা ভগবানের দেহ মানুষের মত বলে তাকে মানুষ বুদ্ধি করে—এটি জীবের মূর্খতা। ভগবান গীতাবাক্যে বললেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ গীঃ ৯।১১

ভগবানের (কৃষ্ণচন্দ্রের) দেহ মানুষের মত দেখতে হলেও তা মায়িক নয়—কারণ দেহ গরুড়ের পিঠে ওঠে—এ দেহকে শিববিরিঞ্চি বন্দনা করেন—কিন্তু অন্য কোন মানুষের দেহতে এটি সম্ভব হবে না।

ভগবান আরও বলেছেন—অর্জ্জুন,

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্তবা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ গীঃ ৪।৯

আমার অপ্রাকৃত জন্ম কর্ম ঠিক ঠিক দিব্যবোধে জানতে পারলে জীবের প্রাকৃত জন্ম কর্ম আর থাকে না। তাই ভগবানের অপ্রাকৃত জন্ম কর্মের সঙ্গে প্রাকৃত জন্ম কর্মের কোন সজাতীয়তা নেই। অন্ধকার যেমন সূর্য্য দেখলে পালিয়ে যায় প্রাকৃত জন্ম কর্মও তেমনি অপ্রাকৃত জন্ম কর্ম দেখলে বা জানলে পালিয়ে যায় অর্থাৎ বিনাশ পায়। ব্রহ্মা বলছেন, হে বালগোপাল, তুমি প্রাকৃত অনুকরণ করলেও তার থেকে মহান্ ভেদকে তুমি প্রকাশ কর। এতে তোমার উৎকর্ষই প্রকাশ পাচ্ছে। শ্রীবালাগাপাল যেন বলছেন, হে ব্রহ্মন্ তা এত খাটালির কি দরকার? ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে মানুষের কাজের মত অনুকরণ এত পরিশ্রমের কি প্রয়োজন? ব্রহ্মা বলছেন—এর প্রয়োজন

আছে। কারণ ভূতলে যারা শরণাগত হয়ে পড়ে আছে তাদের আকর্ষণ করতে হবে তাদের আনন্দ দিতে হবে। কারণ তোমার নাম যে কৃষ্ণ। আকর্ষণ করা এবং আনন্দ দেওয়া—এই দুটি থেকেই তো তোমার নামের উৎপত্তি। তুমি তো ভক্তবৎসল।

এখন কথা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ গোলোকেও তো নিত্য পরিকর আছেন তারাও তো তোমার প্রপন্ন জন—তাহলে তাদের আনন্দবিধান করলেই হয়। ভূতলে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজন কি? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—তুমি অনিত্য ব্রহ্মাদিকেও আনন্দিত কর নিত্য পরিকরদের দর্শন করিয়ে এবং অনিত্য ব্রহ্মাদিকেও আনন্দিত কর শ্রবণ করিয়ে। কিন্তু ভূতলে তুমি সেই আনন্দের রাশিকে বিস্তার কর। এখানে তোমার বিস্তৃত আনন্দ। কারণ সম্পদ্ পেলে আনন্দ হয় বটে কিন্তু বেশী আনন্দ কার হয়? রাজার সম্পদ্ পেয়ে যে আনন্দ তার চেয়ে দরিদ্রের সম্পদ্ লাভে আনন্দ বেশী। মহাজন উদাহরণ দিয়েছেন—দারিদে (দরিদ্র) পাইল যেন ঘটাভরা হেম। শ্যামনাগর রাধারাণীকে পেলেন। ব্রহ্মা বলছেন, হে বালগোপাল, তোমার প্রেম সম্পত্তি লাভ করলে ভূতলে দরিদ্র প্রপঞ্চজনের যত আনন্দ হয় এমন আনন্দ গোলোক বৈকুণ্ঠের নিত্য পরিকরের হয় না।

ব্রহ্মার বাক্যের উত্তরে বালগোপাল যেন বলছেন, ব্রহ্মন্ ব্রজবাসীর কাছে আমার যে পুত্রাদি ভাব সে ভাব কিন্তু সত্য নয়। বাস্তব নয়, আমি যে পূর্ণব্রহ্ম কাজেই আমার এ পুত্রাদি ভাব সত্য না হওয়াই সম্ভব। যেমন জলের নিজস্ব কোন ভাব নেই। যখন যে উপাধিতে থাকে তখন তার বর্ণ আকার ধারণ করে। উদ্ধবজী যেমন নন্দ মহারাজকে তত্ত্ব কথা বুঝিয়েছিলেন। মহারাজ, কৃষ্ণ তো পরমেশ্বর পরব্রহ্ম তাকে পুত্র মনে করে কেন কষ্ট পাচ্ছেন? কৃষ্ণ পরমেশ্বর—তিনি কি কারও পুত্র হন? ব্রহ্মা ভগবানের এ কথার উপরে বলছেন—প্রভু ভূতলে তোমার সদা বসতি। শ্রীশুকদেব বলেছেন—মথুরা যত্র ভগবান নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ। শ্রীশুকবাক্যকে অনুসরণ করে

এখানেও সদা পদ দেওয়া হয়েছে। ভগবানের লীলা প্রকট অপ্রকট দুইই বলা হয়েছে। শ্রীগোবিন্দ গীতাবাক্যে নিজের আবির্ভাবের কারণ বলেছেন—কিন্তু কোথা থেকে আবির্ভূত হন সে কথা বলেন নি। ঠিকানা দেন নি। ভগবানের লীলা নিত্যা। ভগবান নিত্য-লীলানুরক্ত। এখানে থেকেই প্রকট অপ্রকট লীলা করেন। যখন লীলা দেখান তখন প্রকট আর যখন দেখান না তখন অপ্রকট। কারণ ভগবান বলেছেন—নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ। যোগমায়া লীলাশক্তি কৃষ্ণেরই সুখের জন্য যখন পর্দ্দা ফেলে দেন তখন অপ্রকট লীলা আর যখন পর্দ্দা তুলে নেন তখন প্রকট লীলা। তুমি প্রপঞ্চকে বিড়ম্বয়সি অর্থাৎ অনুকরণ কর। অর্থাৎ প্রপঞ্চস্থিত পুত্রাদি ভাবকে অনুকরণ কর। তুমি নিজে নিষ্প্রপঞ্চ হয়েও প্রপঞ্চ মায়ামুগ্ধ জীবের কাজের মত অনুকরণ কর। জীবের অর্থাৎ মানুষের যে পুত্রাদি ভাব তা ঠিক নয়—এটি অবাস্তব। কারণ আত্মাতে অন্য কোন ভাব অর্থাৎ পুত্রাদি ভাব থাকতে পারে না। জীবের স্বরূপ একমাত্র সে নিত্য কৃষ্ণদাস। তাই জীবে নিত্য কৃষ্ণদাস এই ভাবই একমাত্র থাকতে পারে। আর কোন ভাব থাকতে পারে না। পুত্রাদি ভাব জীবে পরান হয়েছে! এটি মহামায়ার কাজ। যাত্রায় যেমন বহুরূপী সাজে। তার কোন সাজটিই নিজস্ব নয়। আত্মা পিতা পুত্র কিছুই নয়। পুত্র বা পিতা এ সংজ্ঞাটি দেহের। দেহের পরিণাম তিন রকম। সৎকার হলে ভস্ম একমুঠো ছাই আর তা না হলে কৃমিকীট বিষ্ঠায় পরিণতি।

বালগোপাল যে বলেছিলেন আমার পুত্রাদিভাব অবাস্তব তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—তোমার পুত্রাদিভাব কিন্তু অবাস্তব নয়—বাস্তব অর্থাৎ নিত্য। কারণ তুমি যে নিত্য স্বরূপ তুমি নিষ্প্রপঞ্চ—তুমি সত্যস্বরূপ তোমার বিগ্রহ আত্মময়—তাই তার সবই সত্য। তোমার প্রতিটি লীলাই নিত্য। লীলার লক্ষণ হল প্রপঞ্চাতীতাপি প্রপঞ্চানুকরণময়ী—প্রপঞ্চ অর্থাৎ মায়ার অতীত স্বরূপ হয়েও মায়া-

মুগ্ধ জীবের কাজের মত অনুকরণ করার নামই লীলা। স্বরূপ থেকেই তো লীলার প্রকাশ হয়। স্বরূপশক্তির বিলাসের নামই লীলা। পরিকর ধাম সবই স্বরূপশক্তি সন্ধিনী শক্তির বিলাস। কৃষ্ণ হলেন অপ্রপঞ্চ রসভূপ। প্রপঞ্চকে অনুকরণ করেন মাত্র। যেমন মা যশোমতী তাঁকে উদূখলে বেঁধেছেন—উদূখলটি টানতে টানতে চলেছেন। সোজা হয়ে দাঁড়াতে যেন বাধা ছিল—কিন্তু প্রপঞ্চকে অনুকরণ করতে গিয়ে সোজা হতে পারছেন না—তাঁর লীলাও অপ্রপঞ্চ। সেইজন্য লীলাও উপাস্য হয়েছেন। স্বারসিকী লীলা হলে তবেই তা উপাস্যা হবে। অসুরমোহন লীলা যেমন পূতনাবধ কালীয়দমন কংসারিলীলা—এগুলি সরস নয়—তাই এই লীলা উপাস্যা হতে পারে না। মদনমোহন গিরিধারী উপাস্য হয়েছেন। প্রপঞ্চবস্তু উপাস্য হয় না। ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিও ভগবানেরই লীলা—কিন্তু সেটি অন্যকে দিয়ে করেছেন—তাই এটি তাঁর স্বরূপশক্তির বিলাস নয়। সুতরাং উপাস্য হবে না। স্বরূপশক্তির বিলাসই উপাস্য হবে। ভৃত্যকে দিয়ে কাজ করালে সে কাজের অত প্রশংসা হয় না কিন্তু নিজে করতে পারলে তার প্রশংসা হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভগবান এই প্রপঞ্চের অনুকরণ করেন কেন? ব্রহ্মা কারণ দেখালেন প্রপন্নজনের ঘন আনন্দবৃদ্ধির জন্য। ভগবান লীলাপ্রকাশ না করলে প্রপন্নজনের অর্থাৎ ভক্তজনের আনন্দ হয় না। ব্রহ্মা বলেছেন 'প্রথিতুং' অর্থাৎ বিস্তার করবার জন্য। ভগবানের লীলা আস্বাদনের যে আনন্দ তা ব্রহ্মানন্দ এবং বৈকুণ্ঠানন্দ হতেও অনেকগুণ বেশী। এইটি বিস্তার করবার জন্য। তা ভগবান এই লীলা ভূতলে প্রকাশ করলেন কেন? ভূলোকে এই লীলা প্রকাশের সার্থকতা কি? শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ বলছেন—প্রকাশে দীপো নাতিশোভতে। দিনে সূর্য্যের আলোতে যেমন প্রদীপ শোভা পায় না—তার উজ্জ্বলতা বুঝা যায় না। কিন্তু রাতের অন্ধকারে তার উজ্জ্বলতা বেশী হয়—তখন আলো মানায়। তেমনি মায়াময় প্রপঞ্চ জগতে চিন্ময়ী লীলা

যত শোভা পায় চিন্ময়ধামে চিন্ময়ী লীলা তত শোভা পায় না—সেখানে ধাম চিন্ময় আর লীলাও চিন্ময়ী—কাজেই ঠিক যেন শোভা হয় না—কিন্তু এখানে মায়াময় জগতে প্রপঞ্চ জগতে অন্ধকারে চিন্ময়ী লীলার শোভা বেশী। যেমন শ্বেতরাজত পাত্রে (সাদা রূপোর থালা) শুভ্র হীরকখণ্ড শোভা পায় না—সাদায় সাদা মিশে যায়—কিন্তু নীলমণিময় পাত্রে সাদা হীরে খুব ভাল মানায়। সজাতীয়তায় বস্তুর শোভা হয় না। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে কলিরাজ অধর্মকে বলেছেন অলৌকিকী লীলার চেয়ে লৌকিকী লীলা বেশী আস্বাদনের। লীলাগঙ্গা যখন বৈকুণ্ঠ গোলকরূপ মহেশের মাথা থেকে নেমে এসে লৌকিক মাটির জগতে প্রবাহিত হন তখনই পতিতের আনন্দ। এখন চক্রবর্ত্তিপাদের এই কথার উপরে একটি দোষ আসে শ্রীধাম বৃন্দাবনে তো ভগবানের চিন্ময়ী লীলা প্রকাশ পেয়েছেন এবং অতিশয় শোভমানা হয়েছেন—তাহলে বৃন্দাবনকে মায়াময় প্রপঞ্চ বলতে হয়। না তা বলা যাবে না। বৃন্দাবন চিন্ময় ধাম। কিন্তু তার ভাব মায়াময়ের মত। ভগবান অপ্রপঞ্চ হয়েও প্রপঞ্চের মত হয়ে এসেছেন দেখে বৃন্দাবনধাম নিজে অপ্রপঞ্চ হয়েও ভাবলেন—আমার ঠাকুর যখন প্রপঞ্চবৎ হয়েছেন তখন আমিও প্রপঞ্চের মত হব। সর্ব্ব কারণকারণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি আজ নরাকৃতি হয়েছেন তাই ধামও আর তাত্ত্বিক স্বরূপে থাকতে পারলেন না—প্রপঞ্চের মত হয়ে পড়লেন। ধাম বৃন্দাবন তত্ত্বও অপ্রপঞ্চ হলেও প্রপঞ্চের অনুকরণ করেছে তাই ভগবানের চিন্ময়ী-লীলা সেখানে অত্যন্ত শোভা পেয়েছে।

ব্রহ্মা সম্বোধন করেছেন—হে প্রভো! প্রভু শব্দের অর্থ হল কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং শক্যঃ—যিনি করতে পারেন—না করতে পারেন বা অন্যরকম করতে পারেন—এ স্বাধীনতা যার আছে তিনিই প্রভু। ব্রহ্মার এই প্রভূ সম্বোধনের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে তিনি তাকে কিছু করাবার জন্য প্রেরণা দিচ্ছেন। এ জগতের প্রপন্ন জন যারা

তাদের বাহাদুরি দিতে হয়। কারণ কৃষ্ণপাদপদ্মের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই—তারা ভাববাচ্যে পড়ে আছে। কৃষ্ণচরণ তারা দেখে নি কেবল চরণের গুণ শুনেছে। ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতম্ এই গুণ শুনেই সেই চরণে জীবন সমর্পণ করেছে। দেখতে পেলে কাজ করা সহজ হয়। কিন্তু সাধুগুরু মুখে শুনে কাজ করা কঠিন। তাই প্রপন্নজনের কাছে তোমার চরণ ঋণী হয়ে আছে। সেই প্রপন্নজনকে আনন্দ দেবার জন্য তোমার চরণ ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে লীলা প্রকাশ করে। ভূতলে তোমার লীলা প্রকাশের তাৎপর্য্য এইটিই। মা যেমন পুত্রকন্যার জন্যই রান্না করেন। অন্যে খায় খাক্ কিন্তু সন্তান খেলেই তার বেশী সুখ। তেমনি ভগবানও যে ভূতলে অবতীর্ণ হয়ে লীলা প্রকাশ করেন—উদ্দেশ্য যে প্রপন্নজন আনন্দ পাবে।

ব্রহ্মা স্তুতি শেষে প্রার্থনা জানাচ্ছেন কাতরে—প্রভু গো তুমি যখন প্রভু তখন সবই তো তুমি করতে পার—তা আমার জন্য কিছু কর। তোমার এই প্রপন্নদলের মধ্যে আমার নামটা লিখিয়ে নাও অর্থাৎ আমাকে তোমার প্রপন্নজনেদের মধ্যে একজন করে নাও।

ব্রহ্মা ভগবানের মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে ভক্ত ব্রজবাসীর মহিমা বর্ণন করেছেন। কারণ ভক্তমহিমা ভগবানের মহিমারই অন্তর্গত। শ্রীবালগোপাল তখন যেন ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করছেন—ব্রহ্মান্ তুমি যখন আমার মহিমা বর্ণন করছ—তখন তুমি আমার মহিমা জান। না জানলে তো বলতে পারতে না। ভগবানের তত্ত্বজ্ঞাতা কেউ নেই। ভগবান নিজেই নিজের তত্ত্ব জানেন না। কারণ তাঁর তত্ত্ব অনন্ত। বালগোপালের এই প্রশ্নে ব্রহ্মা সঙ্কুচিত হয়ে বলছেন—

জানন্ত এব জানন্ত কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ॥ ৩৮

প্রভু, আমি অকপটে স্বীকার করছি আমি সৃষ্টিকর্ত্তা কিন্তু তোমার মহিমা আমার দেহ মন বুদ্ধির গোচর আজও হল না। দেহ, মনঃ বাক্য দিয়ে তোমার মহিমার কণামাত্রও স্পর্শ করতে পারলাম না। তাই

বলি আমার সৃষ্ট যারা তারা যদি বলে যে আমরা ভগবানের তত্ত্ব জেনে নিয়েছি—তারা বলছে বলুক—তারা জেনেছে বলছে বলুক—আমি আর তাদের বেশী কি বলতে পারি ?

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁর টীকায় বলছেন—ব্রহ্মা স্তুতির প্রারম্ভে শ্লোক বলেছেন—'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য'—এই শ্লোকে জ্ঞান সাধনের তুচ্ছতা এবং ভক্তিসাধনের মহিমা বলা হয়েছে। সেখানে ব্রহ্মা বলেছেন—যারা সব সাধন ছেড়ে দিয়ে শুধু বসে বসে সাধুর কাছে তোমার কথা শোনে তারা তোমাকে কায়মনোবাক্যে বশীভূত করে। এই উপক্রম করা হয়েছে। বাক্যে উপক্রম এবং উপসংহার ঠিক রাখতে হবে। 'জানন্ত এব জানন্ত'—এই শ্লোকটি ব্রহ্মার উপসংহার বাক্য। তোমার বৈভব আমার দেহ বাক্য ও মনের গোচর হল না। বৈভব বলতে ভক্তিমাহাত্ম্যকেই বুঝাচ্ছে। সাধক আনন্দ করে সাধুমুখে ভগবানের কথা শুনছে—কোন কষ্ট করতে হচ্ছে না অথচ ক্লেশসাধ্য সব ফলই পেয়ে যাচ্ছে। ভগবানের কোন বৈভব নেই বৈভব যা কিছু তা ভক্তির। কারণ এই ভক্তিই ভগবানকে বশীভূত করে। ব্রহ্মা তো ভাগবতধর্ম জানেন—কারণ দ্বাদশ জন যে ভাগবতধর্ম জানেন বলা আছে তার মধ্যে ব্রহ্মা একজন—স্বয়ম্ভু নারদ শম্ভু কুমার কপিল মনু প্রহ্লাদ জনক ভীষ্ম বলিরাজ বৈয়াসকি এবং যমরাজ (ধর্মরাজ)—এই দ্বাদশজন। তাই ভাগবতধর্ম যিনি জানেন তাঁর দৈন্যও থাকবে। সেই দৈন্যস্বভাবে ব্রহ্মা বলছেন—তোমার বৈভব আমার গোচর হল না। কারণ যে যত পায় তার দৈন্য তত। ভক্তির এমনই মাহাত্ম্য যে যার কাছে যত ভক্তি আছে তার কাছে ভক্তির তত অভাব জাগিয়ে রাখে। সান্নিপাতিক জ্বরের বিকারগ্রস্ত রোগীর মত। কলসে কলসে জল খেয়েও তার পিপাসা মেটে না—বলে জল তো আমি খাই নি। তত্ত্ববোধও তেমনি যে যত করেছে তার দৈন্য তত—তারা বলে কিছুই জানা হল না। সেইজন্য ব্রহ্মা বলছেন—যারা বলে তোমার তত্ত্ব জেনেছি তারা বলে বলুক—জানে জানুক—

কিন্তু আমি তো বুঝেছি—আমি দেহ মন বাক্য দিয়ে তোমার বৈভব কিছুই জানতে পারি নি। ব্রহ্মার কথার তাৎপর্য্য হচ্ছে জ্ঞানের চেষ্টা যারা করে করুক কিং বহূক্ত্যা—জ্ঞানাদির তুচ্ছতা ভক্তির মহিমা এতো অনেক বলেছি আর বেশী বলে লাভ কি ? যারা বুঝবার তারা যা বলেছি তাতেই বুঝবে আর যারা বুঝবে না তাদের কাছে আর বেশী বলে লাভ নেই।

ব্রহ্মা ভগবানকে প্রভো বলে সম্বোধন করছেন। প্রভু অর্থাৎ বিচিত্রানন্তমহাপ্রভাব—তোমার মহিমা আমার দেহের গোচর হল না। অর্থাৎ লিখনাদির সামর্থ্য নেই। তুমি অনন্ত—তাই বাক্যের অগোচর মনেরও গোচর তুমি নও। চিন্তার অবিষয়। কারণ তুমি অপরিচ্ছিন্ন এবং অবিতর্ক্য। তুমি অপরিচ্ছিন্ন তাই দেহের গোচর নয়। বাক্যেরও গোচর তুমি নয়। কারণ শ্রুতি বলেছেন যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। তুমি অবিতর্ক্য তাই মনের গোচর নয়। একমাত্র তুমি ছাড়া আর যা কিছু বস্তু আছে সবই আমার মনের গোচর। ব্রহ্মা যখন বালগোপালের স্তুতি আরম্ভ করেন তখন প্রথমেই বপুর বর্ণনা আরম্ভ করেছিলেন। 'নৌমিড্য তেঽভ্রবপুষে'—আরও বলেছেন অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য—অর্থাৎ এর দ্বারা ব্রহ্মা বলতে চান তোমার বপুটিই পরম তত্ত্ব। তোমার বিগ্রহই আনন্দ, আনন্দই তোমার বিগ্রহ। প্রাকৃত জীবদেহে দেহ দেহী (আত্মা) ভেদ আছে—কিন্তু ভগবানে দেহ দেহী ভেদ নেই। ব্রহ্মা পরমস্তুতি রূপে ভগবানের দেহের বর্ণনা করেছেন। অনেকে শ্রীমদ্ভাগবতে অধ্যাত্মবাদ ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা করতে হয় তখনই যার অধ্যাত্ম ছাড়া আরও কিছু আছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে সবটাই অধ্যাত্মস্বরূপকে নিয়ে কথা। তাই এর আর নূতন করে অধ্যাত্ম ব্যাখ্যার কিছু নেই। জগতে পিতৃ পরিচয় জানতে গেলে যেমন মাতার উপদেশ ভিন্ন জানবার আর কোন পথ নেই—তেমনি ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু ঋষিবাক্য ছাড়া বুঝা যায় না। শ্রুতিমাতা বলেছেন ভগবান

সচ্চিদানন্দঘন—ভগবানের দেহ মায়িক নয়। যে মায়িক বলে তার তা হলে শাস্ত্র ঠিক বুঝা হয় নি বুঝতে হবে। ভগবানের নাম অধোক্ষজ। আমাদের বাক্য দিয়ে বা আমাদের স্বপ্নের উপলব্ধি দিয়ে ভগবানকে বুঝা যায় না।

শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরিভক্তিরুৎপাতায় কল্পতে॥

এ হল শাস্ত্রের কড়া আদেশ। ভগবানের দেহ যে মায়িক নয় তা ভগবানের উক্তি থেকেই পাওয়া যায়।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥ গীঃ ৪।৯

আমার জন্ম কর্ম তত্ত্বত জানলে তার আর পুনর্জন্ম হয় না। ভগবানের জন্ম কর্ম যদি মায়িকই হবে তাহলে তা জানলে আমার মায়িক দেহবন্ধন ছিন্ন হবে কেন? ভগবান আরও বলেছেন যারা আমার দেহকে মায়িক বলে তারা মুর্খ। স্তুতির মাঝখানে ব্রহ্মা নানা সংশর সমাধান করেছেন। বলেছেন—একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ—এখানে বললেন মুক্তঃ উপাধিতঃ। আত্মার উপাধি হল দেহ—তাই ভগবানের যে দেহ তা উপাধি নয়। সেও আত্মস্বরূপ। এ যেন আলো দিয়ে আলো ঢাকা হয়েছে। যদাত্মকো বিগ্রহ স্তদাত্মকো ভগবান্। এখন যদি প্রশ্ন হয় কিমাত্মকো ভগবান্? জ্ঞান শক্তি ঐশ্বর্য্য ও আনন্দাত্মক ভগবান। ভগবানের দেহ যদি মায়িক বলে সংশয় হত তাহলে উপাধিতো মুক্ত বলা হত না। অনেক শাস্ত্র ভগবানকে অরূপ বলেছেন এ অরূপ মানে নয় যে তাঁর দেহ নেই রূপ নেই। কিন্তু প্রাকৃতরূপরহিত অর্থাৎ প্রাকৃতরূপ মায়িক রূপ তাঁর নেই তাই অরূপ বলা হয়েছে। শ্রীজীবপাদ ভাগবত সন্দর্ভে তা বিচার করেছেন—বৈকুণ্ঠপার্ষদ গরুড় সুনন্দ প্রভৃতিকে দেহ এবং ইন্দ্রিয়হীন বলা হয়েছে। এর মানে নয় যে তাদের দেহ ইন্দ্রিয় নেই তা নয়। কিন্তু প্রাকৃত দেহ ইন্দ্রিয় তাদের নেই তাই দেহেন্দ্রিয়াদিহীন

বলা হয়েছে। ব্রহ্মা এইভাবে স্তুতির মধ্যে শঙ্কা সমাধান করে ভক্তি ভজন মহিমা দ্বারা ভগবানের মহিমাকেই দৃঢ় করেছেন। প্রভু—সম্বোধন করেছেন—ভূ অর্থাৎ যে হয়েছে প্রকৃষ্টরূপে হয়েছে তাই প্রভু। প্রকর্ষেণ অর্থাৎ সুন্দরতরাকারেণ এই ভুবনে প্রকট হয়েছেন। তাঁর অসাধারণ প্রকৃষ্টতা ব্রহ্মা বলছেন তোমার বপুর এই অসাধারণ মহিমা আমার গোচর হল না। তোমার বাক্যের মনের মহিমাও আমার গোচর হল না। তোমার মন কোটি সমুদ্র অগাধ আশয়। তোমার বপুর মহিমা কেমন করে গোচর হবে বল? একই বপু তোমার সসীম ও অসীম তাই তাকে কি বুদ্ধির মধ্যে আনা যায়? তোমার বাক্য হল বেদ তা অনন্ত অগাধরূপে। তাই তোমার বাক্যও জানতে পারলাম না। বেদ তাৎপর্য্য এক ভগবান ছাড়া আর কারো জানবার সামর্থ্য নেই। বেদ জানবার পক্ষে আর কাউকে কৃষ্ণ জায়গা দেন নি। ভগবান উদ্ধবজীর কাছেও বললেন—বেদ আমাকেই প্রতিপাদন করেছে। এই বেদকে যদি আর কেউ জানে তাহলে কৃষ্ণকৃপাতেই জানবে। কিংবা আর একটি অর্থ করেছেন—বাক্য বলতে বেদকে ধরা হচ্ছে না। তোমার শ্রীমুখের পরিমিত বাক্য যা দু একটি কথা তুমি বলেছ তাতেই সর্ব্বাশয়বর্ত্তমান—তুমি বাগ্মী বলে তোমার বাক্য সংক্ষিপ্ত। তুমি সখাদের প্রতি সম্প্রীত যে সকল বাক্য উচ্চারণ করেছ তাও আমার বুদ্ধির গোচর হল না। কিংবা আর এক পক্ষে ব্যাখ্যা করছেন—ব্রহ্মা নন্দ ব্রজবাসীর—"অহোভাগ্যম্"—বাক্যে মহিমা বর্ণন করে কৃষ্ণেরই মহান্ স্তুতি গাইলেন। এর দ্বারা জ্ঞানাভিমানী মূর্খকে উপহাস করলেন। এইভাবে ব্রজবাসীর প্রসঙ্গই পূর্ব্বে বলা হয়েছে। ব্রহ্মা বলছেন বৈভব আমার গোচর হল না। কার বৈভব? অনুবৃত্তির দ্বারা ব্রজবাসীই নিতে হবে। অর্থাৎ ব্রজবাসীর বৈভব আমার কায় মন, বাক্যের গোচর হল না। হে প্রভো! শ্রীগোকুলেশ্বর ব্রজবাসীর মাহাত্ম্য তব মম চ ন কায়বাঙ্-মনসো গোচরঃ। ব্রজবাসী প্রেমময় প্রেম ভগবানকে অধীন করে।

ভগবান প্রেম বুঝতে পারেন না। প্রেমের কাছে ভগবানকে হার মানতে হয়। রাসস্থলী হতে অন্তর্হিত হয়ে কৃষ্ণ অন্যত্র গিয়ে চতুর্ভুজ হয়ে বসে আছেন প্রেমস্বরূপা রাধারাণী সামনে এসে উপস্থিত হতেই তাঁর চতুর্ভুজ আর রইল না দ্বিভুজ হতে হল। ভগবান প্রেমকে অধীন করেন না। প্রেমই ভগবানকে অধীন করে। ভগবান প্রেমকে বুঝতেই পারেন না। তাহলে প্রেমময় ব্রজবাসীকে তিনি কেমন করে বুঝবেন? ব্রহ্মা বলছেন—অন্যে যারা বলছে ভগবানের তত্ত্ব আমরা জেনেছি তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাদের আমি আর বেশী কি বলব?

এই বাক্যের উপরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ আস্বাদন করছেন—ভগবান বলছেন—ব্রহ্মন্ তুমি তো আমার স্বরূপ, আমার ব্রজবাসীর স্বরূপ, আমার লীলা এবং আমার ভক্তির সব তত্ত্বই তো বেশ সপ্রতিভ ভাবে আমার সামনে ব্যাখ্যা করলে তা এখন সত্য করে বলত তোমার মত এরকম জ্ঞানী এ জগতে আর কজন আছে? এটি ভগবানের বক্রোক্তি। ভগবানের তত্ত্ব জানা যায় না কারণ তা অনন্ত। ভগবানের একই আধারে সবিশেষতা এবং নির্ব্বিশেষতা বর্ত্তমান তাই এটি দুর্জ্ঞেয়। ভগবানের তত্ত্বটি সচ্চিদানন্দ কিন্তু তাতে প্রাকৃত ধর্ম্ম চেষ্টা ক্ষুধা পিপাসা সব রয়েছে। তাই এই দুটির মধ্যে সামঞ্জস্য করা অসম্ভব বলে ভগবৎতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। প্রাকৃত গন্ধ পর্য্যন্ত যে স্বরূপে নেই তাতে প্রাকৃত ধর্ম্ম পরিপূর্ণভাবে দেখা যাচ্ছে। আত্মারাম সনকাদিমুনিদের হৃদয় হল গবেষণাগার—সেখানে তাঁরা কষে কষে দেখেছেন ভগবৎ স্বরূপে সৎ চিৎ এবং আনন্দ ছাড়া আর কোন উপাদান নেই। তা যদি না হবে তাহলে তাঁদের মন হরণ করবে কেন? ব্রজবাসী যে সব ছেড়ে ভগবানকে ভজে তাদের এ মহিমা ভগবান বুঝতে পারেন না। বুঝতে পারলে ভগবান তার প্রতিদান দিতেন—তাহলে সব ছেড়ে তিনিও ব্রজবাসীকে ভজতেন কিন্তু তিনি তো তা পারেন না—কারণ তাঁর ব্রজবাসী ছাড়া আরও ভক্ত আছে। ব্রহ্মা ভগবানের লীলা এবং ভক্তি বর্ণনা করেছেন। ভগবান লীলা করেন

না। লীলা ভগবানের বাধ্য হন না। ভগবানই লীলার বাধ্য হন। ভক্তিই ভগবানকে বশীভূত করে। ব্রহ্মা শিব যেমন ভগবানের বশীভূত।

বালগোপালের এ বক্রোক্তি শুনে ব্রহ্মা লজ্জা কম্প এবং অনুতাপের সঙ্গে বলছেন 'জানন্ত এব জানন্ত'—প্রভু তোমার স্বরূপ ব্রজবাসী, লীলা এবং ভক্তির বৈভব আমার কায় মন এবং বাক্যের গোচর হল না। ব্রহ্মা বলছেন আমি মহামূর্খ বলে তোমার সামনে এত কথা বলেছি। এটি ব্রহ্মার অকপটে উক্তি—লোক দেখিয়ে দীনতা প্রকাশ নয়। কারণ সেখানে বালগোপাল ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তি ছিল না। কেউ যে তার দৈন্য পূর্ণ বাক্য শুনে প্রশংসাপত্র দেবে তাও নয়। বালগোপাল বললেন সত্য করে নিষ্কপটে বল ব্রহ্মন্ তাহলে তাদের মহিমা কেন বলছিলে? মহিমার খবর তাহলে তুমি জান কি? তার উত্তরে ব্রহ্মা বললেন না, তোমাদের এ মহিমা আমি ধ্যান করে পাইনি। এখন যে তোমাকে চোখে দেখছি তাও তোমার বপু আমার গোচর হল না। যার প্রতি রোমকূপে অন্তত কোটি ব্রহ্মাণ্ড গবাক্ষে ত্রসরেণুর মত যাতায়াত করে তার বপু সাক্ষাৎ দেখলেই বা বোধ হবে কেমন করে? তোমার বাক্যের মহিমা আমার গোচর হল না। যদ্বা তব মনসঃ বৈভবং মম ন গোচরঃ। তোমার মন কোটি সমুদ্র গম্ভীর—সেই মনের মধ্যে কি আছে তা আমি কেমন করে জানব? বপুর খবরই যখন গোচর হল না তখন বিগ্রহে কি আছে তা কেমন করে জানব? আর তোমার বেদলক্ষণারূপ বাক্য তাই বা কেমন করে জানব? ব্রহ্মা এই দৈন্যপূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ টীকায় প্রশ্ন করেছেন—ব্রহ্মার এই দৈন্য কেমন করে এল? যে দৈন্যে কৃষ্ণ বশ। সমাধানও করেছেন—ব্রহ্মা ভগবানের স্তুতি করেছেন—সেই স্তুতির জন্য ভগবানের বিশেষ প্রসাদ লাভ করেছেন। প্রিয়জনের গুণগান সবচেয়ে প্রিয়। ভগবান নিজেই উদ্ধবজীর কাছে বলেছেন—মদ্ভক্তপূজাভ্যাধিকা। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা চাহম্। তাই ব্রহ্মা শেষে ব্রজবাসীর মহিমা বর্ণনা করলেন। কারণ

ব্রজবাসী তাঁর বড় প্রিয়। ব্রহ্মা যে অনুগ্রহ বিশেষ লাভ করেছেন এ অনুগ্রহবিশেষ বলতে কি বুঝায়?

কৃষ্ণকৃপা দুরকম। সামান্য কৃপা আর বিশেষ কৃপা। সামান্যকৃপা হল যা জগৎকে বাঁচিয়ে রাখে। বাতাস, আলো ফল ফুল খাদ্য পানীয় —বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যতটুকু কৃপা দরকার তা কৃষ্ণ মহামায়াকে দিয়ে দিয়ে পরিবেশন করিয়েছেন। এমনভাবে সে কৃপা দান করেছেন যাতে পাতে কিছু নষ্ট না হয়। মহামায়ার পরিবেশিত কৃপা দ্বারা মায়ামুক্তি হতে পারে না। কারণ নিজের মারণ অস্ত্র কেউ নিজে পরিবেশন করে না। তাই জীবের মায়ামুক্তির জন্য সামান্যকৃপার ওপরেও কৃষ্ণের একটি বিশেষ কৃপা আছে—এটি তাঁর সাক্ষাৎ কৃপা। এ কৃপার দ্বারা সাধক মায়ার হাত হতে মুক্তি পেয়ে প্রার্থনা করে, কৃষ্ণ, তোমার পাদপদ্মে আমায় স্থান দাও। এই সাক্ষাৎ কৃপা মায়া পরিবেশন করে না। তাই মায়ার রাজ্যে থেকে মায়ামুক্তির কোন ব্যবস্থা নেই। তাই তো সব ছেড়ে বনে যাবার ব্যবস্থা। কৃষ্ণের এই সাক্ষাৎ কৃপা ভগবান নিজে পরিবেশন করেন—বা তাঁর একান্ত নিজ ভক্তজনের দ্বারা পরিবেশন করেন। এ কৃপার কিন্তু সার্ব্বজনীনতা নেই—অর্থাৎ এ কৃপা আপামর জনসাধারণে পায় না। তাই, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ বলছেন—

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্য্যামিরূপে শিখান আপনে॥

আরও বলা আছে—শ্রীগুরুরূপে কৃষ্ণকৃপা তত্ত্বের অবধি।

ভগবান বলেছেন—আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ—গুরুস্বরূপকে আমি বলে জানবে উদ্ধব। এখন কথা হচ্ছে ভগবান যদি নিজে কৃপা করেন তাহলে জীব নিতে পারবে না কেন? আবার গুরুকরণ করতে হবে কেন? ভগবান নিজে দিলেও জীব নিতে পারে না। যেমন ভক্তবাৎসল্যের মূর্ত্তি নৃসিংহদেব এলেন কিন্তু একমাত্র প্রহ্লাদ ছাড়া ব্রহ্মা, শিব ইন্দ্র এমন কি লক্ষ্মীঠাকুরাণী পর্য্যন্ত তাঁকে প্রসন্ন

করা তো পড়ে আছে তাঁর কাছে ঘেঁসতে সাহস পান নি। তাই যে স্বরূপে এলে মানুষ তাঁকে নিতে পারবে সহজে ভগবানকে সেই স্বরূপে আসতে হয়। ভগবানের এই গ্রহণীয়স্বরূপই হল শ্রীগুরু-স্বরূপ। সাধকের স্তুতির প্রভাবই ভগবানের এই কৃপাবিশেষ তৈরী করে। মেঘ যখন জলে পূর্ণ হয় তখন সে নীচে নেমে আসে আর তখনই বর্ষণ করে দেয়। কারণ মেঘে জল বেশীক্ষণ থাকে না। সাধকের ভজনের অশ্রুজলও তেমনি কৃষ্ণমেঘে করুণা জল সঞ্চার করে। সাধকের চোখে ভগবানের উদ্দেশে যত জল পড়বে ততই ভগবানের করুণাবারি সৃষ্টি হবে এবং জল জমা হলেই তা সাধকের উপর বর্ষিত হবে। যত দান ততই প্রতিগ্রহ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই অনুগ্রহ বিশেষ যে লাভ করেছে তার লক্ষণ কি? তার সকল অভিমান দূরে হয়ে যাবে। অভিমানের লেশও তার আর থাকবে না কৃষ্ণ ব্রহ্মার স্তুতির প্রভাবে ব্রহ্মাকে এই বিশেষ কৃপা করেছেন। যার ফলে ব্রহ্মার সমস্ত অভিমান চলে গেছে। অভিমানই তো আমাদের ভগবানের দিকে অগ্রগতির পথে বাধা দেয়। জমি যেমন একটাই অখণ্ড আল দিয়ে দিয়ে এটা আমার সেটা তার এই ভাগ করা হয়। অখণ্ড চিৎ সত্তা জীবেরও তেমনি একটাই স্বরূপ সে নিত্য কৃষ্ণদাস। তাতে অভিমানের আল দিয়ে অমরা অহং পিতা অহং ব্রাহ্মণ অহং ধনী এই ভাগ করে দিই। অভিমানের আল ভেঙ্গে গেলে সে শুদ্ধ কৃষ্ণদাস— এই স্বরূপ ছাড়া আর কোনও স্বরূপই জাগে না। শোথের ফোলা চলে গেলে যেমন খাঁটি চেহারা তার প্রকাশ পায় তেমনি জীবের অভিমান চলে গেলে শুদ্ধ কৃষ্ণদাস স্বরূপ প্রকাশ পায়। ব্রহ্মা ভগবানের এই কৃপাবিশেষ লাভ করেছেন তাই তাঁর সকল অভিমান চলে যাওয়ায় পরম দৈন্য প্রকাশ পাচ্ছে। ব্রহ্মা এখন দৈন্যভূষণে ভূষিত হয়ে নিজ সত্যলোকে যাবার জন্য কৃষ্ণচরণে অনুমতি প্রার্থনা করছেন।

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতৎ তবার্পিতম্॥ ৩৯

ব্রহ্মা এই মন্ত্রে নিজলোকে যাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছেন। হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে যাবার অনুমতি দাও। তুমি তো আমার সব জান। আমার জগৎ বলতে যা ছিল সব তোমাতে অর্পণ করলাম। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ টীকায় বললেন—ব্রহ্মা এখানে ভগবানকে কৃষ্ণ বলে সম্বোধন করেছেন। কৃষ্ণ নিজাশেষভগবত্তা প্রকটপর। পরের স্তুতিতেও ব্রহ্মা 'কৃষ্ণ' বলে উল্লেখ করেছেন। ভগবানের যত নাম আছে তার মধ্যে কৃষ্ণ নাম শ্রেষ্ঠ। স্বয়ং ভগবানেরই কৃষ্ণতত্ত্ব—এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। এতে বুঝা গেল যিনি স্বয়ং ভগবান তিনিই কৃষ্ণ। যিনি কৃষ্ণ তিনিই স্বয়ং ভগবান। প্রতিবাদীরা বলেন স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ হয়ে এসেছেন—এটি কিন্তু ঠিক নয়। কারণ তা বললে উদ্দেশ্যাবিধেয় দোষ হয়। জ্ঞাত যে বস্তু তার নাম উদ্দেশ্য আর যা অজ্ঞাত তার নাম বিধেয়। 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ' এই বাক্যে কৃষ্ণ জ্ঞাত কারণ পূর্ব্বের অবতার গণনাতে কৃষ্ণকে গণনা করা হয়েছে আর বিধেয় হল স্বয়ম্। কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা হল সাধ্য। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের বাধ্য। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণস্বরূপই। কারণ কৃষ্ণই গৌর হয়ে এসেছেন। গৌরস্বরূপে যদি কৃষ্ণ না থাকেন তাহলে আস্বাদন করবে কে? কৃষ্ণ রাধাভাবে বিভাবিত হলেও কৃষ্ণত্বের হানি হয় নি। কারণ লোভ পূরণ তো গোবিন্দেরই। এখন অনেকে প্রশ্ন করেন কৃষ্ণ যখন গৌর হয়েছেন তখন গৌর পূজার জন্য পৃথক্ গৌর মন্ত্র কেন? কৃষ্ণমন্ত্রেই তো গৌর পূজা করা যায়। কৃষ্ণ যেমন যখন নাপিতানী, মোহিনী বেশ ধারণ করেছিলেন তখন তাঁর পূজা তো কষ্ণমন্ত্রেই হয়েছিল। পৃথক্‌মন্ত্র তো দরকার হয় নি তবে গৌরের বেলায় পৃথক্ মন্ত্রের ব্যবস্থা কেন? এখানে সিদ্ধান্ত হল গৌর সম্বন্ধে পৃথক্ মন্ত্র দরকার। কারণ গৌরস্বরূপ কৃষ্ণ হলেও তাঁর ধাম, পরিকর, পিতামাতা লীলা সব পৃথক হয়েছে। তাই উপাসাসনাতেও পৃথক্ মন্ত্র দরকার। তাই যিনি কৃষ্ণ তিনিই স্বয়ং ভগবান। 'ভগ' বলতে যে ছটি ঐশ্বর্য্য বুঝায় তারমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

হল শ্রী। গৌর সর্ব্বজনের চিত্তকে আকর্ষণ করেন—আর অধর্ম, কলি যে তাঁকে দেখে বা তাঁর নাম শুনে ভয় পান—সুতরাং তিনি যে স্বয়ং ভগবান এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। ভগবান নিজের এই অশেষ ভগবত্তা প্রকাশক গুণ প্রকাশ করেন। এটি তাঁর পরম করুণা। কৃষ্ণকে পরম করুণ বলা হয়েছে। করুণ কাকে বলে? যে ব্যক্তি করুণা করবার জন্য লোভী। পেটুকের যেমন খাদ্য দেখে লোভ হয় তেমনি করুণ ভগবানের করুণা করবার জন্য লোভ হয়। ব্রহ্মা বললেন—কৃষ্ণ, সর্ব্বং ত্বং বেৎসি। তুমি তো সব জান। আমি নিজেকে পবিত্র করবার জন্য স্তুতিবাক্য উচ্চারণ করেছি তোমাকে জানানোর জন্য নয়। কারণ তোমাকে তো জানানোর কিছু নেই। তুমি যে সর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ—দৃশ্ ধাতুর অর্থ হল জ্ঞান। যদ্বা পক্ষে গোস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করছেন—সর্ব্বং ত্বং বেৎসি? কাকু পক্ষে অর্থাৎ তুমি কি সব জান? তুমি নিজেই জান না কারণ তুমি যে অনন্ত—তাই তুমি যে নিজেই জান না—এতে তোমার সর্ব্বজ্ঞতার হানি হবে না। ভগবান নিজের গুণের কথা জানেন কিন্তু জানলেও তিনি তাঁর গুণ শুনবার জন্য এত লোলুপ যে ভক্ত যেখানেই তাঁর গুণগান করে সেখানেই তিনি ছুটে আসেন। ভগবান তাঁর গুণ জানেন না বললেও বিপদ কারণ তাতে তাঁর অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। তাতে তাঁর সর্ব্বজ্ঞতায় বাধা পড়ে। আর যদি বলা যায় তিনি তো জানেন তাহলে প্রশ্ন হয় যদি জানেনই তাহলে এত লোভ কেন? ভগবানের গুণকথা তো অনন্ত। তাই তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব হয় না আর তাতে তাঁর সর্ব্বজ্ঞতার হানিও হবে না। যেমন শশশৃঙ্গ আনতে না পারলে তার যেমন সামর্থ্য নেই বলা চলে না—কারণ শশশৃঙ্গ বলে বস্তুর সত্তাই তো নেই। জগতে আমরা পুত্রমুখ তো কতবারই দেখি অর্থ তো কতবারই হাতে করি তা যেমন পুরাণ তো হয়ই না বরং পর পর আকর্ষণ বাড়ে তেমনি ভক্তমুখে কৃষ্ণকথা পর পর আরও বেশী মিষ্টি লাগে। ভক্তমুখে ভগবৎ কথায় ভক্তপ্রেম মাখান থাকে বলেই

ভগবানের কাছে তা অত প্রিয় বলে মনে হয় এবং নিত্য নূতন মনে হয়।

শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী যখন ব্রাহ্মণকে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে পত্র পাঠান তখন তাতে নিজের গুণের বর্ণনা দেখে ব্রাহ্মণকেই পত্র পড়তে দিলেন। কারণ নিজে নিজের গুণ পড়তে ভাল লাগে না। নিজগুণ ভক্তমুখোচ্ছিষ্ট হলে তা বড় মিষ্টি হয়। ভগবান জানেন ব্রাহ্মণ মুখে ব্রহ্মণ্যস্তুতি বড় মধুর। তাই শ্রীশুকমুখোচ্ছিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবত এত মধুর। ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবন্ তোমার গুণের অন্ত নেই বলে তা তুমি নিজেই যখন জান না তখন আমি তো বরাক মূর্খ—আমি কি করে জানব? ব্রহ্মা আগেও বলেছেন এখনও বলছেন—তোমার কৃপায় শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হয়। ব্রহ্মার এ বোধটি পাকা হয়েছে। নিজের যা কিছু সব তোমাতে অর্পণ না করলে খাঁটি ভক্তি হয় না। জগতের নাথ তুমি। কাজেই জগৎ তোমাতে অর্পণ করলাম। এ যা বললাম তাও ভুল—এটি বলাও ঠিক হল না। আমার এ অর্পণটি অর্থাৎ অর্পণের অভিমানও তোমাতে অর্পণ করেছি।

শ্রীবালগোপাল যেন প্রশ্ন করছেন—ব্রহ্মন্ তুমি তো এই বৃন্দাবনে জন্ম প্রার্থনা করেছ তবে আবার এখন যেতে চাইছ কেন? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—তুমি তো সবই জান। সর্ব্বং ত্বং বেৎসি। এর তাৎপর্য্য কি? ব্রহ্মা বলছেন—আমি প্রার্থনা করেছি বটে কিন্তু এই চতুর্মুখ দেবদেহে বৃন্দাবনে থাকার যোগ্য আমি নই। বৃন্দাবনে যে লীলা তুমি প্রকাশ করেছ তা লৌকিকী লীলা—মানুষী লীলা—তাই দেবদেহে এখানে থাকা অসম্ভব। আর তা ছাড়া এই বৃন্দাবনে তুমি ব্রজবাসীর প্রেমে এমনই মজে আছ এবং তাদের বশীভূত হয়ে আছ যে আমার দিকে ফিরে চাইবারও অবসর নেই। ব্রজবাসীর প্রেমের বেতনে কৃষ্ণ তাদের কাছে কেনা হয়ে আছেন। ব্রজবাসীর ভাগ্য মহিমা বর্ণনে ব্রহ্মা প্রার্থনা করে ফেলেছেন ব্রজে জন্ম—কিন্তু এ প্রার্থনা সিদ্ধির জন্য তো সাধন দরকার। তাই তোমাতে সব অর্পণ করছি—

এইটিই হবে সাধন। জগতের নাথ তুমিই। আমি তোমাকে অর্পণ করছি বলে ভুল করেছি। তাই এখন সংশোধন করছি—অর্পণও তোমাকে অর্পণ করছি। বালগোপাল বলছেন—তুমি তো ব্রহ্মান্ সৃষ্টিকর্ত্তা। তবে তোমার—এত দৈন্য কেন? ব্রহ্মা বলছেন তুমিই নাথ আর আমি হলাম দাস। বালগোপাল বলছেন তুমি তো পিতামহ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সবাই তো তোমার সন্তান। তবে আমাকে কেন জগতের নাথ বলছ?

ব্রহ্মা বলছেন—আমি তোমার কৃপা কিরণ পেয়ে সৃষ্টি কাজ করি মাত্র। প্রকৃতপক্ষে জগৎ তো তোমার। তুমি আমাকে দিয়েছ তাই লোকে বলে এ আমার জগৎ—কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তা নয় জগৎ তোমার। আমি জগতের ভার নিয়ে দেখলাম জগৎ পালন করবার যোগ্যতা আমার নেই। আমি অতি অযোগ্য। তাই তোমার জগৎ তোমাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি।

এর পরে এই মন্ত্রে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ আস্বাদন করছেন। ব্রহ্মা বলছেন—তোমার বৈভব আমি জেনেছি কিনা বলতে পার? এটি বক্রোক্তির সুরে বললেন। ব্রহ্মা লজ্জার সঙ্গে বললেন—আমি অতি নীচ, একক্ষণও বৃন্দাবনে থাকবার অধিকারী আমি নই। তোমার ধামে তোমার লীলা নিয়ে তুমি সুখে থাক আর আমি যেমন লোক তেমনি লোকে যাই। 'কৃষ্ণ' শব্দের যত অর্থই হোক্, রূপে গুণে যিনি আকর্ষণ করেন তিনিই কৃষ্ণ। কৃষ্ণ শব্দের এই অর্থটিই মুখ্য। আমি তোমার কাছে আমার নিজ লোকে যাবার প্রার্থনা করেছি বটে কিন্তু সে লোকে আমার দেহটি মাত্র যাবে চিত্তকে আমার তুমি এইখানে আকর্ষণ করেই নিয়েছ। তাই এখানে 'কৃষ্ণ' সম্বোধনটি সার্থক হয়েছে। আমি তোমার কাছে বৃন্দাবনে কোন একটি জন্ম প্রার্থনা করেছি বটে কিন্তু তুমি তোমার চোখের ভঙ্গি বা কোনও একটি ইঙ্গিতের দ্বারাও তো 'তথাস্তু' বললে না। তুমি সখাসঙ্গে আনন্দে পুলিন ভোজনে প্রবৃত্ত হয়েছিলে। পরম শত্রুকেও লোকে ভোজনে

বিঘ্ন ঘটায় না। আমি সেই ভোজনে বিঘ্ন ঘটিয়েছি—তাই লীলার প্রতিকূল আচরণ করে মহা অপরাধ করেছি। এই অপরাধের ফলেই তোমার শ্রীমুখের কোন বাক্য আমি পাই নি। আমি তাই এখান থেকে চলে যেতে চাই। তুমি তো সবই জান। তুমি হলে নাম। যত যত জগৎ আছে তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র হল এই জগৎ কারণ এখানকার ব্রহ্মা মোটে চতুর্মুখ। এই জগতের কর্তৃত্ব তুমি আমার ওপর অর্পণ করেছিলে তা এখন আমি তোমাতে অর্পণ করছি। আমি তোমার প্রতিকূল আচরণ করেছি তাই আমি এ জগতের ভার গ্রহণের যোগ্য অধিকারী নই। তাই তোমার চরণে আমার এই নিবেদন যে তুমি অন্য কোন যোগ্য অধিকারী দেখে তার ওপর এ জগতের ভার অর্পণ কর।

ব্রহ্মস্তুতির শেষ মন্ত্র—

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্কর জোষদায়িন্ ক্ষ্মানির্জ্জরদ্বিজপশূদধি
বৃদ্ধিকারিন্।
উদ্ধর্ম্মশার্ব্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুগ্ আকল্পমার্কমর্হন্ ভগবন্
নমস্তে॥ ৪০

ব্রহ্মার এই স্তুতিটি নামসংকীর্ত্তনময় স্তুতি। এখানে ব্রহ্মা যে কটি নামে সম্বোধন করেছেন—বৃষ্ণিকুলপুষ্করজোষদায়িন্, ক্ষ্মানির্জরদ্বিজ পশূদধিবৃদ্ধিকারিন্, উদ্ধর্মশার্ব্বরহর ক্ষিতিরাক্ষস-ধ্রুক্ আকল্পমার্কমর্হন—এসবই ভগবানের নাম। বৃষ্ণিকুল অর্থাৎ যদুকুলরূপ যে পদ্ম তাদের জোষ অর্থাৎ প্রীতি যিনি করেন—কমলের প্রীতি দান করে সূর্য্য—তাই সূর্য্যকে বলা হয় পদ্মবন্ধু—তাহলে ভগবান সূর্য্যসম—এটি বললেও ঠিক বলা হয় না। কারণ সূর্য্যের তেজ তার নিজস্ব তেজ নয়—ভগবানের তেজ থেকে ধার করা। সূর্য্য প্রাকৃত আর ভগবান অপ্রাকৃত। সূর্য্যের সঙ্গে ভগবানের উপমা হয় না—তবু আমরা দিই কেন? কারণ অপ্রাকৃত বস্তুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই—তাই প্রাকৃত বস্তুর সঙ্গেই উপমা দিতে হয়। পৃথিবী

দেবতা, ব্রাহ্মণ পশু (গাভী) এরা অসংখ্য—তাই উদধি—সমুদ্র বলা হয়েছে। সমুদ্রকে বৃদ্ধি করে চন্দ্র—তাই ব্রহ্মা বলছেন তুমি চন্দ্রের মত। উদ্ধর্ম অর্থাৎ উপধর্ম পাষণ্ডধর্ম যা শার্ব্বর অর্থাৎ অন্ধকার (শর্ব্বরী) তাকে হরণ করেন যিনি অর্থাৎ অগ্নির মত আর ক্ষিতি পৃথিবীতে রাক্ষসধ্রুক্—রাক্ষস দ্রোহকারী অধর্মকে বিনাশ করবার জন্য ভগবান এ জগতে আবির্ভূত হন—এ কারণ ভগবান নিজেই গীতাবাক্যে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং হে অর্হন্ পূজ্য তুমিই পূজো পাওয়ার যোগ্য—যদি প্রশ্ন হয় তুমি কতকালের পূজ্য ? তার উত্তরে ব্রহ্মা বলছেন—আকল্পম্—অর্থাৎ অনাদিকালের পূজ্য। কিন্তু তা বলবার ক্ষমতা আমার নেই। আমার যেমন আয়ুর পরিমাণ সেই অনুযায়ী বলতে পারি তুমি পূজ্য। যেমন দান করবার সঙ্কল্প যদি মানুষ করে তাহলে অনাদিকালের দানের সঙ্কল্প সে করতে পারে না। যাবৎ আয়ু ততদূর সঙ্কল্প করতে পারে। আ (ব্যাপ্তি) অর্কম্ সূর্য্যমণ্ডলকে ব্যেপে তোমার স্থিতি, হে ভগবন্ তোমাকে প্রণাম করি।

গোস্বামিপাদ আস্বাদন করছেন—ব্রহ্মা যে ভগবানকে শ্রীকৃষ্ণ বলে সম্বোধন করলেন—এখানে শ্রীশব্দের অর্থ হল সর্ব্ববিষয়ে বিবিধ শোভাময়। এর ভেতরে অঙ্গমাধুরী, প্রেমমাধুরী, বাক্য, গতি, বেণু, লীলা সকলের মাধুরী বুঝাচ্ছে। এই সমস্ত মাধুরী দিয়ে ভগবান সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করেন। তাই তাঁর নাম কৃষ্ণ। 'কৃষ্ণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি শাস্ত্রে বলা হয়েছে—কৃষির্ভূবাচকো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে। এই আকর্ষণ এবং আনন্দদানের স্বরূপ অন্য ভগবানও হতে পারেন—এটি যৌগিক অর্থ —কিন্তু কৃষ্ণে এটি রূঢ় অর্থাৎ প্রসিদ্ধ। তাই রূঢ়ির্যোগাপহারিণী এই ন্যায়ে আকর্ষণ এবং আনন্দদানের স্বরূপ অন্য কোন ভগবানকে না বুঝিয়ে কৃষ্ণকেই বুঝাবে। কৃষ্ণ শব্দটি যোগরূঢ়। সেইজন্য অন্য যে কোন ভগবৎ স্বরূপ অপেক্ষা কৃষ্ণ স্বরূপের বৈশিষ্ট্য।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যিনি সূর্য্য তিনিই আবার চন্দ্র হন কেমন করে ? উত্তরে গোস্বামিপাদ বলছেন—ভগবানের বিশেষণ বলে চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি সবই একই সময়ে তাঁর পক্ষে হওয়া সম্ভব। ভগবন্ শব্দটি সর্বৈশ্বর্য্যবিস্তারক অর্থে ব্যবহার হয়েছে। ব্রজে ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের সম্পূর্ণ বিকাশ। শাস্ত্র যদিও কৃষ্ণকেই পূর্ণভগবান স্বয়ং ভগবান বলেছেন—এতে চাংশ কলাঃ পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। কিন্তু এই পূর্ণত্বেরও আবার তারতম্য আছে। পূর্ণ পূর্ণতর পূর্ণতম—দ্বারকায় পূর্ণ, মথুরায় পূর্ণতর আর ব্রজে পূর্ণতম। তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্রজে ভগবানের ভগবত্তার সীমা। যদ্বা বলে গোস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করছেন—দেবতা হিসাবে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণে ব্রহ্মার ভক্তি হয়ত ছিল কিন্তু পরমাভক্তি ছিল না। কিন্তু ভগবানকে ব্রহ্মা এই যে স্তুতি করলেন তাতে তাঁর দৈন্য, ভক্তি উচ্ছলিত হয়েছে। ব্রজবাসীর চরণরেণু পাবার বাসনা যখনই তাঁর মনের মধ্যে স্থান পেয়েছে তখনই বুঝতে হবে তাঁর ভক্তি পরমতাকে লাভ করেছে। আর তাছাড়া ব্রহ্মার বৈকুণ্ঠনাথ পর্য্যন্ত গতি ছিল— ব্রজেন্দ্রনন্দনে গতি ছিল না। ভগবানের যেমন যেমন পূর্ণতা তাঁর প্রাপিকা ভক্তির তেমনি তেমনি তারতম্য। ভগবানের পূর্ণতা, পূর্ণতরতা, পূর্ণতমতা হলে তৎ প্রাপিকা ভক্তিরও তেমনি তেমনি অবস্থা হবে। তাই শ্রীদাম-বন্ধন লীলা প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব বললেন—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ॥ ভাঃ ১০।৯।২১

গোপেন্দ্রনন্দনকে একমাত্র শুদ্ধাভক্তিছাড়া অন্য কিছু দিয়ে পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মা ভগবানের নাভিকমলে জন্মেছেন তাই তিনি তো নাস্তিক হতে পারেন না। ভক্তি তাঁর ছিল। কিন্তু এখন ভগবানকে স্তুতি করার ফলে পরমাভক্তিকে লাভ করেছেন। ভগবানকে স্তুতি করলে ভক্তি হবে তার প্রক্রিয়াটি কি ? ব্রহ্মা ভগবানকে সাক্ষাৎ সামনে রেখে

স্তুতি করেছেন। কিন্তু আমাদের তো সে ভাগ্য নেই—তবে আমাদের উপায় কি ? বিগ্রহের সামনে আমরা স্তুতি করতে পারি। বিগ্রহ সাক্ষাৎ। অবস্থা ভেদে দর্শনের তারতম্য হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে সাক্ষিগোপালের প্রসঙ্গ আছেন—তাতে ছোটবিপ্র তো আগেও বৃন্দাবনে গোপালমূর্ত্তি দর্শন করেছেন কিন্তু তখন তাকে সাক্ষাৎ বোধ হয় নি পরে যখন গোপাল সাক্ষী দিতে এলেন তখন তাঁকে সাক্ষাৎ বলে বোধ হল। তখন তাঁর অবস্থা তৈরী হয়েছে। বিগ্রহ চলে চলেই তো সাক্ষিগোপাল হয়েছেন। বিগ্রহ সাক্ষাৎ কাজেই তিনি চলতে পারেন কিন্তু আমাদের সুবিধার জন্য তিনি অচল হয়ে আছেন। সচল হলে আমরা তাঁকে ধরতে পারব না। ভগবান তো গীতাবাক্যে বললেন আমি সর্ব্বত্র আছি—তাহলে তো যে কোন স্থানে স্তুতি করলেই কাজ হয়। হয় বটে, কিন্তু তাঁর স্থিতি স্থাপনের বিশেষত্ব আছে। শ্রীএকাদশে উদ্ধবজীকে ভগবান বলেছেন—তামস বাস, রাজস বাস, সাত্ত্বিক বাস—কিন্তু মন্নিকেতনং তু নির্গুণম্—ভগবানের নিজের নিকেতন হল নির্গুণ অর্থাৎ সকল গুণের অতীত। ভগবানের সামনে করলে তার ফল বেশী। ভগবানের যত রকম মূর্ত্তি আছে তারমধ্যে চিত্রপটরূপী মূর্ত্তি প্রেমলক্ষণা ভক্তি খুব তাড়াতাড়ি দিতে পারে। জগতের লোকও নিজের নাম নিজে শুনতে ভালবাসে। ভগবানও এ বিষয়ে লোলুপ। নিজের নাম শুনবার জন্য জগতের সর্ব্বত্র তিনি কাণ পেতে রেখেছেন। নিজের নামকীর্ত্তন শুনলে তিনি প্রসন্ন হন। জীবকে দয়া করবার জন্য ভগবান অত্যন্ত ব্যাকুল। ভগবানের যতরকম স্তুতি আছে তার মধ্যে নামকীর্তন হল পরম-স্তুতি। এই বোধটি ব্রহ্মার হয়েছে। তাই ব্রহ্মা নামকীর্ত্তন স্তুতিটি শেষে করব বলে রেখেছেন। একটি শ্লোকে ভগবানের অবতারের সব প্রয়োজন বলব। ব্রহ্মা এখন সাহস করে ভগবানের চরণযুগল স্পর্শ করে প্রণাম করে বলছেন,—সূর্য্য যেমন পদ্মের তমোমুদ্রা অর্থাৎ নিদ্রা (নিমীলন) দূর করে তাকে জাগিয়ে দেয়—ব্রহ্মা বলছেন

হে কৃষ্ণসূর্য্য তুমিও বৃষ্ণিকুলরূপপদ্মেরও তাই করেছ। সূর্য্যোদয়ের পরেই যেমন পদ্মের জাগরণ হয় তেমনি তোমারও আবির্ভাবমাত্রে তাদের দুঃখ নাশ করে আনন্দ বিধান করেছ। শ্রীদশমের প্রথমেই বলা হয়েছে বসুদেব যখনই ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করলেন তখনই তাঁর অপূর্ব্ব তেজের ছটা প্রকাশ পেল। ভগবান জন্মের পরে তো আনন্দ বিধান করেছেনই—জন্মগ্রহণের আগেও আনন্দ দিয়েছেন। বসুদেবের হাতে পায়ে শৃঙ্খল বন্ধন তাহলে দুঃখ হয় নি কেমন করে বুঝা গেল? দুঃখ ও সুখ তো মনের অনুভূতি। সুখ দুঃখ তো হাত পা অনুভব করে না। বসুদেবের হাতে পায়ে শৃঙ্খল থাকলেও মনে কোন দুঃখ ছিল না।

শ্রীনন্দব্রজের বৃদ্ধিকারিন্ তুমি। গোপরামারা গীত গেয়েছেন জয়তিহতেধিকং জন্মনা ব্রজ—তাহলে কি বুঝতে হবে ব্রজ জয়যুক্ত ছিল না? ব্রজ জয়যুক্ত নিত্যই কিন্তু তোমার জন্মের দ্বারা অধিক জয়যুক্ত হল। কারণ তোমার জন্মের পর থেকেই ইন্দিরা (লক্ষ্মী) ব্রজে সেবিকা হয়ে আছেন। তাতে ব্রজের উন্নতি। কারো স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে হলে রোগ নিবারণ করে রসায়ন প্রয়োগ করতে হয় তুমিও তেমনি তাদের অধর্ম রোগ নিবারণ করে সুখ দান করেছ। এখানে ব্রহ্মা পদ বলেছেন—ক্ষ্মানির্জরদ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্—এখন দ্বিজ পশু সবই তো পৃথিবীর মধ্যে—তাহলে—তো শুদ্ধ পৃথিবী বললেই সব মিটে যেত আবার দ্বিজ পশু আলাদা করে বলা হল কেন? কৃষ্ণাবতারে বিশেষ অপেক্ষা আছে।

কৃষ্ণপ্রণামে বলা হয়েছে—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

গো এবং ব্রাহ্মণ সেবা না করলে জগতের পালন করা সম্ভব নয়। অগ্নিতে ঘি দিয়ে আহুতি দিতে হবে—এই ঘি দেবে গাভী। সেই আহুতি অগ্নি আকাশে দেবতাদের কাছে নিয়ে যাবেন। তখন

দেবতাদের কৃপায় বর্ষণ হবে। বর্ষণের ফলে শস্য হবে এবং সেই শস্যে জগতের জীবের প্রাণধারণ হয়। ভগবান তাই গো এবং ব্রাহ্মণ সেবা করেন। তাই গো এবং ব্রাহ্মণের ভেতর দিয়ে ভগবানই জগতের পালন করেন। মহাজন বলেছেন—তুমি না দেখিলে জীবের নাহি স্থিতি গতি। কিংবা মহর্লোকবাসী ঋষি এবং গোলোকবর্ত্তী গোকুল গোসকলকে তুমিই পালন কর অথবা ব্রজসম্বন্ধি ক্ষ্মানির্জর অর্থাৎ ভূসুর পৃথিবীর মধ্যে যারা ব্রাহ্মণ দ্বিজ (পক্ষী) এদের অত্যন্ত প্রাচুর্য্যের জন্য উদধি বলা হল—এত বেশী যেন সাগর—যেমন বেশী লোক হলে বলা হয় জনসমুদ্র। এতে বৃদ্ধিকারী হলেন ভগবান। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের মুখ্য প্রয়োজন শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকেও গোস্বামিপাদ বলেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অবতারের মুখ্য প্রয়োজন প্রেমভক্তি বিস্তার। রামচন্দ্র অবতারে ভক্তিদান করেছেন কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কয়েকজনকে গুহক শবরী, বিভীষণ হনুমানজী প্রভৃতি। রামচন্দ্রের গুরু বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকেও রামচন্দ্র ভক্তিদান করেন নি। তাঁরা কৃষ্ণ অবতারে ভক্তিলাভ করেছেন। কৃষ্ণ ভক্তিদান করতে এসেছেন অঙ্গ মাধুর্য্য হল এ দানের উপকরণ। জগতের লোক যে তাতে প্রেম করবে প্রেম তো খাজনা নয় যে জোর করে লোকের কাছ থেকে প্রেম দাবী করা যাবে। তাঁর রূপমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে জগতের লোক আপনা হতে যেচে যেচে প্রেম করবে। এ প্রেম কারো হয়ত তো হয়।

এর পরে ব্রহ্মা আর একটি নাম বললেন উদ্ধর্মশার্ব্বরহর। এখন প্রশ্ন হচ্ছে উদ্ধর্ম কি? উদ্ধর্মকে বুঝতে হলে আগে ধর্ম বুঝা চাই। যেমন শব্দ বুঝতে হলে অপশব্দ বুঝা চাই। ভগবান নিজে ধর্মের লক্ষণ করেছেন—ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎপ্রোক্তঃ। বেদলক্ষণাক্রান্ত ধর্মকেও এর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ভগবান যে ধর্মের লক্ষণ করলেন তাতে বলা হল সকল ধর্মেরই প্রকৃত তাৎপর্য্য হল আমাকে জানা। এই জানা আবার সাক্ষাৎ অসাক্ষাৎ দুরকম। ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎপ্রোক্ত

এটি হল আসল আর যে সব ধর্মের লক্ষণ আছে তা হল তার অংশ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বললেন—

কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান হয় সর্ব্বতত্ত্বসার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক হয় তার পরিবার॥

কৃষ্ণই একমাত্র সুখসাগর—তিনি ছাড়া সুখ আর কোথাও নেই। জীব যখন সুখের নেশায় এগুচ্ছে তখন সে কৃষ্ণের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। গ্রামে যদি একটি মাত্র জলাশয় থাকে তাহলে পিপাসার্ত্ত সেখানে যাবেই। তেমনি সুখের পিপাসা যার আছে সে কৃষ্ণের কাছেই যাবে।

উপধর্ম বলতে ধর্মের বিপরীত যা তাকেই বুঝায়। জ্ঞানাদির নাম হল উপধর্ম। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ করলেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

জ্ঞান যোগ নিষ্কাম কর্ম, সাংখ্য প্রভৃতিকে ভক্তির বাধক বলা হয়েছে। ভক্তির যা বাধক তার নামই উপধর্ম। যেমন পথ আর উৎপথ তেমনি ধর্ম আর উপধর্ম। গোস্বামিপাদ ধর্মের লক্ষণ করে সোজা পথ বলতে বসেছেন। জ্ঞানকর্মাদিকে উপধর্ম বলে কোন মতাবলম্বী আচার্য্যকে দুঃখ দিতে বসেন নি। তাঁর বক্তব্য হল মৃত্যুর পারে যদি যেতে চাও তাহলে এইটিই পথ—আর অন্য যা কিছু সব হল উৎপথ। জ্ঞান যোগ সবই ভক্তিধর্মের বাধক। জীবের স্বরূপ কি? স্বাভাবিকতাই হল স্বরূপ। এই স্বরূপ হল দুইপ্রকার। প্রথম জীব নিত্য কৃষ্ণদাস আর দ্বিতীয় হল জীব অণু চৈতন্য। জগতে দেখা যায় প্রতিটি অণু বস্তু বিভু বস্তুর শরণ নেয়। অণু জল বিভু জলের শরণাগতি নেয়। নালা নদীতে যায় নদী আবার সাগরে যায়। দুর্ব্বল সবলের আশ্রয় নেয়। যার অল্প জ্ঞান সে যার বেশী জ্ঞান তার শরণ নেয়। এইটিই জীবের স্বরূপ। জীবের শরণ নেওয়ার

ক্রম ক্রমশঃ উঠতে উঠতে বিভু চৈতন্য শ্রীভগবানে গিয়ে পৌঁছেছে। তাই ভগবান গীতাবাক্যে বললেন—

সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। গীঃ ১৮।৬৬

এর উপরে আর শরণ্য কেউ নেই। স্বরূপে স্থিতিই হল স্বধর্ম। এ ছাড়া আর যা কিছু তা হল পরধর্ম। গীতায় ভগবান বললেন—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। এর আপাত অর্থ হল ক্ষত্রিয় ধর্মে থেকে নিধন হলেও তা শ্রেয় কিন্তু ক্ষত্রিয় ধর্মকে ত্যাগ করবে না। কিন্তু এর তাৎপর্য্য হল স্বধর্ম অর্থাৎ ভক্তিধর্মে থেকে যদি নিধনও হয় তাও শ্রেয়ঃ কিন্তু তাই বলে জ্ঞানাদি পরধর্মকে আশ্রয় করা কখনও উচিত হবে না। ভগবান উদ্ধবজীর কাছেও বলেছেন—ধর্মো মদ্ভক্তিকৃৎ। আচার্য্য বেদব্যাসও বললেন—প্রথমেই ধর্মের লক্ষণে ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ—এই দুই জায়গাতেই দেখা যাচ্ছে ধর্ম উদ্দেশ্য এবং মদ্ভক্তি কৃৎ এবং প্রোজ্ঝিতকৈতব দুটিই বিশেষণ। ধর্ম কি তা বলা হচ্ছে—তাহলে আচার্য্য বেদব্যাসের বলবার অভিপ্রায় হল শ্রীমদ্ভাগবতে যা বলা হয়েছে অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি—এর নামই ধর্ম। এই কৃষ্ণভক্তি ছাড়া আর যা কিছু তা হল পরধর্ম—ভক্তিধর্মে থাকার নামই ধর্ম।

উদ্ধর্মশার্ব্বরহর—চন্দ্র এবং সূর্য্য দুইই অন্ধকার দূর করে। জ্ঞানাদিই হল উদ্ধর্ম। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীসনাতনশিক্ষা প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন—সর্ব্বজ্ঞের কথা উল্লেখ করেছেন—দক্ষিণ, পশ্চিম উত্তরে তিনদিকে কর্মমার্গ যোগমার্গ জ্ঞানমার্গ—সেখানে গেলে প্রেমধন পাবে না। সুতরাং দারিদ্র্য ঘুচবে না। কর্মমার্গে ভীমরুলের চাক তার দংশন কেবল জ্বালা—কেবল জন্মমৃত্যুর দংশন গতাগতি, যোগমার্গে অজগর অণিমাদি সিদ্ধি গিলে ফেললে আর কোন কাজ হবে না। জ্ঞানমার্গে 'সোঽহং' ভূত জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এই স্বরূপ ভুলিয়ে দেয়—ভূত তার স্বরূপে ব্যক্ত করিয়ে সোঽহং বলায়। তাই সর্ব্বজ্ঞ বললেন—পূর্ব্বদিকে ভক্তিমার্গ—পূর্ব্বদিকের মাটি অল্প

খুঁড়িতে ধনের জাড়ি পাড়িবেক তোমার হাতেতে। অল্প পরিশ্রমেই ভক্তিতে প্রেমধন পাওয়া যায়। জ্ঞান যোগ প্রভৃতিতে পরিশ্রম বেশী আর তার সঙ্গে ভক্তি মিশ্রণ না থাকলে কোন ফলই নেই। ভক্তিফলের কাছে মুক্তি ফলও তুচ্ছ। সালোক্যাদি মুক্তি ভক্তিমিশ্র জ্ঞানের ফলে লাভ হয়। কিন্তু সাযুজ্য মুক্তি ভক্ত অঙ্গুলি না ছোঁয়। সাধন করে মুক্তি লাভ করলে সুখদুঃখের অতীত একটা অবস্থা লাভ হল বটে কিন্তু স্বরূপ যা চায় তা তো পাওয়া হল না। পেটে ক্ষুধা থাকতে তাকে অজ্ঞান করে দিলেও ক্ষুধা তো তার মিটল না। পেটের ক্ষুধা তার যেমন তেমনি থাকল। তেমনি কৃষ্ণক্ষুধা জীবের মুক্তি পেলেও মেটে না।

এখন প্রশ্ন হতে পারে—শাস্ত্রে তাহলে জ্ঞান যোগ এসব উপদেশ করা হল কেন? ভগবান তো জ্ঞান কর্ম ভক্তির উপদেশ করলেন—এই ত্রিবিধা কেন? শুদ্ধা ভক্তি শুধু উপদেশ করলেই পারতেন। কারণ লোকের রুচি ভিন্ন। ভগবান বিভিন্ন শাস্ত্রে অনন্তরূপে বিরাজমান। যাতে করে কেউ না বিমুখ হয়। সাধুসমাজ, ঋষিসমাজ, শাস্ত্রসমাজ মানুষের রুচি অনুসারে কথা বলেছেন। রাজস তামস বৃত্তি যাদের তারাও যেন ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত না হয়। যে কোন ধর্ম আচরণ করলেও তারা যেন মনে করতে পারে যে আমরা ধর্ম আচরণ করছি। এক কৃষ্ণই অনন্ত দেবতারূপে বিরাজমান কেন? যার যা ভাল লাগে ভগবান মনে করেন যে যে কোন দেবতাই ভজুক না কেন তাতে যদি সাধক আত্মসমর্পণ করতে পারে তাহলে সেই দেবতাই তাকে আমাকে পাইয়ে দেবে। কৃষ্ণপ্রাপ্তিই জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য। মৃত্যু থেকে নিবারণের জন্য কৃষ্ণচরণে শরণাগতি ছাড়া আর কোন পথ নেই। কারণ গোবিন্দের কাছেই মৃত্যু একমাত্র ভয় পায়। তাই কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজন করতেই হবে। এ ছাড়া মৃত্যু এড়াবার পথ নেই। জগতে ভগবানের অনন্ত বিভূতির জাল ছড়ান আছে। জীব পাখী এতে ধরা পড়বেই।

জ্ঞান যোগ নিষ্কাম কর্ম এরা বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য যে কৃষ্ণপাদপদ্মভজন তা তারা বোঝে না। বেদের আপাত ফলেই তারা আটকে যায়। ভগবান বললেন—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ। গীঃ ২।৪২

এ ফল ছাড়া যে কৃষ্ণ বিষ্ণু বলে আর কিছু আছে তা তারা মানে না। সাধককে কাঠুরিয়া ও সাধুর গল্প মনে রাখতে হবে। কাঠুরিয়া বনে কাঠ কাটে। একদিন এক সাধু তাকে শ্রান্ত দেখে বললেন—বনেই যখন এসেছ তখন এখানেই থেমে থেক না—এগিয়ে যাও। কাঠুরিয়া সাধুর কথা শুনে ক্রমশ ক্রমশ এগিয়ে চন্দনের বন, তামার খনি—রূপার খনি, সোনার খনি হীরা জহরৎ মণি মাণিক্যের খনি লাভ করল। সাধককেও তেমনি সাধু বাক্য মেনে এগিয়ে যেতে হবে। বেদের আপাত ফলশ্রুতি স্বর্গাদি লাভে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। এগিয়ে যেতে হবে। গৌরগোবিন্দের পাদপদ্মমাধুর্য্যরূপ হীরা জহরৎ মণি মাণিক্যের খনি না পাওয়া পর্য্যন্ত বিশ্রাম করলে চলবে না। কোনও জায়গায় তাকে আটকে থাকলে চলবে না। বলা আছে "ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।" এখন যদি বলা যায় আত্মারাম মুনিগণও তো কৃষ্ণপাদপদ্ম ভজে তাহলে আমাদেরই বা মুক্তি পেতে দোষ কি? মুক্তি পাওয়ার পর কৃষ্ণভজন করা যাবে। তা বললে চলবে না। কারণ সে ভরসা করা যাবে না। পথে রাত্রিতে চলতে চলতে কেউ হয়ত সোনার তাল পেয়ে বড়লোক হয়েছে তাই বলে অন্ধকার রাত্রে পথে হাঁটা তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। গোপকুমার মুক্তিধামে ব্রহ্মদেহে তাঁর জ্যোতিতে বহু জ্ঞানী-সাধককে লীন হতে দেখে মনে মনে ভয় পেয়েছেন আমিও যদি লীন হয়ে যাই। সাধক যা সাধন করে পাচ্ছেন তা পেতে গোপকুমারের ভয়। কারণ লীন হয়ে গেলে তো আর মদনগোপালের পাদপদ্ম সেবা করা হবে না। সেখানে শিব তাকে বললেন, গোপকুমার ইমং বিঘ্নসমং

ত্যজ। বৈকুণ্ঠপার্ষদগণও সেই উপদেশ দিলেন। গোপকুমারের বিশ্রাম নেই। তিনি কোথাও আটকে যান নি। বৈকুণ্ঠে মহানারায়ণ মহালক্ষ্মী নিজে কোটি মাতৃস্নেহে গোপকুমারকে আকর্ষণ করেছিলেন। কিন্তু নারদের উপদেশে তিনি সে স্থানও ত্যাগ করেছিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা তাকে কোথাও আটকাতে দেয় নি। নিত্য দ্বারকা নিত্য অযোধ্যা ভ্রমণ করেও দ্বারকাধীশের দ্বারা তিনি ভূ বৃন্দাবনে এসেছেন এবং সেখানে ব্রজবাসীর ভাব নিয়ে শুদ্ধ নামসংকীর্ত্তন সাধনে তাঁর গোলোক প্রাপ্তি হল। কৃষ্ণপাদপদ্মে নৌকা বাঁধতে না পারলে অন্য কোনও উপায় নেই। তাই শুদ্ধা ভক্তি ছাড়া আর যা কিছু সবই বাধক। জ্ঞান, যোগ কর্মকে তাই বাধক বলা হয়েছে।

ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুক্—ক্ষিতিরাক্ষস দুইপ্রকার। তমোগুণে যারা বিচরণ করে। রাক্ষস অন্ধকারে বিচরণ করে। প্রাণিবধ করে। রাক্ষসদের নাম রজনীচর, নিশাচর, ক্ষপাচর। তমোগুণে যারা বিচরণ করে তারাও প্রাণস্বরূপ ভক্তিকে বিনাশ করে। তাই রজনীচর সাদৃশ্যে ভক্তিবিনাশকারী তমোগুণে বিচরণকারীকেও পৃথিবীর রাক্ষস বলা হয়েছে। কারণ ভক্তিই হল ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ। ব্রহ্মাণ্ড ভক্তিতে বেঁচে আছে। ভক্তি বিনু জগতের নাহি অবস্থান। আমরা যে জগতে বেঁচে আছি টাকা কড়ি চাকরি বাকরি নিয়ে নয়—জগতের মধ্যে কয়েকজন আজও গৌরগোবিন্দ বলে কাঁদছেন তাই আমরা বেঁচে আছি। ব্রহ্মা নারদকে বলেছেন—যেদিন সাধুর আলয়ে হরিকথা হবে না সেদিন ভগবান কল্কি অবতারে শাস্তারূপে অবতীর্ণ হবেন। এই ক্ষিতিরাক্ষসেরাই অন্তর্নিগূঢ়াসুরভাবা অন্তরে নিগূঢ়ভাবে তাদের অসুর ভাব। অর্থাৎ এরাই অসাধু। আর দ্বিতীয় প্রকারের রাক্ষস হল যারা প্রকাশ্যে অসুর। যেমন কংস প্রভৃতি। ভগবানের প্রতি অসুরের দ্বেষ স্বাভাবিক। নারদ ভক্তদ্রোহ জাগাবার জন্য কংসকে বলেছেন—দেবকী প্রভৃতি স্ত্রী সকলেই দেবতা। কারণ ভক্তদ্রোহ না হলে

ভগবানের আসন টলবে না। কৃষ্ণ কংসকে বধ করেছেন। কালীয়ের অহংকার চূর্ণ করেছেন কিন্তু এর দ্বারা তাদের হিতসাধনই করেছেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে গোস্বামিপাদ বলেছেন—ভগবানের এই কাজটি অদৃষ্টপূর্ব্বম্। কৃষ্ণ হলেন হতারিগতিদায়ক। বৈকুণ্ঠনামেরও এই বিশেষণ আছে। কিন্তু কৃষ্ণে এই গুণটি পূর্ণ। হিরণ্যকশিপুকে ভগবান নরসিংহ অবতারে হিরণ্যাক্ষকে ভগবান বরাহ অবতারে রাবণ কুম্ভকর্ণকে ভগবান রাম অবতারে নিধন করলেন। ভগবানের হাতে বিনাশ পেয়েও তো তারা গতি প্রাপ্ত হল না। গতি প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হল জন্মমৃত্যু নিরোধ হওয়া—তা তো হল না। তাদের তো আবার জন্মাতে হল। নৃসিংহ প্রভৃতি ভগবান তো তাহলে হতারি-গতি দায়ক হলেন না। যদি বলা যায় হিরণ্যকশিপু—প্রভৃতি অসুর তো তিনজন্ম গ্রহণ করতে হবে তাই তাদের তো জন্মগ্রহণ করতেই হবে। এ বললে চলবে না। তা যদি হয় তাহলে তাদের ভগবান ছাড়া অন্য কেউ বিনাশ করলেই পারত। ভগবানের হাতে বিনষ্ট হয়েও তারা যদি গতি না পায় তাহলে তো ভগবানের নামে কলঙ্ক আসে। কারণ তিনি গতিদান করতে পারলেন না। নৃসিংহ, বরাহ, রামচন্দ্র নিজেদের এ কলঙ্ক স্বীকার করেছেন—অংশী ভগবান কৃষ্ণেতেই যে হতারিগতিদায়ক এই গুণটি সম্পূর্ণ এটি দেখাবার জন্যই। আমাদের গুণ থাকা সত্ত্বেও সেটি আমরা চেপে রেখেছি। কারণ হতারির গতিদান করা কাজটি একমাত্র কৃষ্ণেরই, এ কাজ আর কারো নয়।

ব্রহ্মা বলছেন—তুমি অর্হন্ অর্থাৎ যোগ্য—এ যোগ্যতা কতদিন? আকল্পম্—কল্প পর্য্যন্ত—ব্রহ্মার জীবনকালকে ব্যাপিয়া—ব্রহ্মা বলছেন—আমার জীবনকাল পর্য্যন্ত তোমাকে প্রণাম করব। অথবা আকল্প অর্থাৎ তোমার ভূষণকেও প্রণাম করি। তোমার বর্হাপীড় ময়ূরপাখার চূড়া, তোমার গুঞ্জামালা—চরণের নূপুর প্রভৃতি ভূষণকেও প্রণাম করি। এমনকি তোমার হাতের দধিমাখা অন্নের গ্রাস,

শিঙ্গা, বেত্র, বেণু তাদেরও প্রণাম করি। দামোদরাষ্টকে দামকে প্রণাম করেছেন। যে দাম জগৎ ব্যাপক হরিকে বেঁধেছে তার মহিমা তো আরও বড়। তাই দামকে আগে প্রণাম। অর্কপুষ্প আকন্দফুল —বৈষ্ণবেরা একে আদর করেন না। কিন্তু যেহেতু এই অর্কপুষ্প বৃন্দাবনে জন্মেছে তাই তাকেও প্রণাম করি। অথবা আর্কম্— অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলে অর্থাৎ ভূ ভুঁব স্বর্লোক এই তিনলোক বলতে সব লোক ব্যেপে যে তুমি অবস্থান কর—সেই তোমাকে প্রণাম করি। সমগ্র শোভাযুক্ত কৃষ্ণকে ব্রহ্মা প্রণাম করলেন। ব্রহ্মা যখন স্তুতি আরম্ভ করেছেন তখন বলেছেন পশুপাঙ্গজায়—তার দ্বারা নন্দ-বাবার উল্লেখ করা হয়েছে। এখন শেষস্তুতিতে বললেন—শ্রীকৃষ্ণ— কৃষ্ণপদটি যশোদানন্দনে রূঢ়ি। এতে যশোদামায়ের নাম করা হল। তাই উপক্রম এবং উপসংহার ঠিক রইল।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ তার ব্রাহ্মীস্তুতির ব্যাখ্যা সমাপন প্রসঙ্গে বলছেন—শ্রীচৈতন্যের (গৌরহরি—শ্রীমতীর শ্রীহরি নাম ধরেছে গৌরহরি) অনুগৃহীত জনের কৃপায় ব্রাহ্মীস্তুতি ব্যাখ্যা করলাম— তাদের অর্থাৎ গৌরগণের আনন্দের জন্য। যথারুচি বলতে তাঁর নিজের রুচি অনুযায়ী এ অর্থ নয়। কারণ তাঁর নিজের রুচি অনুযায়ী ব্যাখ্যা করবার স্বাধীনতা তো তাঁর নেই। শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগৃহীত জন অর্থাৎ স্বরূপদামোদর রায় রামানন্দ প্রভৃতি তাঁদের রুচি অনুযায়ী এই ব্যাখ্যা রচিত হল।

শ্রীজীবপাদ টীকায় বলেছেন—ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবন্‌, তোমাকে ভূয়ঃ ভূয়ঃ প্রণাম করি। শ্রীকৃষ্ণবৃষ্ণিকুলপুষ্করযোষদায়িন্‌ বৃষ্ণিকুলরূপ পুষ্করকে সেবা করাই স্বভাব যার শীলার্থে নিনি প্রত্যয়। দায়িন্‌। ক্ষ্মা অর্থাৎ পৃথিবী দ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্‌—পৃথিবী, দ্বিজ, পশু সবই অনন্ত তাই উদধি সাগর বলা হয়েছে। এ সবই শ্রীধাম বৃন্দাবনের সংবাদ বলা হয়েছে। এরা অনন্ত তাই সাগরতুল্য আবার দুরবগাহ্য তাই সাগর—তেষাং বৃদ্ধিকারিন্‌—তাই চন্দ্র সদৃশ। উদ্ধর্মশার্ব্বরহর

শার্ব্বরহর অর্থাৎ তমঃ অন্ধকার নাশ করে তাই বহ্নিতুল্য। বহ্নি, ইন্দ্র, অর্ক—সকলেই তমোনাশ করে। এরা সকলেই তমোবিনাশকারী। ব্রহ্মার বাক্যের তাৎপর্য্য হল একা তুমি সূর্য্য, চন্দ্র বহ্নি। সূর্য্য, চন্দ্র বহ্নি তারা তেজোমণ্ডলরূপে বাইরে প্রকাশ পায়। কিন্তু অন্তরে তারা নিজের নিজের আকারে থাকে। ব্রহ্মা বলছেন, হে ভগবন্ তুমিও সেইরকম। তথা ত্বমপি। তুমিও ব্রহ্মাকারে বিশ্বব্যাপী জগদ্ব্যাপক হয়ে আছে—সেখানে তোমার পরিচ্ছিন্ন স্বরূপ কিন্তু ভিতরে তোমার আর একটি স্বরূপ আছে—সেটি হল তোমার নিজস্ব। সেই রূপটি সচ্চিদানন্দময়রূপ উপাসকের ধ্যানের বস্তু। সূর্য্যকিরণ আমাদের গায়ে লাগে—খর বলেও অনুভূত হয় কিন্তু সূর্য্যের সঙ্গে তাতে করে আমাদের পরিচয় হয় না। সূর্য্য উপাসকের সূর্য্যের সাকার মূর্ত্তির ধ্যান করতে হয়। তার জন্য পৃথক্ উপাসনা প্রয়োজন। তাদের শুদ্ধ সূর্য্যকিরণ গায়ে লাগালেই উপাসনা হয় না। তেমনি ব্রহ্মানুভূতি গোবিন্দের জ্যোতিস্বরূপ। তাই সেই ব্রহ্মের অনুভূতি হলেও কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধই হয় না। কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের জন্য কৃষ্ণপাদপদ্মের পৃথক্ উপাসনা দরকার। সূর্য্যসাক্ষাৎকারের জন্য যেমন পৃথক্ সূর্য্য উপাসনা প্রয়োজন কৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের জন্যও তেমনি পৃথক্ কৃষ্ণপাদপদ্মের উপাসনা আবশ্যক ব্রহ্মানুভূতির পরেও। এ উপাসনা হবে শুদ্ধা ভক্তিযোগের দ্বারা। ভগবানকে ব্রহ্মা প্রণাম করেছেন—ক্ষিতিরাক্ষসধ্রুক্—পৃথিবীতে যত রাক্ষস অসুর তাদের দ্রোহকারী তুমি। ভগবান নিজেও বলেছেন—দুষ্কৃতকারীদের—বিনাশের জন্য আমি অবতীর্ণ হই। পরদ্রোহ অর্থাৎ জীবনের দ্রোহ যারা করে আর জীবনের জীবন অর্থাৎ ধর্মের দ্রোহ যারা করে। ভগবানে চন্দ্র সূর্য্য ও বহ্নি এই তিনের তেজ তো আছেই উপরন্তু আর্কম্ অর্থাৎ—ব্যাপক সূর্য্যমণ্ডলকে ব্যেপে অর্থাৎ সকলব্র হ্মাণ্ডকে ব্যেপে তোমার অবস্থান। সূর্য্য চন্দ্র বহ্নির তেজ—এ সব তোমারই তেজ।

ব্রহ্মা ভগবানকে প্রণাম করছেন—আকল্পম্। যাবৎ সূর্য্য ভাস্বতি তাবৎ প্রণামের সংকল্প। ব্রহ্মা বলছেন—হে অর্হন্ নমস্য। প্রথম স্তুতি বাক্যেও ব্রহ্মা বলেছেন নৌমি—আর শেষ করছেন—নমস্তে। কাজেই উপক্রম এবং উপসংহার ঠিক আছে। উপক্রম এবং উপসংহার দেখে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু নির্ণয় করতে হয়। ব্রহ্মস্তুতির প্রতিপাদ্য বস্তু কি? প্রণতিই এর প্রতিপাদ্য বস্তু। প্রণতি অর্থাৎ শরণাগতি। এ শরণাগতি একমাত্র ভক্তিধর্ম ছাড়া আর কোথাও নেই। শরণাগতি হল ছয় রকম। ভগবান বলেছেন—সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। ব্রহ্মা এই বাক্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন। ভগবানের নিজের উপদেশ ব্রহ্মার আচরণে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। ভগবানের কথাও জীব নিতে পারে নি। ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি করেছেন তাই জীবের ঘরের খবর জানেন। তিনি তাই আচরণ করে জীবকে দেখিয়েছেন। ব্রহ্মা কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞ হয়েও অজ্ঞ সেজেছেন। কৃষ্ণ-পাদপদ্ম শরণই একমাত্র সাধ্যবস্তু। এ ছাড়া আর সাধ্যবস্তু কিছু নেই। ব্রহ্মা তাঁর স্তুতিতে তাই দেখালেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলছেন—ব্রহ্মা বলছেন—হে ভগবন্ আমি যে তোমাকে স্তুতি করলাম তা তুমি তো আমার সঙ্গে একটা কথাও বললে না। তা না বল, তাতে কোন ক্ষতি নেই। যদি অপরাধী মনে করে কথা না বল—তা বল না—আমার তাতে কোন ক্ষতি নেই। তোমার বচনামৃতপানে যদি বঞ্চিত হই তাহলে আমার প্রার্থনা, তুমি তোমার নয়ন দ্বারা অবলোকনরূপ অমৃত দান কর। আমরা দেবতা অমৃতভোজী—অমৃত না হলে বাঁচি না। বচনামৃত না পেলে দর্শনা-মৃত দানে ধন্য কর। এই দর্শনামৃতের দ্বারাই কল্প পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করব। এর পরে ব্রহ্মা কৃষ্ণনয়নে দক্ষিণে দৃষ্টি দিয়ে বলছেন, হে ভগবন্—তোমার দক্ষিণ নয়ন সূর্য্য সদৃশ। সে পদ্মের প্রফুল্লতা বিধান করে। তাহলে তার প্রফুল্লতা বিধান করবার সামর্থ্য আছে। আমি তোমার পদ্মসদৃশ সন্তান—তাই প্রার্থনা তুমি আমাকেও

প্রফুল্লিত কর। ছেলের ছেলেকে যেমন অধিক প্রীতি করা হয়। তোমার বাম নেত্র চন্দ্র সদৃশ। ক্ষ্মানির্জরদ্বিজপশূদধিবৃদ্ধিকারিন্— পৃথিবীর মনুষ্য স্বর্গের দেবতা দ্বিজ পক্ষী পশু গো—এ সবই কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধীয়—তাদের তুমি পুষ্টি বিধান কর। স্বর্গের দেবতাকে তোমার আনন্দ দেওয়া স্বভাব—আমি দেবতা নই আমি দেবাধম। ব্রহ্মা এমনই অজ্ঞ সেজেছেন—যে নিজেকে দেবতা বলেও মনে করতে পারছেন না। আমার আনন্দ বিধান কর। আমি দেবতা বটে কিন্তু যখনই প্রভুর ওপর কটাক্ষ করেছি তখনই দেবতার গুণ আমার থেকে চলে গেছে। তোমার দুটি নয়ন একটি সূর্য্য অপরটি চন্দ্র—দিবাকর নিশাকর—একই সঙ্গে চন্দ্র সূর্য্যের উদয়। তাই পুষ্পবন্ত কাল হয়েছে। চাঁদ এবং সূর্য্য একসঙ্গে আকাশে উঠলে তাকে পুষ্পবন্ত কাল বলে। তুমি উদ্ধর্মশার্ব্বরহর—চন্দ্র সূর্য্য এক-সঙ্গে উদিত হয়ে জগতের বেদবহির্ভূত পাষণ্ডধর্মরূপ গাঢ় অন্ধকার বিনাশ কর। এখন প্রশ্ন হতে পারে ব্রহ্মার ভগবানকে এ সম্বোধনের সার্থকতা কি? ব্রহ্মা বলছেন—আমারও অন্ধকার আছে সেটি তুমি কৃপা করে বিনাশ কর। ভগবান যেন বলতে চাইছেন—ব্রহ্মন্ তোমার আবার অন্ধকার কি? ব্রহ্মা বলছেন—আমি যখন নিজ প্রভুতে মায়া বিধানের চেষ্টা করেছি তখন আমি ঘোর পাষণ্ড—আমার এই পাষণ্ড ধর্ম বিনাশ কর। আর যাতে এ বৃত্তি আমার না ঘটে। তুমি তো অসুরকেও স্বর্গতি দান করেছ। এ স্বভাব তো তোমার নূতন নয়। অঘাসুর প্রভৃতিকে দ্রোহ করেও স্বর্গতি দান করেছ। মহারাজ পরীক্ষিৎকে এই সংবাদে বিস্মিত দেখে শ্রীশুকদেব বলছেন—মহারাজ, যে ভগবানের প্রতিমা মনে মনে একবার ধ্যান করলে তার সমস্ত পাপ ক্ষালন হয়ে যায় তাকে অঘাসুর হৃদয়ে ধারণ করেছে—তার যে মুক্তি হবে এ আর বেশী কথা কি? অঘাসুর যে বিষ্ণু বৈষ্ণবদ্রোহের ফলেও উত্তম গতি লাভ করেছে এতে আর বিস্মিত হবার কিছু নেই। ব্রহ্মা বলছেন—আমিও রাক্ষস আমি সত্যলোকের ব্রহ্ম রাক্ষস। আমাকেও

তেমনি দণ্ড দিয়ে গতি দান কর। তুমি প্রভু আমি দাস। দাস তো প্রভুর অনুগ্রহের ওপরেই বেঁচে থাকে। দাস নিজ প্রভুর উদাসীনতা দেখলে বাঁচতে চায় না আবার অনুগ্রহ দেখলে বাঁচতে চায়। তোমার এতটুকু অনুগ্রহের নিদর্শন পেলেও তাকেই পাথেয় করে কল্পকাল বেঁচে থাকতে পারব। হে ভগবন্, প্রথম যখন তোমাকে দর্শন করি তখন তোমার ময়ূর মুকুট কবলবেত্রবিষাণবেণু বসন ভূষণে কটাক্ষ এসেছিল—আমার যিনি প্রভু তাঁর পক্ষে কি এই সব বসন ভূষণ উচিত হবে ? আমার প্রভুর এই সব অনৌচিত্য এই মনে করে অপরাধ করেছি। তাই সেই অপরাধ স্মরণ করে এখন ভূষণাদিকেও প্রণাম করছি। অর্কপুষ্প ভগবানের পূজার যোগ্য নয়—আকন্দপুষ্প বৈকুণ্ঠে এবং বৈষ্ণবগণ যাকে মূল্যবান বলে গণনা করেন না কিন্তু সেই আকন্দ বৃন্দাবনে ফুটেছে বলে তাকেও প্রণাম করি। ব্রহ্মা বলছেন—হে সৎপূজ্য, হে যোগ্য তুমি কৃপা বা অকৃপা মঙ্গল এবং অমঙ্গল সবই বিধান করতে পার। জগতে যত নিন্দিত বস্তু আছে সেই সব বিগীতকে সুগীত করবার জন্যই এবারে কৃষ্ণ ভগবান এসেছেন। নৌমীড্য শ্লোকের টীকায় শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন—গোপবালারা তো স্বৈরিণী—কিন্তু কৃষ্ণ অবতারে তারাও লক্ষ্মীর প্রণম্যা হয়েছেন। ব্রহ্মা বলছেন—তোমার সেই সকলকে নিয়ে তোমাকে প্রণাম করি। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলেছেন—ব্রহ্মস্তুতি সর্ব্বসংশয়কে ছেদন করেছে। এই স্তুতি সর্ব্বভক্তিসিদ্ধান্ত সন্ততি। সেই ব্রহ্মস্তুতি আমার হৃদয়ভিত্তিতে চিত্রিত হয়ে থাকুক। তাহলে আর কখনও ভক্তিসিদ্ধাতে সংশয় হবে না।

ব্রহ্মা ভগবানকে প্রণাম বন্দনা করে প্রদক্ষিণ করে চলে গেলে কৃষ্ণ স্বভবনে গমন করলেন। নিজ সন্তান ব্রহ্মাকে ভগবান গমনের অনুমতি দিলেন। ভগবানের বালক বাছুরের গায়ে ব্রহ্মা হাত দিতে পারেন নি—তারা যেমন তেমনি ছিল। ব্রহ্মা যাদের চুরি করেছিলেন—তারা যোগমায়ার কল্পিত সৃষ্ট বালক বাছুর। এ সংবাদ ব্রহ্মাও জানেন না

—কৃষ্ণও জানেন না। যোগমায়া লীলাশক্তি সব আবরণে রেখেছেন। বালকেরা এই একবছরকে ক্ষণার্দ্ধ কাল বলে মনে করলেন। যাঁর মায়াতে বিশ্বমুগ্ধ তিনি নিজে আজ মুগ্ধ। আমাদের প্রত্যেকেরই 'কে আমি' এটি ভুল হয়ে গেছে। এ বিশ্ব সংসারে আমাদের অনেক জ্ঞানই আছে কিন্তু 'কে আমি' এই জ্ঞানটিই নেই। আমি জানি না—যে আমি কে। কৃষ্ণবিমুখজনকে মুগ্ধ করেন মহামায়া আর কৃষ্ণ-উন্মুখজনকে মুগ্ধ করেন যোগমায়া। যশোদানন্দসূনু—নন্দ মহারাজ এবং যশোদামায়ের পুত্র কৃষ্ণ। এখানে দুজনের নাম উচ্চারণের সার্থকতা কি? শুধু যশোদাসূনু বা নন্দসূনু বললেই হত। এখানে নন্দ অর্থ আনন্দদায়ী—মা যশোদার আনন্দদায়ী পুত্র।

মহারাজ পরীক্ষিৎ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছেন—কৃষ্ণে ব্রজবাসীর এমন প্রেম কেমন করে সম্ভব হয়? ব্রহ্মার গোবৎস হরণের পর কৃষ্ণ সবই সমাধান করেছিলেন কেবল কৃষ্ণের প্রতি ব্রজবাসীর অধিক প্রীতি কেন এটি সমাধান করতে পারেন নি। কৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান বটে কিন্তু এটি সমাধান করতে পারেন নি বলে তাঁর সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয় নি। এতে যুক্তি কি? প্রেমের ওপর ভগবানের কোন হাত নেই। প্রেম পরম স্বাধীন। প্রেম ভগবানকে অধীন করে—কিন্তু ভগবান প্রেমকে অধীন করতে পারেন না। কৃষ্ণ কেমন করে সকলের প্রিয় হতে পারেন? আত্মাই সকলের প্রিয় আর যা কিছু প্রিয় তা হল আত্মার প্রিয়তাতে প্রিয়। আত্মার পরে প্রিয় হল দেহ—দেহের পরে পুত্র বিত্ত গৃহ সম্পদ যা কিছু। পর পর স্নেহ কমে আসে। খুব মোটা বিছানাতে যেমন উপর থেকে জল ফেললে তলায় ভেজে না—এও তেমনি। আত্মার সঙ্গে প্রিয়তা সম্বন্ধে দেহে অধিক প্রিয়তা—এই প্রিয়তা ক্রমে ক্রমে কমে আসে। আত্মা হল নিরুপাধি প্রেমাস্পদ। পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে জীবাত্মা প্রিয় হয়। জীর্ণদেহেও জীবিতাশা বলীয়সী। এটি শুধু আত্মার প্রিয়তার জন্য। এই কে কার প্রিয় এই প্রিয়তা কেমন করে বুঝা যায়? যার জন্য কিছু ত্যাগ

করা যায় সে তার প্রিয়। সকল জীবের পক্ষেই এই একই ব্যবস্থা। আত্মা পরম প্রিয়—দেহের জন্য দেহ নয়—আত্মার জন্য দেহ। আত্মাকে রাখবার জন্য অর্থাৎ বাঁচবার জন্য দেহের অংশকেও বাদ দেওয়া যায়। যেমন পাখীর জন্যই খাঁচা—শুধু খাঁচার জন্য খাঁচা নয়।

আত্মার নাম দেহী। দেহ হল পাঞ্চভৌতিক। জীবের দেহ দেহী ভেদ আছে। কিন্তু কৃষ্ণকে দেহী বলতে পারা যায় না। কারণ তার আত্মাই সব। সচ্চিদানন্দঘন তনু—পাঞ্চভৌতিক দেহ বলে তার কিছু নেই। কৃষ্ণ অদৃশ্য হয়েও দেহীর মত দৃশ্য হয়েছেন। কৃষ্ণকে প্রণাম করা হয়েছে জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। কৃষ্ণের আত্মা এবং বিগ্রহ ভিন্ন নয়। বিগ্রহই আত্মা আবার আত্মাই বিগ্রহ। দুইই এক। সচ্চিদানন্দময় হয়েও দৃশ্য—কেন? কৃপয়া (মায়য়া)। কারণ দৃশ্য না হলে তাঁর সেবা করা যাবে না। এখন প্রশ্ন হতে পারে মায়া এখানে কপটতা অর্থ হবে না কেন? মায়া অর্থে এখানে যদি কপটতা ধরা যায় তাহলে কৃষ্ণকে জগদ্ধিতায় বলে প্রণাম করা যায় না। তাই এখানে মায়া অর্থে কৃপা নিতে হবে। কৃষ্ণকে যারা জানে অখিল জগৎ তাদের কাছে কৃষ্ণস্বরূপ। জগতের স্থাবর জঙ্গম যা কিন্তু সর্ব্ববস্তুর সত্তা কৃষ্ণের সত্তায় সত্তাবান্। দেহের যে চব্বিশটি বস্তু দশটি ইন্দ্রিয় পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র—আর মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার এ সব প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন—তাই এ সব প্রকৃতিতে থাকে। প্রকৃতি বিদ্যমান আছে বলেই এই চব্বিশটি আছে। যেমন মাটি যদি থাকে তাহলেই ঘট থাকবে। আবার এই প্রকৃতির সত্তা ভগবানে। ভগবানের সত্তায় প্রকৃতির সত্তা। কৃষ্ণকে বাদ দিলে কোন বস্তুর সত্তা নেই।

শ্রীব্রহ্মস্তুতির ফলশ্রুতি এই শ্লোকে বলা হয়েছে—

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশোমুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্ বিপদাং ন তেষাম্॥
ভাঃ ১০।১৪।৫৮

এখানে পুণ্য শব্দের অর্থ হল পরম পাবন। পাবনের যিনি পাবন তাঁকে বলা হয় পরম পাবন। কৃষ্ণপাদপদ্ম অবিদ্যারূপ অপবিত্রতাকে পবিত্র করে। তাই তিনি পরম পাবন। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চরণকে কল্পতরু বলা হয়েছে। কৃষ্ণচরণই হল অদ্বিতীয় আশ্রয়— কাদের আশ্রয়—মহতামপি অর্থাৎ শিব বিরিঞ্চি পর্য্যন্ত সকলের আশ্রয়। এই চরণ যারা সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করে অর্থাৎ অকপটে আশ্রয় করে। কোন কপটতা করে আশ্রয় করলে চলবে না। শিশু খাট থেকে অকপটে মা বলে ঝাঁপ দিয়ে কখনও ঠকে না। মা তাকে কোলে তুলে নেবেই। তেমনি আমাদেরও সংসার খাট থেকে 'হা গোবিন্দ' বলে ঝাঁপ দিতে হবে। অকপটে ঝাঁপ দিলে তিনি আশ্রয় দেবেনই। আমাদের কখনও ঠকতে হবে না। ভবসাগর তখন গোবৎসপদ হয়ে যাবে। তাই বৎসপদ উত্তীর্ণ হয়েছি বা হতে হবে এ চিন্তাই থাকবে না। শ্রীজীবপাদ বলেছেন—ভক্ত মুক্তিকে তুচ্ছ করে—মুক্তি হবে বা হয়েছে কোন দৃষ্টিই তার থাকে না। পাদপদ্মের আনন্দে বৃন্দাবন রজঃ প্রাপ্তি হয়। বৈকুণ্ঠপদও তখন তাদের তুচ্ছ হয়। তারা কখনও বিপদ্ ভোগ করে না। কৃষ্ণবিস্মৃতিই বিপদ্—আর কৃষ্ণস্মৃতিই— পরম সম্পদ। শ্রীশুকদেব বলছেন—মহারাজ, এই সব বালক বাছুর, তৃণ ধেণু, বেত্র শিঙ্গা সবই অপ্রাকৃত স্বরূপ। এই ব্রহ্মস্তুতি যিনি শোনেন বা কীর্ত্তন করেন তিনিই অখিল সম্পদ লাভ করেন। আর যিনি সম্যক্ ভাবে আশ্রয় করেন তার কথা আর কি বলা যায়।

—o—